সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

১০ম খন্ড

কোরআনের অনুবাদ
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ



আল কোরআন একাডেমী লন্ডন



সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর
ফী যিলালিল কোরআন

১০ম খন্ড
সূরা ইউনুস
থেকে
সূরা হুদ

কোরআনের অনুবাদ ও
তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

এ খণ্ডের অনুবাদ
মাওলানা সোলায়মান ফারুকী
হাফেজ আকরাম ফারুক



আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

(১০তম খন্ড সূরা ইউনুস থেকে সূরা হুদ)

প্রকাশক
খাদিজা আখতার রেজায়ী
ডাইরেক্টর আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
স্যুট ৫০১ ইন্টারন্যাশনাল হাউজ ২২৩ রিজেন্ট ষ্ট্রীট, লন্ডন ডব্লিউ ১বি ২কিউডি
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪ মোবাইল: ০৭৯৫৬ ৪৬৬৯৫৫

বাংলাদেশ সেন্টার
১৭ এ-বি কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ ওয়েস্ট পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫৮৫২৬

বিক্রয় কেন্দ্র : ৫০৭/১ ওয়ারলেস রেল গেইট (জামে মাসজিদ দোতলা), বড় মগবাজার ঢাকা
১১ ইসলামী টাওয়ার, (নীচতলা), দোকান নং ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭

প্রথম সংস্করণ ১৯৯৮

৮ম সংস্করণ
সফর ১৪৩১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ মাঘ ১৪১৬

কম্পোজ
আল কোরআন কম্পিউটার

বিনিময়: দুইশত বিশ টাকা মাত্র

Bengali Translation of Tafseer

'Fi Zilalil Quran'

Author

Syed Qutb Shaheed

Translator of Quranic text into Bengali
&
Editor of Bengali rendition
Hafiz Munir Uddin Ahmed

10th Volume
(Surah Younus & Surah Hood)

Published by
Khadija Akhtar Rezayee
Director Al Quran Academy London
Suite 501 International House 223 Regent Street London W1B 2QD
Phone & Fax : 0044 020 7274 9164 Mob : 07956 466955

Bangladesh Centre
17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205
Phone & Fax : 00880-2-815 8526
Sales Centre: 507/1 Wireless Railgate, (Masjid Complex 1st Floor)
11 Islami Tower (Garand Floor), Stall No- 36, Bangla Bazar, Dhaka
Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997

1st Edition 1998
8th Edition
Safar 1431 February 2010
Price Tk. 220 .00
E-mail: info@alquranacademylondon.co.uk website: www.alquranacademylondon.co.uk
ISBN- 984-8490-41-8

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একদিন যে মানুষটিকে
স্বয়ং আরশের মালিক
আল্লাহ জাল্লা জালা'লুহু
কোরআনের তোহফা দিয়ে মহিমান্বিত করেছিলেন,
আমাদের মতো নগণ্য বান্দার পক্ষে
তাঁকে কোনো উপহার দেয়ার ধৃষ্টতা
সত্যিই বড়ো বেমানান!

আসমানযমীন, চাঁদসুরুজ, মহাদেশমহাসাগর
তথা সারে জাহানের সবটুকু রহমত
যার পবিত্র নামে উৎসর্গিত
তার নামে আবার কার উৎসর্গ প্রয়োজন?
কোরআনের মহান বাহককে
কোরআনের এই তাফসীরের নিবেদন
কোনো নিয়মতান্ত্রিক উৎসর্গ নয়

এ হচ্ছে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার
আমাদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র

মানবতার মুক্তিদূত
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
রাহমাতুললিল আ'লামীন
হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহ্‌সান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক–এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, এই মহান গ্রন্থের কোথাও যদি কখনো কোনো ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নযরে পড়ে তাহলে কোরআনের স্বার্থেই তা মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামের কাছেও আমাদের বিনীত নিবেদন, এই কেতাব আপনার-আমার কারোর নয়– হেদায়াতের এ মহান উৎসটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাই একে যথাসম্ভব নির্ভুল করার প্রচেষ্টায় আপনি আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিলে আমরা আনন্দের সাথেই তা গ্রহণ করবো এবং সেই আলোকে আগামী সংস্করণগুলোকে আরো সুন্দর, আরো নিখুঁত করার প্রয়াস পাবো।

৯৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত– এই ৯ টি বছর যারা সর্বাবস্থায় আমাদের সাথিত্য দিয়েছেন গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ মানুষের প্রিয় 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'কে নতুন সাজে সাজানোর সুখবরটুকু আমরা তাদের দিতে চাই। আসলে এ কাজটি আমাদের নয় বছর আগেই করা উচিৎ ছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে ক্ষমা করুন।

'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'–এর গায়ে এখন থেকে আমরা যে নতুন সাজ পরাতে চাই, তা হচ্ছে গোটা তাফসীর জুড়ে এর সূচীপত্র জুড়ে দেয়া। গত নয় বছরে বহুবার আমরা একথাটি অনুভব করেছি, যে এই মহান তাফসীরটি থেকে আরো বেশী উপকার পাবার জন্যে এই তাফসীরে একটা পূর্ণাংগ সূচীপত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন থেকে কোন্ বিষয় কোন্ খন্ডের কোথায় পাওয়া যাবে এটা জানার জন্যে একজন সন্ধিৎসু পাঠককে সারা তাফসীরের আট হাজার পৃষ্ঠা চষে বেড়াতে হবেনা। এখন প্রতিটি খন্ডের সূচীপত্র দেখে পাঠক সহজেই নিজের প্রয়োজনীয় অংশ বেছে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় দিকটি ছিলো এই তাফসীরে ব্যবহৃত মূল কোরআনের অংশকে নতুন করে বিন্যাস সাধন করা। এই পূনর্বিন্যাসের ফলে তাফসীরের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এর দামও কমে আসবে। যারা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ এই তাফসীরটিকে আরো সুন্দর দেখতে চান তাদের আমরা আর মাত্র কয়েকটি মাস সময় ধৈর্য্য ধরার আবেদন জানাবো। আল্লাহর তায়ালার ওপর ভরসা করে আমরা এ মাস থেকেই এই পুর্নবিন্যাস প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আপনার হাতে এখন যে কপিটি আছে তা আমাদের এ নতুন প্রক্রিয়ারই অংশ।

বিদায়ের আগে উর্ধাকাশের দিকে গুনাহর হাত বাড়িয়ে বলি ঃ 'রাব্বানা লা তুয়াআখেযনা ইন নাসীনা আও আখতা'না'–'হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কোথাও কিছু ভুলে গিয়ে থাকি কিংবা কোথাও যদি আমরা কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে বসি–তুমি তার কোনোটার জন্যেই আমাদের পাকড়াও করো না। তুমি আমাদের শাস্তি দিয়ো না।' আমীন! ছুম্মা আমীন!!

খাদিজা আখতার রেজায়ী

লন্ডন
জানুয়ারী ২০০৩

সম্পাদকের নিবেদন

আহনাফ বিন কায়েস নামক একজন আরব সর্দারের কথা বলছি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তার সাহস ও শৌর্য ছিলো অপরিসীম। তার তলোয়ারে ছিলো লক্ষ যোদ্ধার জোর। ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি, তবে নবীর বহু সাথীকেই তিনি দেখেছেন। এদের মধ্যে হযরত আলীর (রা.) প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো অপরিসীম।

একদিন তার সামনে এক ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াতটি পড়লেন, 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কেতাব নাযিল করেছি, যাতে 'তোমাদের কথা' আছে, অথচ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।' (সূরা আল আম্বিয়া, ১০)

আহনাফ ছিলেন আরবী সাহিত্যে গভীর পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি ভালো করেই বুঝতেন 'যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে' এই কথার অর্থ কি? তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, কেউ বুঝি তাকে আজ নতুন কিছু শোনালো! মনে মনে বললেন, 'আমাদের কথা' আছে, কই কোরআন নিয়ে আসো তো? দেখি এতে 'আমার' কথা কী আছে? তার সামনে কোরআন শরীফ আনা হলো, একে একে বিভিন্ন দল উপদলের পরিচিতি এতে পেশ করা হচ্ছে–

একদল লোক এলো, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো যে, 'এরা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহখাতার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে।' (সূরা আয যারিয়াত, ১৭-১৯)

আবার একদল লোক এলো, যাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'তাদের পিঠ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, তারা অকাতরে আমার দেয়া রেযেক থেকে খরচ করে।' (সূরা হা-মীম সাজদা-১৬)

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তার পরিচয় হলো আরেক দল লোকের সাথে। তাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'রাতগুলো তারা নিজেদের মালিকের সেজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়।' (সূরা আল ফোরকান-৬৪)

অতপর এলো আরেক দল মানুষ, এদের সম্পর্কে বলা হলো, 'এরা দারিদ্র ও সাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায় (আল্লাহর নামে) অর্থ ব্যয় করে, এরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরা মানুষদের ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

এলো আরেকটি দল, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো যে, 'এরা (বৈষয়িক প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদেরই ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে তারা বড়ই সফলকাম।' (সূরা আল হাশর-৯)

একে একে এদের সবার কথা ভাবছেন আহনাফ। এবার কোরআন তার সামনে আরেক দল লোকের কথা পেশ করলো, 'এরা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যখন এরা রাগান্বিত হয় তখন (প্রতিপক্ষকে) মাফ করে দেয়, এরা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলে, এরা নামাজের প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে।' (সূরা আশ্-শুরা, ৩৭-৩৮)

হযরত আহনাফ নিজেকে নিজে ভালো করেই জানতেন। আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত এ লোকদের কথাবার্তা দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তো এই বইয়ের কোথাও 'আমাকে' খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কই? আমার ছবি তো এর কোথায়ও আমি দেখলাম না, অথচ এ কেতাবে নাকি তুমি সবার কথাই বলেছো।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে কোরআনে নিজের ছবি খুঁজতে শুরু করলেন। এ পথেও তার সাথে বিভিন্ন দল উপদলের সাক্ষাত হলো। প্রথমত, তিনি পেলেন এমন একটি দল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকার করে এবং বলে, আমরা কি একটি পাগল ও কবিয়ালের জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো?' (সূরা আছ ছাফফাত ৩৫-৩৬) তিনি আরো সামনে এগুলেন, দেখলেন আরেক দল লোক। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয় তখন এদের মন আনন্দে নেচে ওঠে।' (সূরা আয যুমার, ৪৫)

তিনি আরো দেখলেন, কতিপয় হতভাগ্য লোককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'তোমাদের কিসে জাহান্নামের এই আগুনে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতাম না, আমরা গরীব মেসকীনদের খাবার দিতাম না, কথা বানানো যাদের কাজ—আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করতাম, এভাবেই একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাযির হয়ে গেলো।' (সূরা আল মোদ্দাসসের, ৪২-৪৬)

হযরত আহনাফ কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন চেহারা ছবি ও তাদের 'কথা' দেখলেন। বিশেষ করে এই শেষোক্ত লোকদের অবস্থা দেখে মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, এ ধরনের লোকদের ওপর আমি তো ভয়ানক অসন্তুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

তিনি নিজেকে নিজে ভালো করেই চিনতেন, তিনি কোনো অবস্থায়ই নিজেকে এই শেষের লোকদের দলে শামিল বলে ধরে নিতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে প্রথম শ্রেণীর লোকদের কাতারেও শামিল করতে পারছেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। তার স্থান যদিও প্রথম দিকের সম্মানিত লোকদের মধ্যে নয় কিন্তু তাই বলে তার স্থান মুসলমানদের বাইরেও তো নয়!

তার মনে নিজের ঈমানের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তেমনি নিজের গুনাহখাতার স্বীকৃতিও সেখানে সমানভাবে মজুদ ছিলো। কোরআনের পাতায় তাই এমন একটি ছবির সন্ধান তিনি করছিলেন, যাকে তিনি একান্ত 'নিজের' বলতে পারেন। তার সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়ার প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। তিনি নিজের নেক কাজগুলোর ব্যাপারে যেমন খুব বেশী অহংকারী ও আশাবাদী ছিলেন না, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকেও তিনি নিরাশ ছিলেন না। কোরআনের পাতায় তিনি এমনি একটি ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের ছবিই খুঁজছিলেন এবং তার একান্ত বিশ্বাস ছিলো এমনি একটি মানুষের ছবি অবশ্যই তিনি এই জীবন্ত পুস্তকের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন।

কেন, তারা কি আল্লাহর বান্দা নয় যারা ঈমানের 'দৌলত' পাওয়া সত্ত্বেও নিজেদের গুনাহ্র ব্যাপারে থাকে একান্ত অনুতপ্ত। কেন, আল্লাহ তায়ালা কি এদের সত্যিই নিজের অপরিসীম রহমত থেকে মাহরূম রাখবেন? এই কেতাবে যদি সবার কথা থাকতে পারে তাহলে এ ধরনের লোকের কথা থাকবে না কেন? এই কেতাব যেহেতু সবার, তাই এখানে তার ছবি কোথাও থাকবে না–এমন তো হতেই পারে না। তিনি হাল ছাড়লেন না। এ পুস্তকে নিজের ছবি খুঁজতে লাগলেন। আবার তিনি কেতাব খুললেন।

কোরআনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় সত্যিই হযরত আহনাফ 'নিজেকে' উদ্ধার করলেন। খুশীতে তার মন ভরে উঠলো, আজ তিনি কোরআনে নিজের ছবি খুঁজে পেয়েছেন, সাথে সাথেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই তো আমি!

'হ্যাঁ এমন ধরনের কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে। এরা ভালো মন্দ মিশিয়ে কাজকর্ম করে–কিছু ভালো কিছু মন্দ। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা এদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো দয়ালু বড়ো ক্ষমাশীল। (সূরা আত্ তাওবা ১০২)

হযরত আহনাফ আল্লাহর কেতাবে নিজের ছবি খুঁজে পেয়ে গেলেন, বললেন, হাঁ, এতোক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি। আমি আমার গুনাহর কথা অকপটে স্বীকার করি, আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও আমি অস্বীকার করি না। এটা যে আল্লাহর একান্ত দয়া তাও আমি জানি। আমি আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ নই। কেননা এই কেতাবই অন্যত্র বলছে, 'আল্লাহর দয়া থেকে তারাই নিরাশ হয় যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।' (সূরা আল হেজর ৫৬)

হযরত আহনাফ দেখলেন, এসব কিছুকে একত্রে রাখলে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে তার 'ছবি'। কোরআনের মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজের এ গুনাহগার বান্দার কথা তাঁর কেতাবে বর্ণনা করতে সত্যি ভুলেননি!

হযরত আহনাফ কোরআনের পাঠকের কথার সত্যতা অনুধাবন করে নীরবে বলে উঠলেন হে মালিক, তুমি মহান, তোমার কেতাব মহান, সত্যিই তোমার এই কেতাবে দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানী, পাপী-তাপী, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সবার কথাই আছে। তোমার কেতাব সত্যিই অনুপম!

❑ ভারতীয় উপমহাদেশের মহান ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তার এক রচনায় হযরত আহনাফ বিন কায়েসের এ ঐতিহাসিক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আহনাফের এই গল্পটি পড়ার পর এক সময় আমিও তার মতো কোরআনের পাতায় পাতায় নিজের ছবি খুঁজেছি। খুঁজতে গিয়ে একেকবার হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, চিন্তায় ডুবে গেছি বহুবার। সন্ধান করেছি কোরআনের এমন একটি তাফসীরের যা 'আমাকে' আমার চোখে আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরবে।

❑ আমার আজো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঢাকার রাজপথ। প্রচন্ড রোদ মাথায় নিয়ে পুরানা পল্টন দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে চলেছে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার দিকে। মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগানঃ মানবতার দুশমন ইসলামের দুশমন নাসের নিপাত যাক, ইখওয়ানকে বেআইনী করা চলবে না, ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুবের মুক্তি

চাই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ইসলামের পতাকাবাহী একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তৌহিদী জনতার এই মিছিলে সেদিন আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

মাত্র এক বছর আগে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। মফস্বল শহর থেকে রাজধানী শহরে এসেছি মাত্র দু'বছর আগে। দেশীয় রাজনীতির কিছুই যেখানে বুঝি না, সেখানে হাজার হাজার মাইলের দূরবর্তী দেশ মিসরে কি হচ্ছে তা জানবো কি করে? আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এই মিছিলে অংশ গ্রহণের আগে অনেকের মতো আমিও 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর নেতা সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতাম না।

এরপর এলো সেই ৬৬ সালের ২৯ আগস্টের কালো রাত্রি। শুনলাম হযরত মুসার পুন্যভূমি মিসরে ফেরআউনের প্রেতাত্মা জামাল নাসের ইখওয়ানুল মুসলেমুনের বরেণ্য নেতা মুসলিম জাহানের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না, ফেরাউন স্বয়ং বেঁচে থাকলে সে যে কাজ করতো আজ তার এই নিকৃষ্ট অনুসারী তাই-ই করতে উদ্যত হলো! ফেরাউনও এই হুংকার দিয়েছিলোঃ 'অবশ্যই আমি কেটে দেবো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলীতে চড়িয়ে দেবো।' (সূরা আল আরাফ, ১২৪)

আর এই নরাধম সেই মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদের (আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাদের সবার ওপর) অনুসারী কতিপয় বান্দাকে সত্যিই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলো! সারা দুনিয়ার মুসলিম জনতার ব্যাপক দাবী দাওয়ার প্রতি যামানার নব্য ফেরাউন কোনো সম্মানই প্রদর্শন করলোনা!

সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসির এ হৃদয়বিদারক ঘটনা দুনিয়ার হাজার হাজার মুসলমানের মতো আমার মনেও তার সম্পর্কে জানার এক ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে গেলো। এই মহাপুরুষের জীবন সংগ্রাম, তার সাহিত্য সাধনা, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমার এ ব্যাকুলতাই একদিন আমাকে এই অমর চিন্তানায়কের তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

কিভাবে কোন সূত্রে এই গ্রন্থ আমি প্রথম দেখেছি তা আজ আর মনে নেই। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে আমি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকা কালে একবার এই পত্রিকার জন্যে শহীদ কুতুবের ওপর কিছু লিখতে গিয়েই সর্বপ্রথম 'ফী যিলালিল কোরআন' এর খোঁজ পাই।

৬৯ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। তাও আবার আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা–শহীদ কুতুবের তাফসীরে ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাষা। আল্লাহ তায়ালা আমার মরহুম আব্বা হযরত মাওলানা মানসুর আহমদ ও আমার মারহুমা আম্মা মোসাম্মত জামিলা খাতুনকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, তাদের চেষ্টা ও সান্নিধ্যে জীবনের প্রথম দিকে কোরআনের ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে তার ওপর ভিত্তি করেই এক সময় শহীদ কুতুবের সেই কালজয়ী তাফসীরটি পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু অচিরেই এটা আমি অনুভব করলাম যে, আমার জানা যে আরবীর দৌড় কোরআন হাদীস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা মোটেই এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়।

'ফী যিলালীল কোরআন'-এর আরবীতে প্রচুর পরিমাণ আধুনিকতার মিশ্রণ থাকায় তার মর্মোদ্ধারের জন্যে বুঝতে পারলাম আমার আরবীর গন্ডিকেও একটু বিস্তৃত করতে হবে। সুযোগ

সুবিধের সীমাবদ্ধতার কারণে 'ফী যিলালিল কোরআনের' গহীন সাগরে ডুব দিয়ে এর মুক্তা আহরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কোনোদিনই আমার হয়ে ওঠেনি। তবু আমি কখনো আমার মনে সে আগ্রহের মৃত্যু হতে দেইনি।

অতপর ১৯৭৯ সালে লন্ডনে এসে আমি আরবী সাহিত্যের একটা বিস্তৃত পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলাম। আবার সেই লালিত আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তবে এবার কিছুটা ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ধরনে। 'ফী যিলালিল কোরআন' পড়ে এর মর্মোদ্ধার করাই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এবার আমার স্বপ্ন এই অমূল্য সৃষ্টিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা।

১৯৯৪ সালের প্রথম দিককার কথা।

১০ই জানুয়ারী সোমবার সারাদিনের কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু পড়তে, কিছু লিখতে বসলাম। প্রসংগক্রমে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর তরজমার কথা এলো, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জীবন সাথী খাদিজা আখতার রেজায়ীকেই সবার আগে বললাম। সব নেক কাজের মতো এখানেও সে আমাকে সাহস যোগালো, এমনকি শুরুর দিকে নিজের 'সেভিংস' ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে সে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশেও আবদ্ধ করে নিলো। কোরআনের মালিকের দরবারে আজ আমি দোয়া করি, জীবনভর 'কোরআনের ছায়াতলে' দেয়া তাঁর অগুনতি সহযোগিতার বিনিময়ে তুমিও তাকে 'আরশের ছায়াতলে' তোমার একান্ত সান্নিধ্যে রেখো!

সেদিনের সেই মুহূর্তটি ছিলো আমার জীবনের এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই আমি মূল তাফসীর খুলে এর ভূমিকাটা তরজমা করতে শুরু করলাম। কেন যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম এই মহান গ্রন্থটিকে বাংলায় রূপান্তরের জন্যে।

সে রাতটি ছিলো 'লায়লাতুল মেরাজ'। এই রাতেই আল্লাহর আদেশে আল্লাহরই এক নবী আল্লাহর আরশে গমন করলেন এবং বিশ্ব মানবের জন্যে মুক্তির মিশন নিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এলেন। মুক্তির সেই মিশনের পথ প্রদর্শক হচ্ছে আল কোরআন। জানি না এর তরজমার দিনক্ষণটির সাথে এই সম্মানিত রাতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না—না এটা নিছক একটি ঘটনামাত্র!

'ফী যিলালিল কোরআন' এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম দিয়েই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে। (এর মানে হচ্ছে 'কোরআনের ছায়াতলে')। ইসলামী জীবন দর্শনের একজন একনিষ্ঠ সাধক তার জীবনের যে দিনগুলো কোরআনের ছায়াতলে কাটিয়েছেন তারই জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, 'ফী যিলালিল কোরআন'। তিনি তার মূল ভূমিকায় এই তাফসীরের প্রতিপাদ্য নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের এই মূল ভূমিকা 'কোরআনের ছায়াতলে' সহ আরো কিছু প্রবন্ধ আমরা এই তাফসীরের প্রথম খন্ডে প্রকাশ করেছি। আশাকরি এর সাথে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলোও আপনার কাজে লাগবে। এক, শহীদের সংগ্রামী জীবনালেখ্য 'সাইয়েদ কুতুব শহীদ একজন মহান মোফাসসের' দুই, তারই একটি মূল্যবান প্রবন্ধের বাংলা রূপান্তর 'আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক', সর্বশেষে যে গ্রন্থটি লেখার জন্যে তাঁকে ফাসির কাষ্টে ঝুলতে হয়েছিলো সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মায়ালেম ফিত তারীক'-এর ভূমিকা। যে নামে আমরা এর অনুবাদ পেশ করেছি তা হচ্ছে, 'কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র'। মূল তাফসীর পড়ার আগে এই লেখাগুলো একবার পড়ার জন্যে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো।

আল কোরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থের নাম, আল কোরআন একটি চালিকা শক্তির নাম, সর্বোপরি আল কোরআন একটি জীবন্ত আন্দোলনের নাম। জাহেলিয়াতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত

একদল মানুষের জীবনকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করার জন্যেই আল্লাহর এক সাহসী বান্দার ওপর এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুতরাং এই পুস্তক থেকে হেদায়াত পেতে হলে এই কেতাবের প্রদর্শিত সেই সাহসী বান্দার সংগ্রামের পথ ধরেই আমাদের এগুতে হবে।

আরেকটি কথা,

'ফী যিলালিল কোরআন' আরবী কোরআনের আরবী তাফসীর, তাই মূল লেখকের এতে কোরআনের কোনো তরজমা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু আমাদের বাংলাভাষীদের তো সে প্রয়োজন রয়েছে। এই তাফসীরে কোরআনের যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা একান্ত আমার নিজস্ব। এর যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও ক্রটি-বিচ্যুতির দায়িত্বও আমার একার। বাজারে প্রচলিত কোনো 'অনুবাদ' গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগিতে কথ্য ভাষার এক নতুন 'স্টাইল' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন কোরআনের পাঠক শুধু তরজমা পড়েই যেন কোরআনের বক্তব্য বুঝতে পারেন সেটাই হচ্ছে এই নতুন ধারার লক্ষ্য। অনুবাদের এই নতুন স্টাইলে আমি যদি সফল হই তবে তা হবে একান্তভাবে আমার মালিকেরই দয়া, আর ব্যর্থ হলে তা হবে আমারই অযোগ্যতা ও অক্ষমতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমি 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' সমাপ্ত করার সীমাহীন তাগাদায় দিন কাটাচ্ছিলাম তখন এই নতুন ধারার অনুবাদটিকে আলাদা গ্রন্থাকারে পেশ করার স্বপ্ন বহুবারই আমার মনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর এখন সে প্রতিক্ষীত স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশেষে ২০০২-এর মার্চ মাসে ঢাকায় 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' গ্রন্থটির উদ্বোধনী উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভাইস চ্যান্সেলর, কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকসহ দেশের বহু জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। সেই থেকে শুরু করে গত কয়েক মাসে এই গ্রন্থটির আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা কোরআন পিপাসু অনেকের মনেই নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। আল্লাহ তায়ালার অগনিত বান্দার কাছে এখন কোরআন বুঝা যেন আগের চেয়ে কিছুটা সহজ মনে হচ্ছে। এই কেতাবের পাতায় তারা এখন দেখতে পেলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে আসলেই বান্দার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছেন। নিযুত কোটী সাজদা আল্লাহ তায়ালার দরবারে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একজন নিবেদিত কোরআন কর্মীর দিবস রজনীর পরিশ্রমকে কবুল করেছেন। হে আল্লাহ! মহা বিচারের দিনে এই ওসীলায় আমি তোমার শুধু ক্ষমাটুকুই চাই।

আমি আর বেশীক্ষণ আপনাদের এই অশান্ত বিয়াবানে অপেক্ষা করাবো না। আমরা সবাই এখন এক সাথে আশ্রয় নেবো 'ফী যিলালিল কোরআন' তথা- কোরআনের ছায়াতলে। কোরআনের এই সুনিবিড় ছায়াতল আমাদের দুনিয়া আখেরাতে সার্বিক প্রশান্তি আনয়ন করুক, এর ছায়াতলে এসে যেন আমরা সবাই এই কেতাবে নিজের ছবিকে আরো পরিষ্কার করে দেখি এবং সে মোতাবেক নিজেকে যথাসম্ভব ক্রটিমুক্ত করে তুলতে পারি, এই মহান গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে গ্রন্থের মালিকের দরবারে এই হোক আমাদের ঐকান্তিক দোয়া।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত,

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
সম্পাদক 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'
অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রকল্প ও
ডাইরেক্টর জেনারেল আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

জানুয়ারী ১৯৯৫

এই খন্ডে যা আছে

সূরা ইউনুস

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আমরা পুনরায় কোরআনের মক্কী অংশের দিকে ফিরে আসছি। মক্কী কোরআনের প্রেক্ষাপট, বক্তব্য, চেতনা ও প্রেরণা সবই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইতিপূর্বে আমরা যে সূরা আনফাল ও তাওবা নিয়ে আলোচনা করেছি, ওই দুটোই ছিলো মাদানী।

কোরআনের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। এই সাধারণ বৈশিষ্টের দিক দিয়ে তার মক্কী ও মাদানী অংশ উভয়ই সমান। অনুরূপভাবে, অন্যান্য মানব রচিত বাণীর সাথে আল্লাহর কালামের যে পার্থক্য, সে দিক দিয়েও মক্কী ও মাদানী অংশ সমান। এতদসত্তেও কোরআনের মক্কী অংশের কিছু অসাধারণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, রয়েছে তার বিশেষ পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট এবং বিশেষ স্বাদও, যা তার আলোচ্য বিষয় দ্বারাই চিহ্নিত হয়ে থাকে। (তার এই আলোচ্য বিষয় হলো সংক্ষেপে– প্রভুত্ব, দাসত্ব, প্রভু ও গোলামের মধ্যকার সম্পর্ক, মানব জাতিকে তাদের সেই প্রকৃত প্রভু ও মনিবের সাথে পরিচিত করা, যার প্রতিটি হুকুম বা বিধান মেনে চলা তার কর্তব্য, সঠিক ও স্বাভাবিক আকীদা বিশ্বাসের ওপর থেকে সব রকমের বিভ্রান্তি ও বিকৃতি দূর করা এবং মানব জাতিকে তাদের প্রকৃত মনিব ও প্রভুর আনুগত্য করতে উদ্বুদ্ধ করা) অনুরূপভাবে, মক্কী অংশের বিশেষ বাচনভংগির কারণেও তাতে একটা বিশেষ স্বাদ ও মজা অনুভূত হয়ে থাকে। এই বাচনভংগি অত্যন্ত তাৎপর্যময় ও গভীর প্রভাব বিস্তারকারী। শব্দ চয়ন থেকে বিষয়গত চমৎকারিত্ব পর্যন্ত যাবতীয় ভাষাগত বৈচিত্র্য এই প্রভাব সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে। এ বিষয়ে আমরা সূরা আনয়ামেও আলোচনা করে এসেছি। (সূরা আনয়াম ও আরাফের ভূমিকা দ্রষ্টব্য) আর এখানেও ইনশাআল্লাহ কিছুটা আলোচনা করবো।

ইতিপূর্বে পরপর দুটো মক্কী সূরা আনয়াম ও আরাফের তাফসীর পেশ করেছি। ওই সূরা দুটো ধারাবাহিকভাবে নাযিল না হলেও কোরআনে ধারাবাহিকভাবে স্থান পেয়েছে। তারপর এসেছে মাদানী সূরা আনফাল ও তাওবা। উভয়ের রয়েছে মদীনার সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচ্য বিষয়, প্রেক্ষাপট ও প্রকৃতি। এবার আমরা যে দুটো মক্কী সূরায় ফিরে যাচ্ছি, তা হচ্ছে সূরা ইউনুস ও হূদ। এ দুটো যেরূপ ধারাবাহিকভাবে নাযিল হয়েছে, সেরূপ ধারাবাহিকভাবেই কোরআনেও স্থান পেয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, সূরা আনয়াম ও আরাফের সাথে এই দুটো সূরার আলোচ্য বিষয় ও বাচনভংগি উভয় দিক দিয়েই চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে। সূরা আনয়ামে ইসলামের আকীদা বিশ্বাস আলোচিত হয়েছে। সেই সাথে আলোচিত হয়েছে এ আকীদার প্রতি অজ্ঞতা ও বিরোধিতার বিষয়টি। অতপর এই অজ্ঞতা তথা জাহেলিয়তকে বিশ্বাসে, চেতনায়, এবাদাতে ও কর্মে সর্বক্ষেত্রেই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। সূরা আরাফের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পৃথিবীতে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের গতি ও পরিণতি এবং এ আকীদা কিভাবে সমগ্র ইতিহাস জুড়ে জাহেলিয়তের মুখোমুখি হয়েছে তাও। সূরা ইউনুস ও হূদেও আমরা আলোচ্য বিষয় ও বাচনভংগি উভয় দিক দিয়েই যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করি। তবে সূরা আনয়াম সূরা ইউনুস থেকে খানিকটা ভিন্ন প্রকৃতির। আনয়ামের বাচনভংগি মনমগজের ওপর অনেক বেশী প্রভাব বিস্তারকারী, অনেক দ্রুত ও জোরদার আবেগ সৃষ্টিকারী এবং গতিশীলতায় ও দৃশ্য অংকনে অনেক বেশী তেজস্বী ও নিপুণ। আর সূরা ইউনুস অপেক্ষাকৃত ধীর, ঠান্ডা, কোমল ও প্রাঞ্জল বাচনভংগির অধিকারী। পক্ষান্তরে সূরা হূদ বিষয়বস্তু, বাচনভংগি এবং আবেগ ও উদ্দীপনা সৃষ্টিতে সূরা আরাফের সাথে অত্যধিক সাদৃশ্যপূর্ণ, এ সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র সত্তেও সামগ্রিকভাবে প্রত্যেক সূরারই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও পৃথক সত্তা রয়েছে।

কোরআনের মক্কী অংশের সামগ্রিক আলোচ্য বিষয় যা, সূরা ইউনুসের মূল আলোচ্য বিষয়ও হুবহু তাই এবং সেটা আমরা একটু আগেই বর্ণনা করেছি। এ সূরা তার নিজস্ব ভংগিতেই তার আলোচ্য বিষয়কে তুলে ধরে। তার এ ভংগি ও বর্ণনা পদ্ধতি দ্বারা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ ফুটে ওঠে। সূরার এ ভূমিকায় আমি ওই আলোচ্য বিষয়গুলোকে একে একে সংক্ষেপে তুলে ধরবো। বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা এখানে সম্ভব নয়। তবে যথাস্থানে সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে যতটা সম্ভব বিশদ আলোচনা ও করা হবে।

ফ সূরাটির শুরুতেই রসূল (স.)-এর কাছে ওহীর আগমন সম্পর্কে ও সেই সাথে প্রাসংগিকভাবে কোরআন সম্পর্কে মক্কার মোশরেকদের মনোভাব ও দৃষ্টিভংগির পর্যালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, একজন মানুষের কাছে ওহী নাযিল হওয়া তেমন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। আর এ কোরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে রচিত গ্রন্থও নয়। আয়াত ১, ২, ১৫, ১৬, ৩৭ ও ৩৮ দ্রষ্টব্য।

ফ মক্কার মোশরেকরা রসূল (স.)-এর কাছে কোরআন ছাড়া অন্য একটা বস্তুগত অলৌকিক নিদর্শনের দাবী জানাতো এবং শাস্তি আযাবের যে সব হুমকি ও হুশিয়ারী তাদেরকে দেয়া হতো, সেটা তারা তাড়াতাড়ি পেতে চাইত। এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন, কোরআনই হলো ইসলামের নিদর্শন। এর যে অলৌকিক ভাষাগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেটা এর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ এবং কাফেরদের প্রতি এক উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ। নিদর্শন কারো চাওয়ার ওপর নির্ভর করে না। ওটা নিরংকুশভাবে আল্লাহর ইচ্ছাধীন ও তাঁর এখতিয়ারাধীন। আর তাদেরকে কখন তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করাবেন, সেটাও তিনিই স্থির করবেন। নবী ও রসূল আল্লাহর বান্দা মাত্র। তাদের এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনোই ক্ষমতা নেই। এভাবে প্রকারান্তরে তাদের কাছে আল্লাহর ক্ষমতা ও বান্দার ক্ষমতার পরিচয়ও তুলে ধরা হয়েছে। আয়াত ১৩, ১৪, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১ ও ২০ দ্রষ্টব্য।

ফ আল্লাহর পরিচয় ও আল্লাহর সৃষ্টির পরিচয় নিয়ে তাদের মনে যে বিভ্রান্তি রয়েছে, রসূল (স.) সেই বিভ্রান্তি দূর করার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। কিন্তু তারা ওহীকে অস্বীকার করে ও তাতে সন্দেহ পোষণ করে। তারা অন্য এক কোরআন এবং অন্য এক নিদর্শন চায়, যা কোরআনের বিশুদ্ধতার প্রতীক। অথচ আদৌ কারো কোনো লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না এমন সব বস্তুর তারা পূজা করে থাকে। কারণ তাদের ধারণা ওইসব পূজনীয় বস্তু বা মূর্তি তাদের মুক্তির জন্যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞতাবশত এবং একেবারেই যুক্তিপ্রমাণ ছাড়া আল্লাহর সন্তানাদি আছে বলেও দাবী করে থাকে। এর জবাবে এ সূরা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে প্রকৃত ইলাহ তার গুণাবলী ও তাদের চার পাশের প্রকৃতিতে তাঁর সীমাহীন ক্ষমতার যে আলামত বিরাজ করছে, তা কি কি। তাদেরকে আরো জানিয়ে দিয়েছে প্রকৃত খোদার কি কি নিদর্শন স্বয়ং তাদের নিজ সত্ত্বার ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে এবং যে সব বিপদাপদ থেকে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উদ্ধার করতে সক্ষম নয়, সে সব বিপদের সময় তাদের বিবেক তাদের কাছে খোদার কি পরিচয় তুলে ধরে। এ সর্বশেষ বিষয়টা এ সূরার বহু জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। এ বিষয়টি সূরার ৪, ৫, ৬, ১৮, ২২, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬১, ৭০, ৫৫ আয়াতসমূহে দ্রষ্টব্য।

ফ সূরার কিছু কিছু অংশে মানুষকে এই মর্মে সচেতন করা হয়েছে যে, মানুষ যে কাজই করুক অথবা মনে মনে যে কোনো ইচ্ছাই পোষণ করুক, তা করার সময় আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থাকেন। এই বিষয়টি তার চেতনা ও স্নায়ুমন্ডলে ভয়ভীতি, সতর্কতা ও জাগরণ

এনে দেয়। ফলে সে স্বেচ্ছাচারী ও বেপরোয়া হতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ ৬১ নং আয়াতটি লক্ষ্য করুন। 'তুমি যে অবস্থাতেই থাকো না কেন, কোরআন পাঠ অথবা যে কোনো কাজই করো না কেন, আমি সেখানে উপস্থিত থাকি। ....'

ফ অনুরূপভাবে, এ সূরার কিছু আয়াত মানুষের মনে আল্লাহর আযাবের ভীতি সদা-জাগ্রত রাখে, যাতে করে প্রাচুর্য ও সচ্ছলতাজনিত উদাসীনতা থেকে তারা মুক্ত হতে পারে এবং চারদিকে সমৃদ্ধির জৌলুস দেখে প্রতারিত ও আল্লাহর সম্ভাব্য আকস্মিক আযাব সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে না যায়। যেমন ২৪, ৫০ ও ৫১ নং আয়াতে লক্ষণীয়।

ফ দুনিয়াবী জীবনের সুখ শান্তি পেয়েই কাফেরদের পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি, আখেরাতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিস্পৃহতা এবং আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়ে জবাবদিহীর অনিবার্যতা সম্পর্কেও এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে। তারপর এই বিভ্রান্তিকর পরিতৃপ্তি এবং এই তৃপ্তিদায়ক হীন কারবারের ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। তারপর জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবন নিছক পরীক্ষা। কর্মফল শুধু আখেরাতেই পাওয়া যাবে। অতপর কেয়ামতের দৃশ্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষত, দুনিয়াতে যাদেরকে মোশরেকরা আল্লাহর শরীক বানাতো, কেয়ামতের দিন সেই শরীকগণ কর্তৃক তাদের উপাসকদেরকে অস্বীকার ও আগ্রহ্য করার দৃশ্য, তাদেরকে আল্লাহর হাতে সোর্পদ করে নিজেদেরকে নিরপরাধ বলে দাবী করার দৃশ্য এবং যতো বড় আকারেই জরিমানা সাধা হোক, তা প্রত্যাখ্যাত হবার দৃশ্য। এটা সূরার যে আয়াতগুলোতে পাওয়া যায়, তা হলো ৭, ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৪৫, ও ৫৪ আয়াত)

ফ এরপর প্রভুত্ব সম্পর্কে কাফেরদের ভ্রান্ত ধারণা, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন ও আখেরাতকে অস্বীকার করা এবং ওহী ও তার সতর্কবাণীকে প্রত্যাখ্যানের ফলে তাদের ভেতরে জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন নিজেই রচনা করার যে প্রবণতা জন্মে সে সম্পর্কেও এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে তাদের পারস্পরিক লেনদেন ও হালাল হারাম নির্ণয়ে স্বেচ্ছাচারমূলক মনোভাব পোষণ এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য বাতিল ও ভুয়া খোদাদের প্ররোচনা অনুসারে এরূপ মনোভাব পোষণের বিষয়েও। বিশ্বাস সংক্রান্ত সমস্যার সাথে জড়িত ও তা থেকে সৃষ্ট সমস্যাবলীর মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। (আয়াত ৫৯-৬০)

সূরার উল্লেখিত আলোচিত বিষয়গুলোকে শ্রোতাদের অন্তরে গভীরভাবে ও দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করা এবং সে জন্য মন ও বিবেককে উদ্দীপিত করার উদ্দেশ্যে সূরায় আরো কিছু প্রভাব বিস্তারকারী ও তাৎপর্যবহ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে, যা সূরার সামগ্রিক ভাবধারার সাথে সাম স্যপূর্ণ। এ ধরনের কয়েকটি বিষয়কে এখানে সংক্ষেপে নমুনা স্বরূপ তুলে ধরা হচ্ছে। পরবর্তীতে তাফসীর আলোচনার সময় বিশদভাবে আলোচনা করবো ইনশা আল্লাহ।

ফ সূরাটিতে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাপকভাবে তুলে ধরা হয়েছে, এ সব দৃশ্য ও বৈশিষ্ট্য মানুষের মনমগযে আল্লাহর প্রভুত্ব, বিশ্বজগতের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় তাঁর প্রাজ্ঞ কর্মকান্ড, বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও পরিচালনায় তাঁর সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও সুপরিকল্পিত তৎপরতা, জগতে জীবন ও জীবের জন্ম ও অবস্থানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, বিশেষত মানব জাতির উপযোগী পরিবেশ ও সামগ্রী সৃষ্টি এবং তার সমস্ত জৈবিক প্রয়োজন পূরণে আল্লাহর নৈপুণ্য প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্ব বিধাতার বিদ্যমানতার বিষয়টিকেও কোরআন এরূপ জীবন্ত, বাস্তব ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে তুলে ধরে, কোনো দার্শনিক বা মনস্তাত্বিক বিতর্ক হিসাবে তুলে ধরে না। মহাবিশ্বের ও মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন যে, মানুষের স্বভাব প্রকৃতি এবং

মহাবিশ্বের দৃশ্য ও রহস্যের মাঝে একটা বোধগম্য ভাষার যোগসূত্র রয়েছে, রয়েছে নিরুত্তাপ মনস্তাত্ত্বিক যুক্তিতর্কের চেয়েও গভীর ও ঘনিষ্ঠ বন্ধন। আল্লাহর এও জানা আছে যে, মানুষের জন্মগত স্বভাব-প্রকৃতিকে কেবলমাত্র প্রকৃতির দৃশ্যাবলী ও রহস্যাবলীর প্রতি কৌতূহলী বানিয়ে দেয়াই তাঁর সঠিক পথের সন্ধান লাভের জন্যে যথেষ্ট। তাকে শুধু এতোটুকু উদ্দীপিত করাই যথেষ্ট, যাতে তার সহজাত বোধশক্তি ও চেতনাশক্তি জেগে ওঠে। এ জন্যই কোরআনে মানুষের ফিতরাত তথা জন্মগত স্বভাব প্রকৃতি ও সহজাত যোগ্যতা ও ক্ষমতাকে সম্বোধন করে অনেক কথা বলা হয়েছে। নিম্নে এর কিছু নমুনা উল্লেখ করা যাচ্ছে,

'নিশ্চয় তোমাদের প্রভু সেই আল্লাহ, যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন ....' (আয়াত ৩, ৪)

'বলো, কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবিকা দিয়ে থাকেন..........' (আয়াত ৩১,৩২)

'তিনিই তোমাদের জন্যে রাতকে বিশ্রামের ও দিনকে দেখার যোগ্য বানিয়েছেন.......' (আয়াত ৬৭)

'বলো, তোমরা দেখ তো আকাশ ও পৃথিবীতে কী আছে...........' (আয়াত ১০১)

ফ কাফেররা যে সব ঘটনা ও অভিজ্ঞতা স্বচোখে দেখে থাকে এবং তারা যে সব ঘটনার প্রতিনিয়ত ভুক্তভোগী, অথচ সেগুলোর শিক্ষা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না, সে জাতীয় ঘটনা ও অভিজ্ঞতায় সূরাটা পরিপূর্ণ। শুধু তাই নয়, এই সব ঘটনা ও অভিজ্ঞতাকে তারা কিভাবে গ্রহণ করে তারও কিছু দৃশ্য এ সূরায় তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি যে সকল ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিসত্ত্বা সম্পর্কেও উদাসীন ও অচেতন, তাদের সামনেও আয়না রেখে তাদের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরে। সূরার নিম্নের আয়াতগুলোতে এর নমুনা লক্ষণীয়।

'মানুষের ওপর যখন বিপদ আসে, তখন সে দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া সর্বাবস্থায় আমাকে ডাকে............' (আয়াত ১২)

'যখনই আমি মানুষকে কষ্টের পর দয়ার স্বাদ গ্রহণ করাই, অমনি তারা আমার আয়াতগুলো নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে দেয়........(২১,২২,২৩)

ফ আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করার পরিণামে যারা আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়েছে, তাদের বহু ঘটনা এ সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। মক্কার কাফেরদের সামনে তাদের ধ্বংসের দৃশ্য তুলে ধরে তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে যে, এ ধরনের পরিণতি তাদেরও হতে পারে। কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তাদেরকে প্রতারিত না করে। কেননা দুনিয়ার জীবন পরীক্ষার একটা ক্ষুদ্র সময় মাত্র। এরপর তাদেরকে চিরস্থায়ী শক্তি অথবা আযাবের স্থানে চলে যেতে হবে। যেমন: 'তোমাদের পূর্বপর্তী জাতিগুলো যখন যুলুম (অর্থাৎ শেরেক) করেছে, তখন আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি........... । (আয়াত ১৩)

'তাদেরকে নূহের ঘটনা শুনিয়ে দাও'.......... (আয়াত ৭১,৭২,৭৩)

'তারপর মূসা ও হারূনকে পাঠিয়েছিলাম ফেরাউন ও তার দলবলের কাছে'........... (আয়াত ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৯২ ও ১০২)

ফ সূরাটিতে কোয়ামতের বহু দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। কাফের ও মোমেনদের পরিণামকে অত্যন্ত জীবন্ত ও প্রভাবশালী ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। পার্থিব জীবনে কাফেরদের ধ্বংস ও মোমেনদের নিস্তার লাভের দৃশ্যের পাশাপাশি আখেরাতেও উভয়ের পরিণামের দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, আয়াত ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ ও ৫৪ দ্রষ্টব্য।

সূরার কিছু সংখ্যক আয়াতে ওহী অস্বীকারকারী মোশরেকদেরকে কোরআনের মতো কোনো একটি আয়াত তৈরী করে নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে, দাওয়াত ও চ্যালেঞ্জ দেয়ার পর রসূল (স.)-কে তাদের নিয়ে চিন্তা না করা ও তাদেরকে তাদের কর্মফলের হাতে সোপর্দ করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। কেননা কাফের ও যালেমদের এটাই চিরন্তন পরিণতি। তাদের প্রতি দাওয়াত পৌছানোর কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করার পর তাদের নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে নিজের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রসূল (স.)-এর পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ প্রদান ও কাফেরদের সংস্রব ত্যাগের ঘোষণাই তাদের মনে কম্পন এনে দেয়, তাদের হঠকারিতাকে নওবড়ে করে দেয় এবং এ ধারণা সৃষ্টি করে যে, এ নবী তার আনীত সত্যের প্রতি অবিচল বিশ্বাস পোষণ করে এবং তার প্রভুর সাথে তার সম্পর্ক অটুট। নিম্নের আয়াতগুলোকে এ চ্যালেঞ্জ ও এ বলিষ্ঠ বক্তব্য এসেছে। (আয়াত ৩৭, ৩৮, ৩৯, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮ ও ১০৯)

এই চূড়ান্ত সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণার মধ্য দিয়েই সূরাটা শেষ হয়েছে। এই সাথে শেষ হলো এ সূরার আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এ সূরা সূরা বনী ইসরাঈলের পরে নাযিল হয়েছে। এ সময়ে কোরআন ও ওহীর ব্যাপারে মোশরেকদের আপত্তি ও অস্বীকৃতি এবং মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাস নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ তুংগে উঠেছিলো। তাই এ সূরায় কাফেরদের আকীদা বিশ্বাসের কঠোর সমালোচনা এবং তাদের জাহেলী কৃষ্টির নিন্দা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের আকীদা বিশ্বাসে যে সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতা রয়েছে, তাও ফাঁস করে দেয়া হয়েছে। কেননা একদিকে তারা বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, জীবীকাদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাদা ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী– যা কিনা হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর আনীত ঐশী আকীদা বিশ্বাসের অবশিষ্টাংশ। অপরদিকে ফেরেশতাদেরকে তারা আল্লাহর মেয়ে বলে বিশ্বাস করতো। তারা আল্লাহর কাছে তাদের জন্যে সুপারিশ করে আযাব থেকে মুক্ত করতে পারবে বলে ধারণা করতো। এ জন্য তাদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করতো। আর এরূপ ধারণা বিশ্বাস থেকে তাদের বাস্তব জীবনে যে ভ্রান্ত আচার আচরণ প্রকাশ পেতো, যেমন বিশেষ বিশেষ ফলমূল ও জীবজন্তুকে হালাল বা হারাম বলে তাদের পুরোহিতরা ঘোষণা করতো এবং তার একাংশ আল্লাহর জন্যে ও একাংশ তাদের কল্পিত দেব দেবীর জন্যে নির্ধারণ করতো।

তারা কোরআনের অনুসারীদের সাথে তাদের পরস্পর বিরোধী আকীদা নিয়ে তর্কবিতর্কে লিপ্ত হতো। একদিকে তার রসূল (স.)-এর রেসালাত ও তাঁর কাছে ওহী আসার কথা অবিশ্বাস করতো এবং তাঁকে জাদুকর বলে আখ্যায়িত করতো। অপরদিকে তাকেই তারা এমন কোনো অলৌকিক প্রমাণ দেখাতে বলতো, যা দ্বারা বুঝা যাবে যে, তিনি যথার্থই নবী এবং তাঁর কাছে ওহী আসে। অতপর তারা সেই সব উদ্ভট দাবী তুলতো, যার কথা সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৯ থেকে ৯৩নং আয়াত পর্যন্ত এবং সূরা ইউনুছের ২০নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে তারা রসূল (স.)-এর কাছে এমন একটা বিকল্প কোরআন উপস্থাপনের দাবী তুলতো, যাতে তাদের আকীদা বিশ্বাস, দেব দেবী ও জাহেলী রীতিনীতির কোনো নিন্দা সমালোচনা করা হবে না। সে রকম কোরআন আনা হলে তার ওপর তারা ঈমান আনবে। আল্লাহ এসম্পর্কে সূরা ইউনুসের আয়াত ১৫, ১৬ ও ১৭ তে বলেন,

'যখন তাদের কাছে আমার আয়াত পড়ে শোনানো হতো, তখন আমার সাথে সাক্ষাতে যারা বিশ্বাস করে না, তারা বলতো, এই কোরআনের পরিবর্তে অন্য একটা কোরআন নিয়ে এসো অথবা এটাকে বদলে দাও।.............'

এই হচ্ছে সূরার পটভূমি। সুরাটা আগাগোড়া পড়লে মনে হয়, এটা একটা অখন্ড সূরা এবং একটা নিকটবর্তী ঘটনাই তার লক্ষ্যবস্তু। ফলে তাকে বিভিন্ন পর্বে সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত করা কঠিন। পক্ষান্তরে অপর একটা মহল এ সূরার ৪০, ৯৪, ৯৫ ও ৯৬ নং আয়াতকে মদীনায় অবতীর্ণ বলে মনে করে। কেননা এ আয়াতগুলো সূরার মূল সুরের বিরোধী। আবার এর কোনো কোনো আয়াতকে বাদ দিলে গোটা সূরাই বেখাপ্পা লাগে।

সূরার সকল অংশের মধ্যে সংযোগ নিবিড় হওয়ার কারণে তার প্রথমাংশ ও শেষাংশের বক্তব্যে গভীর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন প্রথমাংশে বলা হয়েছে, 'আলিফ-লাম-রা, এ হচ্ছে বিজ্ঞানময় গ্রন্থের আয়াতসমূহ। মানুষের কাছে এটা কি বিস্ময়কর যে, আমি তাদেরই একজনের কাছে ওহী পাঠিয়েছি এবং একটি বলেছি যে, মানুষকে সতর্ক করো ও যারা ঈমান আনে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্যে সত্য মর্যাদা রয়েছে!......' আর শেষ আয়াতে বলা হচ্ছে, 'তোমার কাছে ওহী যোগে যা পাঠানো হয়, তার অনুসরণ করো এবং আল্লাহর সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করো। ....' অর্থাৎ সূরার প্রারম্ভিক ও সমাপনী উভয় বক্তব্যই ওহী বিষয়ক। আর এই প্রারম্ভ ও সমাপনীর মাঝখানে যা কিছু আলোচনা এসেছে, তাও ওহীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়েই আবর্তিত।

অনুরূপভাবে সূরার বিভিন্ন ভীতিপ্রদ বক্তব্যের মধ্যেও গভীর সংযোগ পরিলক্ষিত হয়। আযাবের হুমকিকে দ্রুত কার্যকর করার জন্যে কাফেররা যে দাবী জানাচ্ছিলো, তার জবাবকে আমরা এর অন্যতম উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করতে পারি। জবাবে বলা হয়েছে যে, আযাব এমন আকস্মিকভাবে আসবে যে, তখন তারা ঈমান আনলে বা তাওবা করলেও তা কোনো কাজে লাগবে না। এরপর সূরায় এমন কয়েকটা কেসসা কাহিনীও বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে অতীতের অবিশ্বাসীদের ধ্বংসের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে।

তাদের জবাব দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, 'তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে কবে এ হুমকি কার্যকরী হবে? .... প্রত্যেক জাতির জন্যেই একটা সময় নির্ধারিত আছে। যখন তাদের নির্ধারিত সময় আসবে, তখন তা এক মুহূর্ত আগেও আসবে না, এক মুহূর্ত পরেও আসবে না।'....... (আয়াত ৪৭-৫২)

সূরার যে জায়গায় মূসা (আ.)-এর কাহিনী শেষ হয়েছে, সেখানে এ দৃশ্যটা এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যেন তা ওই হুমকিরই বাস্তব রূপ।

'আর আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করিয়ে দিলাম। ফেরাউন ও তার বাহিনী তৎক্ষণাত শত্রুতা ও বিদ্বেষ বশত তার পিছু ধাওয়া করলো। .... (আয়াত ৯০, ৯১, ৯২) এরপর সূরার বিভিন্ন পর্যায়ে ওই জবাব ও এই ঘটনার মাঝখানে আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ কিভাবে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করে থাকেন, তার দৃশ্যাবলী একে একে বর্ণনা করা হয়। এ পাকড়াও এতোই আকস্মিক যে, কেউ তা আগে থেকে কল্পনাও করতে পারে না এবং জানেও না। এভাবে সূরা একই অখন্ড পরিবেশের চিত্র তুলে ধরে, যার দৃশ্যে, বক্তব্যে ও ভূমিকায় পরিপূর্ণ সমন্বয় বিরাজ করে।

অনুরূপভাবে সূরার শুরুতে রসূল (স.) সম্পর্কে কাফেরদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে যে, 'কাফেররা বললো, এতো নিশ্চয়ই প্রকাশ্য জাদুকর।' আর ফেরাউন ও তার দল বলের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে যে, 'মূসা যখন তাদের কাছে সত্য নিয়ে এলো, তখন তারা বললো, এতো নিশ্চয়ই প্রকাশ্য জাদুকর। উভয় বক্তব্যে কী অপূর্ব সাদৃশ্য!

সুরায় হযরত ইউনুসের ঘটনা খুব সামান্যই এসেছে। তবু নাম রাখা হয়েছে সূরা ইউনুস। হযরত ইউনুসের ঘটনার উল্লেখ শুধু এতোটুকু,

'এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই যে, কোনো জাতি আযাব দেখার পর ঈমান এনেছে, অতপর তার সে ঈমান তার জন্যে ফলদায়ক হয়েছে। কেবল ইউনুসের জাতি ছাড়া। তারা যখন ঈমান আনলো, তখন আমি তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে অপমানজনক শাস্তি থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছিলাম।' তবে এতদসত্তেও হযরত ইউনুসের ঘটনা এক শ্রেণীর মানুষের জন্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। যারা আযাব এসে যাওয়ার আগে আত্মশুদ্ধির করে এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাদের জন্যে অবশ্যই এটা একটা দৃষ্টান্ত। সময় থাকতে আত্মশুদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করার এ এক চমৎকার উদাহরণ। ইউনুসের জাতিই ইতিহাসে একমাত্র জাতি, যারা সামষ্টিকভাবে নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে, ফলে নবীর প্রত্যক্ষ দাওয়াত প্রত্যাখ্যানের যে পরিণাম আল্লাহর বিধানে নির্ধারিত রয়েছে, সে অনুসারে হযরত ইউনুস তাদের জন্য আযাবের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। কিন্তু তারা পুনরায় সামষ্টিকভাবে আত্মশুদ্ধি করে ঈমান আনে। ফলে আল্লাহ তাদের আযাব থেকে মুক্তি দেন। এভাবে সূরাটার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন অখন্ড সমন্বয় ও সংযোগ দেখতে পাই যে, সূরাটাকে একটা অখন্ড ও সুসংবদ্ধ একক না মেনে উপায় থাকে না।

এ ভূমিকায় উদ্ধৃত আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রভুত্ব ও দাসত্ব, উভয়ের প্রকৃত পরিচয় এবং ওই প্রকৃত পরিচয়ের স্বাভাবিক ফল স্বরূপ মানব জীবনে যে পরিবর্তন আসা আবশ্যক, সেটাই এ সূরার প্রধান ও মূল আলোচ্য বিষয়। এ ছাড়া ওহী, আখেরাত ও পূর্ববর্তী নবীদের ঘটনাবলীসহ অন্য যে সব বিষয় আলোচিত হয়েছে, তা আলোচিত হয়েছে মূলত ওই প্রধান আলোচ্য বিষয়টির বিশ্লেষণের প্রয়োজনে, তার গভীরতা ও ব্যাপকতা বোঝানোর উদ্দেশ্যে এবং মানুষের জীবনে, বিশ্বাসে, এবাদাতে ও কাজ কর্মে তা যে পরিবর্তন কামনা করে, সেটা বুঝানোর লক্ষ্যে।

বস্তুত প্রভুত্ব ও দাসত্বের বিষয়টি শুধু এ সূরার নয়, বরং সমগ্র কোরআনের এবং বিশেষত কোরআনের মক্কী অংশের মূল আলোচ্য বিষয়। সমগ্র কোরআনের প্রধান আলোচিত বিষয় এই যে, বিশ্বজগতের ইলাহ তথা প্রভু, প্রতিপালক, মনিব, বিধাতা ও সর্বময় অধিপতি কে, তাঁর সার্বভৌমত্ব, নিরংকুশ প্রভুত্ব ও সর্বময় কর্তৃত্ব, দাসত্ব ও তার সীমানা-চৌহদ্দী– যা অতিক্রম করা যায় না। মানুষকে কিভাবে তার প্রকৃত প্রভু ও মনিবের দাসে পরিণত করা যায় এবং কিভাবে সেই একমাত্র প্রভু ও মনিবের সর্বময় প্রভুত্ব, নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের প্রতি মানুষের স্বীকৃতি আদায় করা যায়। এ ছাড়া আর যা কিছু আলোচিত হয়েছে, তা মানব জীবনে এ সত্যের দাবী কী কী ও কত সুদূর প্রসারী, তা বোঝানোর জন্যেই আলোচিত হয়েছে।

আর গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, এ মহা সত্যের ব্যাপারে কোরআনের এত বিশদ আলোচনা সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত। কেননা এটা কোরআনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এর জন্যে সকল নবীর প্রেরণ ও সমস্ত আসমানী কেতাব নাযিল করা সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত। আল্লাহ তাই বলেন,

'আমি যখনই কোনো রসূল পাঠাই, তার কাছে ওহী নাযিল করি যে, আমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।'

মানুষের পার্থিব জীবন সুষ্ঠ ও সুন্দর হতে পারে কেবল তখনই, যখন তাদের আকীদা বিশ্বাসে ও বাস্তব জীবনে এ মহাসত্যের নির্ভুল প্রতিফলন ঘটে।

জীবনে এ মহাসত্যের সার্বিক প্রতিফলন না ঘটলে প্রথমত এ বিশ্ব প্রকৃতির সাথে তার দ্রব্যসমূহ ও প্রাণীদের সাথে আচরণ সঠিক হতে পারে না। কেননা বিশ্বজগতের ও নিজের সর্বময় মনিব ও প্রভু কে, এবং সে কার বা দাস বা গোলাম, আর দাস হিসাবে তার করণীয় কি, এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকলে মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন জিনিস ও বিভিন্ন প্রাণী এমনকি বিভিন্ন কল্পিত সত্ত্বা ও ছায়ামূর্তিকে পর্যন্ত উপাস্য বা প্রভুতে পরিণত করে থাকে, আর নিজেকে অত্যন্ত হাস্যকরভাবে তার দাসানুদাসে পরিণত করে এবং ওইসব প্রভু বা মনিবকে নিজের জীবিকার একাংশ দিয়ে দেয়, এমনকি কখনো কখনো এ জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়। অথচ ওই জিনিস বা প্রাণীর কোনোই ক্ষমতা নেই। কারো লাভ বা ক্ষতি ঘটানোর কোনো সামর্থ তাদের নেই। এ সব বস্তু ও প্রাণীর মাঝে ঝুলন্ত থাকার কারণে ও তাদের দাসত্ব করার কারণে মোশরেকদের গোটা জীবনই তছনছ ও বিশৃংখলার শিকার হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ সূরা আনয়ামে বলেন, 'তারা তাদের কৃষি ফসল ও পালিত পশুর একাংশ আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করে আপন ধারণা অনুযায়ী বলে যে, এটা আল্লাহর আর এটা আমাদের দেব দেবীর। যেটা তাদের দেব দেবীর অংশ তাতো আল্লাহর কাছে যায় না। কিন্তু যেটা আল্লাহর অংশ, তা তাদের দেব দেবীর ভোগে লেগে যায়। .... (আয়াত ১৩৭-১৪১)

সম্পদ ও সন্তানের ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের দাসত্ব করার কী পরিণাম দাঁড়ায়, এ হচ্ছে তার কিছু দৃষ্টান্ত। আল্লাহর পরিবর্তে তার সৃষ্টির জন্যে কোনো সম্পদ নির্দিষ্ট করলে তার ফল এ রকমই হয়ে থাকে। কেননা ওই সব বস্তু বা প্রাণীকে উপাস্য মানা ও সম্পদের অংশ দেয়ার সপক্ষে আল্লাহর কোনো নির্দেশ নেই।

অনুরূপভাবে, মানুষের পরস্পরের সাথে সহাবস্থানও সুখকর হয় না– যদি তাদের আকীদা বিশ্বাস, এবাদাতে ও কর্মজীবনে দাসত্ব ও প্রভুত্ব সংক্রান্ত ধারণা স্পষ্ট না থাকে। যে আকীদায়, আদর্শে ও সমাজ ব্যবস্থায় আল্লাহর একক প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব ও শাসন স্বীকৃত হয় না, দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের জীবনের ওপর আল্লাহর একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে না এবং মানব জীবনের গোপন বা প্রকাশ্য সকল ব্যাপারে আইন রচনা, হুকুম জারী ও আদেশ দানের অধিকার একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট থাকে না, সেই আকীদা ও আদর্শে এবং সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানুষের মনুষ্যত্ব, মর্যাদা ও প্রকৃত পূর্ণাংগ স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হতে পারে না।

ইতিহাসের বাস্তবতা এ মহা সত্যের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। আকিদা বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে যখনই মানুষ আল্লাহর আনুগত্য পরিত্যাগ করে ও আল্লাহর বান্দাদের আনুগত্য করে, চাই এ আনুগত্য আকীদা বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিক এবাদাতেই হোক, অথবা কর্মজীবনে আল্লাহর বিধানের অনুসরণেই হোক, তখন তার অনিবার্য ফল দেখা দেয় এই যে, তারা তাদের মানবতা, মর্যাদা ও স্বাধীনতা সবই হারায়।

ইসলাম ইতিহাসের যে বিশ্লেষণ দেয়, তদনুসারে মানব সমাজের ওপর স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী অত্যাচারী শাসকদের দৌরাত্ম্য দেখা দেয়ার একমাত্র কারণ হলো আল্লাহর বিধানের আনুগত্য পরিত্যাগ করা। এ বিধান আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ বা প্রভু বলে ঘোষণা করে এ অর্থে

যে, প্রভুত্ব, আধিপত্য, কর্তৃত্ব, রাজত্ব, শাসন ও সার্বভৌমত্বের একমাত্র অধিকার আল্লাহর– আর কারো নয়। আল্লাহ সূরা যুখরুফে বলেন, 'ফেরাউন তার জনগণকে জিজ্ঞাসা করলো যে, মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? এ নদনদীগুলো তো আমার হুকুমেই চলে ....।' (আয়াত ৫১, ৫২, ৫৩ ও ৫৪)

এখানে সর্বশেষ আয়াতে স্পষ্টই জনগণের ওপর তাদের আল্লাহর অবাধ্য হওয়াকে ফেরাউনের স্বৈরাচারী শাসন চালাতে পারার একমাত্র কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত যে জাতি এক আল্লাহর অনুগত ও বিশ্বাসী এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো সার্বভৌমত্ব ও শাসনাধিকার মানে না, কোনো স্বৈরাচারী শাসক তাদেরকে নিজের গোলাম বানাতে পারে না।

যারা এককভাবে আল্লাহর আনুগত্য করতে অস্বীকার করেছে এবং তাদের কিছু লোককে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মনগড়া বিধান অনুসারে তাদের ওপর শাসন চালাতে সুযোগ দিয়েছে, তারা শেষ পর্যন্ত আল্লাহর গোলামদের গোলামীতে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছে। আর এ গোলামী তাদের মনুষ্যত্ব, তাদের মর্যাদা ও স্বাধীনতাকে কুরে কুরে খেয়ে সাবাড় করে দেয়। এ সব খোদাবিমুখ শাসন ব্যবস্থার বাহ্যিক রূপ যত রকমেরই হোক না কেন এবং এর কোনো কোনোটি সম্পর্কে মানবতা, স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদার রক্ষক বলে যতই প্রচার চলুক বা ধারণা সৃষ্টি হোক না কেন।

বিকৃত খৃষ্টধর্মের নামে ফ্যাসিবাদী গীর্জার যুলুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে ইউরোপ আল্লাহর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে বসেছিলো। এ গীর্জা চরম স্বেচ্ছাচারী আচরণের মাধ্যমে সকল মানবিক মূল্যবোধকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলো। এরপর জনগণ মনে করলো যে, গণতান্ত্রিক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা ভিত্তিক নতুন সমাজ ব্যবস্থায় তাদের মানবতা, স্বাধীনতা ও সম্মান সংরক্ষিত হয়েছে। মানব রচিত সংবিধান, সংসদীয় প্রতিনিধিত্ব, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আইনগত ও বিচার বিভাগীয় রক্ষা ব্যবস্থা, নির্বাচিত সংখ্যাগুরুর শাসন ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত হবে বলে তারা আশা পোষণ করলো। কিন্তু শেষ ফল কী দাঁড়িয়েছিলো! শেষ ফল দাঁড়িয়েছে পুঁজিবাদী স্বৈরতন্ত্র, যা সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নিছক কল্পনা বা সাইনবোর্ড সর্বস্ব বানিয়ে ছেড়েছে। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সংখ্যালঘুর স্বৈরাচারী শাসনে শোচনীয় গোলামীর জীবন যাপন করছে। কেননা এ সংখ্যালঘুর হাতে দেশের বেশীর ভাগ সম্পদ পুঞ্জীভূত। আর এরই বলে তারা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। সংবিধান, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং অন্য যে সব রক্ষা কবচের ওপর জনগণ নিজেদের মানবতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মর্যাদার রক্ষক হিসাবে আস্থা স্থাপন করেছিলো, তা কোনো কাজে লাগেনি।

এরপর সেখানে একটি দল পুঁজিবাদী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শ্রেণীহীন দলীয় শাসন কায়েম করলো। এতেই বা কী লাভ হলো? আগে ছিলো তারা পুঁজিবাদী শ্রেণীর গোলাম। এবার হলো সর্বহারা শ্রেণীর গোলাম। পুঁজিবাদী শ্রেণীর গোলামী রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের গোলামীতে রূপান্তরিত হলো। আর এটা হয়ে দাঁড়ালো পুঁজিবাদের চেয়েও মারাত্মক।(১)

(১) পশ্চিমী গণতন্ত্রে কোনোদিনই যে দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর মতামতের প্রতিফলন ঘটেনা তা তথাকথিত গণতন্ত্রের ভূখন্ডসমূহের দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারি। ইউরোপ আমেরিকার বিধগ্ধ চিন্তা নায়করাও আজ অকপটে তা স্বীকার করছেন যে এই পদ্ধতিতে হামেশাই সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের ওপর শাসন শোষণ করে। ওদিকে সুদীর্ঘ ৭০ বসর ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ খুন করে সে ব্যবস্থার দাড় করানো হলো তা তার ব্যর্থতার কলংক মাথায় নিয়ে পুনরায় ঘৃনীত পুজিবাদের দিকেই ফিরে গেলো। - সম্পাদক

মোট কথা, প্রত্যেক ব্যবস্থায় মানুষের ওপর মানুষের গোলামী অব্যাহত রইলো। বিপুল অর্থ ও প্রাণের বিনিময়ে প্রতিবার মানুষের এক শ্রেণীর হাত থেকে আর এক শ্রেণীর হাতে প্রভুত্ব হস্তান্তরিত হতে লাগলো।

বস্তুত গোলামী, দাসত্ব বা আনুগত্য ছাড়া উপায় নেই। সেটা যদি আল্লাহর গোলামী না হয়, তবে মানুষের হবেই। একমাত্র আল্লাহর গোলামী মেনে নিলে মানব জাতির সম্মান, মর্যাদা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা সবই বহাল হয়। পক্ষান্তরে মানুষের ওপর মানুষের গোলামী তার স্বাধীনতা ও সম্মান সমূলে বিনষ্ট করে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তার ধন সম্পদ ও যাবতীয় বস্তুগত স্বার্থও ধ্বংস করে।

এ কারণে আল্লাহর সকল কেতাবে ও সকল নবীর দাওয়াতে প্রভুত্ব ও দাসত্বের বিষয়টা সর্বোচ্চ গুরুত্বের অধিকারী। এ সূরায়ও তার কিছু নমুনা প্রতিফলিত হয়েছে। এটা শুধু প্রাচীন জাহেলী সমাজের পৌত্তলিকদের ব্যাপারে নয়, বরং সর্বকালে ও সর্বস্থানে প্রত্যেক মানুষের সাথেই এর সম্পর্ক রয়েছে। এর সম্পর্ক রয়েছে প্রত্যেক জাহেলিয়াতের সাথে, চাই তা ইতিহাস পূর্ব কালের জাহেলিয়াত হোক বা ঐতিহাসিক যুগের জাহেলিয়াত হোক, কিংবা বিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়াত হোক কিংবা মানুষের ওপর মানুষের গোলামী চাপিয়ে দেয় এমন যে কোনো জাহেলিয়াতই হোক না কেন।(২)

এ কারণে প্রত্যেক রেসালাত ও প্রত্যেক আসমানী কেতাবের মূল কথা ছিলো মানুষের ওপর আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা।

সূরার সর্বশেষ বিষয়টি ছিলো এই,

'বলো, হে মানব জাতি! তোমরা যদি আমার ধর্ম সম্পর্কে সন্দেহে লিপ্ত হয়ে থাকো, তবে আমি তোমরা যার উপাসনা করো, কিন্তু একমাত্র সেই আল্লাহর এবাদাত করবো যিনি আমাদের সকলকে মৃত্যু দিয়ে থাকেন ......। (আয়াত ১০৪-১০৯)

সূরার ভূমিকা নিয়ে এতোটুকু আলোচনাই যথেষ্ট মনে করছি। এবার আসুন, সূরার তরজমা ও তাফসীরে মনোনিবেশ করা যাক।

(২) সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রচিত 'ইসলাম ও জাহেলিয়াত' এবং মোহাম্মদ কুতুব রচিত 'বিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়াত' দ্রষ্টব্য।

সূরা ইউনুস

আয়াত ১০৯ রুকু ১১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ① اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ

اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ

صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ② اِنَّ رَبَّكُمُ

اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى

الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ

فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ③ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ اِنَّهٗ

يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. আলিফ-লা-ম-রা। এগুলো (হচ্ছে) একটি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের আয়াত। ২. মানুষের জন্যে এটা কি (আসলেই) একটা আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদের মধ্য থেকে (তাদেরই মতো) একজন মানুষের কাছে ওহী পাঠিয়েছি, যেন সে মানুষকে (তা দিয়ে জাহান্নাম সম্পর্কে) সাবধান করে দিতে পারে, আবার যারা (এ ওহীর ওপর) ঈমান আনে; তাদের (এ মর্মে) সুসংবাদও দিতে পারে যে, তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে উঁচু মর্যাদা রয়েছে, কাফেররা (এমনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়লো যে, তারা) বললো, অবশ্যই এ ব্যক্তি একজন সুদক্ষ যাদুকর! ৩. (হে মানুষ,) তোমাদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি 'আরশে' সমাসীন হন, তিনি (তার) কাজ (স্বহস্তে) নিয়ন্ত্রণ করেন; কেউই তাঁর অনুমতি ছাড়া (কারো জন্যে) সুপারিশকারী হতে পারে না; এই হচ্ছেন তোমাদের মালিক আল্লাহ তায়ালা, অতএব তোমরা তাঁরই এবাদাত করো; তোমরা কি (সত্যি কথা) অনুধাবন করবে না? ৪. (মৃত্যুর পর) তোমাদের সবার ফিরে যাবার জায়গা হবে একমাত্র তাঁর কাছে; (সেখানে গিয়ে তোমরা) আল্লাহ তায়ালার (সকল) প্রতিশ্রুতিই সত্য (পাবে,) তিনিই এ সৃষ্টির অস্তিত্ব দান করেন, (মৃত্যুর পর) তিনিই আবার তাকে (তার জীবন) ফিরিয়ে দেবেন, যাতে করে যারা (তাঁর ওপর) ঈমান আনে, ভালো কাজ করে, (যথার্থ) ইনসাফের সাথে তিনি তাদের (কাজের) বিনিময় দান করতে পারেন এবং (এ কথাটাও পরিষ্কার করে দিতে পারেন,) যারা (আল্লাহ

بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا
كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ
مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا
بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾
إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم
بِإِيمَانِهِمْ ۖ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾ دَعْوَاهُمْ فِيهَا

তায়ালাকে) অস্বীকার করে তাদের জন্যে উত্তপ্ত পানীয় ও কঠিন শাস্তি রয়েছে, কেননা তারা (পরকালের এ শাস্তি) অস্বীকার করতো। ৫. মহান আল্লাহ তায়ালা যিনি সূর্যকে (প্রখর) তেজোদ্দীপ্ত বানিয়েছেন এবং চাঁদকে (বানিয়েছেন) জ্যোতির্ময়, অতপর (আকাশে) তার জন্যে কিছু মনযিল তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে করে (এ নিয়ম দ্বারা) তোমরা বছরের গণনা এবং দিন-তারিখের হিসাবটা জানতে পারো; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যে এসব কিছু পয়দা করে রেখেছেন (তার) কোনোটাই তিনি অনর্থক করেননি; যারা (সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে) জানতে চায় তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিদর্শন খুলে খুলে বর্ণনা করেন। ৬. অবশ্যই দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ তায়ালা যা কিছু (এ) আসমানসমূহ ও যমীনের মাঝে পয়দা করেছেন, তার (প্রতিটি জিনিসের) মাঝে পরহেযগার লোকদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালাকে চেনার) নিদর্শন রয়েছে।৭. (মানুষের মাঝে) যারা (মৃত্যুর পর) আমার সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশা করেনা, যারা এ পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট এবং (এখানকার) সবকিছু নিয়েই পরিতৃপ্ত, (সর্বোপরি) যারা আমার (সৃষ্টি বৈচিত্রের) নিদর্শনসমূহ থেকে গাফেল থাকে, ৮. তারাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের (নিশ্চিত) ঠিকানা হবে (জাহান্নামের) আগুন; (এ হচ্ছে তাদের সে কর্মফল) যা তারা দুনিয়ার জীবনে অর্জন করেছে। ৯. (অপরদিকে) যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের মালিক তাদের (এ) ঈমানের কারণেই তাদের সঠিক পথ দেখাবেন; তাদের তলদেশ দিয়ে (অসংখ্য) নেয়ামতে (পরিপূর্ণ) জান্নাতে (সুপেয়) ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে। ১০. (এ সময়) তাদের (মুখে একটি মাত্র) ধ্বনিই

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ⑩ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ
لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاۤءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُوْنَ ⑪ وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَاۤئِمًا ۚ
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ۖ كَذٰلِكَ زُيِّنَ
لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑫ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا
ظَلَمُوْا ۙ وَجَاۤءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ۖ كَذٰلِكَ نَجْزِي
الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ⑬ ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰۤئِفَ فِي الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ
لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ⑭ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ

(প্রতিধ্বনিত) হতে থাকবে, হে আল্লাহ তায়ালা, তুমি (কতো) মহান, (কতো) পবিত্র! (সেখানে) তাদের (পারস্পরিক) অভিবাদন হবে 'সালাম' (এবং) তাদের শেষ ডাক হবে, যাবতীয় তারীফ সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার জন্যে।

রুকু ২

১১. (ভেবে দেখো,) আল্লাহ তায়ালা যদি মানুষের জন্যে তাদের (অন্যায় কাজকর্মের শাস্তি দিতে গিয়ে) অকল্যাণকে ত্বরান্বিত করতেন, যেভাবে মানুষ নিজেদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চায়, তাহলে তাদের অবকাশ (দেয়ার এ সুযোগ কবেই) শেষ হয়ে যেতো (কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের ঢিল দিয়ে রেখেছেন); অতপর যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা করে না, আমি তাদের না-ফরমানীর জন্যে তাদের উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে দিই। ১২. মানুষকে যখন কোনো দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে, তখন সে বসে, শুয়ে, দাঁড়িয়ে সর্বাবস্থায় আমাকেই ডাকে, অতপর আমি যখন তার দুঃখ-কষ্ট তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাই, তখন সে এমনি (বেপরোয়া হয়ে) চলতে শুরু করে, তাকে যে এক সময় দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছিলো, (মনে হয়) তা দূর করার জন্যে আমাকে সে কখনো ডাকেইনি; এভাবেই যারা (বার বার) সীমালংঘন করে তাদের জন্যে তাদের কাজকর্ম শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে। ১৩. তোমাদের আগে অনেক কয়টি মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা যুলুম করেছিলো, (অথচ) তাদের কাছে (আমার) সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রসূলরা এসেছিলো, (কিন্তু) তারা (কোনো রকমেই) ঈমান আনলো না; এভাবেই (ধ্বংসের মাধ্যমে) আমি না-ফরমান জাতিদের (তাদের যুলুমের) প্রতিফল দিয়ে থাকি। ১৪. অতপর আমি এ যমীনে (তাদের জায়গায়) তোমাদের খলীফা করে পাঠিয়েছি, আমি যেন দেখতে পাই তোমরা কি ধরনের আচরণ করো। ১৫. (হে নবী,) যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তাদের পড়ে শোনানো হয়, তখন (তাদের মধ্যে)

لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ

اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَاۤئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ

اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥﴾ قُلْ لَّوْ شَاۤءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ

وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٦﴾ فَمَنْ

اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ

الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٧﴾ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ

وَيَقُوْلُوْنَ هٰۤؤُلَاۤءِ شُفَعَاۤؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ قُلْ اَتُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي

السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٨﴾ وَمَا كَانَ

النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ

যারা আমার সাথে (মৃত্যুর পর কোনো রকম) দেখা সাক্ষাতের আশা করে না, তারা (ঔদ্ধত্যের সাথে তোমাকে) বলে, এছাড়া অন্য কোনো কোরআন নিয়ে এসো, কিংবা একে বদলে দাও; তুমি (এদের) বলো, আমার নিজের এমন কোনো ক্ষমতাই নেই যে, আমি একে বদলে দেবো; আমি তো তাই অনুসরণ করি যা আমার ওপর ওহী আসে, আমি যদি আমার মালিকের কোনো রকম না-ফরমানী করি, তাহলে আমি একটি মহা দিবসের (কঠিন) শাস্তির ভয় করি। ১৬. (তুমি বলো,) আল্লাহ তায়ালা না চাইলে আমি তোমাদের ওপর এ (কোরআন) তো পাঠই করতাম না, আমি তো এ (গ্রন্থ) সম্পর্কে তোমাদের কোনো কিছু জানাতামই না, আমি তো এর আগেও তোমাদের মাঝে অনেকগুলো বয়স কাটিয়েছি, (কখনো কি আমি এমন ধরণের কোনো গ্রন্থের কথা তোমাদের বলেছি?) তোমরা কি বুঝতে পারছো না? ১৭. অতপর (বলো), তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে, যে আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে কিংবা তাঁর আয়াত অস্বীকার করে; (এ ধরনের) না-ফরমান লোকেরা কখনোই সফলকাম হয় না। ১৮. এ (মূর্খ) লোকেরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর উপাসনা করে, যা তাদের কোনো রকম ক্ষতি করতে পারে না, (আবার) তা তাদের কোনো রকম উপকারও করতে পারে না, তারা বলে, এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার কাছে আমাদের সুপারিশকারী; তুমি (মোশরেকদের) বলো, তোমরা কি আল্লাহ তায়ালাকে এমন কোনো কিছুর খবর দিতে চাও, যা তিনি আসমানসমূহের মাঝে অবহিত নন এবং যমীনের মাঝেও নন; তিনি পাক পবিত্র এবং মহান, তারা যে শেরেক করে তিনি তার চাইতে অনেক উর্ধ্বে। ১৯. (মূলত) মানুষ ছিলো একই জাতি, অতপর তারা (তাদের মাঝে) মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে; তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (তাদের মৃত্যু পরবর্তি শাস্তির মুহূর্তটির) ঘোষণা না থাকলে কবেই সে বিষয়ের ফয়সালা

بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ

فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا ۖ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا

أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ۚ قُلِ

اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ

فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ۖ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ

طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا

مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي

الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ۖ مَتَاعَ

হয়ে যেতো, যে বিষয় নিয়ে তারা মতবিরোধ করে। ২০. তারা (আরো) বলে, তার মালিকের কাছ থেকে তার ওপর কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? তুমি (তাদের) বলো, গায়ব সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যে, অতএব (আল্লাহ তায়ালার সে গায়বী ফয়সালার জন্যে) তোমরা অপেক্ষা করো, (আর) আমিও তোমাদের সাথে (সেদিনের) প্রতীক্ষা করছি।

রুকু ৩

২১. মানুষকে দুঃখ-মসিবত স্পর্শ করার পর যখন আমি তাদের কিছুটা করুণার স্বাদ ভোগ করাই, তখন সাথে সাথেই তারা আমার রহমতের (নিদর্শনসমূহের) সাথে চালাকি শুরু করে দেয় (হে নবী), তুমি বলো, কলা-কৌশলে আল্লাহ তায়ালা সবার চাইতে বেশী তৎপর; অবশ্যই আমার ফেরেশতারা তোমাদের যাবতীয় কলাকৌশলের কথা (তোমাদের আমলনামায়) লিখে রাখে। ২২. তিনিই মহান আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের জলে-স্থলে ভ্রমণ করান; এমনকি তোমরা যখন নৌকায় আরোহণ করো এবং এ (নৌকা)-গুলো যখন তাদের নিয়ে অনুকূল আবহাওয়ায় চলতে থাকে, তখন (নৌকার) আরোহীরা এতে (ভীষণ) আনন্দিত হয়, (হঠাৎ এক সময়) এ (নৌকা)-গুলো ঝড়বাহী বাতাসের কবলে পড়ে এবং চারদিক থেকে তাদের ওপর ঢেউ আসতে থাকে এবং তারা মনে করে, (এবার সত্যিই) এ (বাতাস ও ঢেউ) দ্বারা তারা পরিবেষ্টিত হয়ে গেছে, তখন তারা একান্ত নিষ্ঠাবান বান্দা হয়ে আল্লাহ তায়ালাকে (এই বলে) ডাকতে শুরু করে (হে আল্লাহ), যদি তুমি আমাদের এ (মহাদুর্যোগ) থেকে বাঁচিয়ে দাও তাহলে অবশ্যই আমরা তোমার শোকরগোযার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। ২৩. অতপর (সত্যি সত্যিই) যখন তিনি তাদের এ (বিপর্যয়) থেকে

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ز ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾ اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ط حَتّٰۤى اِذَاۤ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَاۤ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَاۤ لا اَتٰىهَاۤ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ط كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَاللّٰهُ يَدْعُوْۤا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ط وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٥﴾

বাঁচিয়ে দেন, তখন তারা (ওয়াদার কথা ভুলে) সাথে সাথেই অন্যায়ভাবে যমীনে না-ফরমানী শুরু করে দেয়; হে মানুষ (তোমরা শুনে রাখো), তোমাদের এ নাফরমানী তোমাদের নিজেদের জন্যেই (ক্ষতিকারক) হবে, (মূলত এ হচ্ছে) দুনিয়ার (অস্থায়ী) সহায় সম্পদ, অতপর তোমাদের আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদের বলে দেবো, (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা (কে) কি করতে। ২৪. এ পার্থিব জীবনের উদাহরণ (হচ্ছে), যেমন আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলাম, যা দ্বারা অতপর যমীনের গাছপালা ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হলো, যা থেকে মানুষ ও জন্তু-জানোয়াররা (তাদের) আহার সংগ্রহ করলো; এরপর (একদিন) যখন যমীন তার সৌন্দর্যের রূপ ধারণ করলো এবং (আপন সৌন্দর্যে) সে শোভিত হয়ে উঠলো, তখন (এসব দেখে) তার (যমীনের) মালিক মনে করলো, তারা বুঝি এর (ফসল ভোগ করার) ওপর (এখন সম্পূর্ণ) ক্ষমতাবান (হয়ে গেছে, এ সময়) হঠাৎ করে রাতে কিংবা দিনে আমার (আযাবের) ফয়সালা তাদের ওপর আপতিত হলো, ফলে আমি তাদের এমনভাবে নির্মূল করে দিলাম যেন গতকাল (পর্যন্ত এখানে) তার কোনো অস্তিত্বই ছিলো না; এভাবেই আমি আমার আয়াতসমূহ সেসব জাতির জন্যে খুলে খুলে বর্ণনা করি, যারা (এ সম্পর্কে) চিন্তা-ভাবনা করে। ২৫. (হে মানুষ, তোমরা এ পার্থিব জীবনের ধোকায় পড়ে আছো, অথচ) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (চিরস্থায়ী এক) শান্তির নিবাসের দিকে ডাকছেন; তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সহজ-সরল পথে পরিচালিত করেন।

তাফসীর

আয়াত ১-২৫

শুরুতেই বলেছি যে, গোটা সূরা একটা অবিভাজ্য একক। এদিক দিয়ে এ সূরার অবস্থা সূরা আনয়ামের মতো, যার সম্পর্কে সপ্তম পারায় আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্য সূরা আনয়ামের সাথে এ সূরার প্রকৃতিগত কিছু বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। এ সূরাটি ক্রমাগতভাবে অত্যন্ত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে মানব মনে আবেগের ঢেউ তুলতে থাকে এবং বিভিন্ন উপায়ে তাকে সম্বোধন করে। এ উপায়গুলোর মধ্যে রয়েছে ওহী ও কোরআনকে গ্রহণ করার ব্যাপারে কাফেরদের নেতিবাচক

ভূমিকায় বিস্ময় প্রকাশ, আল্লাহর অপার কুদরতের প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলীর বিবরণ দান, কেয়ামতের দৃশ্য তুলে ধরা, বিভিন্ন বিপদ মুসিবতে ও সুখকর ঘটনায় মানুষের প্রতিক্রিয়া, অতীতের কাফেরদের ধ্বংসের কাহিনী ইত্যাদি।

সূরাটাকে যদি বিভিন্ন অংশে বা পর্বে বিভক্ত করার অবকাশ থাকেও, তাহলে এর প্রথম অর্ধেকেরও বেশী অংশকে একটা পর্বরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। একে ক্রমান্বয়ে আবেগের ঢেউ তোলার পর্ব বলা যেতে পারে। এরপর আসে হযরত নূহ ও হযরত মূসার কাহিনী এবং অতি সংক্ষেপে হযরত ইউনুসের ঘটনার বর্ণনা। এগুলোকে একত্রে দ্বিতীয় পর্ব রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এর পরেরটুকু হচ্ছে শেষ পর্ব।

সূরার ব্যতিক্রমী চরিত্র থাকায় আমি কোথাও এর এক একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের তাফসীর আলাদাভাবে আবার কোথাও কয়েকটা অংশের তাফসীর একত্রে আলোচনা করবো।

প্রথম অংশটা শুরু হচ্ছে তিনটে অক্ষর 'আলিফ, লাম ও রা' দিয়ে। সূরার শুরুতেই এসেছে। ইতিপূর্বে সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান ও সূরা আরাফও এ ধরনের অক্ষর সমষ্টি দিয়ে শুরু হয়েছে এবং ওইগুলোর ব্যাখ্যা প্রসংগে আমার মতামত আমি যথাস্থনে উল্লেখ করেছি। এখানে এ অক্ষর কয়টি দিয়ে শুরু হয়েছে বাক্যের উদ্দেশ্য, যার বিধেয় হলো, 'তিলকা আয়াতুল কিতাবিল হাকীম' অর্থাৎ 'এগুলো' হচ্ছে বিজ্ঞানময় গ্রন্থের আয়াতসমূহ।'

এর পরবর্তী আয়াতগুলোতে এক এক করে সেই সব বিষয় আলোচিত হয়েছে, যাতে এ কেতাবের হিকমত তথা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে। এ সব হেকমত বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মধ্যে মানুষকে সতর্ক করা ও সুসংবাদ দানের জন্যে রসূলের কাছে ওহী প্রেরণ, একজন মানুষের কাছে ওহী পাঠানোর ওপর আপত্তিকারীদের জবাব, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ও পরিচালনা, সূর্য ও চাঁদকে আলোকময় করা, বছরের সংখ্যা ও হিসাব বের করার উপায় হিসাবে চাঁদের বিভিন্ন মনযিল নির্ধারণ, দিন ও রাতের ক্রমাবর্তন এবং এসব জিনিসে যে গভীর কর্মকুশলতা ও বিচক্ষণতা নিহিত রয়েছে, তা অন্যতম।

প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী উল্লেখ করার পর যারা এ সব নিদর্শন সম্পর্কে উদাসীন থাকে, সকল বিষয়ের পরিকল্পক ও ব্যবস্থাপক আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টি যারা ভুলে বসে থাকে, এ সব উদাসীন লোকের জন্যে যে শোচনীয় পরিণতি অপেক্ষা করছে এবং মোমেনদের জন্যে যে সম্পদরাজি নির্দিষ্ট রয়েছে, সে সবের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ সাথে উল্লেখ করা হয়েছে এ উদাসীন লোকদের শাস্তি তাৎক্ষণিকভাবে না দিয়ে আখেরাতের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করার 'হেকমত' তথা প্রকৃত ও বিজ্ঞানসম্মত কারণ কি। মানুষ যেভাবে কল্যাণজনক ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে দুনিয়াতেই পেতে চায়, সেভাবে মানুষের অন্যায় কাজের ফলাফল আল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে দুনিয়াতে দেন না কেন, তাও উল্লেখ করা হয়েছে। তাৎক্ষণিক কর্মফল তথা খারাপ কাজের শাস্তি যদি আল্লাহ দুনিয়াতেই দিয়ে দিতেন, তাহলে কর্মের সুযোগ শেষ হয়ে যেতো এবং মানুষকে আর কোনো অবকাশ না দিয়ে পাপের ফল স্বরূপ শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হতো।

এজন্যে ভালো মন্দ ও সুখ দুঃখের সম্মুখীন হলে মানুষ যে স্বভাব সুলভ অস্থিরতা দেখায়, বিপদ মুসীবত পড়লেই আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করা তার স্বভাব এবং বিপদ সরে গেলেই আবার আল্লাহকে ভুলে যাওয়া ও আগের স্বেচ্ছাচারিতায় ফিরে যাওয়া তার যে আসল সহজাত চরিত্র, তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অতীতের জাতিগুলো কি করেছে এবং কিভাবে ধ্বংস হয়েছে, তা বিবেচনায় না এনেই মানুষের এ মৌলিক স্বভাবটাই শুধু উল্লেখ করা হয়েছে এ অংশে।

রসূলের দাওয়াতের প্রথম শ্রোতা আরবরা যদিও অতীতের কাফের জাতিগুলোর ধ্বংসের ইতিহাস জানতো, তথাপি তাদের মধ্যে যারা ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা রসূলের কাছে কোরআনকে সামগ্রিকভাবে বা আংশিকভাবে পরিবর্তন করার মতো গোয়ার্তুমিপূর্ণ দাবী জানাতো। এ ধরনের দাবী জানানোর সময় তারা বুঝতো না বা ভেবেও দেখতো না যে, কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত গ্রন্থ এবং এর পেছনে আল্লাহর এমন একটা চিরস্থায়ী উদ্দেশ্য রয়েছে, যার সাথে এ গ্রন্থের পরিবর্তন মানানসই নয়। আরো বলা হয়েছে যে, তারা সম্পূর্ণ যুক্তি প্রমাণহীনভাবে এমন উপাস্যের পূজা করে, যা তাদের কোনো লাভক্ষতি ঘটাতে পারে না। আর আল্লাহর ওহী দ্বারা সঠিক প্রমাণিত হওয়া সত্তেও তারা একমাত্র আল্লাহর এবাদাত করে না। তাছাড়া কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াতগুলো এবং বিশ্ব প্রকৃতিতে বিরাজমান মানবীয় সৃষ্টিক্ষমতার সাধ্যাতীত নিদর্শনাবলীকে বিবেচনায় না এনেই তারা অলৌকিক ঘটনাবলীর দাবী জানায়।

এরপর পুনরায় সুখ ও দুঃখে মানুষের যে স্বভাবগত প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে, তার উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে এর একটা জীবন্ত উদাহরণও উপস্থাপন করা হয়েছে। একটা আলোড়ন সৃষ্টিকারী দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। দৃশ্যটা হলো একটা সামুদ্রিক জাহাজের যা স্বাভাবিক আবহাওয়ার মধ্যে যাত্রা শুরু করে এক পর্যায়ে ঝড় তুফানের কবলে পড়ে। এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে যাত্রীরা আল্লাহকে একনিষ্ঠাভাবে ডাকে এবং বিপদ কেটে গেলে আবার খোদাদ্রোহী আচরণ শুরু করে দেয়।

আরো একটা দৃশ্য দেখানো হয়েছে দুনিয়াবী জীবনের চাকচিক্য ও জাঁকজমকে প্রতারিত হওয়ার উপমা স্বরূপ। দেখানো হয়েছে কিভাবে দুনিয়ার প্রতারিত অধিবাসীরা এর চাকচিক্যে প্রলুব্ধ হয়ে এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যায়। অথচ এ সমস্ত চাকচিক্য সহসাই উধাও হয়ে যায়। এ প্রসংগে বলা হয়েছে যে, মানুষের দুনিয়ার প্রতারণাপূর্ণ জৌলুসে প্রতারিত হওয়ার কোনো যুক্তি ছিলো না। কেননা আল্লাহ তায়ালা তো আসল চিরস্থায়ী শান্তির ভুবনের দিকে অনবরতই ডাকছেন। সেই শান্তি চিরন্তন। তা কখনো আকস্মিকভাবে হাত ছাড়া হয়ে যাবে না। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর আয়াতগুলো সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বুঝান চিন্তাশীলদেরকে এবং আল্লাহর সৃষ্টি ও ব্যবস্থাবনার মহৎ উদ্দেশ্য যারা বুঝতে চায় তাদেরকে।

ওহী নাযিলের বাস্তবসম্মত প্রক্রিয়া

'আলি-লাম-রা– এগুলো হচ্ছে আল্লাহর বিজ্ঞানময় গ্রন্থের আয়াতসমূহ।'

অর্থাৎ এ অক্ষরগুলো এবং অনুরূপ অন্যান্য অক্ষরগুলো দিয়েই এ বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ কোরআনের আয়াতগুলো লিখিত হয়েছে। এ কেতাব আল্লাহ তাঁর রসূলের কাছে ওহী যোগে পাঠিয়েছেন একথা কাফেররা অবিশ্বাস করে। অথচ যে অক্ষরগুলো দিয়ে এ কেতাব লেখা হয়েছে, সেগুলো ওদের নাগালের মধ্যেই। তবু তা দ্বারা তারা এ কেতাবের একটি ক্ষুদ্র আয়াতের মতো কোনো আয়াতও রচনা করতে পারেনি, যেমনটি কোরআন তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে। তথাপি এ দ্বারা তারা কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি এবং এ কথা বোঝেনি যে, রসূল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ওহীই একমাত্র প্রভেদকারী জিনিস। ওহী যদি না আসতো, তাহলে তাদের মতো রসূল (স.)-ও একটি আয়াতও রচনা করতে পারতেন না। 'হাকীম' অর্থ বিজ্ঞানময়। অর্থাৎ এটি এমন গ্রন্থ, যা মানুষের সাথে তার স্বভাব ও মেযাজের সাথে মানানসই ও সংগতিশীল ভাষায় কথা বলে। এ সূরায় মানুষের সেই স্বভাবের কিছু কিছু দিক তুলে ধরা হয়েছে, যা চিরস্থায়ী, যা সম্পূর্ণ সত্য এবং যার নমুনা আমরা প্রত্যেক প্রজন্মের মধ্যেই দেখতে পাই। এ গ্রন্থকে 'হাকীম' বা বিজ্ঞানময় বলার

আরো একটা কারণ এই যে, তা উদাসীন লোকদেরকে আল্লাহর সেই নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করে, যা সৃষ্টিজগতের দিকে দিকে, আকাশে, পৃথিবীতে, সূর্যে, চাঁদে, দিনে, রাতে, অতীতের অবিশ্বাসী জাতিগুলোর ধ্বংস ও বিলুপ্তিতে, তাদের কাছে আগত রসূলদের কাহিনীতে এবং এ বিশ্বজগতে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত আল্লাহর অসীম শক্তির সাক্ষ্য প্রমাণে বিরাজমান।

'এটা কি মানুষের কাছে বিস্ময়কর যে, তাদেরই একজনের কাছে আমি ওহী পাঠালাম .....?' (আয়াত ২)

এটা নেতিবাচক প্রশ্ন। অর্থাৎ এটা মোটেই বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। রসূলদের কাছে আগত ওহী সম্পর্কে মানুষ সব সময়ই এ ধরনের বিস্ময় বোধ করতো। প্রত্যেক রসূল এরূপ প্রশ্নের সম্মুখীন হতেন যে, 'আল্লাহ কি একজন মানুষকেই রসূল করে পাঠালেন।' এ প্রশ্ন করার কারণ এই যে, মানুষ মানুষের প্রকৃত মূল্য নির্ণয় করতে ও প্রকৃত মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেনি। মানুষ আবার রসূল হতে পারে এবং আল্লাহর সাথে তার ওহীর মাধ্যমে কোনো সংযোগ বা সম্পর্ক হতে পারে, এটা তাদের কাছে অতিরঞ্জিত ও অবিশ্বাস্য মনে মতো। আল্লাহ তায়ালা মানুষের হেদায়াতের দায়িত্ব কোনো মানুষের ওপর অর্পণ করবেন এটা তাদের কাছে অসম্ভব মনে হতো। তারা ভাবতো, এ কাজের জন্যে আল্লাহ তায়ালা কোনো ফেরেশতা বা মানুষের চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন অন্য কোনো প্রাণীকে পাঠাবেন তা সে আল্লাহর দৃষ্টিতে রসূল হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে কিনা এবং ওই সৃষ্টির মধ্য থেকে কেউ আল্লাহর সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের উপযুক্ত বিবেচিত হবে কিনা সেটা ভেবে দেখা হয়নি।

রসূল (স.)-এর যুগের অবিশ্বাসীদের এ ছিলো সন্দেহ। অতীতের অন্যান্য জাতির মনেও এরূপ সন্দেহ বিরাজ করতো। তবে আধুনিক কালেও এক শ্রেণীর মানুষ এ ধরনের প্রশ্ন করে থাকে।

যেমন তারা প্রশ্ন করে আল্লাহর মতো স্বভাব প্রকৃতি তো কারো থাকতে পারে না। সুতরাং বস্তুগত স্বভাব প্রকৃতির অধিকারী মানুষ কিভাবে তার সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাব সম্পন্ন আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে?

এ প্রশ্ন করা কেবল সেই ব্যক্তির পক্ষেই শোভা পায়, যে আল্লাহর স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছে, যেমনটি মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ সম্পর্কে এমন পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী বলে নিজেকে কেউ দাবী করতে পারে না– যদি সে নিজের বুদ্ধি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকে। কেননা মানুষের সম্পর্কেও তো এখনো পূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হয়নি। এখনও নিত্য নতুন তথ্যাদি উদঘাটিত হচ্ছে। ভবিষ্যতেও অনেক উদঘাটিত হবে এবং বহু তথ্যই হয়তো অজানা থেকে যাবে।

বস্তুত মানুষের এমন বহু শক্তি ও প্রতিভা রয়েছে, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। কাজেই যে মানুষকে তিনি রসূল বানান, তার জ্ঞান ও যোগ্যতা সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবগত। যে মানুষটির মধ্যে রসূল হবার যোগ্যতা রয়েছে, তাকে অন্য কোনো মানুষ নাও চিনতে পারে। এমনকি সে নিজেও তার এ যোগ্যতার কথা না জানতে পারে। যে আল্লাহ তায়ালা তাকে এ যোগ্যতা দিয়েছেন, তার প্রতিটি শিরা উপশিরায় এবং প্রতিটি অণুপরমাণুতে কী আছে তা তিনিই জানেন। তাকে তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতাও তিনি দিয়ে থাকেন এবং তা এমনভাবে দেন যে, সেই ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ তা বোঝে না।

কিছু সংখ্যক মোফাসসের বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ওহীর সত্যতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমি মৌলিকভাবে এ নীতির সমর্থন করি না। কেননা বিজ্ঞানের জগতই আলাদা এবং তার উপায় উপকরণও স্বতন্ত্র, যা বিজ্ঞানের জগতেরই করায়ত্ত। আর এ জগতই তার আবিষ্কার উদ্ভাবন ও পর্যবেক্ষণের উপকরণ সংগ্রহ করে দেয়। বিজ্ঞান আত্মা সম্পর্কে কোনো তথ্য নির্ভুলভাবে জানতে পেরেছে এমন দাবী কখনো করেনি। কেননা আত্মা তার আওতাধীন বিষয় নয়। কেননা বিজ্ঞানের কাছে বস্তুগত পরীক্ষা নিরীক্ষার যে উপকরণাদি আছে, তা দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আত্মার নাগাল পাওয়া যায় না। এ জন্যে বিজ্ঞান আত্মার জগতে প্রবেশ করা থেকে বিরত রয়েছে। তবে 'আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান' নামে যে জিনিসগুলো প্রচলিত আছে, সেগুলো নিছক চেষ্টা সাধনা মাত্র এবং তা সন্দেহ সংশয়ের উর্ধে নয়। এ জগতে কোনো সুনিশ্চিত তথ্য জানার জন্যে আমাদের কেবল কোরআন ও হাদীসের ন্যায় নিশ্চিত মাধ্যমের ওপরই নির্ভর করতে হবে এবং কোরআন ও হাদীসের আলোচ্য বিষয়ের সীমার মধ্যেই তা খুঁজতে হবে। এ ক্ষেত্রে রদবদল, হেরফের, অতির ন বা অনুমানের কোনো অবকাশ নেই। কেননা এ সব রদবদল, অতিরঞ্জন বা অনুমান বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাপার। অথচ আত্মার জগত বুদ্ধিবৃত্তির জগত নয় এবং এখানে তার প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণও তার হাতে নেই।

'মানুষের কাছে এটা কি বিস্ময়ের ব্যাপার যে, তাদেরই একজনের কাছে আমি ওহী পাঠালাম এ মর্মে যে, মানুষকে সতর্ক করো এবং সুসংবাদ দাও ....?'

অর্থাৎ ওহীর মূলকথা এতোটুকুই যে, মানুষকে সত্য বিরোধিতার পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করতে হবে এবং মোমেনদেরকে আনুগত্যের পুরস্কার সম্পর্কে সুসংবাদ দিতে হবে। এ সতর্কীকরণ ও সুসংবাদ দানের কাজটার সাথে সাথে যথাক্রমে নিষিদ্ধ ও করণীয় কাজগুলো কি কি, তাও জানিয়ে দেয়া জরুরী। এ হলো, সংক্ষেপে সতর্কীকরণ, সুসংবাদ দান ও এ উভয় কাজের পরিধি ও পরিসীমা।

সতর্কীকরণের কাজটা সকল মানুষের বেলায় প্রযোজ্য। কেননা সব মানুষই সার্বক্ষণিক প্রচার, দাওয়াত ও সতর্কীকরণের মুখাপেক্ষী। (নচেৎ শয়তানের প্ররোচনা যে কোনো মুহূর্তে তার সর্বনাশ ঘটাতে পারে।) পক্ষান্তরে সুসংবাদ দান শুধু মোমেনদের বেলায়ই প্রযোজ্য। তাদেরকে সুসংবাদ দিতে হবে চিরস্থায়ী শান্তি ও স্থিতির। 'কদম' (পা) শব্দটির সাথে 'সিদক' (সত্যনিষ্ঠতা)-এর সম্বন্ধ যুক্ত হয়েছে। 'কাদামু সিদকিন্' অর্থ ভয়ভীতি ও বিপদ মুসীবতের পরোয়া না করে সত্যের ওপর অবিচল থাকা। অর্থাৎ এ ধরনের অবিচল সত্যনিষ্ঠ মোমেনরা আল্লাহর কাছে শান্তিপূর্ণ বাসস্থান পাবে, যখন অন্যদের মন থাকবে বিক্ষিপ্ত ও উদ্বেগাকুল এবং কদম থাকবে টলটলায়মান।

মানুষের কাছে একজন মানুষকে রসূল করে পাঠানো ও তার কাছে ওহী পাঠানো যে কতো বিজ্ঞানসম্মত কাজ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি রসূল হয়ে আসে, তাকেও সবাই চিনে। আর রসূল নিজেও সবাইকে চিনেন। তাঁর সম্পর্কে সবাই নিশ্চিত থাকে। তাঁর সাথে লোকেরা নিশ্চিন্তে ও নিসংকোচে আদান প্রদান করে থাকে। আর রসূল প্রেরণের কাজটিও সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। কেননা ভালো মন্দ উভয় ধরনের কাজ করার ক্ষমতা ও প্রবণতা মানুষের সহজাত ও স্বাভাবিক। তার বিবেক এ ভালো মন্দ, যাচাই বাছাই করার কাজে তাকে সহায়তা করে থাকে। কিন্তু বিবেক এ কাজে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সে কখনো সন্দেহ সংশয় ও বিভ্রাটে পড়ে যায়। তখনই তার একটা সঠিক মানদন্ডের প্রয়োজন হয়, যার সাহায্য নিয়ে সে নিজের সন্দেহ সংশয় দূর করতে পারে। বিবেক অনেক সময় প্রবৃত্তির লালসার প্রবল আকর্ষণে দ্বিধান্বিত ও বিপথগামী হয়। তার দেহে, মেযাজে ও স্নায়ুতে কখনো কখনো সাময়িকভাবে এমন বিপর্যয় দেখা দেয় যে, বিবেকের

যাচাই বাছাই ও বিচার বিবেচনা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। ফলে এক সময় সে যা ভালো বা মন্দ বলে চিহ্নিত করে, অন্য সময় তা ঠিক বিপরীতভাবে চিহ্নিত করে। তাই তার এমন একটা স্থিতিশীল, নির্ভুল, অটুট ও চিরস্থায়ী মানদন্ড প্রয়োজন, যা কোনো ধরনের সাময়িক বিপর্যয় বা বিপরীতমুখী প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তাই সর্বাবস্থায় সে তার পথনির্দেশ গ্রহণ করতে পারে এবং তার থেকে নির্ভুল পথের সন্ধান পেতে পারে। এ চিরস্থায়ী, নির্ভুল ও অটুট মানদন্ডই হচ্ছে আল্লাহর বিধান বা ইসলামী শরীয়ত।

এ কারণে আল্লাহর দ্বীনের একটা স্থায়ী ও অটল মৌল উপাদান বা মূলনীতি থাকা চাই, যার কাছে বিবেক যা কিছু বুঝেছে তা সঠিক কিনা যাচাই করার জন্যে যেতে পারে। এ চিরস্থায়ী মানদন্ডের আলোকে নিজের বুঝকে পরখ করে সে বুঝতে পারে কোন বুঝটা সঠিক এবং কোনো বুঝটা ভ্রান্ত। যারা বলে যে, 'আল্লাহর দ্বীন' বলতে মানুষ যা বোঝে, সেটাই প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর দ্বীন– তাই তার মূলনীত সব সময়ই পরিবর্তনশীল, তারা আল্লাহর দ্বীনের এ মূলনীতিকে তথা তার মৌল উপাদান ও মানদন্ডকে মানুষের বুঝ ও তার বিবেকবুদ্ধির অধীন করে দিতে চায় এবং এর ফলে আল্লাহর দ্বীন আপোসকামী, নিত্য পরিবর্তনশীল ও নমনীয় হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। এভাবে তার কোনো স্থায়ী মানদন্ড থাকে না, যার সাহায্যে মানুষ নিজেদের ভুলভ্রান্তি নিরসন করতে পারে।

উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে এ উক্তির ব্যবধান খুবই কম যে, ধর্ম হলো মানব রচিত বিধান। কেননা উভয় বক্তব্যের শেষ ফল একই এবং তা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক। এ ধারণা ও এর নিকটবর্তী ও দূরবর্তী উভয় ধরনের ফলাফল সম্পর্কে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী।

এভাবে ওহীর অপরিহার্যতা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও কাফেররা ওহীকে একটা আজব ও অদ্ভুত জিনিস মনে করে।

'কাফেররা বলে, এতো একজন যাদুকর।'

জাদুকর বলার কারণ এই যে, রসূল যা বলেন, তার সমকক্ষ কোনো বাক্য রচনা করতে তারা অক্ষম। এমতাবস্থায় তারা যদি সঠিকভাবে চিন্তা ভাবনা করতো, তবে বুঝতো ও বলতো যে, তিনি একজন নবী এবং তাঁর কাছে ওহী আসে। কেননা তাঁর উচ্চারিত কথা এতো উঁচুমানের যে, তার সাথে কোনো কিছুর তুলনা চলে না। জাদুমন্ত্রে প্রাকৃতিক জগত সংক্রান্ত উঁচুমানের বক্তব্য থাকে না। মানব জীবন ও তার কর্মকান্ড নিয়ে কোনো আলোচনা থাকে না। আদেশ-নিষেধ ও আইন কানুন থাকে না। একটা গতিশীল ও উন্নয়নশীল সমাজের যা কিছু প্রয়োজন, তার আলোচনা যাদুমন্ত্রে থাকে না। অথচ রসূল (স.)-এর কাছে আগত ওহীতে এসব উচ্চস্তরের আলোচনা ও তত্ত্ব সন্নিবেশিত রয়েছে।

কাফেরদের চোখে ওহী ও যাদু একাকার হয়ে গিয়েছিলো। কেননা সমস্ত পৌত্তলিক ধর্মমতেই ধর্মের সাথে যাদুমন্ত্রের মিশ্রণ রয়েছে। একজন মুসলমান যখন আল্লাহর দ্বীনের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে এবং সমস্ত পৌত্তলিক কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়, তখন তার কাছে সত্য ও মিথ্যা এবং ইসলাম ও পৌত্তলিকতার পার্থক্য যেভাবে স্পষ্ট হয়ে যায়, কাফেরদের কাছে তেমন হয় না।

বিচিত্রময় বিশ্বের এক সুনিপুন স্রষ্টা

তোমাদের প্রভু আল্লাহ, যিনি ছয় দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন......' (আয়াত ৩, ৪, ৫ ও ৬)

বস্তুত ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে এ রবুবিয়াত তথা প্রভুত্ব সংক্রান্ত আকীদা নিয়েই যতো জটিলতা। বিশ্বের যে একজন ইলাহ তথা স্রষ্টা ও বিধাতা আছেন সে কথা মোশরেকরা কখনো অস্বীকার করতো না। তারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো। কেননা চরম বিকৃতিজনিত বিরল অবস্থা ছাড়া মানুষের স্বভাব প্রকৃতি কখনো বিশ্বের একজন বিধাতা থাকার কথা বিশ্বাস না করে

পারে না। কিন্তু তারা আল্লাহর সাথে অন্য কতক প্রভু বা প্রতিপালকের শরীক করে এবং তাদের উপাসনা করে। এর উদ্দেশ্য, ওই সকল শরীকরা যেন মানুষকে আল্লাহর ঘনিষ্ঠ করে দেয় এবং তার কাছে সুপারিশ করে আযাব থেকে মুক্ত করে দেয়। তা ছাড়া তারা প্রভুসুলভ কর্মকান্ডও চালায় এবং নিজেদের জন্যে আইন রচনা করে, যার অধিকার আল্লাহ কাউকে দেননি।

কোরআন খোদাসুলভ ও প্রভুসুলভ গুণবৈশিষ্ট্য (উলুহিয়াত ও রবুবিয়াত) সম্পর্কে গ্রীক দর্শনের ন্যায় জটিল বিতর্কে জড়িত হয় না। সে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সহজ সরল ও স্বাভাবিক বক্তব্য পেশ করে। কোরআনের বক্তব্য নিম্নরূপ,

আল্লাহ তায়ালা আকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের ভেতরে যা কিছু রয়েছে, তার স্রষ্টা। তিনিই সূর্য ও চাঁদকে আলোকময় করেছেন এবং তার জন্যে কিছু সংখ্যক রাশিচক্র নির্ধারণ করেছেন। তিনি রাত ও দিনের পালাও নির্ধারণ করেছেন। এ সব দর্শনীয় ও লক্ষণীয় নিদর্শন চেতনাকে স্পর্শ করে ও হৃদয়কে জাগ্রত করে, যদি তা নিয়ে সঠিকভাবে চিন্তা ভাবনা করা হয়। যে আল্লাহ তায়ালা এ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা করছেন, তিনিই 'রব' বা প্রভু হওয়ার অধিকারী এবং মানুষের উচিত কেবল তাঁরই দাসত্ব ও আনুগত্য করা। তাঁর সাথে তাঁর সৃষ্টির কাউকে শরীক করা উচিত নয়। এটাই একমাত্র সহজ সরল স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত বক্তব্য। এতে এমন কোনো জটিল মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিতর্ক নেই, যা মনমগজকে কখনো ঠান্ডা ও কখনো উত্তপ্ত করে।

এ বিস্ময়কর বিচিত্র মহাবিশ্ব, আকাশ ও পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্য, দিন ও রাত, আকাশ ও পৃথিবীতে যতো সৃষ্টি, যতো জাতি ও যতো নিয়মরীতি আছে এবং যতো তরুলতা, উদ্ভিদ, পশু ও পাখী আছে, সব কিছুই আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মে চলে।

যে নিথর নিস্তব্ধ তিমিরাচ্ছন্ন রাতে কেবল স্বপ্ন ও আত্মা ছাড়া আর কোনো কিছুর চলাচল থাকে না, যে প্রভাত আনন্দোদ্বেল নবজাত শিশুর হাসির মতো রাতের আঁধার চিরে জন্ম নেয়, যে কর্মচাঞ্চল্য প্রভাত হওয়ার সাথে সাথে পৃথিবীর জীবকুলকে মাতিয়ে তোলে, যে প্রশান্ত ছায়াগুলোকে দর্শক স্থির মনে করে, অথচ তা ধীরগতিতে চলমান, যে সদাচঞ্চল পাখিকুল সকাল সন্ধ্যা দিক থেকে দিগন্তে উড়ে চলে, যে উদ্ভিদ ও তরুলতা ক্রমাগত বিকাশ, বৃদ্ধি ও সজীবতার দিকে অগ্রসরমান, পালাক্রমে ও পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে সুশৃংখলভাবে যে সৃষ্টিকুল ক্রমাগত আসছে ও যাচ্ছে, মায়ের যে উদরসমূহ ক্রমাগত সন্তান প্রসব এবং মাটিতে খনন করা যে কবরসমূহ ক্রমাগত সেগুলোকে গ্রাস করে চলেছে, আর সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিশ্বে জীবন যেভাবে সর্বক্ষণ স্পন্দিত ও গতিশীল।– এই সমস্ত রূপ ও ছায়া, আকৃতি ও প্রকৃতি, অবস্থা ও তৎপরতা, আগমন ও নির্গমন, নতুনত্ব ও প্রাচীনত্ব, ঘাটতি ও বৃদ্ধি, জন্ম ও মৃত্যু এবং দিনে ও রাতে এক মুহূর্তের জন্যে যে তৎপরতা ও গতিশীলতা স্তব্ধ হয় না–এ সবই একজন চিন্তাশীল মানুষের মনকে ক্রমাগত নাড়া দেয়, তার চেতনাকে উজ্জীবিত করে, সারা বিশ্ব–প্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনাবলীর পর্যবেক্ষণ ও চিন্তা গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করে এবং মনমগজকে জাগিয়ে তোলে ও সক্রিয় করে। এ সব নিদর্শন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার জন্যে কোরআন প্রত্যক্ষভাবে মানুষের মন ও বিবেককে জাগ্রত করে।

'তোমাদের 'রব' (প্রভু) হচ্ছেন সেই আল্লাহ, যিনি 'ছয় দিনে' আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন' ....

অর্থাৎ তোমাদের যে প্রভু এককভাবে তোমাদের ওপর সর্বময় প্রভুত্ব করার এবং তোমাদের দাসত্ব ও আনুগত্য লাভের হকদার, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর এ সুদক্ষ, বিজ্ঞ, কুশলী ও নিপুণ স্রষ্টা,

'ছয় দিনে'

অর্থাৎ তার বিজ্ঞতা, কুশলতা ও বিচক্ষণতা যেভাবে তার ইচ্ছাকে রূপায়িত করার জন্যে সৃষ্টি জগতকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সৃষ্টি করতে চেয়েছে, সেভাবেই সৃষ্টি করেছে।

এ ছয় দিন দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে, তা নিয়ে আমরা কিছু বলতে চাইনে। কেননা এ দিনগুলো কেমন ও কতো বড়, তা নিয়ে আমাদেরকে চিন্তা ভাবনা করতে বলা হয়নি এবং সে জন্যে এর উল্লেখও করা হয়নি। এর উল্লেখ করা হয়েছে শুধু একথা বুঝানোর জন্যে যে, তিনি এ জগতকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, সেই উদ্দেশ্যের দাবী অনুসারে এবং সেই উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্যেই তিনি সুপরিকল্পিতভাবে বিজ্ঞতা সহকারে তাকে সৃষ্টি করেছেন।

মোট কথা, 'ছয়দিন' কথাটা আল্লাহর অদৃশ্য ও অজ্ঞাত বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। ওহীর ব্যাখ্যা ছাড়া এর প্রকৃত মর্ম বুঝার কোনো উপায় নেই। তাই যতোটুকু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, ততোটুকু পর্যন্তই আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। এর চেয়ে বেশী কিছু বলা আমাদের সংগত হবে না। এখানে এটা উল্লেখ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা শৃংখলা ও সময়ানুবর্তিতার প্রয়োজনীয়তার দিকে ইংগিত দান। কেননা মহাবিশ্বের সৃষ্টির আদিকাল থেকেই পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, শৃংখলা ও সময়ানুবর্তিতার নীতি অনুসৃত হয়ে আসছে।

'অতপর তিনি আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হলেন।'

'আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হওয়া' দ্বারা আসলে মানুষের বোধগম্য ভাষায় আল্লাহর প্রতাপ ও পরাক্রমের দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। (বিষয়টি আমি আমার পুস্তক 'আত্‌তাসবীরুল ফান্নী ফিল কুরআন'-এ বিশদভাবে আলোচনা করেছি।)

'ছুম্মা' শব্দটার অর্থ অতপর। কিন্তু এখানে এটা কালগত ব্যবধান অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কেননা এখানে কালের কোনো প্রভাব নেই। এমন কোনো অবস্থা থাকতে পারে না, যা ইতিপূর্বে আল্লাহর ছিলো না, কিন্তু পরে হয়েছে। কারণ আল্লাহ তায়ালা অনাদি ও অনন্ত। তাঁর সত্ত্বায় নিত্য নতুন অবস্থার উদ্ভব হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর সত্ত্বায় কোনো স্থানগত বা কালগত আবর্তন, বিবর্তন বা পরিবর্তন সাধিত হওয়া অসম্ভব। তাই আমি সুনিশ্চিত যে, 'ছুম্মা' শব্দটা এখানে সৃষ্টির তুলনায় আল্লাহর মর্যাদাগত ব্যবধান বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এই অভিমত দিতে গিয়ে যে আমি মানবীয় বিবেকবুদ্ধির নিরাপদ সীমা অতিক্রম করিনি তাও সুনিশ্চিত। কেননা আমরা এ মূলনীতির ওপর আস্থাশীল যে, মহান আল্লাহর সত্ত্বা চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। তার সত্ত্বায় স্থানগত বা কালগত কোনো অবস্থার উদ্ভব হয় না এবং সময় বা স্থানের কোনো দাবী ও চাহিদা তার সত্ত্বায় প্রতিফলিত হয় না।

'তিনি সর্ব বিষয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করেন।'

অর্থাৎ সব কিছুর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা আল্লাহই করেন, তার বিভিন্ন অবস্থা ও চাহিদার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন এবং সব কিছুর ফলাফল স্থির করেন।

'কেবল তার অনুমতি দ্বারাই কেউ সুপারিশ করতে পারবে।'

বস্তুত সব কিছু পুরোপুরিভাবে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল এবং সব কিছুর ফয়সালাও তাঁরই এখতিয়ারাধীন। কোনো সুপারিশকারী তাঁর নিকটবর্তী হতে পারে না। শুধুমাত্র তাঁর পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং ঈমান ও সৎ কর্মজনিত যোগ্যতার ওপরই সুপারিশ করা নির্ভর করবে, কেবল সুপারিশকারীদের নৈকট্য যথেষ্ট হবে না। এ দ্বারা কাফেরদের এ ধারণার অপনোদন করা হয়েছে যে, ফেরেশতাদের সুপারিশ আল্লাহ তায়ালা অগ্রাহ্য করেন না। এ ধারণার ভিত্তিতে তারা ফেরেশতাদের মূর্তি বানিয়ে পূজাও করতো।

'তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রভু, অতএব তাঁর গোলামী করো।'

অর্থাৎ তিনিই সেই মহান স্রষ্টা আল্লাহ, যিনি সৃষ্টির পরিচালকও, সর্ব বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালাকারীও এবং যার অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁর কাছে সুপারিশও করতে পারে না। তিনিই প্রভু হওয়ার যথার্থ যোগ্য, কাজেই একমাত্র তিনিই আনুগত্য ও দাসত্ব পাওয়ারও যোগ্য, অন্য কেউ নয়।

'তবু কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

অর্থাৎ বিষয়টা এতো পরিষ্কার যে, শুধু শিক্ষা গ্রহণ করাই যথেষ্ট। আর কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই।

এবাদাতের প্রচলিত কিছু অপব্যাখ্যা

আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহর একক প্রভুত্বের অকাট্য সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপনের পর বলা হয়েছে যে, 'তিনিই সেই আল্লাহ, তোমাদের প্রভু, অতএব তোমরা তাঁর এবাদাত করো।'

এ উক্তিটা নিয়ে কিছু চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন।

আমি আগেই বলেছি যে, মোশরেকরা আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাস করতো না। আল্লাহই যে সকল জিনিসের সৃষ্টিকর্তা, রেযেকদাতা, জীবন ও মৃত্যুদানকারী, ব্যবস্থাপক ও নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী, সে কথা তারা স্বীকার করতো। কিন্তু এ স্বীকৃতির দাবী অনুযায়ী কাজ করা হতো না। আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, রেযেকদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা, সর্ব বিষয়ের চূড়ান্ত ব্যবস্থাপক ও সর্ব ক্ষমতার মালিক বলে মেনে নেয়ার স্বাভাবিক দাবী এ দাঁড়ায় যে, মানুষ তার জীবনের জন্যে আল্লাহকেই একমাত্র 'রব' বা প্রভু তথা হুকুমদাতা ও আইনদাতাও মেনে নেবে, তাঁরই আনুগত্য করবে, তাঁরই এবাদাত করবে এবং তাঁরই নির্দেশমতো কাজ করবে। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রভু, তাই তাঁরই এবাদাত করো'– কথাটার এটাই মর্মার্থ।

এবাদাত হলো দাসত্ব, আনুগত্য, অনুসরণ ও অনুকরণ। শুধুমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করাই মুসলমানের কর্তব্য। কেননা তাকে সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা মানার স্বাভাবিক দাবী এটাই।

সকল জাহেলী ব্যবস্থায় 'উলুহিয়াতের' অর্থ খুবই সংকীর্ণ। সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্ববিধাতা হিসাবে আল্লাহকে মেনে নেয়াই যথেষ্ট মনে করা হয় এবং এটাই ঈমান বলে গণ্য হয়। মানুষ যখন আল্লাহকে মাবুদ ও ইলাহ হিসাবে মেনে নেয়, তখন তার কর্তব্য পালন শেষ হয়ে যায়। এর ফলে যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রভুত্ব বা রবুবিয়ত মেনে নেয়াও অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় এবং তাঁর হুকুম, আইন ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়াও জরুরী হয়ে দাঁড়ায়, সেটা অনুধাবন করা হয় না।

অনুরূপভাবে জাহেলিয়াতে এবাদাতের অর্থ ও সংকীর্ণ। এর অর্থ কেবল আনুষ্ঠানিক উপাসনা, বন্দনা ও জপতপ। মানুষ যদি শুধু আল্লাহর জন্যে এ সব করে, তাহলে সে একমাত্র তাঁরই এবাদাতকারী সাব্যস্ত হয়। অথচ আসলে 'এবাদাত' শব্দটা 'আবদুন' শব্দ থেকে নির্গত। 'আবদুন' অর্থ মূলত দাস, ভৃত্য ও অনুগত ব্যক্তি। আনুষ্ঠানিক এবাদাত দাসত্বের একটা অংশমাত্র– পুরো দাসত্ব নয়।

জাহেলিয়াত কোনো বিশেষ কাল বা স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃতপক্ষে জাহেলিয়াত হচ্ছে উলুহিয়াত বা খোদায়ী ও এবাদাতের অর্থকে এমনভাবে সংকীর্ণ করা যে, মানুষ শেরেকে লিপ্ত হয়েও মনে করে যে, সে আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী। পৃথিবীর সব ক'টি দেশে বর্তমানে এ অবস্থাই বিরাজ করছে। এমনকি মুসলিম নামে পরিচিত দেশগুলোতে এ অবস্থাই বিরাজমান। তারা আনুষ্ঠানিক এবাদাত উপাসনা আল্লাহর জন্যেই করে, কিন্তু তাদের প্রভু হচ্ছে গায়রুল্লাহ অর্থাৎ

আল্লাহ ছাড়া অন্যরা। কেননা যে শাসক তাদের ওপর নিজের ক্ষমতা ও আইন প্রয়োগ করে, সেই প্রকৃত পক্ষে তাদের রব বা প্রভু, তারা তারই আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করে থাকে। আর এটাই তাদের এবাদাত। যেমন রসূল (স.) বলেছেন, 'তারা তাদের হুকুমের আনুগত্য করেছে। এটাই তাদের এবাদাত।' (তিরমিযী– আদী ইবনে হাতেম)

এবাদাতের এ অর্থ আরো স্পষ্ট করে দেয়ার জন্যে আল্লাহ বলেন, 'তুমি বলো, আল্লাহ তোমাদের জন্যে যে জীবিকা নাযিল করেছেন, তা থেকে যে তোমরা কিছু জিনিসকে হালাল ও কিছু জিনিসকে হারাম করো, সেজন্যে কি আল্লাহ তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহর নামে অপবাদ আরোপ করো?'

আজ আমরা যে আচরণ করছি, তা জাহেলিয়াতের অনুসারীদের থেকে পৃথক কিছু নয়। তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই আল্লাহ বলেছেন,

'এই হচ্ছেন আল্লাহ, তোমাদের প্রভু ও মনিব, অতএব তাঁরই এবাদাত করো।'.....

অর্থাৎ তাঁর এমন এবাদাত করো, যাতে কোনো শেরেকের মিশ্রণ নেই। কেননা তোমাদেরকে অন্য কারো কাছে নয়, আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে এবং তাঁকেই হিসাব নিকাশ বুঝিয়ে দিতে হবে। তিনিই কাফের ও মোমেনদেরকে কর্মফল দিয়ে থাকেন।

'তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন হবে তাঁরই কাছে, এটা আল্লাহর অকাট্য প্রতিশ্রুতি।' অর্থাৎ তোমাদেরকে শুধু আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে, তোমাদের মনগড়া শরীকদের বা সুপারিশকারীদের কাছে নয়।

তিনি যে প্রতিশ্রুতি দেন, তা থেকে পিছু হটেন না। আখেরাত সম্পর্কেও তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুরূপ অকাট্য ও অভ্রান্ত। কেননা আখেরাত হলো সৃষ্টিরই পরিপূরক।

'তিনি সৃষ্টি শুরুও করেন, আবার পুনঃ সৃষ্টিও করেন, যাতে সৎকর্মশীল মোমেনদেরকে প্রতিদান দিতে পারেন। আর যারা কুফরী করে, তাদের জন্যে রয়েছে গরম পানির শরবত ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কেননা তারা কুফরীতে লিপ্ত ছিলো।' (আয়াত ৪)

বস্তুত ন্যায়সংগত কর্মফল দেয়াও সৃষ্টি ও পুন সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য, মানব জাতি মনুষ্যত্বের পূর্ণতার যে সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে, তা হচ্ছে সম্পূর্ণ ক্লেশমুক্ত সুখ। অথচ মানব জাতি এ পৃথিবীতে এ লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম নয়। কেননা এখানে সব কিছুই মিশ্র ও ভেজাল। এখানে কোনো আনন্দই কষ্ট থেকে মুক্ত নয়। অবশ্য নিষ্কলুষ আত্মার আনন্দ ভেজালমুক্ত। কিন্তু তা খুব কম মানুষই ভোগ করে থাকে। পার্থিব জীবনে যদি শুধু সুখের সর্বোচ্চ মাত্রার অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই না থাকতো, তা হলে এ একটাই পার্থিব জীবনের অসম্পূর্ণতা বিবেচিত হতো। কেননা মানব জাতি পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মাত্রায় কখনো পৌছতে পারবে না। এ সর্বোচ্চ মাত্রা হলো, দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা এবং হারানো ও ফুরিয়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থেকে সুখ ভোগ করা। কোরআন বলেছে যে, এ সর্বোচ্চ মাত্রার সুখ শান্তি মানুষ কেবল বেহেশতে গিয়ে ভোগ করতে পারবে– দুনিয়াতে নয়। সুতরাং সৃষ্টি ও পুন সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, মানব জাতির মধ্য থেকে যারা হেদায়াত লাভ করেছে এবং নির্ভুল জীবন যাপনের পদ্ধতি অনুসরণ করেছে, তাদেরকে বেহেশতের সেই অনাবিল সুখ ভোগ করার সুযোগ দান ও মানবতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীতকরণ।

পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে, তারা মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌছার চেষ্টাই করে না। তাই স্বভাবতই তারা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না। একজন রোগী যেমন স্বাস্থ্যের নিয়ম না মানার কারণে রোগাক্রান্ত হয়, ঠিক তেমনি কোনো ব্যক্তি কুফরী করলে, সে দুঃখ, কষ্ট, দুর্বলতা ও পতনের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং সে সব তার নিজেরই সৃষ্ট।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাঝে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের নিদর্শন

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে শুরু করে এক আল্লাহর এবাদাত প্রভৃতি বিষয় বর্ণনা করার পর এবং আল্লাহর কাছেই রয়েছে কর্মফল ও প্রত্যাবর্তন এ কথা বলার পর পুনরায় প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলীর আলোচনা শুরু হয়েছে।

'তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি সূর্যকে আলো ও চাঁদকে প্রদীপ বানিয়েছেন......'। (আয়াত ৫)

বস্তুত সূর্য ও চাঁদ হচ্ছে মহাবিশ্বের দুটো দর্শনীয় জিনিস, এদেরকে আমরা সব সময় দেখি বলেই এর গুরুত্ব ভুলে গিয়েছি। নচেত কোনো মানুষ যদি প্রথম সুর্যোদয় ও সূর্যাস্ত এবং প্রথম চাঁদ ওঠা ও চাঁদ ডোবার দৃশ্য দেখতো, তবে এ দৃশ্য তার অনুভূতিতে আলোড়ন সৃষ্টি না করে পারে না।

এ দুটো দর্শনীয় জিনিস বারবার দেখতে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। তাই কোরআন আমাদেরকে পুনরায় ওই দৃশ্যাবলী অবলোকন করাতে নিয়ে যেতে চাইছে, যাতে করে আমাদের অনুভূতিতে নতুনত্বের সাড়া জাগে এবং আমাদের অন্তরে জীবন্ত অন্বেষার চেতনা পুনরুজ্জীবিত হয়। বারংবার দেখা সত্তেও যে চিন্তাশক্তি লুপ্ত হয় না ও যে জাগৃতি বিনষ্ট হয় না, তাকে পুনরুত্থিত করা এর উদ্দেশ্য। এ দুটো শক্তির সৃষ্টির মূলে বিশেষ কৌশল গৃহীত হয়েছিলো বলেই কোনো জিনিস বারবার দেখলেও এ দুটো শক্তি লোপ পায় না।

'তিনি সূর্যকে আলোকিত করেছেন।'

অর্থাৎ উত্তাপময় আলো দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

'আর চাঁদকে উজ্জ্বল করেছেন।'

অর্থাৎ চাঁদকে নিরুত্তাপ আলো দিয়েছেন।

'এবং তাকে (চাঁদকে) বহু সংখ্যক স্তর বা মনযিল অতিক্রম করতে হয়।'

প্রতি রাত্রে চাঁদ একটা নির্দিষ্ট মনযিলে অবস্থান করে এবং এটা বিশেষ আকৃতি ধারণ করে। এটা চাঁদে স্বাভাবিকভাবেই পরিলক্ষিত হয়। জ্যোতির্বিদদের জ্যোতির্বিদ্যা প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না।

'যেন তোমরা বর্ষ গণনা ও হিসাব করতে পারো।'

এখনও সূর্য ও চাঁদের সাহায্যে সময় নির্ধারণের ঋতু সকল মানুষের মধ্যেই প্রচলিত রয়েছে।

এ সব কি বৃথা? এ সব কি নিছক কাকতালীয় ঘটনা? কক্ষণো নয়। এতো শৃংখলা, এতো সমন্বয় ও এতো নিখুঁত আবর্তন বৃথা, নিরর্থক ও কাকতালীয় হতে পারে না।

'এসবকে আল্লাহ সত্য সহকারেই সৃষ্টি করেছেন।'

বস্তুত এর আগাগোড়াই সত্য। এর পদ্ধতিও সত্য এবং এর উদ্দেশ্যও সত্য ও মহৎ। সত্য চিরস্থায়ী। আর এর এ সব সাক্ষ্য প্রমাণও সুস্পষ্ট ও চিরস্থায়ী।

'আয়াতগুলোকে তিনি জ্ঞানী লোকদের জন্যে বিশদভাবে বর্ণনা করেন।'

অর্থাৎ যে দৃশ্যগুলোকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন, যাতে করে ওগুলোর পেছনে কার্যকর সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনা অনুধাবন করা যায়।

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, সূর্য ও চন্দ্রকে আলোকময় করা ও তার জন্যে বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত হওয়া দ্বারা রাত ও দিনের সৃষ্টি হয়। আর খোলা মন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে এ বিস্ময়কর সৃষ্টিজগতে এটা একটা তাৎপর্যময় ঘটনা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'রাত ও দিনের পালাক্রমে আসায় এবং আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাতে সংযমীদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।' (আয়াত ৬)

'ইখতিলাফুল লাইল ওয়ান নাহার' অর্থ রাত ও দিনের পালাক্রমে আসা এবং উভয়ের কখনো ছোট হওয়া ও বড় হওয়া। এ উভয়টি এমন প্রাকৃতিক বাস্তবতা, যা আমরা প্রতিনিয়ত অবলোকন করি। এ দুটো অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে অনুভূতিতে এর এমন তীব্র প্রভাব পড়ে যে, তাতে মানুষের প্রাতনিয়ত অবলোকন জনিত পরিচিতি দূর হয়ে যায়। তবে মন ও চেতনার জাগৃতির মুহূর্তগুলোতে সে নতুন মানুষের রূপ ধারণ করে উদয় ও অস্তের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে। তখন প্রত্যেক নতুন জিনিসকে সে খোলা চোখ ও আগ্রহী চেতনা নিয়ে দেখে। প্রকৃতপক্ষে এরূপ মুহূর্তগুলোতেই মানুষের জীবন প্রকৃত ও পূর্ণাংগ জীবনে পরিণত হয় এবং তার গ্রহণ ও উপলব্ধির ইন্দ্রিয়গুলোতে যে পরিচিতিজনিত শুষ্কতা বিরাজ করে, তা দূর হয়ে যায়।

'আর আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাতে সংযমীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।।.....'

মানুষ যদি এক মুহূর্তের জন্যেও আকাশ ও পৃথিবীতে বিরাজমান আল্লাহর বিচিত্র সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, তাহলে সে এতো শিক্ষা লাভ করতে পারে, যা তার গোটা জীবনের জন্যে যথেষ্ট। স্বয়ং আকাশ ও পৃথিবীকে যেরূপ বিস্ময়কর পন্থায় সৃষ্টি করা হয়েছে, তার কথা না হয় আপাতত বাদই থাক। কারণ এ ব্যাপারে মানুষের মনকে একটি সংক্ষিপ্ত ইংগিতের মাধ্যমে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারপর সে যাতে ওই ইংগিত অনুসারে নিজেই অগ্রসর হয়, সে জন্যে এ ব্যাপারে আর জোর দেয়া হয়নি। শুধু বলা হয়েছে যে, 'এ সব কিছুর মধ্যেই নিদর্শন রয়েছে সংযমী তথা খোদাভীরুদের জন্যে।' এ কথাটা বলে মানুষের তাকওয়া তথা খোদাভীরুতা ও সংযম জাগিয়ে তোলা হয়েছে। আর এ তাকওয়া বা খোদাভীতি এমন একটি গুণ, যা মানুষের মনকে সচকিত ও অনুভূতিপ্রবণ করে দেয়। দ্রুত প্রভাবিত হওয়া ও দ্রুত গ্রহণ করার গুণ তার মধ্যে বিকশিত করে, আর আল্লাহর সীমাহীন শক্তি ও ক্ষমতা, তার সৃজনশীলতার নিদর্শনাবলী এবং সৃষ্টি ও শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবযোগ্য মোজেযা বা অলৌকিক কর্মকান্ডসমূহ সম্পর্কে মন মগযকে সচেতন করে তোলে।

মানুষের চতুর্দিকে বিস্তৃত প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলীর উল্লেখ সহকারে মানবীয় বিবেক ও জন্মগত স্বভাবপ্রকৃতিকে কোরআন যেভাবে সম্বোধন করে, এ হচ্ছে তারই নমুনা। আল্লাহ জানেন যে, মানুষের স্বভাবের মাঝে ও বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে এমন একটা ভাষা রয়েছে যাকে উভয়ে বুঝতে পারে ও শুনতে পায়।

কোরআন নাযিল হওয়ার অনেক পরে আমাদের আকীদা শাস্ত্রীয় ব্যাপারে দার্শনিক ও তার্কিকরা যে তার্কিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, কোরআন সে পদ্ধতি অবলম্বন করেনি। কেননা আল্লাহ তায়ালা জানেন, এ পদ্ধতি মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হয় না, তা মানুষকে কোনো আন্দোলন ও সংগ্রামেও উদ্বুদ্ধ করে না, জীবন গঠনেও উৎসাহ যোগায় না, উপরন্তু ঠান্ডা মস্তিষ্কে যা কিছু প্রেরণা ও উদ্দীপনা সঞ্চিত থাকে, তাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে যায়।

কিন্তু কোরআনী পদ্ধতি, বিশেষত তার অনুসৃত সহজ সরল বাচনভংগি যে প্রমাণগুলো উপস্থাপন করে, তা হচ্ছে মনমগযকে উদ্বুদ্ধকারী সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ। বস্তুত এটাই তার বৈশিষ্ট্য। এ পর্যায়ে সর্ব প্রথম তুলে ধরা হয় এ মহাবিশ্বটাকে এবং এর সুশৃংখল নিখুঁত, নির্ভুল ও সুসমন্বিত পরিচালনা পদ্ধতিকে, দ্বিতীয়ত এর পেছনে কোনো সুদক্ষ শক্তির উপস্থিতি মেনে নেয়া ছাড়া। এ সব কিছুর কোনো ব্যাখ্যা দেয়াই সম্ভব নয়।

যারা এ সত্যকে নিয়ে বিতর্ক তোলে, তারা তাদের মতের সপক্ষে কোনো গ্রহণযোগ্য যুক্তি পেশ করতে পারে না। তারা বড়জোর এতোটুকুই বলতে পারে যে, মহাবিশ্বকে তার সমস্ত

প্রাকৃতিক নিয়মাবলী সহ এভাবেই পাওয়া গেছে। তার অস্তিত্বের জন্যে যুক্তির প্রয়োজন নেই। তার অস্তিত্বের সাথেই তার নিয়ম কানুনও যুক্ত। তাদের এ যুক্তি যদি কারো কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়, তবে আমার বলার কিছু নেই।

এ যুক্তি ইউরোপে আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করার জন্যে ব্যবহৃত হতো। কেননা তারা গীর্জাকে প্রত্যাখ্যান করার পর আল্লাহকেও প্রত্যাখ্যান করার প্রয়োজন অনুভব করে। তাদের জন্যে আল্লাহর অস্তিত্বকে মেনে নেয়ার দাবী থেকে নিস্তার লাভের এটাই ছিলো মোক্ষম উপায়। কারণ প্রাচীন জাহেলিয়াতের অনুসারীদের অধিকাংশই আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো। তারপর সেই আল্লাহর প্রভুত্ব মানা ও তার দাসত্ব ও আনুগত্য করা জরুরী কি না, তাই নিয়ে বিতর্ক তুলতো। যেমন আরব জাহেলিয়াতকে আমরা দেখেছি এবং কোরআন বারবার তারই মুখোমুখি হয়েছে। আল্লাহর অস্তিত্বে তাদের এ বিশ্বাসকে সম্বল করে কোরআন নিজস্ব, যুক্তি প্রয়োগ করে তাদের কাছে দাবী করেছে যে, এ বিশ্বাস অনুসারে আল্লাহকে একমাত্র আইন ও হুকুমদাতা প্রভু বা রব মেনে নেয়া তাদের উচিত। তাই আল্লাহর আইন ও বিধানকেও হুবহু মেনে নেয়া তাদের কর্তব্য। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়াত এ বিশ্বাসের দায়দায়িত্ব থেকেও রেহাই পেতে চায়। তাই আল্লাহর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে চায়।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, 'মুসলিম' নামের দেশগুলোতেও যাবতীয় গোপন ও প্রকাশ্য পন্থায় 'বিজ্ঞানের' নামে আল্লাহকে অস্বীকার করার প্রচারণা চলে। বলা হয় যে, 'বৈজ্ঞানিক' বিধি ব্যবস্থায় 'অদৃশ্য' কোনো জিনিসের স্থান নেই। আর 'অদৃশ্য' জিনিসের যখন স্থান নেই, তখন আল্লাহ ও তদ্‌ সংক্রান্ত সব কিছুই সেখানে অচল। এ পশ্চাদমুখী দরজা দিয়ে পলায়নকারীরা মূলত আল্লাহর কাছ থেকেই পালানোর চেষ্টা করে। তারা আল্লাহকে ভয় করে না। ভয় করে শুধু মানুষকে। তাই তাদের বিরুদ্ধে এ ফন্দি-ফিকির প্রয়োগ করে।

কিন্তু এতদসত্তেও স্বয়ং বিশ্বজগতের অস্তিত্বই আল্লাহর অস্তিত্বের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর রয়েছে বিশ্ব জগতের সুশৃংখল, সুসমন্বিত ও নির্ভুল ব্যবস্থাপনা। এ সাক্ষ্য পলায়নপর অবিশ্বাসীদেরকে পিছু ধাওয়া করে ছুটে চলেছে ক্রমাগত। মানুষের জন্মগত স্বভাব প্রকৃতি, তার বিবেক ও মন এ সাক্ষ্য প্রমাণকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করছে। তদুপরি কোরআনও তার সমগ্র স্বভাব প্রকৃতিকে সর্বাত্মকভাবে এদিকেই আহ্বান জানাচ্ছে।

যারা এ সব কিছু দেখে শুনে বুঝেও আল্লাহর মুখোমুখি হবার অবশ্যম্ভাবিতা বিশ্বাস রাখে না এবং উপলব্ধি করে না যে, দুনিয়ার এ সুশৃংখল ব্যবস্থার দাবীই এই যে, আখেরাত থাকতেই হবে, দুনিয়াটা শেষ কথা নয়, কেননা মানুষ এখানে তার চূড়ান্ত ফলাফল পায় না, যারা বিশ্ব চরাচরে দৃশ্যমান এত সব নিদর্শনকে অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করে, এসব নিদর্শন তাদের মনে ও বিবেকে কোনো চিন্তার উদ্রেক করে না, তারা কখনো তাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সাধন করতে পারবে না এবং বেহেশতে কখনো পৌঁছতে পারবে না। এ বক্তব্যই বিধৃত হয়েছে ৭, ৮, ৯ ও ১০ আয়াতে।

'যারা আমার সাক্ষাতে বিশ্বাস করে না বরং দুনিয়ার জীবন নিয়েই সুখী ও পরিতৃপ্ত এবং আমার আয়াতগুলোর প্রতি উদাসীন। ....'

এ আয়াত ক'টিতে বলা হয়েছে যে, যারা উপলব্ধি করে না যে, প্রাকৃতিক জগত সাক্ষ্য দিচ্ছে, মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা ও পরিচালক রয়েছে। তারা বুঝতে পারে না যে, দুনিয়ার এ জীবনই আখেরাতকে অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। তারা জানে না যে, আখেরাতেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেখানেই মানুষকে তার সর্বোচ্চ মার্গে পৌঁছানো হবে। একথা না জানা ও না

বুঝার কারণেই তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টা বিশ্বাস করে না। আর এটা বিশ্বাস না করার কারণে তারা দুনিয়ার জীবনেই সীমাবদ্ধ ও সন্তুষ্ট থাকে। এখানে যতো ঘাটতি, লোকসান ও ক্ষতি হোক, তাতে তারা অসন্তুষ্ট হয় না। তারা বোঝে না যে, এ দুনিয়া মানুষের জীবনের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ স্তর হবার যোগ্যই নয়। তারা যতো ভালো বা মন্দ কাজই করুক, তার পূর্ণ ফল ভোগ না করেই এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। পার্থিব জবীনে সীমিত থাকার ফলে তাদের দৃষ্টিভংগিও সংকীর্ণ ও নীচ হয়ে যায়। কেননা তারা কখনো উর্ধ জগতের পানে তাকায় না এবং উচ্চতর আশা ও অভিলাষ পোষণ করে না। আল্লাহর যে নিদর্শনাবলী হৃদয় মনে জাগরণ আনে, চেতনায় মহত্ব আনে এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও পরিপক্কতা অর্জনের প্রেরণা যোগায়, সেগুলো সম্পর্কে উদাসীন হয়ে শুধু ইহকালের সুখ ও সমৃদ্ধির কথা ভেবেই জীবন কাটিয়ে দেয়।

'তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম এবং সেটা তাদেরই কর্মফল।' বস্তুত এর চেয়ে খারাপ ঠিকানা ও খারাপ কর্মফল আর কিছু হতে পারে না।

পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে, ঈমান আনার কারণেই তারা বুঝেছে যে, দুনিয়ার জীবনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ একটা জীবন আছে, অতপর এ বুঝ ও বিশ্বাসের দাবী অনুসারে সৎ কাজ করেছে। আল্লাহর হুকুম পালন করেছে এবং আখেরাতের পবিত্র জীবনের অপেক্ষায় রয়েছে ....

'তাদেরকে তাদের প্রভু তাদের ঈমান অনুসারে সুপথে চালান....' অর্থাৎ সৎ কাজ কবার প্রেরণা যোগান তাদের ঈমানেরই ওসীলায়। এ ঈমান আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক দৃঢ় করে, সত্যের পথে অবিচল থাকার শক্তি যোগায় এবং বিবেকের ডাকে সৎ কাজ করার উৎসাহ যোগায়। এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

'তাদের নীতি নিয়ে ঝর্ণাগুলো প্রবাহিত।'...........

বস্তুত পানি সব সময় সজীবতা, উর্বরতা ও প্রবৃদ্ধির আলামত।

এ জান্নাতে তাদের ভাবনা কী, ব্যস্ততা কী, বক্তব্য কী, যা বাস্তবায়িত করতে চায়? তাদের ভাবনা সম্পদ ও মান মর্যাদার জন্যে নয়। তাদের ব্যস্ততা কোনো কষ্ট দূর করা ও স্বার্থ তারা উদ্ধার করার জন্যে নয়। কারণ এসব ব্যাপারে তারা পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করেছে। তাদের এ সবের কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহর নেয়ামত পেয়ে তারা এসব ব্যাপারে কারো মুখাপেক্ষী থাকবে না। তাদের বক্তব্য থাকবে কেবল একটাই,

'হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি। তাদের অভিবাদন হবে শান্তি। তাদের সর্বশেষ বক্তব্য এই যে, বিশ্বপ্রভু আল্লাহর জন্যেই যাবতীয় প্রশংসা।'

এর অর্থ হলো, দুনিয়ার জীবনের সকল দুর্ভাবনা ও ব্যস্ততা থেকে তারা মুক্তি পাবে, দুনিয়াবী সকল প্রয়োজনের উর্ধে উঠে যাবে। সন্তোষ, প্রশংসা, সালাম, তাসবীহর উচ্চ মার্গে তারা বিচরণ করবে। এটা হচ্ছে মানবতার পূর্ণতার স্তর।

বিপদের সময়ে কাফেরদের আল্লাহকে ডাকা

এরপর কোরআন রসূল (স.)-কে কাফেরদের প্রদত্ত চ্যালেঞ্জের জবাব দিয়েছে। তারা তাঁর কাছে দাবী জানাতো, তুমি যে আযাবের ভয় দেখাও, ওটা এক্ষুণি নিয়ে এসো। কোরআন এর জবাব দিয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা ওটাকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্থগিত রেখেছেন। এটা তাঁর বিচক্ষণতা ও দয়া। এ সাথে প্রাসংগিকভাবে কোরআন তাদের বিপদকালীন অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছে যে, যখন বিপদ আসে, তখন তাদের সকল বক্রতা দূর হয়ে যায় এবং তারা আল্লাহর দিকে একান্তভাবে মনোনিবেশ করে। আবার বিপদ দূর হলেই শিথিল ও উদাসীন হয়ে যায়। এ প্রসংগে অতীতের কাফেরদেরকে কিভাবে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, তা স্মরণ করিয়ে দেয়া

হচ্ছে এবং অনুরূপ পরিণতি থেকে তাদেরকে সাবধান করা হচ্ছে। বলা হয়েছে যে, পার্থিব জীবন কেবল পরীক্ষার জন্যে। এ জীবনের পরই এ পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া যাবে।

'আল্লাহ যদি মানুষের শাস্তি সেই রকম দ্রুততার সাথে দিতেন যেমন দ্রুততার সাথে তারা পুরস্কার চায়, তাহলে তাদের অবকাশের মেয়াদ শেষ হয়ে যেতো......। (আয়াত ১২, ১২, ১৩ ও ১৪)

আল্লাহ তায়ালা একাধিক জায়গায় কাফেরদের এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ চ্যালেঞ্জ উদ্ধৃত করেছেন। এ সূরায় বলা হয়েছে, 'তারা বলে, কবে তোমার প্রতিশ্রুত আযাব আসবে?' সূরা রাদে আছে, 'তারা ভালো পরিণামের আগে মন্দ পরিণামের দাবী জানায়।.........' সূরা আনফালে আছে, তারা বলতো, 'হে আল্লাহ, এ দাওয়াত যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের ওপর আকাশ থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষাও, কিংবা কঠিন শাস্তি দাও।'

এসব কিছু থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতের বিরুদ্ধে তাদের ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিলো। আল্লাহর কুশলতা ও বিজ্ঞতার দাবী অনুসারে তিনি এ শাস্তি পিছিয়ে দিয়েছিলেন, তাই শেষ নবীর সমকালীন কাফেরদেরকে আল্লাহ পূর্ববর্তীদের মতো পাইকারী ধ্বংস ও নিশ্চিতকরণের মতো শাস্তি দেন না। কেননা তিনি জানতেন যে, তাদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করবে। মক্কা বিজয়ের পর বাস্তবেও তাই ঘটেছিলো। যারা চ্যালেঞ্জ দিতো, তারা এটা জানতো না বলেই চ্যালেঞ্জ দিতো। তারা জানতো না আল্লাহর প্রকৃত ইচ্ছা কী।

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যে কল্যাণ তারা দ্রুত চায়, অকল্যাণকে যদি তদ্রূপ দ্রুততার সাথে আল্লাহ তায়ালা দিতেন, তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের মেয়াদ পর্যন্ত তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে চান। তারপর এ অবকাশ সম্পর্কে উদাসীন না হবার জন্যে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়। যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হবে একথা বিশ্বাস করে না, তারা তাদের গোয়ার্তুমিতে সীমা ছাড়িয়ে যাবে এবং তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পাপে লিপ্ত থাকবে।

অকল্যাণকে দ্রুত কামনা করার বিষয় প্রসংগে মানুষের একটা অবস্থা তুলে ধরেছেন, যা সে বিপদাপদে পতিত হলে সাধারণত দেখা দিয়ে থাকে। এ দ্বারা মানুষের সহজাত স্ববিরোধিতার মুখোশ খুলে দেয়া হয়েছে। কেননা যে মানুষ বিপদাপদকে এতো ভয় পায়, সে আবার 'আযাব আসুক তো দেখি' বলে চ্যালেঞ্জ দেয়ার ধৃষ্টতা দেখায়। আল্লাহ বলেন,

'যখন মানুষের ওপর বিপদ আসে, তখন দাঁড়ানো, শোয়া ও বসা সর্বাবস্থায় আমাকে ডাকে।' (আয়াত ১৫)

এটা মানুষের একটা চমকপ্রদ নমুনা। এটা প্রায়শ দেখা যায়। জীবন প্রবাহে মানুষ বারবার গুনাহ করে ও সীমালংঘন করে। অথচ সেখানে সুস্থতা অবারিত এবং পরিস্থিতি অনকূল। তথাপি আল্লাহ যার ওপর দয়া করেন ও থাকে রক্ষা করেন, সে ছাড়া কেউ সুস্থ ও সবল থাকার সময় স্মরণ করে না যে, দুর্বলতা ও অক্ষমতার সময়ও কাজে আসতে পারে। সচ্ছলতা মানুষকে অভাবের কথা ভুলিয়ে দেয় এবং প্রাচুর্য তাকে সীমালংঘনে প্ররোচিত করে। আবার যেই বিপদ আসে, অমনি কাকুতি-মিনতি করে অব্যাহতি লাভের জন্যে দোয়া করে, সুদিনের আশা করে। বিপদে পড়লেই দ্রুত ভালো অবস্থা কামনা করে। তারপর যেই বিপদ চলে যায়, অমনি এমন বেপরোয়াভাবে চলতে আরম্ভ করে যে, কিছুই চিন্তা ভাবনা করে না বরং আগের মতো ঔদ্ধত্য দেখাতে থাকে এবং পাপাচারে লিপ্ত হয়।

আয়াতে দেখানো হয়েছে বিপদে পতিত মানুষের কেমন দশা হয়,

'শুয়ে, বসে ও দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকে।'

এখানে বিপদে পতিত প্রতিটি মানুষের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। একটি চলন্ত মানুষের সামনে প্রাচীর পড়লে যেমন তার চলার গতি স্তব্ধ হয়ে যায় অথবা পেছনে ফিরে বিপরীত দিকে চলতে আরম্ভ করে, তেমনি বিপদে পড়া এ মানুষটিরও গতি থেমে যায়। আবার বিপদ সরে গেলেই কোনো শোকর, শিক্ষাগ্রহণ বা চিন্তাভাবনা না করেই সামনের দিকে চলতে আরম্ভ করে। আল্লাহ বলেন,

'সে এমনভাবে চলে যায়, যেন কখনো তার কোনো বিপদ হয়নি এবং আমাকেও ডাকেনি।'

অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের কর্মকান্ডে যথারীতি লিপ্ত হয়ে যায়, এতে কোনো কুণ্ঠা বোধ করে না, কোনো আত্মসমালোচনাও করে না এবং কোনো কিছুর পরোয়াও করে না। শুধুমাত্র বিপদ মুসীবতের সময় আল্লাহকে স্মরণ করে। বিপদ সরে গেলে যথারীতি প্রাত্যহিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে যায়। এটাই সীমা অতিক্রমকারীদের চিরন্তন স্বভাব। অথচ এতে যে সীমা অতিক্রম করা হয়, তা তারা টেরই পায় না।

'এভাবেই সীমা অতিক্রমকারীদের কাছে তাদের কাজ সুশোভিত করা হয়েছে।'

পরবর্তী আয়াতে বলা হচ্ছে প্রাচীনকালে সীমা অতিক্রমের মাত্রা কেমন চরম আকার ধারণ করেছিলো।

'তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো যখন যুলুম করেছে, তখন আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি।............' (আয়াত ১৩)

অর্থাৎ তাদের সীমা অতিক্রম, বাড়াবাড়ি ও যুলুম তথা শেরেক এমন চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলো যে, তা তাদের ধ্বংস ডেকে এনেছিলো। আরব উপদ্বীপে আদ, সামুদ ও লূত (আ.)-এর জাতির আবাসভূমিতে সেই ধ্বংসযজ্ঞের অংশ বিশেষ আরবরা স্বচোক্ষে প্রত্যক্ষ করতো। তোমাদের কাছে যেমন রসূল এসেছে, তেমনি তাদের কাছেও রসূলরা অকাট্য প্রমাণাদি সহকারে আসতো।

'তারা ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিলো না।'

কেননা তারা প্রথম থেকেই ঈমানের পথে চলেনি, বরং বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতার পথে চলেছে। ফলে ঈমানের পথ থেকে তারা দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং ঈমান আনার জন্যে আর প্রস্তুত হয়নি। অবশেষে অপরাধীদের যা পরিণাম হয়ে থাকে, তা তাদেরও হয়েছে।

'এভাবেই আমি অপরাধী জাতিকে শাস্তি দিয়ে থাকি।'

আখেরাতমুখী চেতনাই মানুষকে সৎকর্মশীল বানাতে পারে

যাদের কাছে নবী রসূলরা অকাট্য প্রমাণাদি সহকারে আসেন এবং যারা তাঁদের ওপর ঈমান না আনার কারণে আযাবে পতিত হয়, সেই অপরাধীদের শোচনীয় পরিণাম বর্ণনা করার পর আরবের মোশরেকদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তারা ওই ধ্বংস হয়ে যাওয়া কাফেরদের স্থলাভিষিক্ত। তাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হচ্ছে যে, যে জিনিস সম্পর্কে তাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে, তার সাথে তারা কেমন আচরণ করে।

'অতপর তোমাদেরকে পৃথিবীতে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি, যেন তোমরা কেমন আচরণ করো, তা দেখতে পাই।' (আয়াত ১৪)

কোনো মানুষ যদি বুঝতে পারে যে, একটা জিনিসের পূর্বতন মালিকদেরকে উচ্ছেদ করে তাদের স্থলে তাকে ওই জিনিসের মালিক করা হয়েছে, অতপর সে নিজেও একদিন এ জিনিসের মালিকানা হারাবে, সে মাত্র কিছুদিনের জন্যে এর মালিক হয়েছে, এ মালিকানায় স্বল্পদিন কাটিয়ে সে কী উপার্জন করে, তার পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং তার হিসাব নেয়া হবে, তাহলে এ উক্তিটা তার মনে অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করবে।

বস্তুত মানুষের হৃদয়ে ইসলামের সৃষ্টি করা উপরোক্ত চিন্তাধারা একে তো তাকে একটা অকাট্য সত্য উপলব্ধি করায়, তদুপরি তার ভেতরে একটা তীব্র চেতনা, অনুভূতি ও খোদাভীতির সৃষ্টি করে। এ খোদাভীতি তার নিজের জন্যেও নিরাপত্তার নিয়ামক, তার সমাজের জন্যেও নিরাপত্তার গ্যারান্টি।

মানুষ যে পৃথিবীতে পরীক্ষার সম্মুখীন, তার আয়ুষ্কাল ও ধনসম্পদ সব কিছু দিয়েই যে তার পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে, এ অনুভূতি তাকে দুনিয়া ও দুনিয়ার সম্পদ নিয়ে মেতে থাকা ও আখেরাত সম্পর্কে উদাসীন থাকা থেকে নিরাপদ রাখে। এ চেতনা তাকে পার্থিব সম্পদের লালসা থেকে মুক্ত রাখে। কেননা এ সম্পদ তার পরীক্ষার বিষয় এবং তার দায় দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে।

আয়াতের শেষাংশের 'যেন তোমরা কেমন আচরণ করো, তা দেখতে পাই'-এ উক্তিটা মানুষকে এ ধারণা দেয় যে, তার চারপাশে প্রতি মুহূর্তে পাহারা দেয়া হচ্ছে। এ ধারণা তাকে আরো বেশী সতর্ক ও সচেতন, সৎকর্মে আরো বেশী আগ্রহী এবং এ পরীক্ষা থেকে মুক্তি লাভে আরো বেশী উদগ্রীব করে তোলে।

এখানেই দুই ধরনের চিন্তাধারার মধ্যে প্রভেদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি হলো ইসলামী চিন্তাধারা, যা এ ধরনের বলিষ্ঠ বক্তব্য দ্বারা ইসলাম মানুষের মনে সৃষ্টি করে। অপরাধ হলো অনৈসলামী চিন্তাধারা। তা আল্লাহর সার্বক্ষণিক প্রহরা ও আখেরাতের হিসাব নিকাশের ধারণা এ চিন্তাধারার আওতাবহির্ভূত। ইসলামী চিন্তাধারার অনুসারী ও অনৈসলামী চিন্তাধারার অনুসারীদের জীবন, চরিত্র ও আন্দোলন সংক্রান্ত দৃষ্টিভংগি একই রকম হতে পারে না। অনুরূপ এ পরস্পর বিরোধী ধ্যান ধারণা ও মতাদর্শের ভিত্তিতে গঠিত দুটো মানবীয় ব্যবস্থা কখনো এক রকম হতে পারে না।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা একটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী মতাদর্শের ভিত্তিতে ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবন ও চরিত্র যেভাবে গড়ে ওঠে, অনৈসলামী মতাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে ঠিক তার বিপরীত ধরনের জীবন ও চরিত্র। তাই ইসলামকে অন্য কোনো মতাদর্শের সাথে মিশ্রণ করা সম্ভব নয়।

যারা মনে করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাথে অন্য কোনো জীবন ব্যবস্থার জোড়াতালি দেয়া সম্ভব, তারা সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গভীর পার্থক্যটা বোঝে না, যা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাথে অন্যান্য জীবন ব্যবস্থার রয়েছে।

কাফেরদের কিছু অবান্তর অভিযোগ

কাফেরদেরকে সম্বোধন করে কথা বলার পর এবার তাদের কার্যকলাপের নমুনা তুলে ধরা হচ্ছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত কাফেরদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর তাদের কর্মকান্ড কেমন ছিলো লক্ষ্য করুন,

'যখন তাদের সামনে আমার আয়াতগুলো পড়া হয়, তখন কেয়ামতে অবিশ্বাসীরা বলে যে, অন্য একটা কোরআন নিয়ে এসো .... (আয়াত ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০)

তাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করার পর তারা এ ধরনের কাজ করেছে এবং রসূল (স.)-এর সাথেও এ ধরনেরই আচরণ করেছে।

'যখন তাদের সামনে কোরআন পাঠ করা হয়..... অন্য একটা কোরআন নিয়ে এসো এ একটা বিস্ময়কর দাবী, যা কোনো ব্যক্তি স্বাভাবিক অবস্থায় করতে পারে না। এ ধরনের দাবী কেবল ঠাট্টাচ্ছলেই করা সম্ভব। অনুরূপভাবে কোরআনের কর্মসূচী সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণেও এ ধরনের দাবী করা সম্ভব। যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে হবে বলে বিশ্বাস করে, তারা এ ধরনের দাবী করতে পারে না।

বস্তুত কোরআন মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের জন্যে একটা পূর্ণাংগ সংবিধান স্বরূপ। এ সংবিধান মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সকল দাবী পূর্ণ করে এবং তাকে পার্থিব জীবনে পূর্ণতার পথে পরিচালিত করে। অতপর চূড়ান্ত পর্যায়ে তাকে আখেরাতের জীবনের অনন্ত সুখের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি কোরআনকে যথাযথভাবে বুঝতে পারে, সে কোরআন ছাড়া অন্য কিছু চাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না। কোরআনের কিছু অংশ পরিবর্তন করার এ উদ্ভট দাবীও সে তুলতে পারে না।

এরূপ উদ্ভট দাবী তোলার কারণ সম্ভবত এই যে, আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়ার বিষয়টি যারা বিশ্বাস করতো না। তারা মনে করতো যে, বিকল্প একটা কোরআন রচনা করা বা এ কোরআনের অংশ বিশেষ পরিবর্তন করা একটা সাহিত্যিক দক্ষতার ব্যাপার। তারা ভেবেছিলো, এ বিষয়টাকে জাহেলিয়াতের আরবের বাজারে বাজারে একটা প্রতিযোগিতার বিষয়ে পরিণত করতে পারবে। ফলে মোহাম্মদ (স.) এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে এবং পুরো কোরআন বা তার অংশ বিশেষকে পরিবর্তন করতে পারবেন না।

'বলো, এটা আমার কাজ নয় যে, কোরআনকে নিজের খেয়াল অনুসারে বদল করে দেবো! ....'

বস্তুত এটা কোনো খেলোয়াড়ের খেলা বা কোনো কবির কাব্য দক্ষতার বিষয় নয়। বরং এ হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও পরিচালক এবং মানব জাতির স্রষ্টা মহান আল্লাহর রচিত পূর্ণাংগ সংবিধান। সুতরাং কোনো নবীর পক্ষে এতে কোনো মনগড়া পরিবর্তন আনার কোনোই অবকাশ নেই। তাঁর কাজ হলো, তাঁর কাছে আগত ওহী হুবহু অন্যদেরকে শেখানো ও জানানো। এ ধরনের পরিবর্তন সাধন মারাত্মক গুনাহ এবং তার জন্যে নির্ধারিত রয়েছে কঠোর শাস্তি।

'তুমি বলো, আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে এ ওহী আমি তোমাদের সামনে পড়ে শোনাতে বা জানাতেই পারতাম না। আমি তো তোমাদের মধ্যে একটা জীবনই কাটিয়ে দিয়েছি। তবু কি তোমরা বুঝবে না?'

অর্থাৎ এ ওহী আল্লাহর পক্ষ থেকেই আগত। একে তোমাদের কাছে পৌছানোর নির্দেশ আল্লাহ তায়ালাই আমাকে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন যে, তোমাদের সামনে আমি যেন এটা না পড়ি এবং তোমাদেরকে না জানাই, তাহলে তা পড়তে বা জানাতে পারতাম না। কোরআন নাযিল করা ও তাকে জনগণের কাছে পৌছানোর কাজ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর। তাদেরকে এ কথা বলে দাও। অতপর একথাও বলো যে, রসূল হবার আগে আমি তোমাদের মধ্যে জীবনের একটা বড় অংশ কাটিয়েছি। সেটা ছিলো ৪০ বছর। তখন আমি তোমাদেরকে কোরআনের কিছুই বলিনি। কেননা তখন ওটায় আমার কোনো অধিকার ছিলো না। আমার কাছে তখনো কোনো ওহী আসেনি।

এ ধরনের গ্রন্থ আমার নিজের রচনা করার ক্ষমতা যদি থাকতো, তাহলে চল্লিশ বছর যাবত কেন চুপটি মেরে বসে ছিলাম?

বস্তুত এটা সেই ওহী, যা হুবহু পৌছিয়ে দেয়া ছাড়া আমার আর কোনো কাজ নেই। আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ ওহী আমার কাছে সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে এসেছে। এর ভেতরে আমার পক্ষ থেকে অন্য কিছু ঢুকানোর চেয়ে বড় অন্যায় আর কিছু হতে পারে না।

'যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রটায় বা তাঁর আয়াতগুলোকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে, তার চেয়ে যালেম আর কে হতে পারে।' (আয়াত ১৭)

আমি তোমাদেরকে এ দুটো অপরাধের দ্বিতীয়টা করতে নিষেধ করছি। সেটি হলো, আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার ও মিথ্যা সাব্যস্ত করা। প্রথমটা আমি কখনো করবো না এবং কখনো আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা প্রচার করবো না।

'অপরাধীরা কখনো সফলকাম হয় না।'.........

নতুন কোরআন দাবী করা ছাড়া মোশরেকরা অন্য যে সব অন্যায় কাজ করেছে ও অন্যায় কথাবার্তা বলেছে, তার বিবরণ পরবর্তী আয়াতগুলোতে এসেছে।

'তারা আল্লাহ ছাড়া এমন সব দেব দেবীর পূজা করে, যারা তাদের ক্ষতি বা উপকার কিছুই করতে পারে না। ....'

প্রবৃত্তি যখন বিপথগামী হয়, তখন তার অপকর্মের কোনো সীমা থাকে না। যে সব দেব দেবীর পূজা তারা করতো, তারা তাদের ক্ষতি বা উপকার কিছুই করতে পারতো না। কিন্তু তারা মনে করতো, ওইসব দেবদেবী আল্লাহর সুপারিশ করতে পারবে।

'তারা বলে, এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।'

'বলো, আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ যে জিনিসের অস্তিত্ব টের পান না, সেই জিনিস সম্পর্কে কি তোমরা আল্লাহকে জানাবে?'

অর্থাৎ তোমাদের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহর কাছে কোনো সুপারিশকারী আছে বলে আল্লাহ তায়ালা জানেন না। তাহলে আল্লাহ তায়ালা যা জানেন না, তা তোমরা জেনে ফেলেছো এবং আল্লাহ সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীতে যার অস্তিত্ব টের পায়নি, তাকে তোমরা পেয়ে গেছ? এটা আসলে একটা বিদ্রূপাত্মক বাচনভংগি। কাফেররা এমন একটা অপকর্মে লিপ্ত হয়েছিলো, যার জন্যে এ ভাষা প্রয়োগ যথার্থ ছিলো। আয়াতের শেষাংশে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়েছে যে,

'তিনি পবিত্র ও মহান– তারা যা কিছু শেরেক করে তা থেকে।'

তাদের অন্যান্য কাজ ও কথাবার্তার বিবরণ দেয়ার আগে এ শেরেক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এটা পরে সৃষ্টি হয়েছে। মূল জিনিসটা ছিলো তাওহীদ। তারপর ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে।

'মানব জাতি ছিলো একই জাতি পরে তারা ভিন্ন ভিন্ন মতের অনুসারী হয়েছে।'

আল্লাহ চেয়েছেন তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেবেন। তাই সেই অবকাশ দিয়েছেন একটি মহৎ উদ্দেশ্যে।

'যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটা কথা আগেই বলা হয়ে না যেতো, তবে তাদের দ্বন্দ্ব-কলহ মিটে যেতো।'

এ মন্তবের পর কাফের ও মোশরেকদের কথাবার্তা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে,

'তারা বলে, তার ওপর তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোনো নিদর্শন আসে না কেন?......

সমগ্র কোরআনের এতোগুলো অলৌকিক আয়াত তাদের জন্যে যথেষ্ট হলো না। মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা এতো প্রাকৃতিক নিদর্শনেও তাদের চাহিদা মিটলো না। তারা পূর্ববর্তী নবীদের মতো এখনো অলৌকিক ঘটনা চাইছে। অথচ মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালাত যে ভিন্ন বৈশিষ্টের অধিকারী তা তারা বুঝতে চেষ্টা করছে না। তাঁর কাছে আগত মোজেযা বা অলৌকিক নিদর্শনের প্রকৃতি অনুধাবন করছে না। এটা কোনো সাময়িক মোজেযা নয়, যা একটা প্রজন্ম দেখলেই শেষ হয়ে

পায়। এটা এমন এক চিরস্থায়ী মোজেযা, যা প্রজন্মের পর প্রজন্মের বিবেক ও মনকে যুগ যুগ ধরে আবেদন জানাতে থাকবে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহর কাছে তাদেরকে সোপর্দ করেন। আল্লাহ তায়ালা যদি চান তাদেরকে কোনো মোজেযা দেখাবেন, নচেত দেখাবেন না।

'বলো, অদৃশ্য জ্ঞান কেবল আল্লাহর, তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম'

এ জবাবটা আসলে হুমকি ও অবকাশ মিশ্রিত। এতে বান্দার সীমাবদ্ধতার দিকটাও তুলে ধরা হয়েছে। মোহাম্মদ (স.) শ্রেষ্ঠ নবী ও রসূল হওয়া সত্তেও অদৃশ্য জ্ঞানের বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। সমস্ত অদৃশ্য জ্ঞান আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ। মানুষের ভালোমন্দের ওপরও তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সব কিছু আল্লাহর কাছে সোপর্দ। এভাবে নবী (স.)-এর সীমাবদ্ধতা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এমনভাবে তুলে ধরা হচ্ছে যেন কোনো সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ না থাকে।

বিপদ কেটে গেলেই আল্লাহর অবাধ্যতা করা

কাফের ও মোশরেকদের কথাবার্তা ও আচার আচরণের বর্ণনা দেয়ার পর আবার এক শ্রেণীর মানুষের এক ধরনের বিকৃত স্বভাবের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তারা যখন দুঃখ কষ্ট ও বিপদ মুসীবতের পর সুখ সমৃদ্ধির নাগাল পায় তখন তারা উচ্ছৃংখলতা ও ষড়যন্ত্র শুরু করে দেয়। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, তারা যখন বিপদ মুসীবত থেকে উদ্ধার পায়, তখন এমন ভাব দেখায় যেন কখনো তাদের ওপর কোনো বিপদ আসেনি এবং কখনো আল্লাহর সাহায্য পায়নি। এ প্রসংগে আল্লাহ একটা বাস্তব উদাহরণও দিয়েছেন,

'আর যখন আমি মানুষকে কোনো বিপদ মুসীবত থেকে উদ্ধার করার পর সুখ আস্বাদন করাই, তখন তারা আমার আয়াতগুলো নিয়ে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে............ (আয়াত ২১,২২ ও ২৩)

'বস্তুত মানুষ একটা আজব সৃষ্টি। বিপদ মুসীবত ছাড়া আল্লাহকে স্মরণ করতে চায় না। আর চরম দুঃখ কষ্টে না পড়লে তার স্বভাবের বিকৃতি ও বিপথগামিতা থেকেও ফিরে আসে না। পক্ষান্তরে বিপদ ও কষ্ট থেকে যেই মুক্তি পায়, অমনি হয় স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে, না হয় উদাসীন হয়ে যায়। তবে হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের কথা স্বতন্ত্র। তারা সব সময় ঈমান ও সততার পথে চলতে থাকে।

.... বিপদ মুসীবত থেকে উদ্ধার পেলেই ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে...........'

এ ধরনের আচরণ ফেরাউন করেছিলো মূসা (আ.)-এর সাথে। যখনই সে আল্লাহর কোনো আযাবে আক্রান্ত হতো, অমনি মূসা (আ.)-এর শরণাপন্ন হতো এবং যে সব অন্যায় অত্যাচারে লিপ্ত আছে, তা থেকে ফিরে আসবে বলে অংগিকার করতো। এরপর যখনই সুদিন আসতো, অমনি আল্লাহর নিদর্শন নিয়ে চক্রান্ত শুরু করে দিতো এবং তার অপব্যাখ্যা করতো। তারা বলতো, আমাদের ওপর থেকে আযাব হটে গেছে অন্য কারণে, তোমার দোয়া বা আল্লাহর অনুগ্রহে নয়। কোরায়শরাও এ রকম করেছিলো। এর ফলে তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়ে ধ্বংস হবার উপক্রম করেছিলো। অনন্যোপায় হয়ে তারা রসূল (স.)-এর কাছে এসে তার কাছে বৃষ্টির দোয়া চেয়েছিলো। তিনি বৃষ্টির জন্যে দোয়া করেছিলেন। এরপরও কোরায়শ চক্রান্ত অব্যাহত রাখে। ঈমান এনে চরিত্রের সংশোধন করেছে– এমন ব্যতিক্রমী কিছু লোক ছাড়া এ ধরনের স্বভাব মানুষের সব সময়ই দেখা গেছে।

'তুমি বলো, আল্লাহ অধিকতর দ্রুত চক্রান্তকারী। আমার দূতরা তোমাদের যাবতীয় চক্রান্ত লিখে রাখে।'

বস্তুত আল্লাহ অধিকতর কুশলী এবং অন্যের ষড়যন্ত্র বাতিল করতে সক্ষম। তাদের প্রত্যেক ষড়যন্ত্র আল্লাহর কাছে ফাঁস হয়ে যায়। ষড়যন্ত্র যখন ফাঁস হয়, তখন তার ব্যর্থতা অবধারিত ও সুনিশ্চিত। আল্লাহর দূতরা যখন ষড়যন্ত্র লিখে রাখেন, তখন তা আল্লাহর অজানাও থাকে না, আল্লাহ তা ভুলেও যান না। এই দূতরা কারা এবং কিভাবে লিখে রাখে, সেটা একটা অদৃশ্য ব্যাপার। এ সম্পর্কে আমরা এ আয়াতের চেয়ে বেশী কোনো তথ্য জানতে পারি না। তাই কোনো ব্যাখ্যা বা সংযোজন ছাড়া এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় যা আছে, সেটাই আমাদের বুঝে নিতে হবে।

এরপর সেই জীবন্ত দৃশ্য ও বাস্তব উদাহরণ। মনে হয় যেন এখনই তা সবার চোখের সামনে ঘটছে, মন প্রকম্পিত এবং আবেগ উদীপ্ত হচ্ছে। জগতের সকল গতি ও স্থিতির ওপর আল্লাহর সর্বময় কর্তৃত্বের বর্ণনা দিয়েই উদাহরণটার শুরু হচ্ছে,

'তিনি সেই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে জলে স্থলে পরিভ্রমণ করান।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সমগ্র সূরা জুড়েই মহাবিশ্বের যাবতীয় শক্তির ওপর আল্লাহর একক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার উল্লেখ দেখা যায়!

এরপর দৃশ্যটা একে একে দেখানো হচ্ছে ঘনিষ্ঠভাবে,

'যখন তোমরা নৌকায় আরোহণ করো।'

তারপর নৌকা ধীর ধীরে চলতে শুরু করে।

'যাত্রীদেরকে নিয়ে যখন তা মৃদু বাতাসে চলতে আরম্ভ করে।'.......

যাত্রীদের মনের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, 'এবং তারা উল্লসিত থাকে।'

আর এ শান্ত পরিস্থিতিতে এবং এ আনন্দঘন পরিবেশে সহসা বিপর্যয় নেমে আসে এবং শান্ত শিষ্ট উল্লসিত মানুষদের ওপর চড়াও হয়।

'সহসা এক তীব্র বাতাস এসে পড়ে তার ওপর।'

হায়, কী বিপদ!

'তাদের ওপর সর্ব দিক থেকে তরংগ আঘাত হানে।'

নৌকা উড়ন্ত তুলোর মতো টলটলায়মান, আরোহীরা হতাশায় মুহ্যমান, ভাবছে আর বুঝি বাঁচার সম্ভাবনা নেই।

'তারা ভাবে যে, তারা হয়তো ঘেরাও হয়ে গেছে।'

তাই তাদের উদ্ধারের কোনো আশা নেই।

শুধুমাত্র এ চরম বিপদের মুহূর্তে তাদের মন থেকে সমস্ত গোমরাহী ও ভ্রান্ত ধ্যান ধারণা দূর হয়ে যায়, আসল ও খালেস তাওহীদ ফিরে আসে এবং একমাত্র আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বহাল হয়। 'তারা আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক আনুগত্য প্রকাশ করে দিয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকে এবং বলে, যদি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ হবো।'

এরপর ঝড় থেমে যায়, তরংগ স্তিমিত হয়, ভীত বিহবল আরোহীদের মন শান্ত হয়। নৌকা কিনারে ভিড়ে, আরোহীরা জীবনের নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত হয় এবং তারা শুকনো মাটিতে নামে। তারপর কী হয়? এর জবাব দেয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

'তারপর যখন আল্লাহ তাদেরকে উদ্ধার করেন, অমনি তারা বিনা অধিকারে পৃথিবীতে বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে দেয়।'

এটা কি একেবারেই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত?

এটা একটা পূর্ণাংগ দৃশ্য। এক শ্রেণীর মানুষ সকল প্রজন্মেই অবিকল এরূপ দৃশ্যের অবতারণা করে থাকে। তাই সকল মানুষের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে মন্তব্য করা হয়েছে,

'হে মানব জাতি, তোমাদের বিদ্রোহ তোমাদের জন্যেই ক্ষতিকর।'

এ বিদ্রোহ কোনো ব্যক্তির নিজের বিরুদ্ধেও হতে পারে আত্মঘাতী বা নিজের জন্যে ক্ষতিকর কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে নিজেকে এমন পাপাচারে জড়িত করা, যার ফলে শেষ পর্যন্ত অনুতাপ করতে হয় অথবা জনগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, যা কিনা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজেরই স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়। কেননা যারা বিদ্রোহ করে এবং যারা তাতে সম্মতি দেয়, তারাই তার পরিণাম ভোগ করে।

এ বিদ্রোহের সবচেয়ে জঘন্য রূপটা হলো আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব ও আইন রচনার যে ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য আল্লাহর একক ও নিরংকুশ অধিকার, তা ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহর বান্দাদের ওপর প্রয়োগ করার মাধ্যমেই আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয়। মানুষ যখন এ বিদ্রোহে লিপ্ত হয়, তখন তাকে আল্লাহদ্রোহী বলা হয় এবং এ আল্লাহদ্রোহিতার ফল সে আখেরাতে ভোগ করার আগে এ দুনিয়াতেও ভোগ করে। এর ফলে সমগ্র জীবনে অনাচার ও অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজের প্রতিটি মানুষ ক্ষতি ও দুর্গতির শিকার হয়। কোথাও মানবতা, স্বাধীনতা, সৌজন্যে ও শ্রদ্ধার লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। এভাবেই তারা আল্লাহদ্রোহিতার পরিণাম ভোগ করে।

মানুষকে হয় একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর অনুগত হতে হবে, নচেত আল্লাহদ্রোহীরা তাকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে নিক সে জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। তাই এ কথা যথার্থভাবেই বলা যায় যে, পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও মানব জীবনে আল্লাহর নিরংকুশ প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম মানবতা, স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও মানবীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠারই সংগ্রাম, এটা মানুষের গোলামী, নোংরামি, হীনতা, অপমান, সামাজিক অনাচার ও অরাজকতা এবং জীবনের নীচতা প্রতিরোধের সংগ্রাম। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'হে মানব জাতি, তোমাদের বিদ্রোহ তোমাদের জন্যেই ক্ষতিকর। দুনিয়ার জীবনের সুখ ভোগ করে নাও। ....? খোদাদ্রোহিতা করে তোমরা দুনিয়ার সুখকে বাড়াতে পারবে না।

'তারপর আমার কাছেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে ....'

অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনের দুর্ভোগ ও আযাব ভোগ করার পর আবার আখেরাতেও হিসাব দিতে ও আযাব ভোগ করতে হবে।

'দুনিয়ার জীবনের সুখ কী ও কেমন? কোরআন এ বিষয়টা একটা জীবন্ত ও চলন্ত দৃশ্যের আকারে তুলে ধরেছে। এ দৃশ্য সকলে প্রতিনিয়ত দেখে থাকে। কিন্তু এ দৃশ্য দেখে কেউ সাবধান হয় না।

'দুনিয়ার জীবনের উদাহরণ তো সেই পানির মতো, যা আমি আকাশ থেকে নাযিল করি।.......' (আয়াত ২৪)

এ হচ্ছে দুনিয়ার জীবন। এ জীবনে মানুষ ক্ষণস্থায়ী সুখ ভোগ করা ছাড়া আর কিছু অর্জন করতে পারে না। এ জীবন নিয়েই যখন সে সন্তুষ্ট হয় এবং এ জীবনকালে এর চেয়ে সম্মানজনক ও দীর্ঘস্থায়ী সুখ অন্বেষণ করে না, তখন তার পার্থিব জীবন নিরর্থক ও নিষ্ফল।

আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয়, সেই পানি পান করে ও তার সাথে মিলিত হয়ে উদ্ভিদ জন্মে ও ফলে ফুলে সুশোভিত হয়।

পৃথিবী যেন বাসর ঘরের মতো সজ্জিত হয় এবং এর অধিবাসীরা উল্লসিত হয়। তারা মনে করে যে, পৃথিবীটা তাদের ইচ্ছা ও চেষ্টাতেই এত সুন্দর ও সুশোভিত হয়েছে, তারাই এখানে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী, কেউ এ নিয়ে কোনো বিতর্কও তুলবে না, তাদের কাছ থেকে কেউ তা ছিনিয়েও নেবে না।

এ আনন্দ, এ আস্থা ও এ পরিতৃপ্তির মাঝে সহসাই আল্লাহর আযাব নেমে আসে।

'রাতে কিংবা দিনে আমার সিদ্ধান্ত চলে আসে, ফলে আমি তাকে ফসল কেটে নেয়া হয়েছে এমন ক্ষেত্রে পরিণত করি, যেন গত কাল এখানে কিছুই ছিলো না..............।'

অর্থাৎ আকস্মিকভাবে ও সার্বিকভাবে এরূপ বানিয়ে দেই।

এ হচ্ছে সেই দুনিয়া, যার পেছনে অনেকে নিজের যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দেয় এবং যার সামান্য কিছু সম্পদ আহরণের জন্যে আখেরাতকে বিসর্জন দেয়। এ হচ্ছে সেই দুনিয়া, যাতে কোনো শান্তি নেই, নিরাপত্তা নেই, স্থিতি নেই এবং মানুষ নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যতীত এর কোনো জিনিসই অর্জন করতে পারে না।

'আর আল্লাহ শান্তির আবাসভূমির দিকে ডাকেন এবং যাকে চান সরল পথের সন্ধান দেন।'

এখন ভাববার বিষয় এই যে, এ দুই জগতের মাঝে কত বিস্তর ব্যবধান। একটি এমন যে, উন্নতি, উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করার পর যখন তার অধিবাসীরা পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও আস্থা সহকারে তাতে অধিষ্ঠিত হয়, তখন সহসাই তা ধ্বংস হয়ে যায়। অপরটা চিরশান্তির জগত। আল্লাহ এ জগতের দিকেই মানুষকে আহ্বান করেন এবং সেখানে পৌঁছার পথ দেখিয়ে দেন। মানুষ যখন আপন অন্তর্দৃষ্টিকে প্রসারিত করে এবং শান্তির জগত খোঁজে, তখন সে তার সন্ধান লাভ করে।

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾

২৬. যারা ভালো কাজ করেছে, (যাবতীয়) কল্যাণ তো (থাকবে) তাদের জন্যে এবং (থাকবে তার চাইতেও) বেশী; সেদিন তাদের চেহারা কোনো কালিমা ও হীনতা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকবে না; তারাই হবে জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে থাকবে চিরদিন। ২৭. (অপরদিকে) যারা মন্দ কাজ করেছে, (তাদের) মন্দের প্রতিফল মন্দের সাথেই হবে, অপমান তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে; সেদিন আল্লাহর (আযাব) থেকে তাদের রক্ষাকারী কেউই থাকবে না, (তাদের চেহারা এমনি কালো হবে) যেন রাতের অন্ধকার ছিঁড়ে (তার) একটি টুক্‌রো তাদের মুখের ওপর ছেয়ে দেয়া হয়েছে, এরা হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। ২৮. (হে নবী, তুমি তাদের সেদিনের ব্যাপারে সাবধান করো,) যেদিন আমি তাদের সবাইকে আমার সামনে একত্রিত করবো, অতপর যারা আমার সাথে শরীক করেছে তাদের আমি বলবো, তোমরা এবং যাদের তোমরা শরীক করেছো– স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করো, এরপর আমি তাদের (এক দলকে আরেক দল থেকে) আলাদা করে দেবো এবং যাদের তারা শরীক করেছিলো তারা বলবে, না, তোমরা তো কখনো আমাদের উপাসনা করতে না। ২৯. (আজ) আল্লাহ তায়ালাই আমাদের এবং তোমাদের মাঝে সাক্ষ্য প্রদানকারী হিসেবে যথেষ্ট হবেন, আমরা তোমাদের উপাসনার ব্যাপারে (আসলেই) গাফেল ছিলাম। ৩০. এভাবেই সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি (নিজের কর্মফল– যা সে করে এসেছে, (পুরোপুরিই) জানতে পারবে এবং সবাইকে তাদের সত্যিকারের মালিক আল্লাহ তায়ালার কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে, দুনিয়ায় তারা যেসব মিথ্যা ও অলীক কথাবার্তা (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) উদ্ভাবন করতো, (নিমিষেই) তা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে।

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ
وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ
الْاَمْرَ ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣١﴾ فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ
فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۚۖ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ﴿٣٢﴾ كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ
رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٣﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ
يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى
تُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٤﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ؕ قُلِ اللّٰهُ
يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا
يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٥﴾

রুকু ৪

৩১. (হে নবী,) তুমি বলো, তিনি কে– যিনি তোমাদের আসমান ও যমীন থেকে জীবিকা সরবরাহ করেন, অথবা (তোমাদের) শোনা ও দেখার ক্ষমতা কে নিয়ন্ত্রণ করেন? কে (আছে এমন) যিনি জীবিতকে মৃত থেকে, আবার মৃতকে জীবিত থেকে বের করে আনেন! কে (আছে এমন), যিনি (এসব কিছুর) পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন; (তাদের জিজ্ঞেস করলে) তারা সাথে সাথেই বলে ওঠবে, (হ্যাঁ, অবশ্যই) আল্লাহ, তুমি (তাদের) বলো, (যদি তাই হয়) তাহলে (সত্য অস্বীকার করার পরিণামকে কি) তোমরা ভয় করবে না? ৩২. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনিই তোমাদের আসল মালিক, সত্য আসার পর (তাঁকে না মানা) গোমরাহী নয় তো আর কি? সুতরাং (তাঁকে বাদ দিয়ে বলো), কোন্ দিকে তোমাদের ধাবিত করা হচ্ছে? ৩৩. এভাবেই যারা নাফরমানী করেছে তাদের ওপর তোমার মালিকের সে কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হলো যে, এরা কখনো ঈমান আনবে না। ৩৪. তুমি (তাদের আরো) বলো, তোমাদের (বানানো) এসব শরীকদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে প্রথম বার বানাতে পেরেছিলো, অতপর (মৃত্যুর পর) আবারও তা সে তৈরী করতে পারবে! তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টিকে প্রথম অস্তিত্ব প্রদান করেন, অতপর দ্বিতীয়বার তিনিই তাতে জীবন দান করেন, (এরপরও) তোমাদের কেন (বার বার সত্য থেকে) বিচ্যুত করা হচ্ছে? ৩৫. (তাদের আরো) বলো, তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে এমন কে আছে যে মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে পারে, (তুমি) বলো, (হাঁ) আল্লাহ তায়ালাই সঠিক পথ দেখাতে পারেন; যিনি সঠিক পথ দেখান তিনি অনুসরণের বেশী যোগ্য, না সে ব্যক্তি যে নিজেই কোনো পথের সন্ধান পায় না– যতোক্ষণ না তাকে (সে) পথের সন্ধান দেয়া হয়, তোমাদের এ কি হলো, কেমন ধরনের ফয়সালা করো তোমরা?

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن
دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا
رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ
مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ بَلْ كَذَّبُوا
بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم
مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤٠﴾ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي
عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

৩৬. তাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই নিজেদের আন্দায অনুমানের অনুসরণ করে, আর সত্যের পরিবর্তে আন্দায অনুমান তো কোনো কাজে আসে না; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ওদের কর্মকান্ড সম্পর্কে পূর্ণাংগ ওয়াকেফহাল রয়েছেন। ৩৭. এ কোরআন এমন (কোনো গ্রন্থ) নয় যে, আল্লাহর (ওহী) ব্যতিরেকে (কারো ইচ্ছামাফিক একে) গড়ে দেয়া যাবে, বরং এ (গ্রন্থ) সেসব গ্রন্থের সত্যবাদিতার সাক্ষ্য প্রদান করে যা এর আগে নাযিল হয়েছিলো, এতে কোনোরকম সন্দেহ নেই যে, এটা (হচ্ছে) সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার সত্য বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা। ৩৮. তারা কি একথা বলে, এ ব্যক্তি (মোহাম্মদ) এ (গ্রন্থ)-টি রচনা করে নিয়েছে; (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, তোমরা তোমাদের দাবীতে যদি সত্যবাদী হও, তাহলে তোমরাও এমনি ধরনের একটি সূরা বানিয়ে নিয়ে এসো এবং (এ ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর যাদের যাদের তোমরা ডাকতে চাও ডেকে (তাদেরও সাহায্য) নাও। ৩৯. (আসল কথা হচ্ছে,) যে বিষয়টিকেই তারা তাদের জ্ঞান দিয়ে আয়ত্ত করতে পারলো না, কিংবা (মানবীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে) যার ব্যাখ্যা এখনো তাদের পর্যন্ত পৌঁছুয়নি– তারা তাকেই অস্বীকার করে বসলো; তাদের পূর্ববর্তী মানুষরাও এভাবে অস্বীকার করেছিলো, (আজ) দেখো, (এ অস্বীকারকারী) যালেমদের পরিণাম কি হয়েছে। ৪০. তাদের মধ্যে কিছু লোক এ (গ্রন্থের) ওপর ঈমান আনবে, আবার কিছু আছে যারা এতে ঈমান আনবে না; (জেনে রেখো,) তোমার মালিক (কিন্তু এ) বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালো করেই জানেন।

রুকু ৫

৪১. (এতো বলা-কওয়া সত্ত্বেও) তারা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতেই থাকে, তাহলে তুমি (তাদের) বলে দাও (দেখো), আমার কাজকর্মের দায়িত্ব আমার ওপর, আর তোমাদের কাজকর্মের দায়িত্ব তোমাদের ওপর, আমি যা কিছু করছি তার জন্যে তোমরা দায়িত্বমুক্ত, আবার তোমরা যা করো তার জন্যেও আমি দায়িত্বমুক্ত।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ۚ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا لَا
يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ۚ اَفَاَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوْا لَا
يُبْصِرُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ
يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا
مُهْتَدِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا
مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ
رَسُوْلُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا
الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾ قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا

৪২. (হে নবী,) এদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা তোমার দিকে কান পেতে রাখে; তুমি কি বধিরকে (আল্লাহর কাল[illegible]) শোনাবে? যদিও তারা এর কিছুই বুঝতে না পারে! ৪৩. (আবার) ওদের মধ্যে কেউ [illegible]উ আছে যারা তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে; (কিন্তু) তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাবে. [illegible]ও তারা নিজেরা এর কিছুই দেখতে না পায়! ৪৪. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মানুষের ওপর কোনো রকম যুলুম করেন না, (বরং আল্লাহর অবাধ্য হয়ে) মানুষেরা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করে। ৪৫. যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন (সেদিন তাদের মনে হবে), যেন তারা দুনিয়ায় দিনের একটি ক্ষণমাত্র কাটিয়ে এসেছে, (তখন) তারা একজন আরেকজনকে চিনতে পারবে; ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা, যারা আল্লাহর সামনা-সামনি হওয়াকে অস্বীকার করেছিলো, (আসলে) তারা কখনোই হেদায়াতপ্রাপ্ত ছিলো না। ৪৬. আমি ওদের কাছে যে (বিষয়ের) ওয়াদা করেছি, তার কিছু কিছু (বিষয়) যদি আমি তোমাকে দেখিয়ে দেই, অথবা (এর আগেই) যদি আমি তোমাকে (দুনিয়া থেকে) উঠিয়ে নেই, (এ উভয় অবস্থায়) তাদের আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে, অতপর এরা যা কিছু (দুনিয়ায়) করতো তার ওপর আল্লাহ তায়ালাই (একক) সাক্ষী হবেন। ৪৭. প্রত্যেক উম্মতের জন্যেই একজন রসূল আছে, অতপর যখনি তাদের কাছে তাদের রসূল এসে যায়, তখন (তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালার) সিদ্ধান্ত করার কাজটি ইনসাফের সাথে সম্পন্ন হয়ে যায়, তাদের ওপর কখনো যুলুম করা হবে না। ৪৮. এরা (ঔদ্ধত্য দেখিয়ে) বলে (হে মুসলমানরা), তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বলো, কবে তোমাদের (সে) আযাবের ওয়াদা ফলবে? ৪৯. তুমি বলো (এটা বলা আমার বিষয় নয়), আল্লাহ তায়ালা যা চান তা ব্যতিরেকে আমি তো

شَاءَ اللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا
يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ
مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ ۚ آلْآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ
تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ
تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِي
وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۖ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا
فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۗ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۖ وَقُضِيَ
بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ

আমার নিজস্ব ভালো-মন্দের অধিকারও রাখি না (আসল কথা হচ্ছে), প্রত্যেক জাতির জন্যে (আযাব ও ধ্বংসের) একটি দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করা আছে; তাদের সে ক্ষণটি যখন আসবে তখন (তাদের ব্যাপারে) এক মুহূর্তকাল সময়ও দেরী করা হবে না এবং তাদের দিনক্ষণ আগেও নিয়ে আসা হবে না। ৫০. তুমি (এদের আরো) বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যদি তোমাদের ওপর (আল্লাহর) আযাব রাতে কিংবা দিনের বেলায় এসে পতিত হয়, তাহলে আর কোন বিষয় নিয়ে না-ফরমান লোকেরা তাড়াহুড়ো করবে (বলো)? ৫১. অতপর যখন (সত্যিই) একদিন এ বিষয়টি ঘটবে তখন কি তোমরা এটা বিশ্বাস করবে; তোমাদের বলা হবে [illegible], এখন (তো আযাব এসেই গেলো, অথচ) তোমরা এর জন্যেই তাড়াহুড়ো করছিলে। ৫২. অতপর যালেমদের বলা হবে, এবার চিরস্থায়ী (জাহান্নামের) আযাবের স্বাদ ভোগ করো, (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা যা কিছু অর্জন করেছো, (এখন) তোমাদের শুধু তারই বিনিময় দেয়া হবে। ৫৩. (হে নবী,) এরা তোমার কাছে জানতে চায়, (আযাব সম্পর্কিত) সে কথা আসলেই কি ঠিক? বলো, হাঁ, আমার মালিকের শপথ, এটা আমোঘ সত্য; (জেনো রেখো, প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারে) তোমরা কোনোদিনই তাঁকে অক্ষম করে দিতে পারবে না।

রুকু ৬

৫৪. যদি প্রতিটি যালেম ব্যক্তির কাছে (সেদিন) যমীনের সমুদয় সম্পদ এসে জমা হয়, তাহলে সে তার সব কিছু মুক্তিপণ হিসাবে ব্যয় (করে আযাব থেকে বাঁচার চেষ্টা) করবে; যখন এ (যালেম) মানুষরা (জাহান্নামের) আযাব দেখবে তখন তারা মনে মনে ভারী অনুতাপ করবে (কিন্তু তখন তা কোনোই কাজে আসবে না), সম্পূর্ণ ইনসাফের সাথেই তাদের বিচার মীমাংসা সম্পন্ন হবে এবং তাদের ওপর বিন্দুমাত্র যুলুমও করা হবে না। ৫৫. মনে রেখো, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা সব আল্লাহ তায়ালার জন্যেই;

أَلَآ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا

فِي الصُّدُورِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ

فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ۭ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ مَّآ أَنْزَلَ اللّٰهُ

لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ۭ قُلْ آٰللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى

اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ

الْقِيٰمَةِ ۭ إِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦٠﴾

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَأْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا

জেনে রেখো অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না। ৫৬. তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান এবং (মৃত্যুর পর) তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। ৫৭. হে মানুষ, তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে নসীহত (বিশিষ্ট কেতাব) এসেছে, (এটা) মানুষের অন্তরে যেসব ব্যাধি রয়েছে তার নিরাময় এবং মোমেনদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত। ৫৮. (হে নবী,) তুমি বলো, মানুষের উচিত আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতের কারণে আনন্দ প্রকাশ করা, কারণ তারা যা কিছু (জ্ঞান ও সম্পদ) জমা করেছে, এটা তার চাইতে অনেক ভালো। ৫৯. তুমি (এদের) বলো, তোমরা কি কখনো (একথা) চিন্তা করে দেখেছো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যে রেযেক নাযিল করেছেন তার মধ্য থেকে কিছু অংশকে তোমরা হারাম আর কিছু অংশকে হালাল করে নিয়েছো; (তুমি এদের আরো) বলো, এসব হালাল-হারামের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কি তোমাদের কোনো অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো! ৬০. যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তাদের শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে ধারণা কি এই (এটা কখনো আসবেই না); নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা বড়ো অনুগ্রহশীল (তাই তিনি তাদের অবকাশ দিয়ে রেখেছেন), কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এ জন্যে) আল্লাহর শোকর আদায় করে না।

রুকু ৭

৬১. (হে নবী,) তুমি যে কাজেই থাকো না কেন এবং সে (কাজ) সম্পর্কে কোরআন থেকে যা কিছু তেলাওয়াত করো না কেন (তা আমি জানি, হে মানুষেরা), তোমরা যে কোনো কাজ করো, কোনো কাজে তোমরা যখন প্রবৃত্ত হও, আমি তার ব্যাপারে তোমাদের ওপর

كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُّبِينٍ ﴿٦١﴾ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾
الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾
وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾
أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ
يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا
يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۖ

সাক্ষী হয়ে থাকি, তোমার মালিকের (দৃষ্টি) থেকে একটি অণু পরিমাণ জিনিসও গোপন থাকে না, আসমানে ও যমীনে এর চাইতে ছোট কিংবা এর চাইতে বড়ো কোনো কিছুই নেই যা এ সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নেই। ৬২. জেনে রেখো, (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ তায়ালার বন্ধুদের জন্যে (কোনো) ভয় নেই, (সেদিন) তারা চিন্তিতও হবে না। ৬৩. এরা হচ্ছে সে সব লোক, যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং (তাঁকে) ভয় করেছে। ৬৪. এ (ধরনের) লোকদের জন্যে দুনিয়ার জীবনে (যেমন) সুসংবাদ রয়েছে, (তেমনি) পরকালের জীবনেও (রয়েছে সুসংবাদ); আল্লাহ তায়ালার বাণীর কোনো রদবদল হয় না; আর (সত্যিকার অর্থে) এটাই হচ্ছে সে মহাসাফল্য। ৬৫. (হে নবী,) তোমাকে তাদের কথা যেন কোনো দুঃখ না দেয়। নিশ্চয়ই মান-ইযযত সবই আল্লাহ তায়ালার করায়ত্তে, তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। ৬৬. জেনে রেখো, যা কিছু আসমানে আছে, (আবার) যা কিছু আছে যমীনে, সবই আল্লাহর (অনুগত); যারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া (কল্পিত) শরীকদের ডাকে তারা তো শুধু (কিছু আন্দায) অনুমানেরই অনুসরণ করে মাত্র! তারা মূলত মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কিছুই নয়। ৬৭. (হে মানুষ,) তিনিই মহান আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের জন্যে রাত বানিয়েছেন, যাতে করে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারো, আর দিনকে বানিয়েছেন আলোক (-উজ্জ্বল), অবশ্যই এতে (আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্বের) অনেক নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্যে, যারা (নিষ্ঠার সাথে) শোনে। ৬৮. তারা বলে, আল্লাহ তায়ালা (নিজের একটি) ছেলে গ্রহণ করেছেন, (অথচ) আল্লাহ তায়ালা

هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۖ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ
بِهٰذَا ۖ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾ قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ
عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ
ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

মহাপবিত্র; তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, অভাবমুক্ত; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর; তোমাদের কাছে এ (দাবীর) পক্ষে কোনো দলিল-প্রমাণও নেই; তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন সব কথা বলে বেড়াচ্ছো, যে বিষয়ে তোমরা কিছুই জানো না। ৬৯. (হে নবী,) তুমি বলো, যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তারা কখনোই সফলকাম হবে না। ৭০. (এ মিথ্যাচার হচ্ছে) পার্থিব (জীবনের একটা) সম্পদ, পরিশেষে তাদের আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে, অতপর আমি তাদের কুফরী করার জন্যে এক কঠোর আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাবো।

তাফসীর

আয়াত ২৬-৭০

আলোচ্য এ অধ্যায়টিতে যে কথাগুলো এসেছে তার প্রতিটি বিষয়ই পুরোপুরি আবেগে পরিপূর্ণ। পর্যায়ক্রমে আসা প্রতিটি উপস্থাপনার মধ্যে ভাবাবেগের জোয়ার দেখা যায় এবং এসব কিছু একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে মানুষের মন-মগজকে এগিয়ে দেয়। সত্য বলতে কি এসব মর্মস্পর্শী কথা মানব প্রকৃতিকে আল্লাহর একত্ব এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্যতা সম্পর্কে বুঝার জন্য সর্বপ্রকার যুক্তি-প্রমাণের দিকে এগিয়ে দেয়, তার মধ্যে আখেরাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস এনে দেয় এবং তার মধ্যে ইনসাফের তীব্র অনুভূতি জাগিয়ে দেয়।

আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রতি ছত্রে ছত্রে রয়েছে এমন আবেগ-উচ্ছ্বাস যা পাঠকের গোটা অস্তিত্বকে ভীষণভাবে আন্দোলিত করে এবং তাকে টেনে নিয়ে যায় বিশ্ব প্রকৃতির সুবিশাল ক্ষেত্রে, দৃষ্টি তার প্রসারিত হয়ে যায় পৃথিবী থেকে সুদূর আকাশ পর্যন্ত, সুপ্রশস্ত মহাশূন্যতায় আদিগন্ত বলয়ে বিস্তৃত হয়ে যায় তার মনোযোগ। আর তখন তার কাছে অতীত ও ভবিষ্যত এসব একাকার হয়ে যায়, তার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে না।

পূর্ববর্তী অধ্যায়েও এমনই আবেগ-উচ্ছ্বাসের জোয়ার বয়ে গেছে বটে, কিন্তু বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের আলোচনা আরো নিবিড়ভাবে হৃদয়কে আকর্ষণ করে ..... এখানে দেখা যায়, একদিকে ফুটে উঠেছে রোজ-হাশরের দৃশ্য। অপরদিকে বিশ্ব-প্রকৃতির ছবি যেন জীবন্ত রূপ নিয়ে সামনে হাযির হয়ে তার সামনে ফুটিয়ে তুলেছে তাঁর অস্তিত্বের রহস্যরাজি। আল-কোরআনের বিস্ময় ভরা উপস্থাপনাকে হাযির করে দিচ্ছে তার সামনে সত্যকে অস্বীকারকারী পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণতি। আর এমনই এক মুহূর্তে মুগ্ধ আবেশে সে যেন দেখতে পাচ্ছে রোজ-হাশরের দৃশ্যকে নতুন এক আংগিকে। এমতাবস্থায় তার অন্তর্দৃষ্টিতে অকস্মাৎ জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠছে অন্যায়কারী অপরাধীদের প্রতি নেমে আসা কঠিন শাস্তির ভয়াবহ দৃশ্যাবলী। মহান আল্লাহ, যাঁর কর্তৃত্বে কেউ শরীক নেই, তাঁর অসীম জ্ঞান-ভান্ডার যেন উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে বিশ্বলোকে ছড়িয়ে থাকা বহু

নিদর্শনের মধ্য দিয়ে। আর তখনই সেই বিচার দিনের যথাযর্থতা তার কাছে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে, যার ভয় দেখিয়ে সীমা অতিক্রমকারী ব্যক্তিদেরকে বারবার সাবধান করা হয়ে থাকে।

এ আলোচনার মাধ্যমে মানবমন্ডলীর সুপ্ত হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ারে তীব্রভাবে আঘাত করা হয়েছে যেন তার সুপ্ত বিবেক জেগে ওঠে, যেন তারা সত্যের ডাকে মুগ্ধ আবেগে সাড়া দিতে পারে, যেন অন্যায় ও অসত্য যাবতীয় বিষয় থেকে সরে এসে হৃদয় তাদের বিগলিত হয় সত্য সঠিক জীবন পথের ঝর্ণাধারায়, বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে প্রবাহমান সৃষ্টিকর্তার নিয়মের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়ে যেন পরম আনন্দের সাথে সঠিক পথে চলতে পারে।

কাফেরদের অনুভূতি ছিলো এই যে যে আল কোরআন এসেছে তাদের দলের মধ্যে ভাংগন ধরাতে, এ অনুভূতিতে তারা খুবই নিষ্ঠ এবং প্রকৃতপক্ষে আল কোরআন অন্যায়কারীদের মধ্যে ভাংগন ধরিয়ে তাদের মধ্য থেকে অপেক্ষাকৃত সত্যাশ্রয়ীদেরকে অবশ্য বের করে আনতে চেয়েছিলো। যার কারণে আল কোরআনের আওয়ায যাতে মানুষের কানে না পৌঁছায় এবং তাদের হৃদয়-দুয়ারে আঘাত হানতে না পারে, তার জন্য তারা সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছিলো। তাদের দলীয় নেতাদের ভয় ছিলো, আল কোরআনের যুক্তিপূর্ণ কথা, তার সুর-লহরী এবং অমিয়বাণী যদি মানুষের কান পর্যন্ত পৌঁছুনোর সুযোগ পায়, তাহলে অন্ধ আবেগে ও বাপ-দাদার অনুসরণের দোহাই দিয়ে যাদেরকে বিবেকহীন বানিয়ে রাখা হয়েছিলো এবং অন্ধ আনুগত্য হাসিল করার মাধ্যমে নিজেদের কুক্ষিগত স্বার্থ চরিতার্থ করা হচ্ছিল, তা আর বেশী দিন চলবে না। এজন্যই তারা ঐ সব ভক্ত অনুসারীদেরকে শেরেক-এর মাহাত্ম্য সদাসর্বদা বুঝাতে তৎপর ছিলো।

নেককারদের সফলতা ও মোশরেকদের দৈন্য দশা

এরশাদ হচ্ছে, 'যারা নেককাজ করেছে (যা কিছু ভাল ও অপরের জন্য কল্যাণকর বলে সে কাজে আত্ম নিয়োগ করেছে) তাদের জন্যই রয়েছে প্রকৃত কল্যাণ বরং কল্যাণ থেকে আরও অধিক কিছু .... তারাই দোযখবাসী, সেখানেই থাকবে তারা চিরদিন।'

এ অধ্যায়ের পূর্বে যে শেষ আয়াতটি ছিলো তাতে বলা হয়েছে, 'আর আল্লাহ তায়ালা আহ্বান করছেন চির-সুন্দর ও চির শান্তি-রাজ্যের দিকে এবং তিনি যাকে ইচ্ছা, তাকে সরল সঠিক ও মযবুত পথের দিশা দিয়ে থাকেন'....... সুতরাং, এখানে যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত ও যারা ভুল পথের পথিক, তাদের জন্য পর্যায়ক্রমে কি কি প্রতিদান দেয়া যায় তার মূলনীতিগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণন করা হচ্ছে। এ বর্ণনাধারায় একাধারে তার দয়া ও করুণা ঝরে পড়ছে এবং এদের ও ওদেরকে কি বিনিময় দেয়া যায় সে বিষয়ে তাঁর সুবিচারপূর্ণ ফায়সালা জানিয়ে দেয়া হচ্ছে।

সুতরাং যারা ভাল কিছু করেছে, তারা অন্তরের গভীরে প্রোথিত বিশ্বাসগত দিক দিয়ে যা কিছু ভালো তাই করেছে, অর্থাৎ অন্যায়-অবিচার ও অযৌক্তিক কাজের চিন্তা থেকে মনকে তারা পুরোপুরিভাবে মুক্ত করে নিয়েছে এবং সুন্দর বানাতে সক্ষম হয়েছে তাদের বাস্তব কর্মজীবনকে। উপরন্তু সঠিক পথ চেনাকে তারা সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছে এবং বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে যে ব্যবস্থা চালু রয়েছে, তার উৎস কোথায় তা হৃদয়ংগম করে সেই উৎসকেই নিজেদের নিয়ন্তা জেনেছে এবং এগিয়ে গেছে শান্তি-রাজ্য গঠন করার দিকে। এসব ব্যক্তির জন্যই রয়েছে তাদের উত্তম ব্যবহার ও কাজের প্রতিদান, শুধু প্রতিদানই নয়, বরং প্রতিদান হিসাবে যা পাওয়া দরকার তার থেকেও তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর মেহেরবানীতে আরো আরো অনেক কিছু বেশী।

এরাই রোজ হাশরের দুঃখ ও পেরেশানী থেকে রেহাই পাবে, সৃষ্টি সম্পর্কে ফায়সালা হওয়ার পূর্বে যেখানে তাদের রাখা হবে, সেই বাসস্থানের বিপদ থেকেও। 'তাদের চেহারাকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে না কোনো কালিমা অথবা হীনতা।'

'কতার' বলতে বুঝায় ধুলাবালি, কালিমা এবং কাদা-মাটি, অর্থাৎ দুঃখ পেলে ও মন সংকীর্ণ হয়ে গেলে মানুষের চেহারা কখনও মলিন হয়ে যায়, কখনো হয়ে যায়, কালির মতো কালো, আবার কখনও বা তাদের চেহারা মনে হয় কর্দমাক্ত। আর 'যিল্লাত' বলতে বুঝায় বিনয়াবনতভাব, হীনমন্যতা বা নিজেকে ছোট মনে করার মনোভাব। সুতরাং ওপরের আয়াতের অর্থ দাঁড়াচ্ছে- দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা ও দুঃখের কারণে অথবা বিপদের ভয়ে তাদের চেহারাগুলো যেমন কালো হয়ে যাবে না, তেমনি একেবারে ফ্যাকাশেও হয়ে যাবে না। একথার ব্যাখ্যাতে বুঝা যায় রোজ হাশরের ঐ দিনটি হবে এতই কঠিন যে, সাধারণভাবে মানুষের ওপর ছেয়ে থাকবে ভয়-ভীতি, হীনমন্যতা এবং ভীষণ বিপদের আশংকায় তাদের মুখমন্ডলগুলো থাকবে বিবর্ণ। কিন্তু যারা সুন্দরভাবে আল্লাহর হুকুম পালন করবে এবং মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তারা ঐসব কঠিন অবস্থা থেকে মুক্ত থাকবে, ভয়ভীতির কোনো ছাপই থাকবে না তাদের চেহারাতে এবং বিপদের আশংকা থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকার কারণে কোনো হীনমন্যতার গ্লানিও তাদেরকে স্পর্শ করবে না। এসব কঠিন অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়া বড়ই ভাগ্যের বিষয়-এরপরও তাদের ওপর থাকবে আল্লাহ তায়ালার খাস মেহেরবানীর দৃষ্টি, যা হবে তাদের পাওনা থেকে বাড়তি এক পুরস্কার। এরশাদ হচ্ছে,

'ওরাই'........ সেই সব উচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি যারা থাকবে দুঃখ, কষ্ট, দুশ্চিন্তা ও দুরাবস্থা থেকে বহু বহু উর্ধে। অর্থাৎ, তারাই হবে 'জান্নাতবাসী', জান্নাতবাসী এ মানুষরা নতুন জামাই-এর মত আদর-যত্নে থাকবে ঐ মহা সম্মানিত স্থানসমূহে, সেখানে কোনো দুরবস্থা তাদেরকে স্পর্শ করবে না। 'সেখানে থাকবে তারা চিরদিন।'

'আর যারা উপার্জন করবে অন্যায়-অপকর্ম।'..........

অর্থাৎ জীবনের খেলাশেষে অন্যায়-অত্যাচারে লিপ্ত থাকা ব্যক্তিরা শুধু এই লোকসানের পণ্য নিয়েই আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাযির হবে! এরা আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর নিকট থেকে তাদের উচিত পুরস্কারই লাভ করবে, তবে তাদের এই অপ্রিয় পুরস্কারকে আর একটুও বাড়ানো হবে না, বা যে অন্যায় তারা করেছে, সেগুলোকেও বর্ধিত আকারে তুলে ধরা হবে না, বরং যতটা অন্যায় তারা করেছে, তার শাস্তি যতটা হওয়া দরকার, ঠিক ততটাই তাদেরকে দেয়া হবে। .... (এই শাস্তির) ফলে 'তাদের গোটা অস্তিত্ব অপমানের গ্লানিতে ছেয়ে যাবে।'

অর্থাৎ তাদের গোটা সত্ত্বাকে ঢেকে ফেলবে অপমানের গ্লানি, তাদের ওপর আত্মশ্লাঘা এমনভাবে সওয়ার হয়ে যাবে যে, এ অবস্থা থেকে তারা কখনও মুক্ত হবে না এবং একারণে দুঃখের কশাঘাতে তারা সদা-সর্বদা জর্জরিত হতে থাকবে।

'থাকবে না (সেদিন) তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো বাঁচানেওয়ালা।'

যারা তাদেরকে ঐ অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে নেবে এবং চূড়ান্ত ঐ শাস্তির স্থান থেকে সরিয়ে নিতে পারবে। গোটা বিশ্বের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর নিয়মই এই যে, এ ভাবেই তিনি শাস্তি দিয়ে থাকেন তাদেরকে, যারা তাঁর পথ থেকে সরে দাঁড়ায় এবং তাঁর পয়গাম্বরদেরকে অস্বীকার ও বিরোধিতা করে।

তারপর এমনভাবে তাদের মানসিক অন্ধকার ও হীনতার গ্লানিকে এবং পরিণতিতে ঐ কঠিন শাস্তি দানের চিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, তার বর্ণনা হৃদয়কে ভীষণভাবে ঝাঁকিয়ে তোলে, পাঠকের হৃদয় মুহুর্মুহু প্রকম্পিত হতে থাকে এবং তার গোটা অস্তিত্বে ভয়-ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। এরশাদ হচ্ছে,

'যেন ছেয়ে যাবে তাদের চেহারার ওপর অন্ধকার রাত্রির একটি টুকরা।'

অর্থাৎ যেন অন্ধকার রাত্রির একটি টুকরা এনে তাদের চেহারার ওপর ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে এবং এজন্য চেহারাগুলো ঢাকা পড়ে গেছে– এ অবস্থাটা তাদেরকে সেদিন পেয়ে বসবে! আর এই একইভাবে তাদের গোটা অস্তিত্বকে গভীর কালো রাত্রের অন্ধকারের মতো ভীষণ অন্ধকার ঢেকে ফেলবে এবং ছেয়ে ফেলবে তাদের গোটা সত্ত্বাকে। এভাবে আল্লাহর দেয়া ভয়ানক ভয়-ভীতি এবং এ ভয়ের ছাপ তাদের চেহারায় পরিস্ফুট হয়ে থাকবে।

'ওরাই'.........হাঁ, আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত ও দূর অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত ঐ ব্যক্তিরাই হবে 'দোযখবাসী' সেখানকার অধিবাসী ও সেখানকার বাসিন্দাদের সংগী-সাথী 'সেখানেই বাস করবে তারা চিরদিন।'

শরীকরা যেদিন মোশরেকদের ছেড়ে পালিয়ে যাবে

এরপর এসেছে সেই সব শরীকদের আলোচনা যাদের কারণে তাদের আজ এই করুন পরিণতি কোথায় থাকবে সেদিন তাদের সেই সব শক্তিধর দেবতারা, যাদেরকে তারা আল্লাহর ক্ষমতায় অংশীদার মনে করতো, আর কোথায়ই বা থাকবে তাদের সেই সুপারিশকারীরা, যাদের সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিলো যে, তারা ওদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে? আর তাদের কেমন অবস্থা হবে সেদিন, যেদিন আল্লাহ ব্যতীত তাদেরকে কোনোভাবে কেউ বাঁচাতে পারবে না এবং কেউ কোনো সাহায্য করতে পারবে না সে কঠিন দিনে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'যে দিন আমি সর্ব শক্তিমান আল্লাহ একত্রিত করব তাদের সবাইকে .... এবং দূরে সরে যাবে তারা যাদেরকে ওরা মিছেমিছি তাদের উদ্ধারকারী মনে করে নিয়েছিলো।'

এটাই হচ্ছে কেয়ামতের দিনের ঐ ভয়াবহ অবস্থার সুপারিশকারী ও অংশীদারদের দুরবস্থার কাহিনী। ওপরের আয়াতগুলোতে কেয়ামতের যে চিত্র আঁকা হয়েছে, তা যেন পাঠকের সামনে এক বাস্তব ও জীবন্ত রূপ নিয়ে হাযির হয়। কেয়ামতের দিন ঐ নাফরমানদের দেবতারা বা কল্পিত সুপারিশকারীরা তাদের ভক্ত-অনুরক্তদেরকে আল্লাহর কঠিন আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না এবং মুক্ত করতেও পারবে না– এই সাধারণ বর্ণনা থেকে ওপরে বর্ণিত বর্ণনা ভংগি অনেক বেশী হৃদয়গ্রাহী ও পাঠকের মনে আরো বেশী প্রভাব সৃষ্টিকারী।

ওরা সবাই হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে ... একত্রিত হবে কাফের ও তাদের ঐ মাবুদরা, যাদেরকে তারা আল্লাহর ক্ষমতায় শরীক মনে করত ..... কিন্তু আল কোরআন ঘৃণাভরে তাদের সম্পর্কে 'তাদের শরীকরা' শব্দগুলো উচ্চারণ করেছে। এভাবে বলাতে এই ইংগিত করা হয়েছে যে, ওদেরকে ওদের ভক্তবৃন্দ শরীক করত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর শরীক ছিলো না।

বাস্তব ব্যবহারে ওরা সবাই কাফের ও শেরেককারী ছিলো। তাই ওদের দিকেই ওদের কথাকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে। বলা হয়েছে, 'তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে থাক।'

অর্থাৎ যেখানে আছ ওখানেই অপেক্ষা কর, আর অবশ্যই ওদের সম্ভাবনাপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে হয়ত ওরা চিন্তা-ভাবনা করতে থাকবে। কিন্তু চূড়ান্ত ফায়সালার সেই দিনটি পূর্ব থেকেই নির্ধারিত রয়েছে, তারপর, তাদের ও তাদের ঐ শরীকদের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই এসে যাবে এবং এর পরই তাদের মধ্যে দেখা যাবে মতামতের আমূল পার্থক্য।

'তখন আমি মহান আল্লাহ তাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে দেব।.......'

অর্থাৎ, সেদিন কাফেররা কোনো কথা বলবে না, বরং ঐদিন সেই শরীক ব্যক্তিরা নিজেদেরকে সেই সব অপরাধ থেকে মুক্ত করার জন্য কথা বলবে, যা ঐ কাফেররা আল্লাহর সাথে ওদেরও পূজা অর্চনা করতে গিয়ে করেছিলো, অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শুধু ওদেরই দাসত্ব করত

এবং ঘোষণা দিত যে, তাদের দাসত্ব বা পূজার জন্য তারা দায়ী নয় যেহেতু তারা জানতই না যে, কেউ তাদের পূজা করছে অথবা তাদের পূজা করা হচ্ছে বলে তারা কখনও বুঝেওনি। এজন্য আল্লাহর সাথে অন্য কারো দাসত্ব ব পূজা করার অপরাধে তারা মোটেই জড়িত নয় আর এসব কথায় আল্লাহকেই তারা সাক্ষী মানবে। (প্রকৃতপক্ষে এমন হয়েছে যে, অনেক নবী বা উন্নতমানের কোনো ব্যক্তিত্ব মারা যাওয়ার পর অনুসারীরা তাদের স্মৃতিটা ধরে রাখতে গিয়ে তাদের মূর্তি বানিয়ে রেখেছে এবং অতিভক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে তাদের ওপর মালা চড়িয়েছে এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে সালাম দেয়া ও মাথা নত করে সেজদা করা ইত্যাদি নানা প্রকার আনুষ্ঠানিকতা করেছে, যে বিষয় ঐ মৃত ব্যক্তিদের কোনো খবর রাখাই সম্ভব ছিলো না। তাই কেয়ামতের দিন তারা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে ঐ সব কদর্য কাজ থেকে তাদের দায়িত্ব মুক্তির কথা ঘোষণা দেবে।) এরশাদ হচ্ছে,

'(সেদিন) তাদের শরীকরা বলবে, কখনোই তোমরা আমাদের এবাদাত (পূজা) করনি, এ ব্যাপারে, তোমাদের ও আমাদের মাঝে ফায়সালা করার জন্য সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। তিনিই বলে দেবেন যে, তোমাদের ঐ সব এবাদাত করার কথা আমরা কিছুই জানতাম না।'

অর্থাৎ ঐ শরীকরাই তো তারা, যাদের মূর্তি তৈরী করে নাদান ও মূর্খ মানুষেরা পূজা-অর্চনা করতো, তাদের মূর্তির সামনে নানা প্রকার খাদ্য পেশ করত এবং বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে তাদের কাছে সমাধান চাইত, কিন্তু ঐ সব মিথ্যা মাবুদ (মূর্তি) ছিলো এতোই দুর্বল যে, তাদের গায়ে মশা, মাছি পড়লে তা তাড়ানোর ক্ষমতাও তারা রাখত না। আবার কখনও এমন হয়েছে যে, নেতৃবৃন্দের অন্ধ আনুগত্য করতে গিয়ে অনেক অন্যায় কাজ করা হয়েছে, যার খবর ঐ নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত পৌঁছায়নি। তাদের দোহাই দিয়ে যেসব অন্যায় কাজ করা হয়েছে, সেগুলো সামাল দিতে তারা অক্ষম থেকেছে– এসব বিবিধ কারণে তারা ঐ সব শেরেক থেকে নিজেদের দায়িত্ব মুক্তির কথা ঘোষণা করবে এবং তাদের কথার সত্যতার জন্য আল্লাহ তায়ালাকেই সাক্ষী মেনে নাজাত চাইবে।

সে সময়ে তাদের এ অবস্থা প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের অতীতের যাবতীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হয়ে যাবে এবং পরিণতিতে যার যা কিছু পাওনা তা ঠিক মতোই পেয়ে যাবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'সে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে যা সে অতীতে করেছে।'

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির ভূমিকা অতীতে কি ছিলো এবং সেই অনুসারে তার অবস্থান কোথায় নির্ধারিত হবে সেই দিনই সব আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে তারা জেনে যাবে, যার কাছে যেতেই হবে সবকে। তিনি ছাড়া আর অন্য যারা যা কিছু করেছিলো বা দাবী করেছিলো, সবই বাতিল বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে।

তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর তাদেরকে তাদের আল্লাহ তায়ালার কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।' অর্থাৎ সেদিন মোশরেকরা তাদের দাবীর কোনো কিছুই পাবে না, ভুল প্রমাণিত হবে তাদের যাবতীয় ধারণা এবং বিভিন্ন মাবুদের দাবী, সবাই সেদিন তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে, কারও অস্তিত্ব আর সেদিন ফিরে আসবে না। তাই আল্লাহ তায়ালার এরশাদ দেখুন,

'মিথ্যা যে সব মনগড়া জিনিস তারা বানিয়ে নিয়েছিলো (এবং তাদেরকে শক্তি-ক্ষমতার আংশিক মালিক মনে করে নিয়েছিলো) তারা সবাই সেদিন তাদের থেকে দূরে সরে যাবে।'

আল্লাহকে চেনার অসংখ্য নিদর্শন

উপরের আয়াতাংশে এ ভাবে হাশরের ময়দানের দৃশ্য যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠছে। এ সময় যা ঘটবে, তা পাঠকের হৃদয়ে এক বাস্তবতা বলে মনে হচ্ছে, দারুণভাবে প্রভাবিত হচ্ছে তার মন এবং দ্বীন-এর দাওয়াত কবুল করার ব্যাপারে স্বতস্ফূর্তভাবে এক সাড়া জাগছে। ওপরের কথাগুলো সংখ্যায় খুব কম মনে হলেও কথাগুলো মনের গভীরে এমনভাবে প্রবেশ করছে যা কোনো সাধারণ সংবাদ দ্বারা অথবা দীর্ঘ কোনো প্রামাণ্য বাক্য বিতন্ডা দ্বারা পয়দা করা সম্ভব হয় না।

আর সেই সে ময়দানে হাশরে মানুষের মনগড়া ওযর-আপত্তি ও ভুল যুক্তিসমূহ সব ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং একথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আল্লাহ তায়ালাই প্রকৃত মালিক ও সব কিছুর নিয়ামক, আর যে যা কিছু করছে তার তত্ত্বাবধায়ক এবং সবার পরিণতি নির্ধারণকারী, তিনিই সবার অন্তরের সমস্ত খবর রাখেন। এরপর আলোচনা ফিরে আসে আজকের এই বাস্তব জগতের দিকে, যেখানে আজকের মানুষ বাস করছে এবং ফিরে আসে তাদের নিজেদের দিকেও যাদেরকে তারা নিজেরা জানে, ফিরে আসে সেই সব দৃশ্যের দিকে যা তারা নিজেদের জীবনে দেখছে; বরং আরও বাস্তব সত্য হচ্ছে, অন্তরে তারা স্বীকার করছে যে সব কিছু আল্লাহর হুকুমে চলছে এবং সবকিছু তাঁরই সৃষ্টি। এরশাদ হচ্ছে,

'বল, কে তোমাদেরকে দিয়ে চলেছে আসমান-যমীন থেকে তোমাদের জীবন-সামগ্রী? কে তোমাদের কান ও চোখগুলোর মালিক, কে মৃত থেকে জীবন্ত প্রাণীগুলোকে বের করছে এবং কে–ইবা সকল কাজ পরিচালনা করছে? শীঘ্রই ওরা বলবে, আল্লাহ। সুতরাং বলো, কেন তোমরা ভয় করছো না এবং বাছ-বিচার করে জীবন যাপন করছ না? হ্যাঁ, যাকে তোমরা আল্লাহ বলে জানো, তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তিনিই তোমাদের পালনকর্তা। আর এটাও জেনে রাখো যে, সত্যকে গ্রহণ না করার পরিণতিই হচ্ছে পথ ভ্রষ্টতা। তাহলে কোথায় তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?'

আর ইতিপূর্বে আলোচনা এসে গেছে যে, আরবের মোশরেকরা আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বকে মোটেই অস্বীকার করত না, তাঁকে সৃষ্টিকর্তা, রেযেক-দাতা, ব্যবস্থাপক বলেও মানতে অস্বীকার করতো না। যাদেরকে তারা আল্লাহ তায়ালার সাথে তাঁর ক্ষমতায় শরীক বলে মানতো তাদেরকে মনে করতো যে, তারা ওদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে, তারা বিশ্বাস করতো যে, মহা শক্তিমান রব্বুল আলামীন-এর কাছে পৌঁছানোর মতো কিছু যোগ্যতা ও ক্ষমতা তাদের রয়েছে। আসলে এসব ছিলো তাদের মনগড়া আকীদা, এরই ভিত্তিতে ওরা মনে করতো যে, ঐসব দেবতা তাদের সঠিক পথে এগিয়ে নেবে, এগিয়ে নেবে তাদেরকে তাদের স্মৃতিশক্তিকে জাগিয়ে দেয়ার মাধ্যমে এবং তাদের ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতিগত যুক্তি-প্রদর্শনের মাধ্যমে। এখানেই ছিলো গোলমাল এবং মূল ভ্রান্তি। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রেযেক দান করেন?' ....

ভেবে দেখো, কে তোমাদেরকে সেই বৃষ্টি থেকে রেযেক দেন যা যমীনকে যিন্দা করে তোলে এবং শস্য সম্ভার উৎপন্ন করে। এভাবে তিনি তোমাদের প্রয়োজন মেটান পৃথিবীর খাদ্য ভান্ডার থেকে, পাখীকুল, মাছ ও জীবজন্তু থেকে, তারপর ঐ সকল জিনিস থেকে তাদের ও তাদের গবাদি পশুদের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করেন। আসমান-যমীনের মধ্যে বিস্তৃত যে রেযেকের ব্যবস্থা রয়েছে, তার থেকে ওরা এসব জিনিস পর্যাপ্ত পরিমাণে পায় এবং এসব সত্য কথা মানুষ যখন বুঝতে পারে, তখনই সে সঠিক পথ গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসে এবং প্রকৃতির বুকে

ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর নিদর্শনগুলো সে দেখতে পায় ও তার থেকে শিক্ষা। নিতে চায়। অবশ্য এসব থেকে কখনও কখনও তারা ভালো শিক্ষাও নেয়, আবার কখনও নেয় মন্দ শিক্ষা। তাদের বিশ্বাসের সাথে এসবের যোগ থাকুক আর না-ই থাকুক এবং এসব কিছু আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর দেয়া রেযেক থেকে এসেছে, যা তিনি মানুষের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। এ রেযেক আসে পৃথিবীর উপরিভাগ ও অভ্যন্তর ভাগ উভয় দিক থেকে, আসে পানির ওপর থেকে এবং এর গভীর থেকেও। এ রেযেক নাযেল হয় সূর্যের কিরণ থেকে যেমন, তেমনি চাঁদের স্নিগ্ধ আলো থেকেও। অবশেষে এক সময় এমন আসবে, যখন গোটা পৃথবীর আব-হাওয়ার মধ্যে পচন ধরবে ওষধ ও বিষ সব একাকার হয়ে যাবে। এরশাদ হচ্ছে,

'কিম্বা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক?'

এদের প্রত্যেককে যে যে কাজ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো, তা পালন করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা তিনিই দিয়েছেন, আবার যখন তিনি চেয়েছেন তখন কারো ক্ষমতা তিনি কেড়েও নিয়েছেন। কাউকে দিয়েছেন তিনি সুস্থতা, আবার কাউকে দিয়েছেন রোগ-ব্যাধি। কাউকে দিয়েছেন তিনি কর্মপ্রেরণা, আবার কারো মধ্যে এনে দিয়েছেন কর্মবিমুখতা। কে কোন্ কাজ পছন্দ করবে আর কে কোন্ কাজ অপছন্দ করবে, তাও তিনি জানেন .... সেই সে ভয়ংকর দিনে তারা টের পাবে কে প্রকৃত পক্ষে শোনার এবং কে সত্যিকারে দেখার মালিক। আসলে এ সব প্রশ্নের সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে জানার জন্য তিনিই যথেষ্ট এটা সবাই বুঝে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন ও চেতনা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মধ্যে ক্রমান্বয়ে শোনা ও দেখার তাৎপর্য আরো আরো বেশী বাড়তে থাকবে এবং তারা আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর আসমান-যমীন ব্যাপী এ বিশ্ব-কারখানার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলো ধীরে ধীরে অবহিত হতে থাকবে, যার ফলে তাদের মধ্যে জানার কৌতূহল ও আগ্রহ আরো ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকবে। আবার দেখুন চোখের গঠন প্রণালী ও তার শিরা-উপশিরার সংস্থাপন পদ্ধতি এবং দেখার কাজে এগুলোকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকই জানেন। অনুরূপভাবে তিনিই জানেন শোনার জন্য কানের কি কি কারিগরি কলকবযা লাগানো হয়েছে এবং কোন কায়দায় কি কি ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে। এরপর কান দ্বারা শোনার পদ্ধতিও তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন যাতে করে শব্দ-তরংগ জ্ঞানীদের কর্ণকুহরে পৌঁছে তার হৃদয়ানুভূতিতে প্রচন্ড কম্পন জাগায় ও এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যে, যখন এই সংস্থাপন কুশলতা সম্পর্কে চিন্তা করা হয়, তখন যে কোনো ব্যক্তির মাথা ঘুরতে থাকে, অথবা আধুনিক জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে আশ্চর্যজনক আবিষ্কার হচ্ছে তার দিকে তাকালেও হতবাক হয়ে যেতে হয়। কিন্তু মানুষের তৈরী এসব কারিগরি দ্রব্যাদি দেখে মানুষ যতোই ভয় পাক, অভিভূত হয়ে যাক এবং যত বিস্মিতই হোক না কেন, এ সব কিছু দেখেও সে আল্লাহ পাকের বিশাল কারখানার ব্যাপকতা ও বিরাটত্ব সম্পর্কে কিছুমাত্র আন্দাজ করতে পারবে না। সাঁধারণভাবে মানুষ এগুলোর দিকে ঔদাসীন্যের সাথে তাকায় এবং ভাসাভাসাভাবে এগুলো দেখে চলে যায়। তারা আল্লাহ তায়ালার মহা-বিস্ময়কর কারখানার কারিগরি কলাকৌশলের চাতুর্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে না, এ জন্য তাদের এ দেখা, না দেখারই শামিল, দেখেও তারা দেখে না এবং সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে তারা কিছুই বুঝে না! তাই এরশাদ হচ্ছে,

'কে বের করে যিন্দাকে মৃত থেকে এবং মুর্দাকে বের করে যিন্দা থেকে?'

ওপরের আয়াতাংশের অর্থ করতে গিয়ে ওরা তাদের সাধারণ বুদ্ধিতে স্থবির বা স্থির জিনিসকে মাইয়েত বা মুর্দা বলত আর বাড়নশীল ও গতিশীল জিনিসকে বলত যিন্দা।, ফলে

আলোচ্য বিষয়ের অর্থ দাঁড়াতো, মুর্দা থেকে যিন্দা, অর্থাৎ দানা থেকে সজীব চারা গাছ অংকুরিত হওয়া এবং যিন্দা থেকে মুর্দা অর্থাৎ জ্যন্ত গাছ থেকে বীজ পাওয়া, আবার নির্জীব ডিম থেকে জ্যান্ত বাচ্চা পাওয়া এবং জ্যান্ত মুরগী থেকে নির্জীব ডিম লাভ এটা নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করে তারা বিস্মিত হতো, আসলে এই রূপান্তরও কম বিস্ময়কর নয়। এমনকি ডিম ও বীজ যে একেবারে নির্জীব নয় একথা জানার পরও এসব জিনিস কীভাবে রূপান্তরিত হয় তা চিন্তা করলে বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারা যায় না। কারণ স্থির হয়ে থাকলেও পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝা যায় ডিম বা বীজের মধ্যে জীবন ঘুমিয়ে থাকে এবং উপযুক্ত সময় ও পরিবেশ পাওয়ার সাথে সাথে তা জেগে উঠে জীবনের সাক্ষ্য দিতে শুরু করে, জানিয়ে দেয় তাদের ক্ষমতার কথা। যে জীবন গতিশীল, ক্ষমতা প্রকাশকারী ও পরবর্তীদের মধ্যে নিজ বংশ বিস্তারকারী, তা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ডিম বা বীজের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকবে এটা কি কম বিস্ময়কর? অবশ্যই এটা আল্লাহর ক্ষমতাসমূহের মধ্যে এক মহাবিস্ময়কর ক্ষমতার বহিপ্রকাশ।

বীজ ও দানা বা আঁঠির সামনে দাঁড়িয়ে একবার চিন্তা করে দেখুন, ক্ষুদ্র একটি বীজ তার থেকে বেরিয়ে আসা নাযুক একটি চারা গাছ বর্ধিত হয়ে মহা মহীরুহে পরিণত হয়(১)। অপরদিকে একটি ক্ষুত্র দানা থেকে বেরিয়ে আসা অংকুর ধীরে ধীরে বর্ধিত হয় এবং পরিণত হয় বিরাট খেজুরগাছে অথবা আরো চিন্তা করুন ডিম থেকে বেরিয়ে আসা বাচ্চা পরিণত হয় পূর্ণাংগ মোরগ বা মুরগীতে আর ডিম্বকোষ থেকে রেরিয়ে আসা ভ্রূণ পরিণত হয় সুঠামদেহী ও পূর্ণাংগ শক্তিশালী মানুষে। চিন্তা-ভাবনা ও হৃদয় অনুভূতি জাগানোর জন্য এ দুটি উদাহরণই যথেষ্ট।

আল্লাহর একান্ত নিজস্ব ক্ষমতা যদি এখানে সক্রিয় হয়েছে বলে মনে না হয়, তাহলে আর কে আছে যে আনতে পারে চারার অংকুরকে বাস্তবে আর বীজের মধ্যে কোথায়ই বা লুকিয়ে ছিলো এই নয়নাভিরাম লকলকে ডগা, কোথায়ই বা লুকিয়ে ছিলো গাছের এই শক্ত এবং মযবুত কাঠ, শেকড়, কান্ড ও পত্রপল্লব ....?

আর ডিমের মধ্যে কোথায় অবস্থান করছিলো মুরগীর ছানা, কোথায় লুকিয়ে ছিলো তার হাড্ডি এবং তুলতুলে গোশত, মিহি ও ছোট ছোট পশম, মোটা ও লম্বা পশম, রং ও ছাপার রং-এর মত বিচিত্র নকশা-আঁকা পাখনা ও ডানা, আর কোথায় লুকিয়ে ছিলো তাদের মিষ্টি-মধুর কি কিচিরমিচির আওয়ায ....?

আবার ভেবে দেখুন কোথায় ছিলো জ্ঞানে-গুণে, শক্তি-সৌন্দর্যে ভরা সৃষ্টির চরম ও পরম বিস্ময় এই মানবকুল ঐ ক্ষুদ্র ডিম্বকোষের মধ্যে? কোথায় ছিলো তার বাহ্যিক চেহারা-ছবির সুসমঞ্জস্য আকৃতি মুখমন্ডল ও শরীরের অন্যান্য অংশে অবস্থিত পরিচয়বহ বিশেষ বিশেষ দাগ, যা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বাপ-মা অথবা ঊর্ধতন কোনো পূর্বপুরুষ থেকে এসে তার বংশপরিচয়কে সুস্পষ্ট করে দিচ্ছে? কোথায় ছিলো তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ভংগিতে চাপ দিয়ে কথা বলার বৈশিষ্ট্য, তীক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি, প্রাণকাড়া গ্রীবা-ভংগি এবং দেহের পেশীশক্তির চিত্তাকর্ষক বাহার। কোথায় ছিলো শ্রেণীগত, পারিবারিক ও পিতামাতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্টসমূহ? বলো, বলো না কোথায়-কোথায় লুকিয়ে ছিলো মানুষের মধ্যে নানা প্রকার গুণাবলী, বৈশিষ্টসমূহ এবং চেহারা-ছবি ও অবয়বের মধ্যে অংকিত বৈশিষ্টসমূহ, এ যেন ছাপার অক্ষরে লেখা বিচিত্র সৌন্দর্যের সমাহার!

(১) যশোর-ঝিনেদার মধ্যবর্তী কালিগঞ্জ থেকে এক মাইল পূর্বে অবস্থিত বিশ বিঘা জমির ওপর ছড়িয়ে থাকা এ গাছটি সম্ভবত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বটগাছ। এর বয়স ৮০০-৯০০ বছর বলে অনুমান করা হচ্ছে। ৬৫০টি ঝুরি নেমে গাছটি এতো মোটা হয়েছে যে, কোনটা মূল কান্ড এবং কোনটা তার ঝুরি, তা বুঝাই মুশকিল।—সম্পাদক

আর আমাদের পক্ষে একথা বলা কি যথেষ্ট হবে যে, এ বিশ্ব এ মহা বিশ্বের অন্যান্য অংশ থেকে ছিঁটকে এসে বীজের মধ্যে লুকিয়ে ছিলো। লুকিয়ে ছিলো আঁঠির মধ্যে, ডিমের মধ্যে এবং ডিম্বকোষের মধ্যে। এসব এমনভাবে লুকিয়ে ছিলো যেন এর থেকে অতি আশ্চর্যভাবে রূপান্তরিত হয়ে এগুলো বর্তমান অবস্থায় পৌছুতে পারে। এটা কিভাবে সম্ভব? একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা ও তার ব্যবস্থাপনা ছাড়া এর আর কোনো ব্যাখ্যা দেয়া যায় না।

মানুষ বরাবর মৃত্যু ও জীবনের রহস্য খুঁজে বের করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে, মৃত থেকে জীবন্ত প্রাণী বের করার জন্য সাধনা করছে এবং প্রয়াস পাচ্ছে যিন্দা থেকে মুর্দাকে বের করার জন্য। আরো চেষ্টা চালাচ্ছে মৃত্যু ও জীবনের স্তরগুলো পার হয়ে যে সব উপাদান ক্রিয়াশীল হয়ে রয়েছে, সেগুলো খুঁজে বের করার জন্য। এ প্রচেষ্টা প্রতিদিন এবং প্রতিক্ষণে তার সামনে প্রশ্নের ময়দান আরো আরো বেশী প্রশস্ত হয়ে চলেছে। আর কোনো খাদ্যকে যদি আগুনে জ্বালিয়ে রান্না করে মেরে ফেলার কারণে তার রূপান্তর হয়, আর আগুন যদি পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে জীবন্ত শরীরের মধ্যে জীবন্ত অবস্থায় অবস্থান করে, আবার যদি আগুনে পুড়িয়ে ফেলার কারণে এই রক্ত বর্জ্য পরিত্যক্ত বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তাহলে, আরো আরো জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে, আরো আরো বহু রহস্যের দ্বার উদঘাটিত হবে বলে আশা করা যায় এবং হয়তো শীঘ্রই বিস্ময়ের ময়দানের পরিধি আরো বহুগুণে বেড়ে যাবে। আবার দেখুন, রাত ও দিনের আনাগোনা প্রতি মুহূর্তে আমাদের সামনেই সংঘটিত হয়ে চলেছে। আর এই যে জীবন, এটাই বিরাট এক গোপন রহস্য, মানুষ যদি এর ওপরেই একটু চিন্তা করে, তাহলে তার মনে এতো বেশী প্রশ্ন জাগতে শুরু করবে, যার জওয়াব পেতে গিয়ে সে হয়রান হয়ে যাবে, বরং তখন একটি কথা ছাড়া অন্য কোনো জওয়াবই সে খুঁজে পাবে না আর তা হচ্ছে, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন, তিনিই তাঁর নিজ ক্ষমতা বলে দিয়েছেন এ জীবন। তিনি আল্লাহ রব্বুল আলামীন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর কে চালায় এসব ব্যবস্থাপনা?'

অর্থাৎ এই যা কিছু এখানে বর্ণিত হল এ ছাড়াও সৃষ্টির অন্যান্য যে সব অবস্থা বর্তমান রয়েছে এবং মানুষের মধ্যেও অন্য যে সব অবস্থা বিরাজ করছে এসব কিছুকে কে পরিচালনা করছে? কে পরিচালনা করছে বিশ্বজগতের সেই নিয়ম-কানুন যার অধীনে নিজ নিজ (অদৃশ্য) কক্ষপথে পরিভ্রমণরত রয়েছে গ্রহ-নক্ষত্র ও তারকারাজি, আর কে–ইবা পরিচালনা করছে জীবনের এই স্পন্দনকে, যার কারণে জীবজগত গভীর ও অতি সূক্ষ্ম এক নিয়ম মাফিক নিরন্তরভাবে নিজ নিজ কাজ করে চলেছে, আর কে সেই শক্তি, যিনি জগত জোড়া বিশ্ব সমাজের শৃঙ্খলা বিধানে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেন, যাঁর কোনো ভুল হয় না, কখনও কোনো ক্রুটি হয় না, যাঁর শক্তি একক, নাই যার কোনো বিভক্তি, কে সেই শক্তি? এসব প্রশ্নের জওয়াবে তারা বাধ্য হয়ে যে কথাটা বলে ওঠে, তার উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলছেন,

'ওরা শীঘ্রই বলে উঠবে, আল্লাহ'

আসলে ওরা আল্লাহর অস্তিত্বকে কখনই অস্বীকার করে না, আর এই মহা বিশ্ব যে তাঁরই পরিচালনায় চলছে, তাও তারা অস্বীকার করে না, কিন্তু তার প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে কাজটি তারা করে চলেছে তা হচ্ছে তার স্বভাবধর্ম ও তার স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অবাস্তব ও অযৌক্তিক এমন কিছু সে করে চলেছে, যা তার মন মেনে নেয় না। এতদসত্তেও সে আল্লাহর সাথে (তাঁর ক্ষমতায়) অন্য কাউকে শরীক করে নিচ্ছে। এভাবেই সে শেরেক-এর দিকে এগিয়ে চলেছে। এর ফলে তার চেতনা বিগড়ে গেছে এবং বিবেক বিরুদ্ধ কাজ করে চলেছে। আর

এই কারণে তারা এমন সব আইন-কানুন মেনে চলছে, যার কোনো অনুমতি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে বলে তাদের জানা নেই। এরশাদ হচ্ছে,

'অতএব বলে দাও (তাদেরকে) তোমরা কি ভয় করবে না?'

অর্থাৎ ভয় করবে না কি আল্লাহকে, যিনি আকাশ ও পৃথিবী থেকে তোমাদেরকে রেযেক দিচ্ছেন, যিনি কান ও চোখের মালিক, যিনি মৃত থেকে জীবিত প্রাণ বের করেন এবং বের করেন জীবন্ত প্রাণী থেকে মৃতকে, আর যিনি এখানে এবং এর বাইরে সকল কাজের ব্যবস্থাপনা করেন। এসব কিছু যিনি পরিচালনা করেন তিনিই আল্লাহ, তিনিই বরহক (প্রকৃত অর্থে) প্রতিপালকও আইনদাতা, তিনি ছাড়া নেই আর কোনো বাদশাহ– আইনদাতা। তাই বলা হয়েছে,

'অতএব, তিনিই তোমাদের আল্লাহ, তিনিই তোমাদের সত্যিকারের প্রতিপালক, মনিব, মালিক-আইনদাতা-শাসনকর্তা।'

আর সত্য একটিই, বিভিন্ন নয়। আর যে এই সত্য থেকে দূরে সরে যাবে, সে মিথ্যার মধ্যে পড়ে যাবে আর অবশ্যই তার তাকদীর বিগড়ে যাবে। এজন্যই এরশাদ হয়েছে,

'সত্যকে বাদ দিলে থেকে যায় গুমরাহী, তাহলে বলো, কোথায় তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

অর্থাৎ কেমন করে তোমরা সত্য থেকে দূরে সরে গিয়ে অন্যদিকে চলে যাচ্ছো, অথচ তোমরা তোমাদের সামনে সত্যকে সুস্পষ্টরূপে হাযির দেখতে পাচ্ছ!

এভাবে চির ভাস্বর ও স্পষ্ট সত্য থেকে মুখ ফেরানো হয়ে থাকে, যার শুরু মোশরেকরা মেনে নেয় বটে, কিন্তু তার অবশ্যম্ভাবী অশুভ ফল অস্বীকার করে এবং সত্যের দাবী হিসাবে তাদের কর্তব্য পালন করতে এদের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিয়ম ও বিধান দিয়েছেন তারা তা মানে না। তাই চূড়ান্তভাবে এই আচরণের শাস্তি হিসাবে স্থির করে রেখেছেন যে, যারা অন্যায় কাজ করবে এবং মানুষের প্রকৃতিগ্রাহ্য ও স্বাধীন যুক্তিবুদ্ধিকে অস্বীকার করবে এবং অমান্য করবে অতীতে আগত সৃষ্টির নিয়ম-বিধানকে, তারা মোমেন নয়। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যারা গুরুতর অপরাধে জড়িত হয়েছে, তাদের ব্যাপারে তোমার রব-এর ফায়সালা এভাবে চূড়ান্ত হয়ে গেছে যে, তারা মোমেন নয়।'

তাদের সম্পর্কে এ ঘোষণা এজন্য নয় যে, তাদের জন্য তিনি ঈমানের পথকে বন্ধ করে দিয়েছেন, বরং অপরাধজনক কাজ করলে তার ঈমানকে কবুল করা হবে না– গোটা সৃষ্টিজগতের সকল মানুষের জন্যই তাঁর এই স্থায়ী বিধান রয়েছে এবং সবার মন-মগজের স্বাভাবিক বিশ্বাসের অনুভূতির মধ্যে একথাটাকে বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছে, বরং প্রকৃত সত্য এটাই যে, যে পথ ঈমানের দিকে নিয়ে যায় অপরাধজনক কার্যকলাপের সাথে জড়িত থাকার ফলে তারা সে পথ থেকে সরে দাঁড়ায়, তাদের সত্ত্বায় গেথে দেয় ঈমানের প্রথম দাবীগুলোকে অস্বীকার করে, সরিয়ে রাখে তারা নিজেদেরকে সেই সব যুক্তি-প্রমাণ থেকে সরিয়ে রাখা, যা তাদের কাছে সুস্পষ্ট এবং সত্যের যে অনুভূতি ও যুক্তি তাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছে, তাকে নিষ্ক্রিয় ও শক্তিহীন করে ফেলে।

এরপর, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শক্তি-ক্ষমতার বহিপ্রকাশ ঘটেছে যে সব জিনিসের মাধ্যমে, সেগুলোর দিকে মানুষের দৃষ্টিকে ফেরাতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

'বলো, তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে সৃষ্টি করে, এরপর (মৃত্যুর পর) ফিরিয়ে আনে কারো মধ্যে জীবন স্পন্দন .... তাহলে কি হলো তোমাদের, কেমন ধরনের ফায়সালা তোমরা করছো?' (আয়াত ৩৪-৩৫)

ওপরের আয়াতগুলোতে বর্ণিত বিষয়সমূহের ওপরই তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, জিজ্ঞাসা করা হবে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করার প্রশ্নে এবং তাদেরকে সত্য পথ প্রদর্শনের ব্যাপারে– তাদের সামনে শুরু থেকে এমন কোনো দৃশ্য নেই যা দেখে পুনরুত্থান সম্পর্কে স্পষ্টভাবে তারা কিছু বুঝতে পারে। আর না সৃষ্টির প্রথম অবস্থার অনুরূপ এমন কোনো জিনিস তাদের সামনে আছে, যা দেখে তারা তাদের বিশ্বাসকে সুস্থির করে নিতে পারে। বরং তাদের অন্তরের নিকট আল্লাহ তায়ালা সেই বিষয়টিকে তুলে ধরছেন, যার ওপর তারা সেইভাবে বিশ্বাস করতে পারে, যেমন করে জন্মের প্রথম অবস্থাটা তাদের সামনে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে রয়েছে। এই অবস্থাটাই তাদের চিন্তাকে জাগিয়ে দেয় এবং সঠিক পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করে। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছে কোনো জওয়াবের আশা করছেন না। সৃষ্টির প্রথম দিকে তারা যে অসহায় অবস্থায় ছিলো– একথাটা তারা যখন স্বীকার করছে, তখন পরবর্তীতে কি অবস্থা হতে পারে, একটু চিন্তা করলেই তাদের কাছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে– একথা জেনে-বুঝেই তাদেরকে চিন্তা করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'বল, তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে সৃষ্টির কাজটি শুরু করে এবং (মৃত্যু দান করার পর) তাদেরকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম হবে?'

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, তারা মানে যে আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টিজগতকে বাস্তবে এনেছেন, অথচ তিনিই আবার তাদেরকে ফিরিয়ে নেবেন এটা তারা মানতে চায় না, এমনকি তাদের পুনরুত্থান হবে, হাশরের মাঠে একত্রিত হবে, হিসাব-নিকাশ হবে এবং প্রতিদান দেয়া হবে– এসবও তারা মানতে চায় না। কিন্তু অবশ্যই এটা সত্য কথা যে, মহা বিজ্ঞানময় সৃষ্টিকর্তা ও ব্যবস্থাপক আল্লাহর হিকমতের দাবী শুধু এতোটুকুই নয় যে, তিনি তাদের সৃষ্টি করে এমনি এমনিই ছেড়ে দেবেন, তারপর সে যা ইচ্ছা তাই করে যাবে– এ পৃথিবীতেই তাদের জীবনের সমাপ্তি ঘটে এবং তাদের জন্য পূর্ব নির্ধারিত কোনো পূর্ণত্ব আসবে না। তারা কারো প্রতি যে এহসান বা সদ্ব্যবহার করছে, তার পুরস্কার পাবে না বা যে অন্যায় কাজ করছে তার শাস্তি পাবে না এবং তাদের সঠিক পথে চলতে থাকা বা ভালো পথ থেকে সরে যাওয়া– এসব বিষয়ে আল্লাহর কোনো গরজ থাকবে না, তা হতে পারে না। এভাবে মানুষকে যথেচ্ছাচার করার জন্য লাইসেন্স দিয়ে দেয়া, মহা বিজ্ঞানময় এবং সকল বিষয়ের ব্যবস্থাদানকারী আল্লাহ তায়ালার পক্ষে শোভা পায় না। আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে যে সব জরুরী বিষয় আছে, তার মধ্যে আখেরাত-এর বিশ্বাস অন্যতম। সৃষ্টিকর্তার হেকমত (প্রজ্ঞা), তাঁর ব্যবস্থাপনা, তাঁর ইনসাফ ও রহমতের দাবীও এটাই। যারা আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টিকর্তা বলে বিশ্বাস করে, তারা মানে যে, তিনি মৃত থেকে যিন্দা প্রাণী সৃষ্টি করেন– মৃত্যুর পর আর একটি জীবন আছে সন্দেহ-মুক্ত মনে তারা তাও বিশ্বাস করে, যেহেতু তিনি মৃত থেকে যিন্দা প্রাণী বের করেন। তাঁর কাছেই তারা নিজেদেরকে সোর্পদ করেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'বল, আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টি (কাজটা) শুরু করেছেন, তারপর পুনরায় তাদেরকে ফিরিয়ে নেবেন।'

আর এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, তাদের নিকট সত্য সঠিক কথা পূর্বেই জানা ও বুঝার জন্য সকল প্রকার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুর পর আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তনের সত্যটা তারা অস্বীকার করছে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'সুতরাং কোন্ দিকে তারা দিশেহারা হয়ে ফিরছে?'

অর্থাৎ সত্য থেকে বহু দূরে সরে গিয়ে মনগড়া কথা বলছে এবং এভাবে ভুল পথে এগিয়ে চলেছে? এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, আছে কি তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ, যে সত্যের দিকে মানুষকে এগিয়ে দিচ্ছে?'

এ উদ্দেশ্যে কি সে কোনো কেতাব পাঠাচ্ছে, বা কোনো রসূল পাঠাচ্ছে, বা কোনো সংগঠন স্থাপন করছে, বা আইন-কানুন তৈরী করছে, অথবা সতর্ক করছে এবং কোনো কল্যাণের দিকে মানুষকে এগিয়ে দিচ্ছে! সে কি সৃষ্টির বুকে অথবা কোনো মানুষের কাছে আল্লাহ তায়ালার কোনো নিদর্শন ফুটিয়ে তুলছে, জাগিয়ে তুলছে কি তাদের উদাস মনকে, বন্ধ হয়ে যাওয়া কোনো কল্যাণ-প্রচেষ্টাকে চাংগা করে তুলছে কি এবং হে জনগণ, ভেবে দেখো, আল্লাহর রসূল যেমন সত্য-সঠিক ও মংগলময় কাজের দিকে মানুষকে পরিচালনার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই ওয়াদাবদ্ধ ছিলেন এবং এজন্য ওপরে বর্ণিত সকল প্রকার কর্ম-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, এরকম কোনো দায়িত্ব তারা পালন করে চলেছে কি? আর এই বিষয়টাকে পূর্বে কখনও মেনে নেয়া হয়নি। বরং একথাগুলো কতটা সত্য তা ওদের সামনেই রয়েছে। সুতরাং রসূলুল্লাহ (স.) এই যুক্তিপূর্ণ কথাগুলোই তাদের সামনে তুলে ধরছেন এবং এভাবেই তাদেরকে দৃঢ়তার সাথে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'বল, আল্লাহ তায়ালাই মানুষকে সত্য-সঠিক পথ দেখান।'

এ পর্যায়ে এসে নতুন আর একটি সমস্যা দেখা দিচ্ছে, যার জওয়াবও নির্দিষ্ট করা রয়েছে। বলা হচ্ছে,

'যে ব্যক্তি সত্য-সঠিক কথার দিকে মানুষকে এগিয়ে দিচ্ছে, সেই কি অনুসরণ করার জন্য যোগ্যতর ব্যক্তি নয়, না সেই ব্যক্তি বেশী যোগ্য, যে জীবনের পথ-পরিক্রমায় কোনো ভূমিকাই রাখে না, বরং তার নিজেরই প্রয়োজন সঠিক পথের দিশা?'

এর একমাত্র জওয়াব হচ্ছে, যে মানুষকে সত্যের দিকে এগিয়ে দেয়, সে-ই অনুসরণ করার জন্য বেশী যোগ্য– অবশ্যই অনুসরণ ও আনুগত্য লাভের অধিকারী সে-ই বেশী, যে নিজে হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং অপরকেও হেদায়াত লাভের দিকে এগিয়ে দেয়। যে নিজে হেদায়াতপ্রাপ্ত নয় এবং অপরকে সত্য ও কল্যাণের পথে এগিয়ে দেয় না, তার আনুগত্যের দাবী যুক্তিগ্রাহ্য নয়। একথাগুলো ঐ সব বস্তু, ব্যক্তি বা লোকের জন্য প্রযোজ্য নয়, যারা ওদের অন্ধ অনুসরণ পাচ্ছে– এগুলো পাথর হতে পারে, গাছ হতে পারে অথবা তারকারাজিও হতে পারে, আবার তারা মানুষও হতে পারে। এ প্রসংগে ঈসা (আঃ)-এর নাম নেয়া যেতে পারে, মানুষ হওয়ার কারণে তিনি নিজে আল্লাহ তায়ালার হেদায়াতপ্রার্থী। তিনি নিজেও মহান আল্লাহর কাছ থেকেই সৎপথপ্রাপ্তির আকাংখী। প্রতি পদে পদে তাঁর প্রয়োজন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পথ প্রদর্শনা– যদিও তিনি প্রেরিত হয়েছেন মানুষকে হেদায়াতের জন্য (পথ দেখানোর জন্য)।

এছাড়াও ঈসা (আ.)-এর ওপর নীচের কথাটি বেশী প্রযোজ্য।

'কি হলো তোমাদের? কেমন ফায়সালা করছো?'

অর্থাৎ কি হয়েছে তোমাদের এবং কোন্ বিপদ তোমাদেরকে স্পর্শ করেছে? বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তোমাদের কতোটুকু কর্তৃত্ব রয়েছে এবং কিভাবে তোমরা সেগুলোর ওপর কর্তৃত্ব খাটিয়ে থাকো, যার কারণে তোমরা সুস্পষ্ট সত্য ও সত্য পথ প্রদর্শনকারী আল্লাহ তায়ালার বাণীকে অস্বীকার করছ?

অতপর ওদের কাছে যখন এসব প্রশ্ন রাখা শেষ হলো, ওদের থেকে জওয়াবও নেয়া হলো এবং সে জওয়াবের অকাট্যতা ও সত্যতা চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়ে গেলো, তখন নিরুপায় হয়ে বাধ্য হলো তারা সর্বজন স্বীকৃত সত্যের কাছে মাথা নত করতে এবং এই সময়েই তাদের কাছে এমন কিছু বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরা হলো যা তাদের চিন্তা রাজ্যে বিপ্লব আনলো, যার থেকে তারা অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার যোগ্য হয়ে গেলো, বলিষ্ঠতা অর্জন করলো সত্যকে নির্দ্বিধায় মেনে নেয়ার, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে এবং তার ফলে তাদের অন্তরে গভীর বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠলো। তাদের জীবনে এমন বিপ্লব সৃষ্টি হলো, যা তাদের বাপ-দাদাদের আমল থেকে গড়ে ওঠা বিশ্বাস, ধারণা-কল্পনা, প্রচলিত এবাদাতের নিয়ম-প্রথা, বিচার-ফায়সালার পদ্ধতি, সব কিছু ভেংগে-চুরে খানখান করে দিলো। আসলে এ পর্যন্ত তারা নিজ নিজ বুদ্ধি ও স্বভাবগত ভাবাবেগে পরিচালিত হয়ে অথবা ধারণা-কল্পনার বশবর্তী হয়ে এবাদাতের নামে অনেক কাজ করেছে, গান-বাজনা ও আমোদ-ফুর্তিতে মেতে থেকেছে, যা সত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোনো কাজে আসতে পারে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'ওদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ শুধু ধারণা-কল্পনারই অনুসরণ করে। নিশ্চয়ই সত্য প্রতিষ্ঠায় ধারণা-কল্পনা কোনো কাজে লাগে না। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা জানেন সেই সব বিষয়ে যা ওরা করে চলেছে।'

ওরা তো মনে করে যে, আল্লাহর কোনো অংশীদার আছে, যারা তাঁর ক্ষমতা ব্যবহার করে ...... কিন্তু এ বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে তারা মোটেই পর্যালোচনা করে দেখে না বা এ ধারণার যথার্থতা সম্পর্কে বুদ্ধি প্রয়োগ করে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করে না। ওরা শুধু এতোটুকু ধারণা করেই ক্ষান্ত হতে চায় যে, ঐ সব দেব-দেবতা এবাদাত পাওয়ার যোগ্য যদি নাই হতো, তাহলে কিছুতেই তাদেরকে তারা এবং তাদের বাপ-দাদারা পূজা করতো না। এ অলীক ধারণার যৌক্তিকতা সম্পর্কে তারা কোনো পরীক্ষা করতেও রাযী নয়। এ বিষয়ের সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে এবং কল্পনার দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নিজেদের বুদ্ধিকেও প্রয়োগ করতে চায় না। তারা মনে করে, তাদের মতোই কোনো মানুষের কাছে ওহী নাযিল হয় না এবং কোনো ক্রমেই নাযিল হওয়া সম্ভব নয়। এটা চিন্তা করে দেখে না। 'আল্লাহর পক্ষে এটা সম্ভব নয়' বলে কেন তারা মনে করছে! অপরদিকে তারা মনে করছে যে, আল কোরআন মোহাম্মদ-এর তৈরী করা একটি কেতাব। অথচ এটা ভেবে দেখে না যে, মোহাম্মদও একজন মানুষ। তাঁর পক্ষে যদি এমন একখানা গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব হয়ে থাকে, তাহলে তারাও তো তাঁরই মতো মানুষ। তাহলে তারাও কেন অনুরূপ কোনো গ্রন্থ রচনা করতে পারে না? এভাবেই তারা নিছক মিথ্যা ও অসার ধারণা-কল্পনার মধ্যেই মশগুল হয়ে থাকতে চায়, যা সত্য নিরূপণ করার ব্যাপারে কিছু মাত্র সাহায্য করতে পারে না। আর একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সেই সত্ত্বা যিনি নিশ্চিত জ্ঞানের অধিকারী, তিনি তাদের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা, তাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত।'

আল কোরআনের মিশন

তাদের এসব কদর্য ব্যবহার ও কাজগুলোকে ভাগ ভাগ করে প্রত্যেকটার পৃথক পৃথক সমালোচনা করা হচ্ছে– এ ক্ষেত্রে আল কোরআন নতুন এক আংগিকে এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলছে যে, যদি এ পবিত্র গ্রন্থ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে রচনা করা সম্ভব হতো, তাহলে তারাও অনুরূপ কোনো গ্রন্থ কেন তৈরী করে না? একথা বলে তাদেরকে চ্যালে

করা হয়েছে যে, তারা এই গ্রন্থের মতোই সর্বপ্রকার বৈশিষ্টে ভরা আর একটা গ্রন্থ নিয়ে আসুক, আর যদি পূর্ণাংগ একটি গ্রন্থ আনতে তারা না-ই পারে, তাহলে অন্তত আল কোরআনের সূরাগুলোর মতোই একটা সূরা তৈরী করে আনুক। আর যতোক্ষণ আল কোরআনের মাহাত্ম্য তারা নিশ্চিতভাবে জানতে পারেনি বা তার ফায়সালার তাৎপর্য সম্পর্কে বুঝতে পারেনি, ততক্ষণ দ্বিগুণ তৎপরতা চালিয়েছে এ পাক কালামের বিরোধিতায় এবং আল কোরআনের মোকাবেলায় নিজেদের অবস্থা সুসংহত করার জন্য ততোধিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। অপরদিকে, তারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর ডাকে সাড়া দিক আর নাই দিক আল কোরআন রসূলুল্লাহ (স.)-কে তাঁর কাজে মযবুত করে রাখার দায়িত্ব পালন করেছে এবং পাশাপাশি ভ্রান্ত দলটি থেকে হতাশ হতেও দেয়নি। বরং ইংগিতে সেই একই স্থানে সবাইকে ফিরে যাওয়ার কথা জানিয়েছে, যেখানে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সামান্যতম কোনো যুলুমও করবেন না বরং তাদের প্রত্যেকের যতোটা পাওনা তাকে ততোটাই দেবেন, তবে এটাও সত্য, যে ভুলের মধ্যে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে জীবন কাটিয়েছে তার মন্দ পরিণতি অবশ্যই তাদেরকে ভোগ করতে হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'না, কখনোই আল কোরআন আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো রচিত কেতাব এটা নয় .... বরং অধিকাংশ মানুষ নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করে চলেছে। (আয়াত ৩৭-৪৪)

'মহাগ্রন্থ এ কোরআন, আল্লাহ ছাড়া আর কারো রচিত মনগড়া কেতাব নয়।'

এ পাক কালাম তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট নিয়ে এক অন্যে গ্রন্থ, বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে যেমন, তেমনি বাস্তব-মুখী নানা প্রকার ব্যাখ্যার দিক দিয়েও। এ কেতাবের মধ্যে যে আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে পূর্ণাংগতা। এই পরিপূর্ণতা সেই মানব সংগঠনের মধ্যে পরিলক্ষিত হবে যারা এই বিশ্বাস গ্রহণ করেছে। এ কেতাবের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্বের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তাও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, মানব-প্রকৃতির যে ছবি আঁকা হয়েছে, জীবনের প্রকৃতি সম্পর্কে যে বর্ণনা পেশ করা হয়েছে এবং সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে যেসব তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে সবই অপূর্ব। এমন চমৎকার উপস্থাপনা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া, অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ যে ক্ষমতা ও যোগ্যতা দ্বারা এসব চিত্র ফুটিয়ে তোলা যায় এবং যে সব তথ্য এ কেতাব থেকে পাওয়া যায়, তার জন্য যে শক্তি-ক্ষমতা, যোগ্যতা-অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন, তা একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আছে, অন্য কারো পক্ষে এসব গুণাবলী আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। তাঁর এ কুদরত চিরদিন আছে, চিরদিন থাকবে— শুরু ও শেষ সবই তাঁরই হাতে, প্রকাশ্য ও গোপন সবই তাঁর নখদর্পণে। আর একমাত্র তিনিই মানুষের জন্য নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত চলার পথ রচনা করেন, যার মধ্যে থাকে না কোনো অজ্ঞতা ও অপূর্ণতা।

'আল্লাহ ছাড়া এ কোরআনে করীম আর কারো মন থেকে বেরিয়ে আসা গ্রন্থ হতে পারে না।' অর্থাৎ এ কেতাবের বৈশিষ্ট এতোই মহান ও উচ্চাংগের যে, ইচ্ছা করলেই এমন মহীয়ান কেতাব কেউ তৈরী করতে পারে না। মানুষ নিজের থেকে তৈরী করে অনেক কথা বলে সত্য এবং এ ধরনের আশ্চর্যজনক বহু কথা তার জন্য যে একেবারেই অসম্ভব তাও বলা যায় না, কিন্তু তবু এটাও সত্য যে, অবিকল আল কোরআনের মতোই কোনো কেতাব বানানো মানুষের পক্ষে কশ্মিনকালেও সম্ভব নয়।

'বরং, এ পাক কেতাব সত্যতার সাক্ষ্য দেয় সেই সব কেতাবের, যা তার সামনে রয়েছে।' অর্থাৎ যে সব কেতাব পূর্ববর্তী নবীদের কাছে এসেছিলো এবং এখনও (পরিবর্তিত হলেও)

আসমানী কেতাব রূপে বর্তমান রয়েছে– মানুষও সেগুলোকে আল্লাহর প্রেরিত কেতাব বলেই জানে– সেই সব কেতাবের মধ্যে যে মূল বিশ্বাসের কথাগুলো পরিবেশিত আছে, সেগুলোকে আল কোরআন সত্যায়িত করে, সত্যায়িত করে সকল আসমানী কেতাবের মধ্যে লিখিত জনকল্যাণকর দাওয়াত ও উপদেশবাণীকে।

'(রয়েছে এ কেতাবের মধ্যে) পূর্বেকার কেতাবসমূহের বিশদ বিবরণ ও বিশ্লেষণ'

'যেসব কেতাব নিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল রসূল এসেছেন তাঁরা সবাই একই দাওয়াতে নিয়ে এসেছেন, অর্থাৎ সকল নবী রসূল একই শিক্ষা ও সেই শিক্ষা দানকারী একই মিশন নিয়ে এসেছেন। সেগুলোর মূল শিক্ষা ছিলো একই, কিন্তু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে শরয়ী হুকুম আহকামে সামান্য কিছু পার্থক্য হয়তো থেকেছে। আর এই আল কোরআন সেই মূল কেতাবের ব্যাখ্যাই পেশ করছে (শেষ বারের মতো) এবং স্পষ্ট করে সেই সব কল্যাণের উপায় উপকরণ সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছে যা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলো যুগে যুগে ওই মূল কেতাব, বলে দিচ্ছে সেই পথের দিশা, যার দ্বারা সেই মূল কেতাবের সত্যতা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। সে কেতাবের মূল কথা হচ্ছে, এক আল্লাহ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাস পয়দা করা যে, তিনিই সারা জাহানের বাদশাহ, অনাদি অনন্ত কাল থেকে তিনি আছেন এবং চিরদিন তিনি থাকবেন। যাঁর লয় নাই ক্ষয় নাই সকল, শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই হাতে কেন্দ্রীভূত। তাঁর ইচ্ছাকে পরিবর্তন করার সাধ্য কারো নেই। আর ওই মূল কেতাবের দ্বিতীয় শিক্ষা হচ্ছে, মানুষকে একমাত্র সেই সরল সঠিক পথের দিকে আহ্বান জানানো, যার মধ্যে রয়েছে সর্বাধিক শান্তি ও কল্যাণ। তবে সেই কল্যাণ কি ভাবে আসবে তা চূড়ান্ত ও নিখুঁতভাবে এবং শেষ বারের মতো আল কোরআনের মধ্যে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এই বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে রয়েছে মানুষের গোটা জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল আইন কানুন, যার মাধ্যমে প্রত্যেক যামানায় মানুষের সর্বাধিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধিত হয়েছে। আর এভাবে আসে মানবতার কাংখিত অগ্রগতি। এ পাক কালাম আল কোরআনের কর্ম– পদ্ধতি হচ্ছে, মানুষ যখন বয়োপ্রাপ্ত হয় (তার জ্ঞান বুদ্ধি পরিপক্ক হয়) তখনই তাকে সম্বোধন করে তার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। তাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য ও যুক্তিপূর্ণ কথা দ্বারা জানিয়ে দেয়া হয় তার জন্যে সঠিক পথ কোনটা। তাকে এমন কোনো অলৌকিক বা অস্বাভাবিক কাজের নির্দেশ দেয়া হয় না, যা মানুষের বিবেক বুদ্ধিতে ধরে না অথবা যা তার কল্পনার অতীত। এরশাদ হচ্ছে,

'এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই, এসেছে এ কোরআন বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের কাছ থেকে।'

এই আয়াতাংশে চূড়ান্তভাবে এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল কোরআন কোনো মানুষের রচনা হতে পারে না। কারণ সারা বিশ্বের মালিক যা দিয়েছেন তা দেয়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়, যেহেতু 'জগতসমূহের মালিকের পক্ষ থেকেই এ মহাগ্রন্থের অবতরণ।'

'ওরা কি বলে যে, তিনি (মোহাম্মদ) নিজের মন থেকে তৈরী করে বলছেন এ কোরআন?'

এ মহাগ্রন্থ কোনো মানুষের দ্বারা রচিত হওয়া সম্ভব নয়-একথা জানানোর পর এটা ব্যক্তি মোহাম্মদের নিজ কীর্তি বলে মেনে নেয়া কি করে সম্ভব? আবদুল্লাহর ছেলে মোহাম্মাদ তো অন্যান্য মানুষের মতোই একজন মানুষ। তিনি সেই ভাষায় কথা বলেন, যে ভাষায় ওরা কথা বলে। ওরা যা জানে, তিনি তাই জানেন। ওরা যে হরফগুলো চেনে তিনি তো তার থেকে বেশী কিছুর অধিকারী নন। 'অলিফ-লাম-রা, আলিফ-লাম-মীম– সোয়াদ..... ইত্যাদি। এগুলো ছাড়া আরো

যে সব হরফ আছে সেগুলোসহ অন্যান্য যেসব শব্দ সমষ্টি আছে, সেগুলোকে কে একত্রিত করতে পারে? ঠিক আছে, ওরা যদি পারে বানিয়ে আনুক না ওইসব কথা যা মোহাম্মদ (ওদের ধারণা মতে) বানিয়েছে। পুরো কোরআন নয়, অন্তত একটা সূরাই বানিয়ে আনুক না! এই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে গিয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, পারলে এই রকমেরই একটি সূরা নিয়ে এসো, আর এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য যাদেরকে সাহায্যের জন্যে ডাকতে পারো ডাকো, যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হয়ে থাকো।'

আর অবশ্যই এই চ্যালেঞ্জের যথার্থতা প্রমাণিত হয়ে গেছে, আর প্রমাণিত হয়েছে কাফেরদের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার অক্ষমতাও। রসূলুল্লাহ (স.) বরাবরই তাঁর কাজে দৃঢ় অবস্থানে ছিলেন।

আর যারা এ ভাষার চমৎকারিত্ব অনুভব করবে, এর মধুর স্বাদ পাবে এবং এর মাধ্যমে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু ও প্রাসংগিক আলোচনার সংস্পর্শে আসবে, তারা অবশ্যই একথা বুঝবে যে, এমন ভারসাম্যপূর্ণ কথা কোনো মানুষের হতে পারে না। আর এভাবে যারা এ গ্রন্থের মধ্যে বর্ণিত আইন কানুন সম্পর্কিত মূলনীতিগুলো পাঠ করবে, পাঠ করবে সেই নিয়ম শৃংখলার কথা, যা নিয়ে আল কোরআন নাযিল হয়েছে, তারা দেখতে পাবে এর মধ্যে রয়েছে মানব জাতির জন্যে শান্তি ও মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত একটি সুস্থ ও সুন্দর সংগঠন তৈরী করার রূপরেখা এবং মানব জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল কিছু লাভ করার পূর্ণাংগ দিক নির্দেশনা। তারা এ পাক কালামের মধ্যে দেখতে পাবে জীবনের সকল সমস্যার সুন্দরতম সমাধান। সেখানে এত সুন্দরভাবে সে সব সমাধান পেশ করা হয়েছে, যা ব্যক্তিগতভাবে কোনো মানুষের কল্পনায় তো আসতে পারেই না, বরং সকল যামানার সমুদয় মানুষ একত্রিত হয়েও অনুরূপ সমাধান দিতে পারে না। আর যারা মানব জীবন নিয়ে গবেষণা করে এবং গবেষণা করে সেসব বিষয় ও উপকরণ নিয়ে, যা মানব জীবনের ওপর কার্যকর প্রভাব ফেলে এবং বাস্তব জীবনে তাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করে এবং বারবার আল কোরআনে প্রদত্ত উপায় উপকরণের দিকে তাকায়, জেনে নেয় তার মধ্যে বর্ণিত পরমোন্নত পদ্ধতি ও তার প্রাপ্তি সূত্র সম্পর্কে এবং গভীরভাবে অধ্যয়ন করে এ মহাগ্রন্থের প্রতিটি ছত্র, তখন তারা এর মধুর বর্ণনাশৈলী প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ হয়ে যায়।

আল কোরআনের বৈশিষ্ট্য ও চমৎকারিত্ব শুধু এর মধ্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীর কারণেই নয়, এর ব্যাখ্যা ও প্রকাশভংগির সৌন্দর্যের কারণেও নয়, বরং এ পাক কালামের মাধ্যমে যে সব ঘোষণা দেয়া হয়েছে, যে শৃংখলাপূর্ণ জীবনের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে, গোটা মানব জীবনের সুখ শান্তি ও সংহতির জন্যে যে আইন কানুন দেয়া হয়েছে এবং মানুষের মধ্যে দয়া মায়া মমতা ও দরদ সৃষ্টি করার জন্যে যে মন মানসিকতা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে, তারই জন্যে ....।

আর যারা এ পাক কালামের তাফসীর করার গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং যাদের মধ্যে তাফসীর করার যোগ্যতা ও অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে, তাঁরা সাধারণ মানুষের তুলনায় আল কোরআনের মধ্যে বহু নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান পেয়ে থাকেন। আর যাঁরা সামাজিক জীবন ও তার শৃংখলা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন, মানব জীবনের আইন-কানুন ও মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা করেন, চিন্তা করেন জীবনকে সুন্দর ও সুশৃংখল বানানোর পদ্ধতি সম্পর্কে, তারাও অন্য যে কোনো গ্রন্থের তুলনায় আল কোরআনের মধ্যে দেখতে পান অনেক অনেক বেশী স্বচ্ছ ও সন্দেহমুক্ত দিক নির্দেশনা।

আল কোরআনের সম্মোহনী শক্তি

পবিত্র এ কালামের বিস্ময়কর ক্ষমতার পেছনে কি রহস্য লুকিয়ে আছে এবং তা কতো অধিক তার বর্ণনা দেয়ার পূর্বে এতোটুকু আরয করতে চাই যে, আমরা যাই বলি না কেন এবং যতোভাবেই তা প্রকাশ করার চেষ্টা করি না কেন, প্রকৃতপক্ষে এটাই সত্য কথা যে, আমরা তার পূর্ণাংগ বর্ণনা দিতে সম্পূর্ণ অপারগ– অক্ষম। এর সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত কিছু বলতে গেলেও তা অনুসরণ করে বলতে হবে, যেহেতু মহান আল্লাহ তায়ালা যেমন অসীম, তাঁর বাণীও সেভাবে অতুলনীয় এবং সে বাণীর মূল্যায়ন করাও মানুষের সাধ্যের বাইরে। এ এক অনন্য ও স্বতন্ত্র গ্রন্থ, যার বিষয়বস্তুর পরিমাপ করা যায় না। সুতরাং, আমরা গভীর আগ্রহ নিয়ে এই মহাগ্রন্থ সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করে যাচ্ছি, এর অতল তলে পৌঁছুতে পারা কোনো দিন সম্ভব হবে না।

আল কোরআনের ভূমিকা মানুষের যে কোনো ভূমিকার উর্ধে। মানুষের হৃদয়ে এর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা অতুলনীয়, যা কোনো মানুষ কোনো দিন কল্পনাও করতে পারবে না। এমনকি যারা আরবী একটি হরফও বুঝে না, তাদের সামনে এর তেলাওয়াত করার সাথে সাথে তাদের অন্তরেও গভীর রেখাপাত হয়। এ পাক কালাম সম্পর্কে আরো কিছু আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে, যার ব্যাখ্যা কিছুতেই কলম কিংবা কথা দিয়ে দেয়া যায় না। যদিও ঘটনাটার প্রতিপাদ্য বিষয়কে কোনো মূলনীতি মনে করি না। কিন্তু এঘটনার কিছু ব্যাখ্যা ও যুক্তি দেয়া প্রয়োজন...... অন্যদের জন্যে যে সব উদাহরণ দান করা হয়েছে, আমি কিছুতেই সেগুলো তুলে ধরবো না, বরং আমার জীবনে সংঘটিত এক সত্য ঘটনা আমি পেশ করছি, যে ঘটনার সাক্ষী আমার সাথে আরো ছয় ব্যক্তি বর্তমান আছে। এ ঘটনাটা প্রায় পনের বছর পূর্বে ঘটেছিলো.......

আমি আমার ছয় জন মুসলিম সাথীকে নিয়ে মিসরের এক জাহাজে করে আটলান্টিক মহাসাগরের বুক চিরে নিউ ইয়র্কের দিকে যাচ্ছিলাম। এ জাহাজে আরো এক শত বিশজন পুরুষ ও মহিলা যাত্রী ছিলো, যাদের মধ্যে একজনও মুসলমান ছিলো না। হঠাৎ করে আমাদের মনে জাগলো, সমুদ্রের বুকে জাহাজের ওপর আমরা জুময়ার নামাযটা আদায় করে নিই। আর আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন, সমুদ্রের বুকে নামায কায়েম করার এ ইচ্ছা একটা দ্বীনী আবেগ ছাড়া অন্য কিছুই ছিলো না। এ চিন্তা আমাদের কাছে যেন এক অকল্পনীয় আনন্দ বয়ে আনছিলো।...... জাহাজের কাপ্তান ছিলো একজন ইংরেজ। আমাদের ইচ্ছা বাস্তবায়িত করা সহজ করে দিলো, অর্থাৎ জুময়ার জামায়াতের যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করে দিলো। আর নাবিক, পাচক ও শ্রমিক-কর্মচারীরা, যারা মুসলমান ছিলো, তাদের সবাইকেও নামাযের জন্যে কাপ্তান অনুমতি দিয়ে দিলো। শুধুমাত্র যারা ঠিক নামাযের সময়ে জরুরী কাজে ব্যস্ত ছিলো, তারা বাদে বাকি সবাই নামাযে যোগ দেয়ার সুযোগ পেলো, যার কারণে তারা সবাই খুবই খুশী হয়ে গিয়েছিলো। মহাসাগরের বুকে জাহাজের ওপর জুময়ার নামাযের ব্যবস্থা আমার জানা মতে এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হলো। আর আমি নিজে এই জুময়ায় খুতবা দিলাম এবং নামাযের ইমামতিও করলাম। অচেনা অজানা যাত্রীরা অপলক নেত্রে দেখছিলো নামাযের এ মহিমাময় দৃশ্য, আর ওদের মধ্যে যারা গণ্যমান্য ছিলো, তারা আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে থেকে মুগ্ধ নয়নে এ মহান দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিলো। ...... আর নামায বাদ ওদের মধ্যে অনেকেই আমাদের কাছে এসে সুললিত কণ্ঠে উচ্চারিত আল কোরআনের মধুর সুরধ্বনির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলো!!! আমাদের নামাযের কিছুই তারা বুঝেনি। তাতেই তাদের তাদের মন গলে গিয়েছিলো।

কিন্তু ওইসব যাত্রীর নেত্রী– যার সম্পর্কে পরে আমরা জানতে পেরেছিলাম, তিনি যুগাশ্লাভিয়ার অধিবাসী ছিলেন এবং মার্শাল টিটোর নেতৃত্বাধীন সেখানকার সমাজতন্ত্রের জাহান্নাম থেকে তিনি

পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি নামাযের মধ্যে পঠিত কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত শুনে ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন এবং ভাবাবেগে এতটা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে, দরদবিগলিত ধারায় তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো। তিনি তাঁর অন্তরের গভীর আবেগ ঢেকে রাখতে পারছিলেন না। তিনি এগিয়ে এসে আমাদের হাত চেপে ধরে ভাংগা ভাংগা ইংরেজীতে বলে উঠলেন, তিনি আমাদের নামাযের যে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখেছেন, এর মধ্যে যে বিনয়াবনত ভাব লক্ষ্য করেছেন এবং মুসল্লীদের মধ্যে আল্লাহর দরবারে আত্মনিবেদনের যে হৃদয়াবেগ ফুটে উঠেছে, তাতে তিনি লক্ষ্য করেছেন এ নামাযে রয়েছে এক অচিন্তনীয় প্রাণপ্রবাহ রয়েছে। এতে তিনি এতো বেশী প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন, যা তিনি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছেন না......., যে ভাষায়ই 'তোমাদের ইমাম সাহেবের' কথাগুলো ব্যক্ত হয়ে থাকুক না কেন, তার মধ্যে নামাযের সময়ে এমন কাকুতি-মিনতি প্রকাশ পাচ্ছিলো, যাতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছিলো যে, তিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ দরবেশ এবং অত্যন্ত উঁচুমানের ব্যক্তি। অথবা খুবই উচু পর্যায়ের মহা সম্মানিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি– যেটা খৃষ্টীয় গীর্জার কোনো কোনো পোপের মধ্যে দেখা গেছে। আমরাও বললাম, অবশ্যই তিনি ঠিকই বুঝেছেন এবং আল্লাহমুখী জীবনের মর্মস্পর্শী আবেগ তিনি সত্যিই অনুভব করেছেন। তখন তিনি বললেন, 'যে ভাষায় নামাযের মধ্যে কথাগুলো পাঠ করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে এমন মনোমুগ্ধকর সুরের মূর্ছনা, এমন অদ্ভুত আবেগ যা হৃদয়কে পাগল করে তোলে যদিও আমি তার একটা অক্ষরও বুঝতে পারিনি।'

তাঁর বক্তব্যে যে বিস্ময়কর সত্যটা ফুটে উঠতে আমরা দেখলাম, তা প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর ভাষায়- 'কিন্তু এটাই সেই আসল বিষয় নয়, যা (জানার জন্যে) আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই।..... যে বিষয়টা আমার হৃদয়াবেগকে নাড়া দিয়েছে তা হচ্ছে, ইমাম সাহেবের কথার মধ্যে কিছু অংশ বড়ই মিষ্ট মধুর সুরে বারবার পড়ছিলেন, যে অংশটা অন্য অংশগুলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও এক অতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধ্যায়, যা হৃদয়ের মধ্যে ভীষণ কম্পন সৃষ্টি করছিলো, শিরা উপশিরাগুলো যেন থরথর করে কেঁপে উঠছিলো। মনে হচ্ছিলো, অন্যান্য কথা থেকে স্বতন্ত্র এ অন্য এক জিনিস। মনে হচ্ছিলো ইমাম সাহেবের হৃদয় যেন ভাবের আবেগে ভরপুর হয়ে রয়েছে এবং তাঁর সুরের লহরীতে স্পন্দিত হচ্ছে উচ্ছল প্রাণপ্রবাহ, যা সর্বতোভাবে একথারই সন্ধান দিচ্ছে যে, তিনি নিজেকে নিশেষে বিলিয়ে দিচ্ছেন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে। ভদ্র মহিলার এসব কথা শুনে আমরা একটু চিন্তা করলাম, তখন অনুভব করলাম, যে কথাগুলো তার অন্তরকে এতো গভীরভাবে আন্দোলিত করেছে তা হচ্ছে খুতবা ও নামাযের মধ্যে উচ্চারিত পাক কালামের মুক্তাঝরা বাণীসমূহ। কিন্তু আমাদের কাছে এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় ছিলো যে আমাদের যে কথাগুলো তাঁর হৃদয়কে এমনভাবে নাড়া দিলো, তার একটা হরফও তো তিনি বুঝেননি।

আল্লাহর কালাম পড়লে এমন হতেই হবে এবং সবার মধ্যেই এমন আবেগ আসতেই হবে এমন কোনো ধরা বাঁধা কথা নেই। তবে সেদিন যা ঘটেছিলো শুধু সেই অবস্থাটাই এখানে তুলে ধরলাম। তবে অবশ্যই এটা সত্য কথা যে,, এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ ঘটনা জানায় যে এ কোরআন-এর মধ্যে উপস্থাপিত আর একটা বিশেষ রহস্য হচ্ছে, শুধুমাত্র তেলাওয়াত করলেও কোনো কোনো হৃদয় গভীরভাবে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। হতে পারে, এই মহীয়সী নারীর নিজ ধর্মের প্রতি যে গভীর বিশ্বাস ছিলো, তার উৎস আল্লাহর কেতাব হওয়ার কারণে সেই বিশ্বাস তাকে নিজ দেশে বর্তমান সমাজতন্ত্রের জাহান্নাম থেকে পালিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। সেই আল্লাহপ্রেমিক মানুষটার হৃদয় আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার বাণীর পরশে এমন আশ্চর্যভাবে

উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলো..... কিন্তু হায়, কি হলো আমাদের, ভাবতে কষ্ট হয়, আমাদের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ এ মহান কেতাবের বাণী প্রতিদিনই পড়ছে ও শুনছে, কিন্তু তাদের হৃদয়ে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখা যায় না এবং তাদের বুদ্ধিতেও কোনো সাড়া জাগে না। কিন্তু দেখুন, ভিন ধর্মের ওই লোকদের অন্তরে কেমন করে এ পবিত্র কালাম সাড়া জাগালো, কীভাবে এর রহস্যভরা বাণীর ঝংকার তাদের হৃদয়তন্ত্রীতে কম্পন সৃষ্টি করলো, অথচ তারা এই মহান কেতাবের মধ্যে বর্ণিত জ্ঞানগর্ভ কথাগুলো ওদের থেকে যে বেশী বুঝে ছিলো তাও তো নয়। বিশেষ করে ওই যুগোশ্লাভিয়া থেকে পলাতক সত্যানুসন্ধিৎসু ওই নারী তো আল কোরআনের একটা শব্দও বুঝেননি। কিন্তু তবু কেন তাকে পাক কালামের সুরধ্বনি এমনভাবে পাগলপারা করে তুললো !!!

অবশ্য আমি চেয়েছিলাম আল কোরআনের এই অদ্ভুত গোপন শক্তিটার কথা বলতে, যারা এ মহা বিস্ময়কর গ্রন্থের তাফসীর করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং এ গ্রন্থের ওপর সচেতনভাবে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের থেকে ও অন্য যারা আল কোরআনের মোজেযা অনুভব করেছে, এ কেতাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চিনতে ও জানতে পেরেছে, তাদের প্রসংগ তোলার আগেই এ পাক কালামের শক্তি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও প্রমাণ থেকে আল কোরআনের অলৌকিকতার যে নযীর পাওয়া যায় তা এতোই আশ্চর্যজনক যে, মানুষের পক্ষে যুক্তি দিয়ে তার ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি কথার অর্থ যেমন ব্যাপক, তেমনি গভীর তার ব্যাখ্যা, আর তেমনি মনের ওপর তা প্রভাবশীলও বটে। আল কোরআনের ভাষা, অর্থ, বাস্তবতা, পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে পারস্পরিক যে সম্পর্ক বিদ্যমান, তার দিকে তাকালে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। এরপর রয়েছে বর্ণনাভংগি ও বর্ণনা পরম্পরার সৌন্দর্য। আরও রয়েছে শব্দ বিন্যাসের মাধুর্য। অর্থাৎ প্রতি শব্দ নিজ নিজ স্থানে এক বিশেষ পরিমাপ মতো সুবিন্যস্ত, যার কোনো একটির হেরফের হলে তার অর্থ, সৌন্দর্য সব কিছুই বিগড়ে যাবে। এই সব বিবেচনায় দেখা যায়, এমন ভারসাম্যপূর্ণ ভাবে সব কিছু নিজ নিজ জায়গায় স্থাপন করে মূল উদ্দেশ্যের দিকে মানুষকে টেনে নেয়ার এ মহা কৌশল। এটা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়– মানুষের সকল শক্তি, চেষ্টা যত্ন, কর্ম কুশলতা সব কিছু এ মহাগ্রন্থের কাছে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে।(১)

আল কোরআনের এ বলিষ্ঠ বৈশিষ্ট্য জানার পর আমাদের কাছে এ মহাগ্রন্থের আর একটা অত্যুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে...... তা হচ্ছে, এর এক একটা আয়াত বিভিন্নভাবে একাধিক বিষয় সম্পর্কে জানায় এবং এর প্রত্যেকটা কথাই নিসন্দেহে প্রমাণিত সত্য হিসাবে পাঠকের সামনে ফুটে ওঠে, যার মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এর প্রত্যেকটা বিষয় এবং প্রত্যেকটা তথ্য উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত স্থানে পরিবেশিত হয়েছে বলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, দেখা যায়। এক একটা আয়াতের মাধ্যমে বহু বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং প্রতি বারেই বুঝা যায় কোরআনের মধ্যে বর্ণিত প্রত্যেকটা কথাকে সেই বিষয়ের ওপর যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, যে বিষয়কে কেন্দ্র করে উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে। মনে হয় যেন, ওই কথাটাকে কখন এবং কোথায় প্রয়োগ করতে হবে, তা সৃষ্টির প্রথম থেকেই নির্ধারিত হয়েছিলো। আর কোরআনের বিষয়টা এতোই স্পষ্ট যে, এদিকে ইশারা করার অধিক আর কিছু বলার প্রয়োজন হয় না (যদিও এ সূরার মধ্যে বর্ণিত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকালে পাঠক দেখতে পায় এক একটা আয়াতে

(১) 'আত্তাসবীরুল ফান্নি ফিল কোরআন' নামক কেতাবে এ বিষয়ের ওপর আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অতি সূক্ষ্ম আলোচনা এবং বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা। আর প্রতিবারেই দেখা যাবে আয়াতটি মানুষকে ঐকান্তিকভাবে এবং পূর্ণাংগভাবে সত্যের দিকেই আহ্বান জানিয়ে চলেছে। তবে এসব কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ পাকের আয়াতগুলোর মধ্যে যে ব্যাপকতা রয়েছে, তা বিভিন্ন উদাহরণ দ্বারা তা বুঝানোর প্রক্রিয়া পেশ করা মাত্র।

আল কোরআনের বর্ণনার মধ্যে এভাবে দেখা যায় প্রতিটা কথার গাঁথুনিতে রয়েছে বিভিন্ন দৃশ্যাবলীকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার এক মহাশক্তি এবং রয়েছে এমন হৃদয়গ্রাহী অভিব্যক্তি, যেন মনে হয় দৃশ্যটি চোখের সামনে ভাসছে। এতো সুন্দরভাবে এসব বিষয়কে পেশ করা হয়েছে, যা কোনোভাবেই কোনো মানুষের ভাষায় আশা করা যায় না এবং কোনো মানুষও কোনো ভাবেই এই পদ্ধতির অনুসরণ করতেও সক্ষম নয়। কারণ আল কোরআনের অনুসরণে যা কিছু তারা লিখতে চাইবে, সেখানে ভাষা, পদ্ধতি, তথ্য ও বর্ণনাভংগি সব দিক দিয়েই তারা অবশ্যই ব্যর্থতার পরিচয় দেবে এবং অবশেষে তারা হয়রান পেরেশান হয়ে খেই হারিয়ে ফেলবে। আর কী করেই বা মানুষ মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কেতাবের পদ্ধতির হুবহু অনুসরণ করতে পারে? যেমন নীচের আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে,

'আর আমি বনী ইসরাঈল জাতিকে সমুদ্র পার করে নিলাম, তারপর ফেরাউন ও তার লোক লশকর তার অনুসরণ করলো....... এবং সে বললো, আমি মুসলমানদের একজন।'..... আর এ পর্যন্তই ওই কাহিনীর বর্ণনা এসেছে। তারপর দেখুন, ফেরাউনকে সরাসরি সম্বোধন করে আল্লাহ তায়ালা কঠোরভাবে বলছেন.......' এখন ঈমান আনছো? অথচ এর পূর্বে তুমি আমার চরম অবাধ্যচারীতা করেছিলে (ঈমানকে) এবং তুমি ফাসাদ সৃষ্টিকারীই হয়ে রয়ে গিয়েছিলে! সুতরাং তোমার শরীরটাকে আমি পানি থেকে উদ্ধার করে নেবো, যাতে করে তোমার পরবর্তীদের জন্যে এক দৃষ্টান্ত হিসেবে তুমি থেকে যাও।' (৯১-৯২) এরপর এই পরিণতি কি হয়ে থাকে এবং কেন হয়, তা জানাতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'আর অবশ্যই অধিকাংশ মানুষ আমার নিদর্শনগুলো থেকে উদাসীন হয়ে থাকে, দেখেও দেখে না এবং সেগুলো থেকে কোনো শিক্ষাও গ্রহণ করে না।' পুনরায় এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, সর্বাপেক্ষা বড় সাক্ষী কে আছে? বলো, তোমার ও আমার মাঝে আল্লাহ তায়ালাই সাক্ষী, আর আমার কাছে এই কোরআন নাযিল হয়েছে যেন আমি তোমাদেরকে সতর্ক করতে পারি এবং তারাও যেন সতর্ক হয়ে যায় যাদেরকে কাছে এ বাণী পৌছুবে।'........ আর এখানে এসে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করা হচ্ছে এবং রসূল (স.) দেখছেন.......... তারপর হঠাৎ করে আমরা দেখতে পাই রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর জাতিকে সম্বোধন করে বলছেন, 'তোমরা কি বলতে চাচ্ছো যে আল্লাহর সাথে তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় ভাগ বসানোর মত আরো অনেকে আছে?'......... আর এভাবে নবী (স.)-ও তাঁর জাতিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আর তারাও তাঁকে জওয়াব দিয়েছিলো। .... এরশাদ হচ্ছে, 'বলো, না আমি এমন কাউকে দেখছি না, যে তাঁর ক্ষমতায় তাঁর সাথে শরীক হতে পারে। বলো, তিনিই একমাত্র সকল ক্ষমতার মালিক, আর আমি সম্পূর্ণ সম্পর্কমুক্ত তাদের থেকে, যাদেরকে তোমরা (আল্লাহর সাথে) শরীক বানাচ্ছ।' (সূরা আনয়াম ১৯)

আর এমনি করেই বারবার এই রকম আরো আয়াত দ্বারা ওই এক কথার পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, আর সেদিনের অবস্থা কেমন হবে যে দিন আল্লাহর সামনে সকল মানুষকেই একত্রিত করা হবে .....। (সূরা আনয়াম ১২৮-১৩১)

(বলা হবে) হে জিন সম্প্রদায়, তোমরা বহু মানুষকে তোমাদের অনুগামী বানিয়ে নিয়েছিলে....... আর মানুষের মধ্যে যারা তাদের বন্ধু বান্ধব ছিলো তারা বলবে, হে আমাদের রব, আমাদের অনেকেই একে অপরের দ্বারা উপকৃত হয়েছিলো, আর (আজকে) আমরা সেই নির্ধারিত নিয়তিতে পৌঁছে গেছি, যা আপনি আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, দোযখই তোমাদের ঠিকানা, সেখানেই তোমরা চিরদিন থাকবে। তবে আল্লাহ তায়ালা কাউকে রেহাই দিলে সে কথা আলাদা। নিশ্চয়ই তোমাদের রব মহা বিজ্ঞানময় জ্ঞানবান... এমনি করে কাফেরদের কীর্তিকলাপের কারণে তাদের কোনো কোনো দলকে অপর কোনো দলের সাথে মিলিয়ে দেবো.... বলবো, হে জ্বিন ও মানব জাতি, তোমাদের কাছে, তোমাদের মধ্য থেকে রসূলরা এসে তোমাদের কাছে আমার আয়াতগুলোর কি কথা বলেনি এবং আজকের দিনে এই কঠিন সাক্ষাত সম্পর্কে বলে তোমাদেরকে কি সতর্ক করেনি? ওরা বলবে (অবশ্যই রসূলরা সতর্ক করেছেন), আমরা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি....... আর সেই তাদের এলাকাবাসী ছিলো উদাসীন। (সূরা আনয়াম ১৩১)

সমগ্র কোরআনের মধ্যে এর বহু উদাহরণ রয়েছে। এ এক চমৎকার ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য এক পদ্ধতি, যা মানুষের উদ্ভাবিত সকল পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। তবে যে কেউ এ বিষয়টা চিন্তা করে দেখতে চায় দেখুক এবং এভাবে আল কোরআনের মতো কিছু তৈরী করার চেষ্টাও করুক না কেন এবং আল কোরআনের মতো মযবুত কোনো কেতাব আনতে চায় আনুক না কেন, সর্বাংগীন সুন্দর ও সকল দিক দিয়ে সমৃদ্ধ যদি নাও হয় এবং কোরআনের মতো অবিকল যদি নাও হয়, তবু কিছু সামঞ্জস্যশীল ভারসাম্যপূর্ণ ও অর্থবোধক এমন একটা কেতাব তৈরী করে নিয়ে আসুক না! কিছুতেই পারবে না।

এ হলো আল্লাহর কালামের কিছু বৈশিষ্ট্য এবং কিছু বিশেষ গুণ, যা আমরা তাৎক্ষণিকভাবে দেখতে পাই। এরপর বাকি থেকে যায় বিষয়গত বৈশিষ্ট্য। আর তারপর দেখা যায় আল্লাহর কালামের শক্তির বিশেষ বিশেষ নিদর্শন, যা অনেক সময়ে প্রকাশিত হতে দেখা গেছে এবং যা মানুষের কথায় সংঘটিত হতে পারে না।

আল কোরআনের উপস্থাপনরীতি

অবশ্যই মহাগ্রন্থ এ পাক কোরআন সামগ্রিকভাবে গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করেছে, এ ব্যাপারে একবার মাত্র মানুষের মনমগজকে আকর্ষণ করা হয়েছে, তা নয়। তার চেতনাকে একবার মাত্র উদ্বুদ্ধ করে ক্ষান্ত হয়েছে, তাও নয়। তার সজাগ চেতনাকে একবার মাত্র ও পৃথক পৃথকভাবে জাগানো হয়েছে, তাও নয়। বরং সামগ্রিকভাবে সমগ্র মানবমন্ডলীকে একই সাথে সম্বোধন করা হয়েছে এবং খুবই সংক্ষিপ্তভাবে এই সম্বোধন করা হয়েছে। যতোবারই আল কোরআন মানুষকে সম্বোধন করেছে, ততোবারই গোটা মানবমন্ডলীকে এক সাথে সম্বোধন করেছে এবং তাদের সঠিক মূল্যায়ন করেছে। গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে অবশ্যই এটা প্রতীয়মান হবে যে, আল কোরআনে উপস্থাপিত মানব কল্যাণমূলক ব্যবস্থার সমকক্ষ কোনো ব্যবস্থা গোটা মানব জাতির ইতিহাসে কোনো দিন কেউ দিতে পারেনি। এমন সামগ্রিক, সার্বজনীন, ভারসাম্যপূর্ণ এবং এমন সুবিচারপূর্ণ ব্যবস্থা কোনো মানুষ কোনো দিনই বানাতে সক্ষম হয়নি।

এখানে আমার রচিত 'খাসাইসুত্তাসাওবুর ওয়া মুকাওয়ামাতিহী' নামক কেতাবের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করতে চাই, যা এই তথ্যটির সুন্দর ব্যাখ্যা বলে দেবে। এতে ইসলামী দৃষ্টি পেশ করতে গিয়ে আল কোরআন কি পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, তা সুস্পষ্টভাবে জানা যাবে। জানা যাবে সব কিছুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কি চমৎকারভাবে এবং কতো পূর্ণাংগভাবে আল কোরআন মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছে। বলা হয়েছে,

এ পাক কালাম মানব রচিত সকল প্রকার জীবন ব্যবস্থা থেকে সুন্দর। কারণ,

'এক, এ পবিত্র কালাম সেই সত্যকে পেশ করেছে, যা বাস্তব জগতে বর্তমান রয়েছে। পেশ করেছে সেই পদ্ধতিতে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে, সেই সব দিক, সেই সব সম্পর্ক, যা মানব জীবনের সকল দৃষ্টিভংগিকে তুলে ধরেছে, যার মধ্যে নেই কোনো জটিলতা, নেই কোনো অস্পষ্টতা! বরং গোটা মানব জাতির সকল ভাবধারাকে এ পবিত্র গ্রন্থ পেশ করেছে।(১)...... আর আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা বান্দার প্রতি তাঁর রহমত থাকার কারণে তাদের স্বাধীন চিন্তা চেতনাকে ছিনিয়ে নিতে চাননি। চাননি তাদের বুঝ শক্তি দমন করতে। চাননি তাদের বিশ্বাস জোর করে দমন করতে। চাননি তাদের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের স্বাধীনতা খর্ব করতে। তিনি তো তাদের সম্পর্কে পূর্ব থেকে সবই জানেন। কারণ তাদের জীবন পরিচালনার জন্যে প্রথম পরিচালিকাশক্তিই হচ্ছে তার অন্তরের গভীরে লুকিয়ে থাকা আকীদা বিশ্বাস। আর তাদের বিবেক বুদ্ধির মধ্যে এবং তাদের অন্তরের মধ্যে যে ধারণা কল্পনার সৃষ্টি হয়, তাই তাদেরকে জানায় সমগ্র সৃষ্টির সাথে তাদের ব্যবহার কি হবে। এই আকীদাই তাদেরকে বলে দেয় কোন জ্ঞান বিজ্ঞান তারা অধ্যয়ন করবে এবং জীবনের জন্যে কোন পথ তারা বেছে নেবে।....... এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা এ আকীদাকে পূর্বে প্রাপ্ত জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল বানিয়েছেন। অর্থাৎ এই আকীদা সঠিকভাবে পেতে হলে সন্দেহমুক্ত আল কোরআনের জ্ঞান অর্জন করাটা অবশ্যই প্রয়োজন। প্রয়োজন আর একটা জিনিসের, আর তা হচ্ছে মানব জাতির থাকতে হবে, যারা এই আকীদার তাৎপর্যকে তাদের মধ্যে বাড়াতে চায়। যেহেতু এটাই হবে তাদের চিন্তা চেতনার মূলনীতি এবং এই ভিত্তিতে তারা তাদের সৃষ্টিলোকের ব্যাখ্যা করবে। ব্যাখ্যা করবে সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু আছে তার এবং ওই সব জিনিসের, যা তাদের নিজেদের মধ্যে রয়েছে, যাতে করে তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সেই সুনিশ্চিত সত্যের ওপর দাঁড়াতে পারে, যা ব্যতীত স্থির সত্য বলতে আর কিছু নেই। কেননা পার্থিব জীবনে মানুষ যে জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জন করে তা কোনো নিশ্চিত জ্ঞান নয়, তা কাল্পনিক মাত্র। তার ফল ভালো হওয়ার সম্ভাবনা আছে– এতোটুকুই বলা যায়, চূড়ান্তভাবে বা অকাট্যভাবে বলা যাবে না যে, ভালো ফল পাওয়া যাবেই। এমনকি জ্ঞান গবেষণা ও 'পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে' প্রাপ্ত জ্ঞানকেও চূড়ান্ত বলা যায় না। কারণ পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানও অনুমান ছাড়া আর কিছু নয়। কোনো অনুসন্ধান বা কোনো পরীক্ষাই চূড়ান্ত নয়। যে কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত ফল চিরদিন মানুষের জন্যে সত্য বলে বিবেচিত হবে তা নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে সর্ব প্রকার বাহ্যিক পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ লব্ধ ফল ও মানুষের প্রতি সেই অভিজ্ঞতার আলোকে সকল নির্দেশাবলী সবই আনুমানিক। এর পরিণাম ফল কি হতে পারে তাও আনুমানিক। আর বিজ্ঞান নিজেও একথা স্বীকার করে যে, এই আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অবশ্যই ওই ফল পাওয়া যাবে এমন নিশ্চয়তাও নেই বা এটা চূড়ান্ত সত্যও নয় (যেহেতু যে থিউরীর ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান গবেষণা হয় তা হচ্ছে, কোনো একটা পরীক্ষার জন্যে মনে করা হয় দুটি 'সম্ভাবনার' যে কোনো একটি হতে পারে– হবেই এমন চূড়ান্ত কথা নয়) পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞান গবেষণার দ্বারা অর্জন করেছে, তার কোনোটাই বেশীদিন টিকে থাকেনি। মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ আল্লাহর দেয়া জ্ঞানই একমাত্র চূড়ান্ত সত্য। আর তিনিই তাদের

(১) ঠিক এভাবে মানবজীবনের সব কিছু সম্পর্কে ভূমিকা রাখা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রত্যেক লেখক তার নিজ নিজ বুদ্ধি, যোগ্যতা ও দৃষ্টিকোণ থেকে লিখেন। এদের কারো সাথে কারো বুঝশক্তিতে পুরোপুরি মিল নেই।

সম্পর্কে যে খবর দিয়েছেন, তাই সঠিক, চির সত্য ও অপরিবর্তনীয় এবং তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাদাতা।(১)

আর দ্বিতীয়ত, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সেই সব বিচ্ছিন্নতা ও মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, যা মানব নির্মিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান গবেষণা এবং দার্শনিক চিন্তাধারার ফল স্বরূপ মানব সমাজে পরিলক্ষিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আল্লাহর বিধি নিষেধের তোয়াক্কা না করে মানুষ যা কিছু করছে, তার ফলে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, মারামারি কাটাকাটির দরযা প্রশস্তই হয়ে চলেছে এবং খুন-খারাবি বন্ধের নাম নিয়ে যতো পন্থাই অবলম্বন করা হচ্ছে, তাতে উল্টা ফল ছাড়া কোনো ইতিবাচক ফলাফল আসছে বলে দেখা যাচ্ছে না, যদিও সদিচ্ছা নিয়ে অনেক হৃদয়বান লোক এসব প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আসলে যিনি হাযির ও গায়েবের খবর রাখেন, যিনি মহা দয়াময়, যিনি সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন এবং যিনি সবার মংগলের জন্যে বিধি নিষেধ প্রয়োগ করতে চান, তিনি চান যে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল থেকে মনে প্রাণে তাঁর হেদায়াত গ্রহণ করে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করুক এবং তার পার্থিব জীবনের সাথে আখেরাতের জীবনের একটা যোগসূত্র কায়েম হয়ে যাক। জন্যে প্রয়োজন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা এবং আন্তরিকতার সাথে ও নির্দ্বিধায় ও পুরোপুরিভাবে তাঁর দেয়া পন্থাগুলো মেনে নেয়া এবং এ ব্যাপারে কোনো মানুষের নিয়ম নীতির দিকে না তাকানো। কেননা মানব রচিত বিধান ও পদ্ধতিসমূহের নির্বিচার অনুসরণ ডেকে আনে নানা প্রকার বিশৃংখলা ও নিদারুণ বিপর্যয়, যা প্রতিনিয়ত আমরা প্রত্যক্ষ করে চলেছি– এ সত্যটিই কোরআন মজীদে বর্ণিত কথাগুলোতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

একমাত্র আল কোরআনে বর্ণিত পদ্ধতি থেকেই জানা যায় যে, মানুষে মানুষে সম্পর্ক সৃষ্টি করাই মানুষের মূল কাজ এবং সকল আয়াত থেকেই এই সম্পর্ক ও সহযোগিতা গড়ে তোলার কথা জানা যায়। যদিও আলোচনা ক্ষেত্রের বিভিন্নতায় এক এক স্থানে এক একটি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তা সত্তেও মানুষে মানুষে সম্পর্ক গড়ে তোলার কথাটাই সবখানে মুখ্যভাবে পরিবেশিত হয়েছে এবং সকল আয়াতের গভীর অধ্যয়ন আমাদেরকে এ সত্যটিই জানায়।

তারপর কোরআনের বর্ণনার মধ্যে কোনো কোনো স্থানে বিশেষ কোনো বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে দেখা যায়। যেমন মানুষ কর্তৃক তার প্রকৃত মালিকের প্রশংসা করার প্রসংগ, তখন ওই মহা সত্যটি সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে, অর্থাৎ সৃষ্টির সবখানে এবং মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করার কাজে আল্লাহর শক্তি সক্রিয় থাকতে দেখা যায়। দেখা যায় দৃশ্য অদৃশ্য জগতের সবখানে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সকল শক্তি মানুষের জন্যে কল্যাণকর কাজেই নিয়োজিত রয়েছে। আবার যখন অন্য কোনো জায়গায় দেখা যায় কোনো ঘটনার সত্যতার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তখন ওই ঘটনার বাস্তবতা এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর মাঝে সম্পর্কের বাস্তবতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তারপর দেখা যায়, আলোচনার গতি বেশীর ভাগে আবর্তিত হচ্ছে জীবন ও জীবিতদেরকে কেন্দ্র করে। আর তার সাথে দেখানো হচ্ছে সৃষ্ট সকল বস্তু ও প্রাণীর মধ্যে আল্লাহর দেয়া একটাই নিয়ম চালু

(১) এ কারণেই দেখা যায় মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাকের কাছ থেকে মানুষ নিশ্চিত ও স্থায়ী সত্য জ্ঞান লাভ করেছে এবং তারা অন্তর-প্রাণ দিয়ে অনুভব করে যে, যাবতীয় শক্তি-ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ, অন্য কেউ নয় এবং সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র তিনি .... আর এই বিষয়টিই আল কোরআনের বর্ণিত রহস্য ভান্ডারের অন্যতম।

রয়েছে। কিন্তু যখনই মানব জাতির সৃষ্টির তাৎপর্যকে কেন্দ্র করে আলোচনা হয়েছে, তখনই তার সৃষ্টিকর্তাকে এবং কিভাবে ও কোন উপাদানে তাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন, বিশ্বলোক ও তার মধ্যে বিরাজমান অন্যান্য প্রাণীর সাথে তার সম্পর্ক কি দেখা যায়– এসব প্রশ্নও একইভাবে একে একে সামনে এসেছে। যিনি গায়েব ও হাযির (উপস্থিত ও অনুপস্থিত) সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকেফহাল, তার সম্পর্কে নানা প্রকার চিন্তার উদ্রেক হয়েছে। আর এরই সাথে দুনিয়ার জীবন ও পরকালীন জীবন সম্পর্কিত চিন্তা পরস্পর যেন একই সূত্রে প্রথিত হয়ে এসবের নিয়ন্তা আল্লাহ রব্বুল আলামীন ও অন্যান্য বিষয়াদির সাথে সব কিছুর একটা যোগসূত্র কায়েম হয়ে গেছে। একইভাবে দুনিয়ার জীবনের সকল বিষয়াদির সাথে অতি সুন্দরভাবে সম্পর্ক নির্ণীত হয়েছে.... যার সুস্পষ্ট চিহ্ন কোরআনের মধ্যে পাওয়া যায়।

তৃতীয়ত, আল কোরআনে সর্বত্র দেখা যায় প্রাকৃতিক পরিবেশের সব কিছুর মধ্যে এক অপরিবর্তনীয় নিয়মের বর্ণনা, যা এর নিয়ন্তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং জানায় যে, অবশ্যই তিনি সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক, তিনিই সব কিছুর হেফাযত করছেন এবং সৃষ্টিকুলকে প্রয়োজনীয় সব কিছু দান করছেন, তাঁর দৃষ্টিতে সবাই সমান, তাঁর জগতে সবার যথাযোগ্য মূল্য রয়েছে, তাঁর বিচার সবার জন্যে ইনসাফপূর্ণ, সেখানে নেই কোনো পক্ষপাতিত্ব বা নেই কোনো বঞ্চনা– এসব ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা যখন নযরে পড়ে, তখন এসব কিছুর সৃষ্টিকর্তার তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝা যায়, বুঝা যায় সর্বশক্তিমান আল্লাহর মালিকানা ও মানুষের দাসত্বের কথা, যা সব কিছুর মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। এমনকি মানুষের মজবুরী (অসহায়ত্ব) ও নির্ভরশীলতার বিষয়টিও আল কোরআনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হিসাবে বুঝা যায়।(১) .... এভাবে, গায়েবের খবর সম্পর্কে অবগত মহান আল্লাহর হাতেই যে সবার ভাগ্য রয়েছে এবং পরকালীন জীবন নির্ভর করছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কেননা বিশ্ব জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর করুণারাশি। এরপর জানা যায় মানব জীবনের ও বিশ্বের অস্তিত্বের তাৎপর্য। জানা যায় মানব জীবনের তাৎপর্য, যা বাস্তব জীবনের সব কিছুর সাথে আরো আরো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। এভাবে এ মহা সত্যটি অন্যান্য বিষয়ের সাথে মিশে একেবারে একাকার হয়ে যাবে না বা মানব জীবন কোনো অবহেলার বিষয় হয়েও থাকবে না এবং সৃষ্টিজগতের মধ্যে তার অস্তিত্ব এমনভাবে বিলীন হয়ে যবে না যে তার অস্তিত্বের চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে যাবে। ইসলামী চিন্তাধারার মধ্যে এসব তথ্য মোটেই পরস্পর বিরোধী নয়, যেমন আমরা এ তাফসীরের প্রথম ভাগ 'তাওয়াযুন ভারসাম্য' অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে এসে আমরা দেখতে পাই, বস্তুগত জগতের মধ্যে বিস্ময়ের কোনো শেষ নেই। এর মধ্যে পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান এবং এর রহস্য সন্ধান করতে গিয়ে এ সবের সৃষ্টিকর্তার কথা জানতে পারা যায়। জানা যায়, বস্তুজগতের সকল জিনিস ও প্রাকৃতিক সকল রহস্যের পেছনে রয়েছে বিশ্বপালক আল্লাহর শক্তি ক্ষমতা। অতীতে যেমন এসব কিছু রহস্যের জালে ঢাকা ছিলো, আজও তেমনি অজানার অন্ধকারে লুকিয়ে রয়েছে। আবার যখন জীবন, জীবনের দাবী, এর স্থায়িত্বের জন্যে প্রয়োজনীয় কাজ, এর পরিচালনার জন্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও যোগাযোগ এবং এ বিশাল প্রাকৃতিক জগতের সাথে জীবনের সম্পর্ক এবং এসব কিছুর পেছনে যাঁর ইচ্ছা ও শক্তি কাজ করে যাচ্ছে– এসব বিষয়ে যখন গভীরভাবে চিন্তা করে

(১) আমরা ইতিপূর্বে সূরাটির সফসীরে আল্লাহ তায়ালার এসব অবদানের কথা বর্ণনা করেছি যাতে তাঁর মহান মর্যাদা এবং সর্ব বিষয় সমাধানে তাঁর মেহেরবানীর কথা প্রকাশ করা যায়-দেখুন সূরাটির গোড়ার দিকের তফসীর।

দেখি, তখন বিস্ময়ের কোনো সীমা পরিসীমা থাকে না। যেমন দেখা যায় জীব বিজ্ঞানীরা জীবন ও জগত সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। আর মানব জীবন সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলেও হয়রান হয়ে যেতে হয়। যতোই চিন্তা করা হোক না কেন, কূল কিনারা পাওয়া যায় না তার বৈশিষ্ট্যসমূহ, তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা অফুরন্ত সম্ভাবনা। বিশ্ব জোড়া বস্তুনিচয়কে ব্যবহার করার যোগ্যতা ও স্বাধীনতা– এমনকি নিজেদের বুদ্ধি ও জ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসা। এগুলোকে বাস্তবে রূপ দেয়ার উদাহরণ অভিনেতারা কোনো বিশেষ জিনিসকে অভিনয়ের মাধ্যমে যেমন রূপ দিয়ে থাকে ঠিক তেমন– এসব কিছু এমন বিস্ময়ের ব্যাপার যে চিন্তা করতে গেলে সে চিন্তা যেন শেষই হতে চায় না।

চতুর্থত, ওই প্রাণ প্রবাহী, উচ্ছল, প্রভাবশীল ও মনকে উজ্জীবনকারী দৃশ্যসমূহ, যার সূক্ষ্মতা, যার বর্ণনা এবং চূড়ান্তভাবে যার সীমাবদ্ধতা আমাদের মনকে প্রচন্ডভাবে আন্দোলিত করে, আবার বিমোহিতও করে আমাদেরকে এর অন্তর্নিহিত রহস্যরাজি, এর ভয়ংকর শক্তি এবং এর অফুরন্ত সৌন্দর্য, এ সুন্দরের মেলায় রয়েছে এতো রাশি রাশি রূপ যার পরিমাণ করা মানুষের সাধ্যের উর্ধে বরং এসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা, পুরোপুরি অনুভব করা বা এর সঠিক কোনো ব্যাখ্যা করা কোনোটাই মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অথবা এর সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা এবং এর মধ্যে অবস্থিত ভয়ংকর শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করাও মানুষের সাধ্যের অতীত।

মানবিক সীমাবদ্ধতা এবং আল্লাহর অসীম জ্ঞান

মানবীয় শক্তি ক্ষমতার দ্বারা বিশাল এই বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছু সম্পর্কে স্বচ্ছ কোনো জ্ঞান লাভ করাও সম্ভব নয়, সম্ভব নয় আল কোরআনে বর্ণিত জীবন পথের সকল রহস্যের পূর্ণাংগ বিশ্লেষণ করে নিজেদের বুদ্ধি মতো সেই পথে পদচারণা করা এবং সেই পথে চলার পূর্ণ ফায়দা হাসিল করা। একইভাবে আমরা ইসলামী চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ও তার মূল্য সম্পর্কে আল কোরআন যে দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছে, অবিকল সেইভাবে আলোচনা করে পূর্ণাংগ কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর যদিও আমরা ইসলামের সঠিক চেতনা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে জনগণকে জানাতে চাই, কিন্তু তাতেও আমরা আশানুরূপ সফল হচ্ছি না যেহেতু আজকের জনগণ তাদের জীবন থেকে আল কোরআনকে বহুদূরে সরিয়ে রেখেছে। আজ সেইভাবে তারা জীবন থেকে আল কোরআনের শিক্ষা দূরে সরিয়ে রেখেছে, যেভাবে কোরআন নাযিল হওয়ার সময় তৎকালীন মানুষ নিজেদের বাস্তব জীবনকে কোরআন থেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলো। আর আজ পর্যন্ত ওই সময়ের সাধারণ মানুষের মতো বাজে সংস্রব থেকে মানুষ ফিরে আসেনি বা যাদের প্রতি আল কোরআন নাযিল হয়েছিলো, তারা যে যত্ন সহকারে এই মহাগ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলো, নিজেদের জীবনে এর প্রত্যেকটি নির্দেশ বাস্তবায়ন করেছিলো পরবর্তীকালে এবং আজও মানুষ আল কোরআনকে সেভাবে বুঝছে না ও তার অর্থ করছে না। ওই সময়ের ওই কঠিন পরিবেশে আল কোরআনের আলোকে একটা পূর্ণাংগ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিলো, কিন্তু তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ কোনো দিন অনুরূপ আদর্শ সমাজ গড়তে সক্ষম হয়নি এবং আল কোরআনের স্বাদও ওইভাবে কোনো দিন ফিরে আসেনি মানুষ সেই স্বর্ণ-সমাজের কল্যাণ থেকে আজও বঞ্চিত রয়েছে........ যার ফলে ইসলামের মনমুগ্ধকর বাগিচার ফল কুড়ানোর দিন যেন শেষ গেছে বলে মনে হয়।

আর আল কোরআন আকীদার বিভিন্ন তাৎপর্য পেশ করেছে। অর্থাৎ আকীদা বলতে কী বুঝায়, তা জানাতে গিয়ে এমন এমন বিষয় আল কোরআন তুলে ধরেছে, যা মানুষের বুদ্ধিতে সাধারণভাবে আসে না। কেননা বিষয়টার প্রকৃতিই এমন জটিল, যার চিন্তা মানুষের কল্পনার উর্ধে এবং যেদিকে মানুষ সাধারণভাবে খেয়ালও করে না।

সূরায়ে আল আনয়ামে এ বিষয় সম্পর্কিত আল্লাহর জ্ঞান ও সে জ্ঞানের ক্ষেত্র সম্পর্কে যে বিবরণ পেশ করা হয়েছে, তা ছবির মতো ফুটে উঠেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তাঁর কাছেই রয়েছে গায়েবের চাবিকাঠি, যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। তিনিই জানেন স্থল ও পানিভাগের কোথায় কি আছে, তাঁর অজান্তে গাছের একটা পাতাও পড়ে না। আর পৃথিবীর অন্ধকার গহ্বরে যে দানাকণাগুলো রয়েছে এবং ভিজা ও শুকনা (জ্যান্ত ও মৃত) যেখানে যা কিছু আছে, সবই তাঁর সুস্পষ্ট কেতাবে রেকর্ড করা রয়েছে।'

অর্থাৎ উল্লেখিত এসব স্থান যেগুলো সম্পর্কে মানুষ এ পর্যন্ত সন্ধান করতে পেরেছে, এসবের গোপন ও প্রকাশ্য, দৃশ্য ও অদৃশ্য এগুলোর সঠিক অবস্থা মানুষের কল্পনাতেও আসে না, আসতে পারে না। অথচ এসব তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্যে মানুষের সাধনার অন্ত নেই। অতলান্ত এই রহস্য সাগরে অনাদিকাল থেকে মানুষ হাবডুবু খেয়ে চলেছে, কিন্তু অদ্যাবধি সে কতটুকু জেনেছে তার! এসব কিছুর চিত্র আঁকার জন্যে মানুষ কল্পনার ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলেছে নিরন্তর রহস্য থেকে রহস্যান্তরে, এগিয়ে চলেছে সে অবিরামভাবে। কিন্তু উদ্ধার করতে পারেনি বিশ্বের তথ্য ভান্ডারের কোনো চাবিকাঠি, জানতে পারেনি এ রহস্যরাশির প্রকৃতি কি.........একথাগুলোর দিকেই আমরা ইতিপূর্বে এই তাফসীরের সপ্তম খন্ডে কিছু ইংগিত দিয়েছি,

আমরা এই ছোট্ট আয়াতটির দিকে যেদিক থেকেই তাকাই না কেন, আমরা দেখতে পাই আয়াতটি যেন এর মধ্যে বিধ্যমান এই পবিত্র কালামের অলৌকিক ক্ষমতা এবং তার গোপন ভান্ডারের আলোকে কথা বলছে।

আসুন আমরা এ আয়াতটির দিকে তার বিষয়বস্তুর নিরিখে তাকাই, তাহলেই প্রথম দৃষ্টিতেই আমরা দেখতে পাব যে, কোনো মানুষের মুখ দিয়ে একথাটা বেরোচ্ছে না, মানুষের কথা বলার প্রকৃতি এটা নয়..........মানুষের চিন্তাধারা হচ্ছে এ ধরনের বিষয়ে যখন সে কথা বলে, কথা বলে বৈজ্ঞানিক কোনো বিষয়ে বা কিছু গবেষণা দ্বারা উদঘাটন করতে চায়, তখন এ মহাবিশ্বের মহা বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে তার চোখের পলক যেন আর পড়তে চায় না......... অবশ্যই বিশাল ও রহস্য ভরা বিশ্বের দিকে মানুষ যখন তার কল্পনার নেত্রে তাকায় এবং কল্পনার পাখায় ভর করে এ মহা সাম্রাজ্যের পরিক্রমায় বের হয়, তখন কতোটা সে অগ্রসর হতে পারে? মানুষের প্রকৃতি তো এ বিশ্বপ্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, অবশ্য যদিও তার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। সে তো নিজের অপরিসর ও সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকেই তার চিন্তাধারার গাড়ী ছুটায় এবং এই সীমাবদ্ধ চিন্তা ক্ষমতা দ্বারা সে আয়ত্ত করতে চায় বিশ্ব পরিব্যাপ্ত অসীম এ ভান্ডারকে.........ভেবে দেখুন একবার এ বিশ্বের সর্বত্র বৃক্ষরাজি থেকে যে পাতাগুলো নিশিদিন ঝরে পড়ে, কল্পনানেত্রেও মানুষ যদি সেগুলো দেখতে চায় বা সীমা-পরিসীমা করতে চায়, তাহলে তা কখনও কি সে পারবে? প্রথমত, মানুষের চিন্তাধারাতেই একথাটা আসে না, এরপর গোটা বিশ্বের সর্বত্র কোথায় কত সংখ্যক পাতা ঝরে পড়ছে, তার কল্পনা সে করতে পারে না। আর এ কারণেই এ সব কিছুর পরিমাপ করতে সে চায় না বা গণনা করার ধারণাও তার মনে জাগে না। আর এটাই ঠিক যে, এভাবে অসীম এ ভান্ডারের রহস্য তার সসীম জ্ঞান দ্বারা কিছুতেই বুঝা সম্ভব নয়! বিশ্বব্যাপী ঝরে পড়া পত্র পল্লবের অবস্থা একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালাই জানেন, মানুষের যেটুকু বুদ্ধি বিবেক আছে তার দ্বারা এর কিছুই জানা সম্ভব নয়।

'মানবীয় চিন্তাধারার স্বাধীন প্রয়োগ বলতে কি বুঝায়? (বলা হচ্ছে, কোনো সজীব ও নির্জীব কেউই আল্লাহর জ্ঞান ভান্ডারের খবর রাখে না)। মানুষ বেশীর বেশী এতোটুকু করতে পারে যে

তার সামনে উপস্থিত সজীব ও নির্জীব বস্তুকে কাজে লাগাতে পারে........ পূর্ণাংগ জ্ঞান সমৃদ্ধ প্রমাণ দ্বারা কথা বলা কোনো মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয় বা এভাবে কোনো ব্যাখ্যাও সে দিতে পারে না। সকল প্রাণী ও প্রাণহীন বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র তিনি, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীন!

'আর মানুষ চিন্তাই করতে পারে না যে শুকনা ঝরে পড়া পাতাসমূহ মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা বীজ এবং জীবন্ত এবং প্রাণহীন বস্তুসমূহের হিসাব সম্পর্কে কিভাবে সুস্পষ্ট কেতাবে লিখিত রয়েছে,। এসব কিছুর রেকর্ড (হিসাব নিকাশ) কিভাবে সংরক্ষিত রয়েছে, কেমন হিসাবের বইতে রয়েছে? তাদের এসব হিসাব রাখাতে তাঁর কী লাভ, এই রেকর্ড রাখতে তাদেরই বা কেন এই আনন্দ উৎসবের আয়োজন? যিনি এসব কিছুর হিসাব রাখেন বলে জানিয়েছেন এবং যিনি এসব হেফাযত করছেন, তিনিই সব কিছুর মালিক, তিনিই মহা-সম্রাট রাজাদের রাজা– সকল শক্তি ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি। যাঁর ক্ষমতায় কোনো শরীক নাই, যার কাছে ছোট বড়, তুচ্ছ মর্যাদাবান, গোপন প্রকাশ্য, অজানা ও জানা এবং দূর ও নিকট সবই সমান।

'অবশ্যই অতি ব্যাপক, গভীর ও চমকপ্রদ। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল বৃক্ষ থেকে ঝরে পড়া এসব পাতা, সারা জগত ব্যাপী ছড়িয়ে থাকা প্রাণ ও প্রাণহীন বস্তুনিচয়– এ এমন এক দৃশ্য, যা ইচ্ছা করলেও কোনো মানুষের জ্ঞান বা ধারণা চিন্তাতেও আসে না, মানুষের দৃষ্টি সেগুলোকে অবলোকন করতেও সক্ষম নয়......... এ এমন এক অবস্থার মনোমুগ্ধকর বর্ণনা, যা মানুষ আন্দাজ করতে পারে না, বাস্তবে দেখার কথা তো দূরের কথা কল্পনা নেত্রেও এসব কথা চিন্তা করতে পারে না এবং তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সঠিক কোনো ব্যাখ্যাও মানুষ দিতে পারে না......... আর যারা এ বিষয়ে মাথা ঘামানোর দুঃসাহস করতে চায়, তারা সারা দুনিয়ার সকল মানুষ থেকে সর্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করে আনুক না কেন, দেখুন না এসব পদক্ষেপ নিয়ে তারা সফল হতে পারে কিনা (যেমন চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, 'নিয়ে এসো না তোমরা অনুরূপ একটি আয়াত তৈরী করে, যদি আমার বান্দার ওপর যেসব আয়াত আমি নাযিল করেছি, সেগুলো আমার নাযিল করা কি না, সে বিষয়ে তোমাদের মনে কোনো সন্দেহ থেকে যাক.........)' আবার 'আমিই এ উপদেশমালা পাঠিয়েছি, আর এর হেফাযতের দায়িত্ব আমারই'। চেষ্টা করে দেখেছে সারা দুনিয়ার সকল ইসলাম বিরোধীরা এ কেতাবকে ধ্বংস করতে। কিন্তু হাজারো চেষ্টা করা সত্তেও আজ পর্যন্ত কেউ একেতাবের একটি অক্ষরও কেউ পরিবর্তন করতে পারেনি। এতেও কি বিবেকবানদের বিবেকে সাড়া জাগবে না?

কোরআনুল কারীমের এ আয়াত এবং অনুরূপ আরো অনেক আয়াত এ মহান কেতাবের উৎস জানার ও বুঝার ব্যাপারে যথেষ্ট।

একইভাবে কোরআনে কারীমের ব্যাখ্যা ও তাফসীর করতে গিয়ে এ মহান কেতাবের এক চমৎকার বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করি– লক্ষ্য করি এমন এক সৌন্দর্য এবং বর্ণনা পরম্পরার মাধুর্য, যা কোনো মানুষের কথার মধ্যেই পাওয়া যায় না। কোথাও পাওয়া যায় না এমন মান সম্পন্ন বর্ণনাশৈলী, এমন ভারসাম্যপূর্ণ কথামালা, 'আর তাঁর কাছেই তো রয়েছে গায়েবের চাবিকাঠি, যার খবর তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না।' .... অর্থাৎ দৃষ্টির অন্তরালে কোথায় কি ঘটছে কতোকাল ধরে তা ঘটতে থাকবে পৃথিবীর এ রূপ রস মাধুর্য, এ মহা বিশ্বের সীমা শেষ কোথায়, কতো দূরে, কতো গভীর ও সূক্ষ্ম এর রহস্য রাজি, সবই অজ্ঞানের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। অতীতে কখন হয়েছিলো এর শুরু, বর্তমানে এর বিস্তৃতি কতো ব্যাপক এবং ভবিষ্যতে এর ইতিই বা হবে কবে– সবই তো রয়েছে অজানার অন্ধকারে– দৃষ্টির আড়ালে, সবই রয়েছে জীবনের আনাগোনায়, কল্পনার গভীরে ও আবেগের গুপ্ত কন্দরে লুক্কায়িত।

'আর একমাত্র তিনিই জানেন পৃথিবীর স্থল ও পানিভাগে কোথায় কী আছে।'

অর্থাৎ এ বিশ্ব কতোকাল থাকবে, কতোদূর পর্যন্ত এ বিশ্বের বিস্তৃতি ঘটবে এবং এর অজানা রহস্যের যতটুকু আমাদের দৃশ্যপটে পড়ে, তার গভীরতাই বা কতোটা-এর ব্যাপকতা কতো বিশাল এবং কতো কিছু রয়েছে এর অন্তর্গত............ দৃশ্য ও অনুভূত জগতের সাথে অদৃশ্য, দূর ও গভীর সকল বস্তুর পরস্পর ভারসাম্যপূর্ণ সহ-অবস্থান– সবই অদেখা জগতের অন্ধকারে এবং পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে, যা ইচ্ছা করলেও জানার সাধ্য মানুষের নেই।

'আর তাঁর অজান্তে গাছের একটা পাতাও পড়ে না।'................

মৃত্যু ও ধ্বংস, ওপর থেকে নীচে নেমে যাওয়া, সম্মানিত হওয়া ও অপমানিত হওয়া এবং জীবন্ত থেকে ধরাপৃষ্ঠের বুকে বিলীন হয়ে যাওয়া-সবই তাঁর হাতে। তাঁর অজান্তে কোনো কাজই সংঘটিত হয় না।

'আর মাটির অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যা কিছু লুকিয়ে আছে, তার জ্ঞানও তাঁর ছাড়া আর কারো কাছে নেই।'

অর্থাৎ দানা থেকে অংকুর বেরিয়ে আসা এবং ধীরে ধীরে মাটির গভীর থেকে মাটির ওপরে চারাগাছ আকারে উঠে আসা, তারপর কান্ড ও শাখা প্রশাখা বিস্তার করে পরিপূর্ণ মযবুত বৃক্ষে পরিণত হওয়ার এই যে পর্যায়ক্রমিক ধারা কিভাবে সংঘটিত হচ্ছে তা লক্ষ্য করলে আল্লাহকে স্বীকার না করে কোনো উপায় থাকে না।

'তারপর পৃথিবীর বুকে ও বিশ্বের সর্বত্র প্রাণী ও প্রাণহীন সৃষ্টি বিরাজ করছে, তার হিসাব সুস্পষ্ট এক কেতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।' ছোট্ট এ আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন যে, সৃষ্টির সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং সবারই তাঁর কাছে হিসাব নিকাশ দিতে হবে।

এবার ভেবে দেখুন, মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন ছাড়া সৃষ্টির প্রতিটি জিনিসকে এভাবে পরিচালনা করা ও পর্যায়ক্রমিকভাবে তাদের গতি দান করার এই যে কাজ, আর কে করতে পারে এবং বাস্তবে কে এগুলোকে পরিচালনা করে চলেছে? কে এগুলোর মধ্যে সংযোগ সাধন করে এবং কেইবা দিচ্ছে এসবের মধ্যে সৌন্দর্য রূপ রস গন্ধ? কেইবা এগুলোকে অনুপস্থিত থেকে বাস্তব সেই অস্তিত্ব দান করছে, যা এই ছোট্ট আয়াতটির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে– কে করছে এসব অসম্ভবকে সম্ভব.......... আল্লাহ ছাড়া?

এভাবে পরবর্তী আয়াতটিও আল্লাহর সর্বব্যাপী জ্ঞানের স্বাক্ষর বহন করছে।

'তিনি জানেন যা কিছু ভূগর্ভে প্রবেশ করে, আর যা কিছু তার থেকে বেরিয়ে আসে তাও জানেন। আর যা কিছু আকাশ থেকে নেমে আসে আর যা ওপরের দিকে উঠে যায়– এসব কিছুই তাঁর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে এবং তিনিই পরম করুণাময় ক্ষমাশীল।'

কিন্তু মানুষ ছোটো ছোটো আয়াত সম্বলিত এসব কথার দিকে খুবই কম খেয়াল করে থাকে। এর ফলে সে ভয়ানক ও আশ্চর্যজনক বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়। তার সামনে সে নানা প্রকার ও বিভিন্ন রূপের বহু রহস্যজনক বস্তু দেখতে থাকে, সম্মুখীন হয় বহু জটিলতার এবং এতো বেশী অজানা অচেনা জিনিসের মোকাবেলা তাকে করতে হয়, যা তার কল্পনাতেও কখনো আসেনি।

আর একটি মাত্র মুহূর্তে কোথায় কী ঘটছে তা যদি সারা পৃথিবীবাসী সবাই মিলে তালাশ করতো এবং আলোচ্য আয়াতে যে সব বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে সকল বিষয়ে হিসাব করতে শুরু করতো, তাহলে তারা অবশ্যই সঠিক কোনো হিসাব বের করতে অক্ষম হয়ে যেত!

কেউ কি বলতে পারে এই মুহূর্তে কতোগুলো জিনিস ভূগর্ভে প্রবেশ করছে, কতো জিনিস ভূগর্ভ থেকে বের হয়ে আসছে, কতো জিনিস আকাশ থেকে নীচে আসছে, কতো জিনিস আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে, কতো জিনিস পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে, কতো দানা বা বীজ পৃথিবীর এখানে ওখানে লুকিয়ে রয়েছে, কতো পোকা মাকড়, কীট পতংগ, কতো জীব জন্তু, হিংস্র পশু, বুকে হাঁটা প্রাণী (সরীসৃপ) সুবিশাল এ পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করছে এবং যত্রতত্র বিচরণ করছে, কত পানির ফোঁটা, কতো গ্যাসের অণু পরমাণু, কতো অগ্নিস্ফুলিংগ, কত বিদ্যুতপ্রবাহ পৃথিবীর অভ্যন্তরে এবং ভূপৃষ্ঠের আশপাশে ছড়িয়ে রয়েছে– তার খবর কেউ কি রাখে? কেউ কি জানতে পারে পৃথিবীতে কখন কি প্রবেশ করছে? না, না, মানুষের পক্ষে এসবের কোনো খবর রাখা আদৌ সম্ভব নয়। অথচ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অতন্দ্র দৃষ্টি সদা সর্বদাই এসব কিছুর খবরদারী করে চলেছে। তাঁর দৃষ্টি কখনও ঘুমায় না এবং এক মুহূর্তের জন্যেও তন্দ্রাভিভূত হয় না।

আবার দেখুন, কতো কি যে এই যমীন থেকে বেরিয়ে আসছে? কতো প্রকার শাক সব্জি ছড়িয়ে পড়ছে? কতো ফোয়ারা পানির প্রবাহ নিয়ে ছুটে চলেছে দিকে দিকে? কতো আগ্নেয়গিরি অগ্নি উদ্গীরণ করছে, কতো স্থানের মাটি ফেটে ফেটে অজস্র গ্যাসের প্রবাহ ছুটছে, কতো গুপ্তধন পৃথিবীর মধ্য থেকে প্রকাশিত হয়ে চলেছে, কতো পুঞ্জীকৃত ধন তার আবরণ ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসছে, আরো দেখা-অদেখা কতো কি জিনিস এই পৃথিবীর বুকে লুকিয়ে আছে, যার কতোটুকুই বা মানুষ জানে! জানে খুবই সামান্য, অজানা ভান্ডারই তো বেশী?

এই মহাবিশ্বে আরো কতো কি অজস্র জিনিস আছে, যা আকাশ থেকে নাযিল হচ্ছে, কত বৃষ্টির ফোঁটা, কতো বজ্রপাত, কতো আগুনের স্ফুলিংগ রয়েছে সবুজ বৃক্ষের মধ্যে, যা দাবানলের মতো এলাকার পর এলাকা জ্বালিয়ে দেয়। আবার কতো স্নিগ্ধ আলো, আর কতো ফয়সালা মহাবিশ্বের মহা মালিকের নিকট থেকে নিশিদিন নেমে আসছে। গোটা সৃষ্টির জন্যে কতো রহমতের বারিধারা বর্ষিত হচ্ছে, যার থেকে আবার বহু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রহমত গ্রহণ করার জন্যে, বিশেষিত করে তাদেরকে মহিমান্বিত করছেন। আর মানুষের যিন্দেগীর জন্যে প্রয়োজনীয় আরো কতো কি যে আল্লাহ তায়ালা সরবরাহ করছেন, তার ইয়ত্তা নেই। আরো বহু বস্তু আল্লাহপাক তাঁর বান্দার জন্যে ব্যবস্থা করে রেখেছেন, যার খবর আল্লাহ ছাড়া আর কেউই রাখে না– বলুন এ কথাগুলো কি সঠিক নয়?

অপরদিকে দেখুন, এমনও অনেক জিনিস কি নেই, যা আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে? নেই কি উৎপাদনে সহায়ক এমন কোনো বস্তু বা গাছপালা, লতা গুল্ম যা উৎপাদনে সহায়তা করে উর্ধাকাশে ছুটে চলে যায়, নেই কি এমন কোনো জীবজন্তু বা মানুষ অথবা মানুষের অজানা এমন কোনো সৃষ্টি, যার গতি উর্ধের দিকে? আর নেই কি আল্লাহর দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কোনো দাওয়াতী কাজ, যার সাফল্য আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না?

আর আল্লাহর সৃষ্টি আত্মাসমূহের মধ্যে কতো এমন আত্মাও আছে, যাদের আমরা জানি না। অথবা মৃত হওয়ার কারণে তাদেরকে আমরা ভুলে গেছি। আছে কতো ফেরেশতা, যারা আল্লাহর হুকুমে রূহসমূহ নিয়ে উর্ধে উঠে যাচ্ছে। আর কতো রূহ এজগতে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে, যাদের খবর আল্লাহ ছাড়া আর কেউই রাখে না?

আর কতো কতো বাষ্পের বিন্দু সমুদ্র থেকে ওপরের দিকে নিয়ত উঠে যাচ্ছে, আর শরীর থেকেও যে কতো গ্যাসের অণু পরমাণু প্রতি মুহূর্তে বেরিয়ে যাচ্ছে, আরো আরো কতো কি যে সংঘটিত হয়ে চলেছে রহস্য ভরা এ বিশ্বের মধ্যে, যার খবর তিনি ছাড়া আর কেউই রাখে না।

একটি মাত্র মুহূর্তের মধ্যে কত কি যে সংঘটিত হয়ে চলেছে সুবিশাল এ ধরায় কে তার খবর রাখে? এগুলো গণনা করতে গিয়ে সকল মানুষ মিলে সারা যিন্দেগী ভর যদি চেষ্টা করে, তাহলেও

কি এগুলোর কোনো হিসাব তারা বের করতে পারবে? অথচ আল্লাহর গভীর, সূক্ষ্ম সর্বব্যাপী জ্ঞানের মধ্যে এসব কিছুর পুংখানুপুংখ হিসাব সদা সর্বদাই বর্তমান রয়েছে। খবর রয়েছে প্রতিটি অন্তরের চিন্তা ভাবনার, যমীনের প্রতিটি স্তরে লুক্কায়িত দানা কণার। আর যা কিছু নড়াচড়া করছে যা কিছু স্থির রয়েছে এ বিশাল ধরাধামে– সবকিছুর বিস্তারিত খবর আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে সদাসর্বদা হাযির রয়েছে। এতদসত্তেও তিনি অনেক কিছু লুকিয়ে রাখেন এবং বহু ক্রটি বিচ্যুতি তিনি ক্ষমাও করে দেন।........ 'আর তিনিই মহা দয়াময় মহা ক্ষমাশীল।'

আল কোরআনের এই আয়াতের মতো অন্য যে কোনো আয়াতের দিকে খেয়াল করলেও বুঝতে কষ্ট হবে না যে, এ মহাগ্রন্থ কোনো মানুষের তৈরী নয়, কোনো কথা মানুষের এ কেতাবের কথার মতো কারো মনে এভাবে দাগ কাটে না এবং পাক কালাম সৃষ্টিজগতে বিরাজমান সব কিছুর যে কল্পনা মূর্ত হয়ে উঠেছে তার কোনো পরিমাপ করা মানুষের ধারণাতে আসাও সম্ভব নয়। এভাবে মানুষ আল্লাহ পাকের মহা কীর্তিসমূহের যে কোনো একটির দিকে তাকালেই দেখবে যে, এগুলো মানুষের তৈরী শিল্প কারখানাসমূহ থেকে কতো ভিন্ন, কতো স্বতন্ত্র প্রকৃতির। বরং কোনো কিছুর সাথেই আল কোরআনকে কোনো তুলনা করা সম্ভব নয়!

দৈনন্দিন জীবনের বাঁকে বাঁকে আল্লাহর নিদর্শন

এভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ক্ষমতার যে নিদর্শন বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনার উপস্থাপনায় এ মহা গ্রন্থের মধ্যে ফুটে উঠেছে, তা বাহ্যিক দৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে যে সব অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি এগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, তারা এসব কিছু থেকে আল্লাহর অস্তিত্ব ও ক্ষমতার বহু প্রমাণ লাভ করে– যার বিবরণ নিম্নের আয়াতটিতে দেখা যায়,

'আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, সুতরাং কেন তোমরা আমার কথাগুলোকে সত্য বলে মেনে নাও না। একবার চিন্তা করে দেখেছো কি, তোমাদের বীর্যপাত করার বিষয়ে (এর দ্বারা কি তোমরা তাকে সৃষ্টি করো? না আমি সৃষ্টি করি। আমিই তো তোমাদের মৃত্যুর দিন ক্ষণ নির্ধারণ করে দিয়েছি, আর তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের অনুরূপ আর এক মানব গোষ্ঠীকে নিয়ে আসতে আমি মোটেই অক্ষম নই এবং আমি বানিয়ে দিতে পারি তোমাদের এমন অভিনব এক রূপ-চেহারা, যা তোমরা জান না। আর তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী সৃষ্টির অবস্থার কথা জেনেই নিয়েছো, তাহলে বলো, কেন তোমরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে না। (ওয়াকেয়া ৫৭)

'তোমরা কি একবার ভেবে দেখেছো সেই পানির কথা, যা তোমরা পান করো? এ পানি কি তোমরা নিজেরা বর্ষণ করিয়েছো? না আমি বর্ষণ করে থাকি? আমি চাইলে তো বৃষ্টির এ পানিকে (সমুদ্রের পানির মতই) লোনা বানিয়ে দিতে পারতাম। তাহলে বলো, কেন তোমরা শোকরগুযারি করছো না। (ওয়াকেয়া ৬৮)

'সেই আগুন সম্পর্কে কি তোমরা একবার ভেবে দেখেছো যা তোমরা জ্বেলে থাকো? এ আগুনের গাছ কি তোমরা বানিয়েছে না আমি বানিয়েছি? এসবকে স্মরণ করার বস্তু হিসাবে তোমাদের জন্যে বানিয়ে রেখেছি এবং বানিয়েছি এগুলোকে মরুবাসীদের জন্যে প্রয়োজন মেটানোর বস্তু।' (ওয়াকেয়া ৭১-৭৩)

'অতএব, পবিত্রতার তাসবীহ জপতে থাকো তোমার মহান পালনকর্তার নামে।' মহাগ্রন্থ আল কোরআন তোমাদের কাছে সেই সব কথা ও উদাহরণ পেশ করছে, যা সাধারণভাবে তোমাদের কাছে পরিচিত, তুলে ধরছে সেই সব ঘটনা, যা প্রায়ই তোমাদের মধ্যে ঘটে থাকে। তোমাদের সামনে বিশ্বের সেই সব বড় বড় ঘটনা, তুলে ধরছে, যা সৃষ্টির কাছে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট।

মানুষকে যে জ্ঞান বুদ্ধি দেয়া হয়েছে, তার সদ্ব্যবহার করেই সে কাজ করে যায়। অস্বাভাবিক কি ঘটনা ঘটবে, কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে কি না, সে বিষয় চিন্তা করে সে কখনো নিশ্চেষ্ট থাকে না। অথবা অলৌকিক বিশেষ কোনো ঘটনার জন্যে সে দমেও যায় না। এমনি করে, তাকে তার চেষ্টার জন্যেই দায়ী করা হবে, তার প্রচেষ্টাকে বাদ দিয়ে, ঘটনাচক্রে কি ঘটে গেলো, কি অলৌকিক ঘটনা ঘটলো অথবা তার ইচ্ছা ছাড়া কোন কাজ সংঘটিত হলো, এর জন্যে তাকে মোটেই দায়ী করা হবে না। অথবা তাদের জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে, অথবা তাদের জানা সৃষ্টির বাহ্যিক কোনো নিয়মকে কেন্দ্র করেও তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে না। অবশ্যই তাদেরকে কোনো দার্শনিক বিতর্কে জড়িয়ে ফেলা হবে না বা বুদ্ধিবৃত্তিক কোনো জটিলতার মধ্যেও তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে না, অথবা বৈজ্ঞানিক কোনো জ্ঞান গবেষণার জন্যেও তাকে দায়ী করা হবে না। কারণ মানুষ হিসাবে তার স্বাধীন জ্ঞান গবেষণার অধিকার থাকলেও আসলে সে তো সব কিছুর ওপর কর্তৃত্বশীল নয়। তাদের অন্তরের মধ্যে সুস্থ চেতনা বিশ্বাস গড়ে উঠুক এটাই আল্লাহ তায়ালা চান। কারণ এই আকীদার ওপরই জীবন ও জগত সম্বন্ধে সঠিক দৃষ্টিভংগি গড়ে ওঠে।

তাদের অন্তরের জগত হচ্ছে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার বিশেষ এক কারখানা। আর তার চতুর্দিকের প্রকাশ্য প্রাকৃতিক বিষয়াদি মহান আল্লাহর ক্ষমতার চমৎকার বহিপ্রকাশ। আল্লাহর কুদরতের হাত যা কিছু সৃষ্টি করে চলেছে, তার মধ্যে অতি বিস্ময়কর অলৌকিকতা লুকিয়ে রয়েছে ..... আর এ মহাগ্রন্থ আল কোরআন তাঁরই গ্রন্থ। এ কারণেই তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা বহু অলৌকিক বিষয়ের দিকে তিনি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছেন। যা তাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে এবং যা ছড়িয়ে রয়েছে আদিগন্ত বিস্তৃত প্রকৃতির মধ্যে, সেদিকে তাকানোর জন্যে মানব মন্ডলীকে উৎসাহিত করছেন। মহা বিস্ময়কর এ কালামের মাধ্যমে তাদের মনোযোগকে তিনি আকর্ষণ করছেন সেই সব অলৌকিক বিষয়ের দিকে, যা তাদের কাছে পরিচিত, যা তারা প্রতিনিয়ত দেখছে কিন্তু এসবের মধ্যে নিহিত অলৌকিক বিষয়াদির তাৎপর্য তারা অনুভব করতে পারছে না। কারণ পৃথিবীর জীবন ও তার মধ্যে অবস্থিত লোভনীয় বস্তুসমূহের প্রতি তীব্র ভালোবাসার কারণে মোজেযাগুলো কোত্থেকে আসছে তার থেকে তাদের দৃষ্টিগুলো সরে রয়েছে। বারবার বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে তাদের মনোযোগ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঐসব অস্বাভাবিক ও রহস্যপূর্ণ বিষয়ের দিকে, যাতে করে তাদের জ্ঞানের চোখ খুলে যায় এবং সৃষ্টির মধ্যে লুকিয়ে থাকা মহা বিস্ময়কর রহস্যরাজি তারা উপলব্ধি করতে পারে। বুঝতে পারে আল্লাহর সৃষ্টি করার কুদরতের কথা এবং যেন বুঝতে পারে যে, তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং যেন উপলব্ধি করতে পারে প্রাকৃতিক বিষয়াদির রহস্যের মতোই তাদের নিজেদের অস্তিত্বের মধ্যে লুকিয়ে থাকা আল্লাহর অসংখ্য কুদরতের কথা। এসব কিছুই তাদের ঈমানকে মযবুত বানাতে সাহায্য করে এবং তাদের অস্তিত্বের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা তাদের আকীদার স্বচ্ছতা ও সুস্থতা প্রমাণ করে, অথবা এসব কিছুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা প্রকৃতির মধ্যে স্বাভাবিক যে বোধশক্তি আছে, তা জাগিয়ে দেয়।

আল কোরআনে প্রদর্শিত এ জীবন পদ্ধতিতে রয়েছে মানুষের জন্যে সহজ সরল ব্যবস্থা। যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা, তাঁর সৃজনীক্ষমতার প্রভূত নিদর্শন রেখে দিয়েছেন প্রকৃতির সকল দৃশ্যাবলীর মধ্যে, তেমনই তাদের নিজেদের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মধ্যেও অনুরূপ বহু রহস্য লুকিয়ে রেখেছেন এবং তাদের পরিচিত বহু জিনিস আছে, যা তাদের চোখের সামনে প্রতিদিন ঘটছে– সেসবের মধ্যেও এসব গূঢ় রহস্য। আর সেই সব ফুল-ফল ও ফসলাদির মধ্যেও রয়েছে এমন বিস্ময়কর জিনিস, যা তারা উৎপন্ন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিন্তু তার কোনো কূল কিনারা করতে

পারছে না। যে পানি তারা পান করে, যে আগুন তারা জ্বালায় সে সবের মধ্যেও রয়েছে অনেক বিস্ময়। তাদের জীবনের জন্যে জানা যে সব জিনিস তাদের চোখের সামনে সংঘটিত হচ্ছে তা অবশ্যই খুবই ব্যাপক। এভাবে তাদের কাছে তাদের শেষ পরিণতির মুহূর্তটি যেন বাস্তব রূপ নিয়ে ফুটে উঠছে। পৃথিবীর বুকে তাদের জন্যে মরণ কালের এই মুহূর্তটাই শেষ মুহূর্ত। কিন্তু পরকালীন জীবনের জন্যে এ মুহূর্তটাই হচ্ছে শুরু। এ এমন একটা মুহূর্ত। যার সম্মুখীন হতে হবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে, এমুহূর্ত থেকে বাঁচার জন্যে কারো কোনো ওযর খাটবে না। সকলকেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়ার জন্যে অবশ্য অবশ্যই এ মুহূর্তটি অতিক্রম করতে হবে। কারো কোনো চেষ্টা বা ক্ষমতার বলে এ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। অবশ্যম্ভাবী ওই মুহূর্তের জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে কেউ অপেক্ষা করুক বা নানা যুক্তি প্রদর্শন করে কেউ ওই মুহূর্তটিকে বিলম্বিত করার চেষ্টা করুক– উভয় অবস্থাই তাদের জন্যে সমান।

মানব প্রকৃতিকে সম্বোধন করার জন্যে আল কোরআন যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, তাতে বুঝা যায়, এ পদ্ধতি এসেছে মূল উৎস থেকে– এ হচ্ছে সেই উৎসমূল, যার থেকে সৃষ্টিজগত অস্তিত্ব লাভ করেছে। অতএব মানুষের সৃষ্টি এবং অন্য যা কিছু আছে, সে সবের নির্মাণ পদ্ধতিরই অনুরূপ। অতএব, এটা বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, সৃষ্টির প্রশস্ততর যে সব বস্তু রয়েছে, সেগুলোর সৃষ্টি কৌশলও সেই রকমই জটিল এবং সেগুলো মান মর্যাদা ও গুরুত্বের দিক দিয়ে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।...... সাধারণত মনে করা হয় সকল সৃষ্টির মূল উপাদান হচ্ছে অণু বা পরমাণু'...... আর যে কোষের মধ্যে এ অণু অবস্থান করে তা হচ্ছে জীবনের ভিত্তির উপাদান। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এসব অণু হচ্ছে অতি বিস্ময়কর ও ক্ষুদ্রতম বস্তু এবং এসবের অবস্থান ক্ষেত্র, কোষগুলোও কোনো অংশে কম বিস্ময়কর নয় ......আর এ প্রসংগে দেখা যায় আল কোরআনের মধ্যে গভীর দ্বীনী আকীদা ও সৃষ্টি-জগত সম্পর্কে প্রশস্ততর চিন্তাধারা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এমন সব দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, যা মানুষের কাছে সুপরিচিত ও গ্রহণযোগ্য।...... এসব দৃশ্য মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আওতার মধ্যে রয়েছে, যেমন কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য, পানি, আগুন এবং মৃত্যু– এ বিশাল পৃথিবীর বুকে কোনো এমন কেউ আছে, যে এসব জিনিসের সাহচর্যে আসেনি বা এসব জিনিস ব্যবহার করেনি? কোনো এমন গুহাবাসী আছে, যে ছোটো ছোটো গাছপালাগুলোর বেড়ে ওঠা অবলোকন করেনি। দেখেনি উদ্ভিদ ও শাক সব্জির মনোরম শ্যামল দৃশ্য ও তার নয়নাভিরাম বাড়নশীল অবস্থা, দেখেনি জলপ্রপাতের উৎসমূল, অগ্নিকুন্ড বা আগ্নেয়গিরি এবং মানুষের মৃত্যু মুহূর্তে কঠিন ও হৃদয়-বিদারক দৃশ্য?...... কোরআনে করীম মানুষের জানা ও দেখা এ দৃশ্যাবলী তুলে ধরেই মানুষের মধ্যে ঈমান-আকীদার বীজ বপন করছে। তাই দেখা যায়, এ মহান কেতাব সকল পরিবেশের সকল মানুষকে সম্বোধন করে কথা বলছে....... আর বিস্তৃত ও সহজ সরল এবং সাধারণ মানুষের বোধগম্য এ দৃশ্যাবলীই বিশ্বলোকের বৃহত্তর সত্য হিসাবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, দোলা দিয়েছে মানুষের হৃদয়কে আল্লাহর সর্বাপেক্ষা বড় রহস্য হিসাবে। এগুলো ব্যাপকভাবে মানব প্রকৃতির কাছে আবেদন পেশ করেছে। প্রকৃতপক্ষে শেষ যামানা পর্যন্ত ওলামায়ে কেরামের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের কাছে এ বিষয়টা এক গভীর গবেষণার বস্তু হয়ে রয়েছে।

এ মহাগ্রন্থ আল কোরআন যে উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে, সেই উৎসের তথ্য জানাতে গিয়ে একেতাব যে ভূমিকা রেখেছে, তার থেকে কখনও আমরা দূরে সরে যেতে পারবো না– আর এ জন্যে আমাদেরকে সাধ্যানুযায়ী এ সূরার গভীর অধ্যয়ন ও আলোচনার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

মহান আল্লাহ তায়ালা এ প্রসংগে যথার্থই বলেছেন,

'আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এ কোরআন নিজের থেকে তৈরী করা সম্ভব নয়।'

'ওরা কি বলছে, সে তৈরী করেছে? বলে দাও, বেশ তো তোমরাও এ রকমই কোনো একটি সূরা তৈরী করে নিয়ে এসো না, আর তোমাদের এ দাবীতে যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে এ দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার যার কাছ থেকে পারো, সাহায্য গ্রহণ করো।'

দ্বীনের দাওয়াত অস্বীকার করার ইতিহাস

এই চ্যালেঞ্জ দান করার পর প্রাসংগিক কিছু আলোচনা এখানে এসেছে, যাতে করে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া যায় যে, কোরআন সম্পর্কে সন্দেহ আরোপকারী ব্যক্তিরা নিছক ধারণা কল্পনার বশবর্তী হয়েই আজে বাজে মন্তব্য করছে, ওদের কাছে প্রমাণ করার মতো কোনো যুক্তি নেই। এমন বিষয়ে তারা মন্তব্য করছে যার সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। সিদ্ধান্তকর কোনো কথা বলার জন্যে অবশ্যই ওই বিষয়ের স্বচ্ছ জ্ঞান থাকা জরুরী– নিছক কোনো ধারণা কল্পনা বা আবেগ প্রবৃত্তির তাড়নে কোনো কথা বলা মোটেই যুক্তিসংগত নয়। আর যে মহান সত্ত্বার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালার বাণী শোনানো হচ্ছে, তা হচ্ছে আল কোরআনের মধ্যে বর্ণিত ওহী। এর প্রতিটি কথা সত্য। সত্য পুরস্কারের ওয়াদা ও ধমকি সবগুলোই। কিন্তু ওরা একে মিথ্যা কথা বলে দাবী করে এ মহামূল্যবান বাণী প্রত্যাখ্যান করছে। মিথ্যা কথা দাবী করে যতোই আল কোরআনকে তারা অস্বীকার করুক না কেন, ওদের কাছে এমন কোনো জ্ঞান নেই, যার বলে ওরা এ পবিত্র কালামের কথাগুলোকে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারে। অথচ তাদের ওপর তাদের এ হঠকারিতাপূর্ণ আচরণের বাস্তব শাস্তি এখনও নেমে আসেনি (যেহেতু আল্লাহ তায়ালা মহা দয়াময়)। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'বরং তারা সেই সব বিষয় অস্বীকার করেছে, যা তাদের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে তারা আনতে পারেনি, আর এজন্যেও তারা এ আয়াতগুলোকে আল্লাহর কথা বলে মানতে চায়নি, (আর এজন্যেও তারা এ বাণীকে সত্য বলে মানতে পারেনি) যে তাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি সাথে সাথে নেমে আসেনি।'...............

তাদের অবস্থা পূর্বেকার না-ফরমানদের মতোই, যারা নিজেদের নবীদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছিলো এবং তাদের কাছে প্রেরিত আয়াতগুলোকে আল্লাহর আয়াত বলে মানতে অস্বীকার করেছিলো। সুতরাং দাম্ভিক, হঠকারী যালেম ও মোশরেক লোকদের অবশেষে যে কঠিন পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছিলো, সে অবস্থা সামনে রেখেই চিন্তাশীলদের চিন্তা করা প্রয়োজন যেন তারা পরবর্তীতে কি অবস্থা হবে তা বুঝতে পারে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'এমনি করেই পূর্ববর্তী মানুষরা (তাদের নবী রসূলদেরকে) মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছিলো। অতএব, একবার তোমরা কি ভেবে দেখবে, সেই যালেমদের কি চরম পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছিলো।'

অর্থাৎ ওদের অধিকাংশই ধারণা কল্পনার অনুসরণ করেছিলো এবং যাঁর সম্পর্কে তারা সঠিকভাবে কিছু জানতে পারেনি তাঁর ব্যাপারেও মিথ্যা তৈরী করে করে বলেছিলো। অবশ্য সবাই যে মিথ্যা আরোপকারী ছিলো, তা নয়। তাই বলা হচ্ছে,

'তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঈমান আনে। আর অনেকে ঈমান আনে না এবং তোমার রব বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের ভালো করেই জানেন।'

অর্থাৎ ফাসাদ সৃষ্টিকারীরা (কখনো) প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার হয় না, আর মানুষকে তাদের রবের প্রতি বিশ্বাস থেকে দূরে রাখা এবং তাঁর দাসত্ব থেকে মানব সমাজকে দুরে রাখার ফলে যে বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি হয়, অন্য কোনো কারণে হয়না। যতো প্রকার অশান্তি পৃথিবীতে শুরু হয়, তার মূল কারণ হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো অন্ধ আনুগত্য করা। আর মানুষের জীবনে নিজের বা অপরের প্রবৃত্তির অনুসরণই আসল ক্ষতিকর কারণ মানুষকে ও আইনদাতা হিসাবে দাঁড় করানোর প্রচেষ্টাই সকল শান্তি ধ্বংস করার মূল কারণ। কেননা এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে মিথ্যা মনিবদের ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখা...... যা মানুষের চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়, তাদের আত্মা ও চিন্তা চেতনাকে নির্জীব করে দেয়...... এরপর মিথ্যা ও কৃত্রিম প্রভুদের স্বার্থের জন্যে বিপর্যস্ত হয়ে যায় তাদের কল্যাণকর সব ব্যবস্থা ও তাদের সম্পদ-সম্পত্তি। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের জাহেলিয়াত (হঠকারিতা ও অজ্ঞানতা)-ই হচ্ছে এসব অশান্তির জন্যে দায়ী, আর তারাই এসব অশান্তি সৃষ্টি করে রেখেছে, যারা আল্লাহর ওপর প্রকৃতপক্ষে ঈমান রাখে না।

এ কেতাব সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভংগি পেশ করার পর রসূল (স.)-কে সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে, যেহেতু মিথ্যারোপকারীদের সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোতে এবং তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা করায় তিনি মুষড়ে পড়ছিলেন,

'যদি ওরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে থাকে তাহলে ওদেরকে বলে দাও, আমার জন্যে রয়েছে আমার কাজ, আর তোমাদের জন্যে রয়েছে তোমাদের কাজ, আমি যা কিছু করছি তার কোনো দায়িত্ব তোমাদের নেই, আর তোমরা যা কিছু করছো তার জন্যেও আমি দায়ী নই।'

এই ছিলো তাদের মনোভাবের একটি বাস্তব চিত্র, সত্য থেকে নিজেদের দূরে রাখা এবং তাদের অপকর্মের ও সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের সত্যকে পরিত্যাগ করার অবস্থাটা এভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এটা ছিলো তোমার ওই বাচ্চাকে পরিত্যাগ করার মতো যে অহংকার করে এবং পথের মধ্যে হঠাৎ করে তোমার সাথে চলতে অস্বীকার করে বিনা যুক্তিতে পেছন দিকে চলতে শুরু করে। এ ধরনের ধমকিতে অনেকেরই ফায়দা হয়ে থাকে।

এরপর, রসূল (স.) থেকে তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়ার বর্ণনা এগিয়ে চলেছে। বলা হচ্ছে, তারা রসূল (স.)-এর কথা এমনভাবে শুনছে যেন তাদের কান ও অন্তরের দরযাগুলো আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তারা রসূল (স.)-এর দিকে তাকায় ঠিকই, কিন্তু তাদের চোখগুলোতে যেন কোনো দৃষ্টিশক্তি নেই। এর ফলে তাদের শোনা ও দেখাতে কোনো ফায়দা হচ্ছে না এবং তারা সত্য সঠিক পথের দিকে এগিয়ে আসছে না। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তাদের মধ্যে অনেকে এমনও আছে, যারা খেয়াল করে তোমার কথা শুনছে বলে (মনে হয়) না। এমতাবস্থায় যারা দেখে না (এবং দেখতে চায় না) এমনসব অন্ধ ব্যক্তিকে কি তুমি পথ দেখাবে? (দেখাতে পারবে)?'

এগুলো তো হচ্ছে এমনই জীব জানোয়ার, যারা শোনে বটে, কিন্তু যা শোনে তা মানে না, তা পালনও করে না। তারা দেখে বটে, কিন্তু সে দেখাতে তাদের বোধোদয় হয় না ..... এ ধরনের মানুষ প্রতি যামানা ও প্রত্যেক দেশের সমাজে বহু রয়েছে........... আর রসূল (স.)-এর কোনো কর্তৃত্ব তাদের ওপর নেই। কারণ তাদের অনুভূতি ও তাদের অংগ প্রত্যংগ এমনভাবে বিফল হয়ে গেছে যে, সত্য পথ তারা কিছুতেই দেখতে পারে না। যেন তাদের হৃদয় দুয়ার এমনভাবে বন্ধ হয়ে গেছে যে, তারা তাদের কর্তব্য যে কি তা বুঝতেই পারে না। আর রসূল (স.) তো কোনো বধিরকে শোনাতে পারেন না বা অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দিতে পারেন না। এটাই হচ্ছে আল্লাহ

পরওয়ারদেগারে আলমের ফয়সালা। আল্লাহ তায়ালা এমন এক নিয়ম চালু করে দিয়েছেন, যার অধীনে গোটা সৃষ্টিজগত চলছে। তিনি তাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও ভালো মন্দ বাছ বিচার করার বুদ্ধি দিয়েছেন যাতে করে তারা জীবনের সঠিক পথ বেছে নিতে পারে। কিন্তু এ ইন্দ্রিয়গুলোকে যখন তারা নিষ্ক্রিয় করে দেয়, তখন আল্লাহর নিয়ম তাদের ওপর কার্যকর হয়ে যায়, যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না, বা সে নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়াও সম্ভব নয়। আর এর পরিণতিতে তারা অবশ্যই এর উচিত ফল পাবে এবং আল্লাহ তায়ালা কারো প্রতি কোনো যুলুম করবেন না। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি কোনো প্রকার যুলুম করেন না বরং মানুষ নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করে।'

অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে রসূল (স.)-কে অস্বীকার মিথ্যা সাব্যস্ত করা এবং যে সত্য নিয়ে তিনি প্রেরিত হয়েছেন তা প্রত্যাখ্যান করার কারণে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিলো, তার থেকে নযর ফিরিয়ে নিয়ে এবং তাঁকে বাস্তব অবস্থা জানিয়ে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। তাদেরকে উপর্যুপরি বুঝানোর চেষ্টা করা ও সত্য সঠিক বিষয়গুলো তাদেরকে অবগত করা সত্তেও তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যে কঠিন বিদ্বেষ পোষণ করে চলেছিলো সে সব দিক থেকেও তাঁর নজর ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর রব তাঁকে জানাচ্ছেন যে তাদের হেদায়াতের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া তাঁর চেষ্টার কোনো ত্রুটির কারণে নয় বা তাঁর আনীত ব্যবস্থার মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকার কারণেও নয়, বরং এর মূল কারণ হচ্ছে মানুষরূপী ইসলাম বিরোধী ওই পশুগুলো যেন বোবা ও অন্ধ। তাদের চোখ খুলে দেয়া আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এহেন বিদ্বেষী মনোভাব সত্যের দিকে আহ্বানকারীদের প্রকৃতি বিরোধী– আর এ কঠিন ব্যাধি দূর করার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ নয়। এ মনোভাবকে বান্দা চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে– এটাই তার নিজের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার। উপরের আয়াতে সকল বান্দাকে এই কল্যাণকর শিক্ষাই দেয়া হচ্ছে, এমনকি স্বয়ং আল্লাহর রসূলকেও সকল প্রকার মন্দ ব্যবহার পরিহার করার জন্যে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। কারণ রসূল হলেও তিনিও তো মানুষ এবং আল্লাহর একজন বান্দা, বান্দার সীমাবদ্ধতার উর্ধে তিনিও নন এবং সকল ফয়সালার মালিক একমাত্র আল্লাহ।

পরকালীন জীবনের অনুভূতি

এরপর দেখা যায়, মানুষের আবেগ অনুভূতি ও ভাবাবেগের কাছে আকাংখিতভাবে ফুটে উঠছে কেয়ামতের চিত্রটি, যেখানে তার পার্থিব জীবনের বেপরওয়া সেই সব চালচলন স্পষ্ট হয়ে উঠছে, যা তাদের সত্যানুভূতিকে বিপর্যস্ত করে রেখেছিলো, সারাক্ষণ তাদের গোটা সত্ত্বাকে কর্মব্যস্ত বানিয়ে দিয়েছিলো এবং অকার্যকর করে রেখেছিলো তাদের সমস্ত বিবেচনা শক্তিকে..........তাদের কিছুতেই একথা মনে হতে দেয়নি যে, ক্ষণস্থায়ী এ জীবন শেষে এগিয়ে আসছে পরকালীন স্থায়ী ও চিরন্তন জীবন, যেখানে তাদের সকল কাজের চূড়ান্ত ফায়সালা দেয়া হবে এবং সেই ফয়সালা অনুযায়ী তাদের জীবন শাস্তি অথবা শান্তির মধ্যে চিরকাল অতিবাহিত হতে থাকবে।

এরশাদ হচ্ছে,

'সেই ভয়ংকর দিনে যখন তিনি তাদের সবাই একত্রিত করবেন, তখন তাদের কাছে মনে হবে যে তারা যেন দুনিয়ায় দিনের মাত্র একটি ঘন্টা কাটিয়েছিলো এবং এই ক্ষণিক সময়ের জন্যেই হয়েছিলো তাদের পারস্পরিক পরিচয় (ও আত্মীয়তার বন্ধন)। এসময়ে যারা আল্লাহর

সাথে সাক্ষাতকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিয়েছিলো অবশ্যই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আর মোটেই তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।'

অতি ক্ষণস্থায়ী ও স্বল্প সময়ের এ জীবনের দিকে একটু খেয়াল করে তাকালে আমরা দেখতে পাব যে, হঠাৎ করেই এ জীবন শেষ হয়ে যাবে এবং পরিণামে খুব শীঘ্রই এসে যাবে হাশরের ময়দানে সবাই জড়ো হয়ে যাবো, যেখানে আকস্মিকভাবে তাদেরকে অতীতের পাপাচারের জন্যে পাকড়াও করা হবে। সেদিন তারা দুনিয়ার জীবনের আসল মান সম্পর্কে যথাযথভাবে অনুধাবন করবে এবং বুঝবে যে কতো ক্ষণস্থায়ী ছিলো এ জীবন। আর তখনই মনে হবে যে, এ জীবনের সময়কাল এক ঘন্টার অধিক ছিলো না, যা পারস্পরিক পরিচয় জানতে জানতেই কেটে গেছে। আর তারপর যেন হঠাৎ করে এক পর্দা নেমে আসায় তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেলো এক চিরন্তন ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেলো। হয়ত বা দুনিয়ার জীবনের এটা নিছক একটা দৃষ্টান্ত বা সাদৃশ্যপূর্ণ ছবি অথবা সেই সব মানুষের এক উপমা, যারা ঘরে প্রবেশ করলো আর কালবিলম্ব না করেই বেরিয়ে গেলো। এসময়ে যেন শুধুমাত্র সাক্ষাত ও পরিচয় পর্ব সারতে সারতেই ফুরিয়ে গেলো বেলা– কাজ করার কোনো সময়ই পাওয়া গেলো না।

আসল অবস্থা বুঝার জন্যে অবশ্যই এটা একটা তুলনা– না, এটাই হচ্ছে সুনিশ্চিত ও অকাট্য সত্য। তা না হলে বলুন, আসলে মানুষ কি দুনিয়ার জীবনে তার পরিচয় পর্বটুকুও শেষ করতে পারছে? তারা তো আসছে এবং চলে যাচ্ছে। পারস্পরিক পরিচয় জানার জন্যেই বা কতোটুকু সময় তারা পাচ্ছে। আর কোনো একটা দল অপর কোনো দলের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেতে পেতেই বেজে উঠছে বিদায়ের ঘন্টা, মাঝ পথেই তখন সবাইকে সব কিছু ফেলে দিয়ে পাততাড়ি গুটাতে হচ্ছে।

তা না হলে কি এমনি করে মানুষের মধ্যে হানাহানি মারামরি কাটাকাটি হতো? সংঘটিত হতো কি তাদের মধ্যে এসব তিক্ত সম্পর্ক ও দুর্ঘটনাসমূহ? সত্যিকারে তাদের পারস্পরিক পরিচয় যেভাবে জানা প্রয়োজন ছিলো, তা কি সঠিকভাবে তারা জানতে পারছে?

আর এই যে দলাদলি, গোত্রীয় বিবাদ বিসম্বাদ, হানাহানি– প্রকৃতপক্ষে এসবের পেছনে কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। না আছে কোনো সুচিন্তিত পরিকল্পনা। এর পেছনে রয়েছে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের কিছু আবেগ বা সাময়িক কিছু স্বার্থ। হাঁ, এটাই আসল অবস্থা। পার্থিব জীবনের সামান্য স্বার্থের কারণে নিরন্তর এই বিবাদ চলছে। একবার খেয়াল করে দেখুন না, এই অবস্থার মধ্যে সত্যিকারে কি তারা পারস্পরিক পরিচয় লাভ করতে পেরেছে? এ পরিচয় লাভ করার জন্যে তাদের সময় সুযোগ কোথায়? মতভেদ, বিবাদ বিসম্বাদ একটার পর একটা এমনভাবে তাদেরকে পেয়ে বসছে যে, তাদের ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করার এতটুকু অবসর নেই।

এটাই হচ্ছে তাদের ক্ষণস্থায়ী এ জীবনের প্রকৃত উপমা। যদিও মানুষ মাঝে মাঝে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটে আসল সত্যটা গভীরভাবে উপলব্ধি করে... তবু সাময়িক স্বার্থের কারণে আসল সত্যকে সে ভুলে যায়– আবার পথ চলে বে-পরওয়াভাবে।

আর এ দৃশ্যের আলোকে সেই সব ব্যক্তির কাছে তাদের জন্যে ক্ষতিকর এই দিকটা শীঘ্রই ফুটে ওঠে, যারা তাদের জীবনের ক্ষণস্থায়ী ও দ্রুত পরিবর্তনশীল এই সময়ের হক আদায় না করে এ জীবনের আমোদ আহলাদে পুরোপুরি মজে থাকবে এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে। এভাবে ভুলে থাকবে তারা মহা প্রয়াণের কথা– আর এরই ফলে আল্লাহ সাক্ষাতের জন্যে কোনো প্রস্তুতিই তারা নেবে না, কোনো সম্বলও সংগ্রহ করবে না এবং চিরন্তন জীবনের সুখ শান্তির জন্যে কোনো পাথেয়ও তারা যোগাড় করবে না। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা, যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কথাকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছে, যার ফলে তারা সঠিক পথের দিশা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে।'

আর কেয়ামতের দিনের এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য ও ইতিপূর্বে বর্ণিত পার্থিব জীবনের দৃশ্যসমূহ থেকে রসূল (স.)-এর যামানা পর্যন্ত যতো ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়, সামনে নিয়ে সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ধমকি নেমে এসেছে, তা বড়ই রহস্যজনক, বড়ই দুর্বোধ্য। কেউ খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে চাইলে অথবা সারা যিন্দেগী ধরে ধীরেও যদি কেউ বুঝতে চায়, তবু ওই কঠিন অবস্থা যথাযথভাবে বুঝতে পারবে না। তবে অবশ্যই এটা সত্য যে, ওই কঠিন শাস্তির ধমকি মানবমন্ডলীর মাথার ওপর উন্মুক্ত তরবারির মতো ঝুলে রয়েছে। এই ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ ওই ভয়ংকর দিবসের ভয়কে হৃদয়ের অভ্যন্তরে লালন করতে থাকে এবং সময় থাকতেই ভালো মন্দ, বাছ বিচার করে চলে আর এই ভাবে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়।........ অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা চান, এভাবে যেন মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে পারে যে, তাদের জীবনের এ মহা যাত্রার পরিসমাপ্তি একদিন ঘটবেই। এজীবনের শুরু হয়েছে শাস্তির হুশিয়ারী বাণী উচ্চারণের সাথে। এ হুশিয়ারী চলতে থাকবে সেই দিন পর্যন্ত, যে দিন সারা দুনিয়ার সকল সম্পদ ফিদয়া স্বরূপ বিলিয়ে দিয়েও কেঁউ আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না। সে দিন আল্লাহ তায়ালা পরিপূর্ণ ভারসাম্যের সাথে সব কিছুর বিচার করবেন। তিনি কিছুতেই সেদিন কারও প্রতি কোনো যুলুম করবেন না। মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর জন্যে আল কোরআনে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। কাজে কথায়, চিন্তায় ও ব্যবহারে ঈমানী জীবনের চিত্র জীবন্তরূপে ফুটিয়ে তুলতে হবে, যেন এহেন মোমেনের জীবন যে কোনো হৃদয়কে আকর্ষণ করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সমন্বিত এক বাস্তব নমুনা পেশ করতে পারে। এটাই হবে সঠিক ইসলামী জীবনের ছবি। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমার কাছে যে সব ওয়াদা আমি করেছি, তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত যদি আমি দুনিয়াতে তোমাকে দেখিয়ে দেই, অথবা তোমাকে যদি আমি মৃত্যু দান করি, যা যে কোনো সময় আমি করতে পারি, সে অবস্থায় জেনে রেখো, অবশেষে আমার কাছেই তো ওদের সবাইকে ফিরে আসতে হবে......... আর যখন ওরা সেই কঠিন আযাব দেখবে, তখন ওদের লজ্জা ওরা গোপন করার চেষ্টা করবে, আর সেদিন ওদের মধ্যে সঠিক ভাবে ফয়সালা করে দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না।' -(৪৬-৫৪ আয়াত)

এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে যে মূল তথ্যটি পরিবেশন করা হচ্ছে তা হলো, সকলের সর্বশেষ ফিরে যাওয়ার জায়গা আল্লাহর কাছেই, রসূল (স.)-এর হুঁশিয়ারী মতে কোনো কোনো শাস্তি যদি দুনিয়াতে নেমেও আসে অথবা মৃত্যুর পরে যদি আসে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছেই তো সবাইকে ফিরে যেতে হবে আর দুনিয়ায় রসূল (স.)-এর সামনে (তাঁর জীবদ্দশায়) এবং তাঁর ইন্তেকালের পরে কি আমল তারা করছে তিনি নিজেই তার সাক্ষী। সুতরাং তাদের কোনো হয়ে যাবে না, আর রসূলুল্লাহ (স.)-এর মৃত্যুর পর, তাদের সাথে প্রদত্ত ওয়াদার কোনোটা বাদও পড়ে যাবে না। এরশাদ হচ্ছে,

'আর (তোমার জীবদ্দশায়) যদি তাদের দেয়া ওয়াদা মতে তাদের প্রতি নেমে আসা কোনো শাস্তির দৃশ্য তোমাকে দেখাই অথবা তোমাকে (ওই শাস্তি নাযিল হওয়ার আগেই) ওফাত দান করি (তাতে শাস্তির মাত্রায় কোনো কম বেশী হবে না) কারণ অবশেষে আমার কাছেই তো ওদের সবাইকে ফিরে আসতে হবে। এরপর ওরা যা কিছু করছে সে বিষয়ে তো আল্লাহ (নিজেই) সাক্ষী রয়েছেন' ....

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সব কাজই নিয়মতান্ত্রিক সংঘটিত হবে এবং আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী পূর্ব সিদ্ধান্ত মতে সব কিছুই পরপর ঘটতে থাকবে। এগুলোর কোনোটাই হারিয়ে যাবে না, প্রতিকূল অবস্থার কারণে বা স্থানকাল পাত্রভেদে পরিবর্তিতও হয়ে যাবে না। তবে প্রত্যেক জাতিকে তাদের নিজেদের রসূল না আসা পর্যন্ত শোধরানোর সময় দেয়া হবে এবং সাথে সাথে তাদেরকে ধ্বংস করা হবে না, বরং তাদের সতর্ক করা হবে ও সত্যকে তাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হবে। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যে প্রতিদান দেয়া নিজের ওপর তিনি ফরয করে নিয়েছেন, তা তাদেরকে পুরোপুরিই দেবেন। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা এটাও স্থির করে রেখেছেন যে, তিন কাউকে ততোক্ষণ পর্যন্ত আযাব দেবেন না, যতোক্ষণ তাদের নিকট কোনো রসুল না পাঠান এবং সত্য পথ তাদের কাছে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন। এ ভাবে, রসূল (স.) এসে দ্বীনের দাওয়াত সঠিক ভাবে তাদের কাছে পৌঁছানোর পর তারা যে ভাবে সাড়া দিয়েছে, সেই অনুযায়ী তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ফয়সালা করেছেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর প্রত্যেক জাতির জন্যেই রসূল ছিলো,অতপর তাদের কাছে রসূল এসে যাওয়ার পর তাদের সাথে ন্যায় বিচারের কাজটি সম্পন্ন হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতেও তাদের প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না।'

আর এই দুটি আয়াত থেকে আমরা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং মানুষের দাসত্বের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারি। এই দুটি বিষয়ের ওপরই প্রধানত ইসলামী চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে। আল কোরআনের আলোচনা ও তার প্রদর্শিত পথও এ দুটি বিষয়কেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এবং বিভিন্নভাবে এবং নানারূপে এ বিষয় দুটির প্রতি বিশ্বাসের তাৎপর্য এবং বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলনের কথা জানানো হয়েছে।

রসূল (স.)-কে বলা হচ্ছে যে, ইসলামী আকীদা ও যে জাতিকে সম্বোধন করে এ আকীদা গ্রহণ করতে বলা হচ্ছে, সে জাতির বিষয়ে যাবতীয় আলোচনা সব কিছু আল্লাহরই সন্তুষ্টির জন্যে। আরও বলা হচ্ছে যে, এক সময় তো তোমার জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে এবং যারা তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে, তোমার বিরোধিতা করছে এবং তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে, তাদের পরিণতি তুমি নিজ চোখে দেখে যাওয়ার সুযোগও পাবে না। তোমাকে ওদের মন্দ পরিণতি দেখাবেন এবং ওদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা যাদের পুরস্কৃত করবেন তাদের অবস্থাও তোমাকে ইতিমধ্যে দেখানো হয়েছে– এসবই একমাত্র আল্লাহরই জন্যে। তোমার ও অন্য সকল রসূলের দায়িত্ব হচ্ছে শুধু দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। বলা হয়েছে.......... তোমরা কর্তব্য হচ্ছে এ দাওয়াতকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া.........তারপর রসূল (স.) তাঁর মিশন নিয়ে এগিয়ে চলেছেন এবং সফলতা ব্যার্থতার ভার আল্লাহর হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন, যাতে করে বান্দা তার কর্মক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারে এবং আল্লাহর পথে আহবানকারীরা দুনিয়াতে সাফল্য লাভের ব্যাপারেও যেন আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে ব্যস্ত না হয়ে পড়েন, তা এ দাওয়াত যতো দীর্ঘ সময় ধরেই দিতে থাকা হোক না কেন এবং এ পথে তাদের যতো কষ্টই দেয়া হোক না কেন। এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা বলে, তোমার ওয়াদা করা সে আযাব কখন আসবে (আনো না দেখি) যদি তুমি (তোমার ওয়াদার ব্যপারে) সত্যবাদী হয়ে থাকো।'

হতভাগা ওই কাফেররা মনে করতো, আযাবের এসব কথা ভিত্তিহীন এবং এজন্যে তারা আযাবের ওই কঠিন অবস্থা বাস্তবে দেখার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। তারা চাইছিলো নবী

(স.) যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছিলেন শীঘ্রই তার বাস্তবায়ন হোক। তাদের সম্পর্কে আল্লাহর যে ফয়সালা শোনানো হচ্ছিলো, তা তেমনি করে এসে যাক যেমন করে অন্যান্য রসূলরা প্রত্যাখ্যান করার সাথে সাথে তাদের প্রতি এসেছে। তাদের এই ব্যস্ততার জওয়াবে উদাত্ত কণ্ঠে নেমে এলো আল্লাহর বাণী,

'বলে দাও, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া আমি নিজের কোনো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখি না। প্রতিটি জাতির জন্যেই বেঁচে থাকার একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে। যখন এসে যাবে, তখন তারা কেউ এক মহূর্ত বিলম্ব করবে না বা কেউ এক মুহূর্ত আগেও মরবে না।'

আর রসূল (স.) যখন নিজের কোনো ক্ষতি বা উপকার করার মালিক নন, তখন স্বাভাবিকভাবে তাদের জন্যেও কোনো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা তাঁর নেই। এখানে পেছনের ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, একথা বুঝাতে গিয়ে রসূল (স.)-কে নিজের ব্যাপারেও কথা বলতে বলা হয়েছে। কারণ ওরা আযাবের ব্যাপারে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। বর্তমান আলোচ্য অংশে ক্ষতি বা আযাবের কথা প্রথম উল্লেখিত হয়েছে। অন্য জায়গায় উপকারের কথা আগে বলা হয়েছে। কারণ নিজের জন্যে উপকারের কথাটা আগে উল্লেখ করা বেশী উপযোগী, আর যেহেতু সেখানে নবীর নিজের কথাটিই উদ্ধৃত করা হয়েছে। বলা হচ্ছে,

যদি আমি গায়েবের খবর জানতাম তাহলে অবশ্যই আমি চাইতাম যে, কল্যাণটাই বেশী বেশী আসুক, (অকল্যণ আসুক তা কিছতেই আমি চাইতাম না) ফলে আমার কোনো কষ্ট হতো না।'

বলে দাও, আমি নিজের কোনো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা ও রাখি না.... তবে আল্লাহ তায়ালা যা চাইবেন তা-ই হবে।...........'

'বলে দাও, আমি নিজের জন্যে নিজের সিদ্ধান্তকে'................

এতে বুঝা গেলো যে, সকল কাজ আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয় এবং ক্ষমতা সবটুকু একমাত্র আল্লাহর। তিনি তাঁর আযাবের সিদ্ধান্তকে সেই সময়ে বাস্তবায়িত করেন, যখন তিনি চান এবং আল্লাহর এই চিরন্তন নিয়মের মধ্যে তাঁর কখনো কোনো ব্যতিক্রম হয় না। আর তিনি যে সময়ে যা হবে বলে নির্ধারণ করে রেখেছেন, সে সময়েই তা হবে। তিনি কখনো ব্যস্ত হন না এবং তড়িঘড়ি করে কোনো কাজ করেন না। এরশাদ হচ্ছে,

'প্রতিটি জাতির মৃত্যুর জন্যে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময়। সেই নির্দিষ্ট সময় যখন এসে যাবে, তখন তারা এক মুহূর্ত দেরীও করবে না, আর এক মুহূর্ত পূর্বেও মরবে না।'

আর নির্দিষ্ট সে সময়টা তখনই শেষ হয়ে যাবে, যখন মানুষের অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এভাবে কোনো জাতি সমূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সে জাতির ঐতিহ্য, যেমন ঘটেছে অতীতের বহু জাতির ভাগ্যে। এ মৃত্যু হচ্ছে জীবনযুদ্ধে পরাজয়ের প্রতীক এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে পুরোপুরি হারিয়ে যাওয়া। আর অতীতের জাতিসমূহের ভাগ্যে বারবার এটাই ঘটেছে। অবশ্য তাদের বিলুপ্তি কখনো সাময়িকভাবে হয়েছে, যার পর কখনো তারা আবার ফিরেও এসেছে, কিন্তু সে শুধু মান সম্ভ্রমহীন কোনো রকমে জীবন ধারণের জন্যে, আবার কখনো তাদের অস্তিত্ব পুরোপুরি ও চিরদিনের জন্যে মুছে গেছে ধরাপৃষ্ঠ থেকে এবং কখনো একটি জাতি হিসাবে তাদের বিস্তৃতি থেকে গেছে। আবার কখনো কোনো জাতি সার্বিকভাবে ধ্বংস থেকে রেহাই পেলেও ব্যক্তি হিসাবে বেঁচে থেকেছে কোনো রকমে, কোনো জাতি হিসাবে নয়। আর এসবই ঘটেছে আল্লাহর অমোঘ নিয়মের অধীন, যার মধ্যে কোনোদিন কোনো পরিবর্তন হবার নয়। এ নিয়মকে কেউ

ঠেকিয়ে রাখতে পারে না বা এ নিয়মকে কেউ মিথ্যাও প্রমাণ করতে পারে না। যুলুম করে অথবা পারস্পরিক হৃদ্যতা বাড়িয়ে এ নিয়মের মধ্যে কোনো পরিবর্তনও কেউ আনতে পারে না সুতরাং জীবনের উপায় উপকরণ এবং জীবন ধারণ সামগ্রী যে জাতি যতো বাড়াতে পারবে, আল্লাহর নিয়মে সে জাতি ততো বেশী উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে। আর যে জাতি এসব উপায় উপকরণের সঠিক ব্যবহার করবে না, সে জাতি আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী অবশ্যই দুর্বল হয়ে যাবে অথবা সার্বিকভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে বা যে পরিমাণে আল্লাহর বিধান অমান্য করবে সেই পরিমাণেই তার ক্ষতি হবে। অপরদিকে ইসলামী উম্মত তাদের রসূলের অনুসরণ করে চলার জন্যে যে নির্দেশ আল কোরআন থেকে লাভ করেছে, তা মেনে চলতে তারা দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ। আর রসূলের দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে এমন সব কাজের দিকে আহবান জানানো, যা তাদেরকে পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে এক জীবন্ত জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আর এ প্রতিষ্ঠা লাভ শুধু মাত্র অন্তরের মধ্যে আকীদা বিশ্বাস পোষণ করার কারণেই সম্ভব নয়, বরং বাস্তব বাস্তব কর্মের মাধ্যমে এ সাফল্য অর্জন করতে হবে, যা সঠিক আকীদার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং সে কাজগুলো বিভিন্ন দিক দিয়ে জীবনকে সুন্দর ও গতিশীল করে তোলে। কৃতকার্যতা আসে সেই জীবনধারা অনুসরণে যা আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা ও তাঁর প্রেরিত আইন অনুযায়ী গড়ে ওঠে এবং সমাজের বুকে গড়ে তোলে সেই মূল্যবোধ যা আল্লাহর দেয়া ও রসূলের দেখানো জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বলিষ্ঠভাবে বাস্তব কাজ করতে হবে নতুবা সেই নির্দিষ্ট পরিণতির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, যা আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী অবশ্যই একদিন আসবে।

মনের বক্রতা দুরীকরণ

এরপর দেখা যায় আলোচনার ধারার মধ্যে মানুষের হৃদয়াবেগের প্রতি পেশ করা হয়েছে এক গভীর আবেদন পেশ, যার কারণে সেই সকল ব্যক্তির অন্তর দিবারাত্রির প্রতিটি মুহূর্তে ভয় ভীতিতে পরিপূর্ণ থাকে। ইতিপূর্বে এ পবিত্র কোরআনের বাণীকে হৃদয়হীনভাবে কটাক্ষপাত করেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, তোমরা কি একবারে ভেবে দেখেছো, রাতের বেলায় অথবা দিবা ভাগের কোনো সময় তোমাদের ওপর আল্লাহর সেই আযাব যদি এসে যায়, যার জন্যে ওই অপরাধীরা বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো....... তাহলে কি অবস্থা হবে?'

অজানা অদেখা এ আযাবের রূপ চেহারা যে কি হবে, তা কেউই জানে না। কি ভাবে কখন এবং কার ওপর এ আযাব নাযিল হবে, তাও কারও ধারণার মধ্যে নেই। তবে রাত্রিকালে তোমরা যখন আরামের ঘুম ঘুমাতে থাকবে, তখন হয়তো হঠাৎ করে এ ভয়ানক আযাব এসে পড়বে, অথবা আসবে সে কঠিন মুহূর্ত ঝলমলে আলোয় ভরা দিনের বেলায় তোমাদের জেগে থাকাকালে। তোমাদের শত রকমের সজাগ ও সতর্ক থাকা অবস্থা এই আযাব থেকে কিছুতেই তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবে না, যার ব্যাপারে অপরাধীরা ব্যস্ততা দেখাচ্ছিলো। এ হচ্ছে এমন কঠিন শাস্তি, যার জন্যে কোনো প্রকার ব্যস্ততা দেখানোতে তাদের জন্যে কোনো প্রকার কল্যাণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এ প্রসংগে এ কথাটাও সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, যখন তারা আযাব সম্পর্কে বারবার প্রশ্ন করছে, তখন আপাতদৃষ্টিতে তাদের প্রশ্নগুলো তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনে হলেও প্রতিবার প্রশ্ন করার সাথে সাথে তাদের অজান্তেই তাদের হৃদয়ের গভীরে এক অজানা আতংক ছড়িয়ে পড়ছে। তাদের অন্তর দুরুদুরু করে কাঁপছে, কখন যেন আযাব এসে পড়ে। কারণ যে কোনো অপরাধীর মন এমনিতেই

দুর্বল থাকে। উপরন্তু তাদের সুপ্ত বিবেকের কাছে বারবার একথা আসতে থাকে যে, যুক্তিহীন ভাবে সত্যকে অস্বীকার করার পরিণতি অবশ্যই ধ্বংসাত্মক। আর এ ধ্বংসলীলা একবার যদি শুরু হয়েই যায়, তাহলে তা ঠেকানোর মতো কোনো শক্তি বা ক্ষমতা তাদের নেই। তাদের মনের গভীরে আগত এই অনুভূতিকে তারা যতোই সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করুক না কেন, ভয় ভীতির এই অনুভূতি কিছুতেই তাদেরকে ছেড়ে যায় না– এই কথাটিই যখন পবিত্র কোরআন তাদের কাছে এক হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তুলে ধরে, তখন তাদের মধ্যে এমন ভয়ংকর ত্রাসের সৃষ্টি হয়, যা আর তারা উপেক্ষা করতে পারে না। এরশাদ হচ্ছে,

'এবার কি তাহলে আযাব এসে যাওয়ার পর তোমরা ঈমান আনবে? হায় আযাব যখন প্রায় এসেই গেলো, তখন সেই আযাব থেকে বাঁচার জন্যে তোমরা ঈমান আনছো? অথচ এই আযাব আসার ব্যাপারে এতোদিন তোমরা কতোই না ব্যস্ততা দেখিয়েছো!'

এ আয়াতটির ভাষার মধ্যে এমন ভাবধারা ফুটে উঠেছে যে, পাঠক বা শ্রোতার মনে এ প্রতীতি জন্মাতে শুরু করেছে যে, আযাব আসতে মোটেও আর বিলম্ব নেই-এখন যেন তাদের মনের মধ্যে ঈমান আনার জন্যে এক দারুণ আগ্রহ পয়দা হয়ে গেছে বা ঈমান এনেই ফেলেছে। আর তাদের অন্তরের এই অবস্থাকে সামনে রেখেই যেন আয়াতে উল্লেখিত কথাগুলো বলা হচ্ছে।

এরপর দেখুন, ওপরে বর্ণিত কথার পরিপূরক হিসাবে বলা হচ্ছে, (ভবিষ্যতে প্রকৃতপক্ষেই যখন আযাব এসে যাবে, তখন) 'এরপর যালেমদেরকে বলা হবে, স্বাদ গ্রহণ করো চিরস্থায়ী সেই আযাবের। অতীতে তোমরা যা করেছো, তারই প্রতিফল স্বরূপ আজকের এই আযাব এসেছে।'

এ ভাবে আলোচনার ধারার মধ্যে আমরা যেন দেখতে পাচ্ছি হাশরের ময়দান বাস্তবিকই সামনে হাযির। অপরাধীরা বিচারের অপেক্ষায় দন্ডায়মান এবং তাদের নির্ধারিত শাস্তিগুলো যেন বাস্তবে চোখে দেখা যাচ্ছে। আলোচনার ধারাতে আরও যেন মনে হচ্ছে যে, কেয়ামতের দিন আমাদের কাছেই মনে হবে যে, প্রত্যাবর্তনের দিনের এ অবস্থা সম্পর্কেই তো রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে আমরা আল্লাহকে বলতে দেখছি!

দীর্ঘ আলোচনাধারার পরিশেষে, অস্বীকারকারী ওই জাতির থেকে যেন প্রশ্ন আসছে, যদি আযাবের এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্যই হয়, তা হলে কী পন্থা অবলম্বন করা যায়? এ প্রশ্ন মনের মধ্যে পয়দা হলেও দুনিয়ার লোভ ও লাভের বস্তুর আকর্ষণ তাদের মধ্যে এ বিষয়ের ওপর প্রত্যয় সৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে রয়েছে, যার কারণে তারা যেন আযাব আসা সম্পর্কে আরও নিশ্চয়তা লাভ করতে চাইছে। যেহেতু এখনও তাদের মধ্যে এ বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেনি, তবু ভেতরে ভেতরে হৃদয় তাদের কেঁপে কেঁপে ফিরছে। তাই এ পর্যায়ে ইতিবাচক জওয়াব দিতে গিয়ে চূড়ান্ত ও অকাট্য ভাবে এবং শপথের ভাষায় বলা হচ্ছে,

'ওরা তোমার কাছে (ভবিষ্যতের সংবাদ) জানতে চাইছে, সত্যিই কি (ওয়াদা করা) সে দিনটি সত্য? বলো, হাঁ, আমার রবের কসম, অবশ্যই হিসাব নিকাশের সে দিন সত্য। কিছুতেই তোমরা ওই কঠিন দিবসের আগমনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।'

'হাঁ, আমার রবের কসম।'

আমার রব তিনি, যিনি তাঁর নিজ মালিকানার মূল্যের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আমি দৃঢ়তার সাথে তাঁর শপথ করে বলছি, নিশ্চিত আমি জানি, তিনিই সকল ক্ষমতার মালিক। তাঁর কসম খেয়ে আমি বলছি,

'অবশ্যই তিনি সত্য, আর কিছুতেই তোমরা তাঁকে সক্ষম করতে পারবে না।'

অর্থাৎ তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করে তোলার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ন সক্ষম। তোমাদের হিসাব নেয়ার ব্যাপারে এবং তোমাদেরকে প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারেও তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। কেউ তাঁকে অক্ষম বানাতে পারবে না। তোমরা যতোই তাঁকে ক্ষমতাহীন বানাতে চাওনা কেন-কিছুতেই কেউই তাঁর ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারবে না।

এদিকে আমরা সাধারণ মানুষেরাও ওদেরই মতো এ দুনিয়াবাসী। আমরাও তাঁর পক্ষে আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করে তোলার ব্যাপারে কৌতূহলী। আমরাও জানতে চাই কিভাবে তিনি আমাদেরকে– আমাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দেহের অংশগুলোকে মাটির মধ্য থেকে বের করে একত্রিত করে জীবিতকরে তুলবেন। আমরাও আল্লাহর কাছ থেকে একথার জওয়াবের প্রত্যাশী আল কোরআন এখানে কেয়ামতের দিন সেই হাশরের ময়দানে কিভাবে আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করে তোলা হবে তার একটা বাস্তব চিত্র এঁকেছে, তা আমরাও বুঝতে চাই। আল কোরআন জানাচ্ছে,

'সে দিনটা হবে এতো ভয়ংকর যে, সেখানকার কষ্ট থেকে বাঁচার জন্যে যে নিজের ওপর যুলুম করেছে সে যদি সারা দুনিয়ার সম্পদের মালিক হয়ে যেতো, তাহলে সে ওই সমুদয় সম্পদ সেদিনকার ওই কঠিন কষ্ট থেকে বাঁচার জন্যে ফিদিয়া স্বরূপ দিয়ে দিতো।'

কিন্তু সেদিন কারো কাছ থেকে কোনো বিনিময়ই গ্রহণ করা হবে না। এটাও বুঝতে কষ্ট হয় না যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত না শরীরের সাথে মানুষের রূহ যোগ হবে, ততোক্ষণ এ বিচার কাজও সমাধা করা হবে না।

আর কেয়ামাত সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত আয়াতে বর্ণিত কথার বাস্তবায়নও পূর্ণাংগভাবে বুঝা যাবে না। কেয়ামতের দিনেই সকল বিচার কার্য পুরোপুরি সমাধা করা হবে। এরশাদ হচ্ছে, 'আর ওরা যখন আযাব দেখবে, তখন ওরা চেষ্টা করবে ওদের অনুতা গোপন রাখতে।'

অর্থাৎ সেদিন হঠাৎ করে আগত এক ভীষণ ভীতি তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। এর ফলে তখনই তাদের নিজেদের ভুল তারা পুরোপুরিই বুঝবে এবং চরমভাবে লজ্জিত হয়ে নিজেদের এ অনুভূতি গোপন রাখার চেষ্টা করতে থাকবে। সেদিন তাদের মনের যাবতীয় সন্দেহ ঘুচে যাবে, সকল সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে, মনে মনে গুমরে মরবে, অনুতপ্ত হবে এবং তাওবা করতে চাইবে, কিন্তু ঠোঁট ফেটে কোনো কথা বেরুবে না! এরশাদ হচ্ছে,

'(এ অবস্থায়) পরিপূর্ণ ইনসাফের সাথে তাদের বিষয়ে ফায়সালা দান করা হবে এবং কোনো প্রকার যুলুম তাদের প্রতি করা হবে না।'

এভাবে আলোচ্য আয়াতের অর্ধেকাংশ থেকে যে দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে ,তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বাস্তবে পুরো আয়াতটার ব্যাখ্যা এখানে শেষ হলো। এভাবে আল কোরআনের বিশেষ বর্ণনাভংগির মাধ্যমে রোয হাশরের ভয়ানক অবস্থা এমন ছবির মতো ফুটে উঠেছে যে, যে কোনো ঈমানদার এ কথাগুলো অধ্যয়ন করবে, তার হৃদয় প্রভাবিত না হয়ে পারবে না।

আলোচ্য আয়াতের বিশেষ শিক্ষা হচ্ছে রোয হাশর ও মহা বিচার দিবস সম্পর্কে মানুষকে স্মরণ করানো। আর একটি শিক্ষা পাওয়া যায়, তা হচ্ছে, আকাশ ও পৃথিবীতে যে সব রহস্য বিরাজ করছে এবং জীবন ও মৃত্যুর যে বিষয়টা সদা-সর্বদা মানুষের জ্ঞাতসারে আসছে এসব কিছু বুঝা বা কাজে লাগানোর কিছু ক্ষমতা মানুষকে দেয়া হয়েছে। এসব কিছু জ্ঞানের এমন ক্ষেত্র যেখান থেকে মানুষ চেষ্টা করলে কিছু না কিছু জানতে বা অর্জন করতে পারে। তারপর দেখা যায় আয়াতটির মধ্যে রয়েছে গোটা জাতির প্রতি এক সাধারণ আহ্বান, যেন মানুষ আল কোরআন

অধ্যয়ন করে এবং এর শিক্ষার অলোকে জীবনের দুর্গম পথ পরিক্রমায় সঠিক ভূমিকা রাখতে পারে। যেহেতু এর মধ্যে রয়েছে উপদেশ, দিক নির্দেশনা এবং মানুষের মানুষের মন মানসিকতার মধ্যে বক্রতা রূপ যে রোগ ব্যাধি রয়েছে, তা নিরাময় করার অতি কার্যকর এক ওষুধ। এরশাদ হচ্ছে,

'শোনো, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর। তিনি সব কিছুর মালিক প্রভু প্রতিপালক ও পরিচালক। শোনো, অবশ্যই, আল্লাহর ওয়াদা সত্য ....বল, এসব কিছু সংঘটিত হচ্ছে আল্লাহর ক্ষমতা ও মেহেরবানীতে। সুতরাং, ওদের খুশী হওয়া দরকার ওরা যা কিছু সঞ্চয় করছে সে সব কিছু থেকে তিনি উত্তম।'

'শোনো.....' আদরের এ আহ্বানের মধ্যে রয়েছে হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চিত জাহেলিয়াত রূপ ব্যাধির এক আরামদায়ক ও কার্যকর ওষুধ। বলা হচ্ছে, 'শোনো, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে, সে সব কিছুর মালিক আল্লাহ তায়ালা।' আর যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত সব কিছুর মালিক, অবশ্যই তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করতে সক্ষম। সুতরাং কোথাও কোনো কঠিন কাজ বা ক্ষমতা এমন নেই, যা তাকে তার ওয়াদা পূরণের ব্যাপারে বাধা দিতে পারে বা কোনো প্রতিবন্ধকতাও এমন নেই যা তাঁর ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। এরশাদ হচ্ছে, 'শোনো, অবশ্যই আল্লাহর ওয়াদা সত্য .... কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।'

আসলে তাদের অজ্ঞানতার কারণেই তারা সন্দেহ করছে এবং নবী (স.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

'আর তিনিই জীবিত রাখেন এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন।'

অর্থাৎ যিনি জীবন মৃত্যুর মালিক, তিনিই আবার জীবিত করতে ও হিসাব গ্রহণ করতে সক্ষম।

'আর তাঁর কাছেই তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।'

এ বাক্যগুলো এতোই সহজবোধ্য যে, অতি শীঘ্র এবং অতি সহজে কেয়ামতের দিনে প্রত্যাবর্তনের অবস্থাটা মনের ওপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

এরপর গোটা মানবমন্ডলীকে সম্বোধন করে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

বলা হচ্ছে, 'হে মানবজাতি, অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এক মহা উপদেশবাণী এসেছে, যা অন্তরসমূহের মধ্যে যে ব্যাধি সৃষ্টি হয়, সেগুলোর জন্যে আরোগ্যস্বরূপ এবং মোমেনদের জন্যে পথ প্রদর্শক ও এক অপার রহমত।'

অর্থাৎ হে মানবজাতি, তোমরা যে কেতাবটি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করছো, তা এসেছে তোমাদের কাছে এক উপদেশমালা হিসাবে, 'তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।' সুতরাং অবশ্যই এটা কোনো মানুষের বানানো কেতাব নয়, আর যা কিছু এর মধ্যে আছে তা কোনো মানুষের পক্ষ থেকে আসেনি। তোমাদের কাছে এ উপদেশমালা এসেছে যেন এর দ্বারা তোমাদের অন্তরগুলো যিন্দা হয় এবং তোমাদের অন্তরসমূহের মধ্যে যে সব আজে বাজে চিন্তা ভরপুর হয়ে রয়েছে, সেগুলোকে দূর করা যায়। তোমাদের মনের গভীরে যে সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে রয়েছে, তা পরিষ্কার করা যায়, যে বক্রতা তোমাদের অন্তরকে অসুস্থ করে রেখেছে, তার থেকে তাকে উদ্ধার করা যায় এবং যে দুশ্চিন্তা তোমাদেরকে সদা সর্বদা অস্থির করে তুলেছে, তার থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করা যায়। এ উপদেশ এসেছে তোমাদেরকে ঈমানের সাথে জীবন যাপন করাতে মুক্তির খবর

শোনাতে, কল্যাণ দিতে, নিশ্চিত বিশ্বাস, নিশ্চিন্ততা এবং শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে। এ নসীহত এসেছে সেই সব ব্যক্তির জন্যে, যাদেরকে সেই ঈমানরূপ নেয়ামত দান করা হয়েছে, যা তাদেরকে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছে দেবে এবং ভ্রান্ত পথ ও আযাব থেকে বাঁচার জন্যে এক রহমত হিসাবে কাজ করবে। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, আল্লাহর মেহেরবানী ও করুণার কারণেই এই মহান কেতাব তোমাদের কাছে এসেছে। অতএব, ওদের খুশী হওয়া উচিত, যা কিছু ওরা জড়ো করছে, সে সব থেকে তিনি উত্তম।'

অতএব, (এটা অবশ্যই বুঝা দরকার) আল্লাহর এই মেহেরবানীর কারণেই তিনি তাঁর বান্দাদেরকে এ কেতাব দিয়েছেন। আর এই দয়ার কারণেই তাদেরকে তিনি ঈমানরূপ নেয়ামত দান করেছেন। সুতরাং এ কারণে একমাত্র তাঁরই শোকরগোযারি করা দরকার, তাঁকেই খুশী করার জন্যে বান্দাহর সদা সর্বদা চেষ্টা করা প্রয়োজন, যেহেতু এটা তাঁরই হক। তাঁর সন্তুষ্টিকে বাদ দিয়ে ধন দওলত বা পার্থিব কোনো লাভের চিন্তা তাদের করা উচিত নয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টাই হচ্ছে সেই মহা খুশী, যা মানুষকে পার্থিব লোভ লালসার হাতছানি থেকে মুক্তি দেয়, রেহাই দেয় তাকে নগদ পাওয়ার আকর্ষণ থেকে। আর তখন পৃথিবীর এই লাভের বস্তুগুলো তার অনুগত খাদেমে পরিণত হয়। তখন সে নিজে তাদের গোলাম থাকে না। সে তখন মানুষকে (মানুষের প্রয়োজন ও কল্যাণকে) সব কিছুর ওপরে স্থান দেয়। মানুষের কথা, দুঃখ বেদনা সে খেয়াল করে শোনে, সে রিপুর অসহায় দাস থাকে না। অবশ্যই একথার অর্থ এটা নয় যে, দুনিয়ার প্রয়োজন ও সুনাম সুখ্যাতির জন্যে মানুষ চেষ্টা করবে না। ইসলাম দুনিয়ার জীবনের প্রয়োজনকে ঘৃণা করে না এবং চায় না যে মানুষ এসব পার্থিব প্রয়োজনকে পরিত্যাগ করে দরবেশী, জীবন যাপন করুক। ইসলাম দুনিয়ার জীবনের যে মূল্যায়ন করে, তা হচ্ছে, আল্লাহর এসব নেয়ামত মানুষের জন্যেই, তারা এসব ভোগ করবে, কিন্তু তাদের হৃদয় হবে উদার, হাত হবে প্রশস্ত, আর পার্থিব বিষয়াদির প্রতি লোভ লালসার ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিকোণ হবে বহু উঁচু এবং দুনিয়ার জীবনের বিষয়াদির জন্যে তাদের আকাংখা ও প্রচেষ্টা হবে সীমিত। তাদের কাছে ঈমানের নেয়ামতই হচ্ছে সব থেকে বড় এবং সকল কিছুর ওপরে ঈমানের দাবীসমূহ পূরণ করাই হচ্ছে তাদের জীবনের আসল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণ করে দুনিয়ার জীবনের সুখ সমৃদ্ধির জন্যে প্রচেষ্টা চালানো হবে তাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং এ ঈমানের কারণেই দুনিয়া হবে তাদের গোলাম– তারা দুনিয়ার গোলাম হবে না। এ বিষয়ে নীচের হাদীসটি চমৎকার ব্যাখ্যা পেশ করেছে।

'সাফওয়ান ইবনে আমর বলছেন, আয়ফা ইবনে আবদুল্লাহ আল কালায়ীকে আমি বলতে শুনেছি, যখন ওমর (রা.)-এর নিকট ইরাক থেকে আদায়কৃত খারাজ এলো, তখন তিনি এবং তার একজন খাদেম এগুলো দেখার জন্যে এগিয়ে গেলেন। তারপর তিনি উঁটগুলো গুণতে শুরু করে দেখলেন যে, যে খারাজ আসার কথা ছিলো, তার থেকে অনেক বেশী এসেছে। তখন তিনি বলতে লাগলেন, যাবতীয় প্রশংসা ও শোকর মহান আল্লাহর (আলহামদু লিল্লাহ) এসময় তাঁর খাদেমও বললো, আল্লাহর কসম, আল্লাহর মেহেরবানী ও দয়া থেকে এটা এসেছে। তখন ওমর (রা.) বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছো, আল্লাহ তায়ালা এটা বলেননি। 'তুমি বলো, আল্লাহর মেহেরবানী ও রহমতেই এটা সম্ভব হয়েছে সুতরাং ওদের খুশী হওয়া দরকার। ওরা যা কিছু জড়ো করছে, সে সব জিনিস থেকে তিনি উত্তম।'

এমনি করে প্রথম যুগের মুসলমানরা জীবনের মূল্যের দিকে তাকাতো। আল্লাহর কাছ থেকে যে উপদেশবাণী ও দিক নির্দেশনা নাযিল হচ্ছিলো, তাকেই তারা মনে করতো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম মেহেরবানী ও প্রথম রহমত। আর আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি কারো ওপর একবার এসে যাওয়ার পর, ধন দওলত, সহায় সম্পদ সকল দিক দিয়ে এবং সবার কাছ থেকে এমনিতেই আসবে, সৌভাগ্য ও সচ্ছলতা তাদের পদচুম্বন করবে। অবশ্যই এ মুসলিম উম্মতের পথস্পষ্ট ও শুভ্র সমুজ্জ্বল। আল কোরআন তাদেরকে এ সুন্দরতম পথ দেখিয়েছে এবং জানিয়েছে যে, এটা সেই পথ, যা ইসলামের প্রথম যুগের লোকেরা তাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছ থেকে বুঝেছে। এটাই সেই একমাত্র মহান পথ, যা আমাদের সবার কাম্য।

জীবন ধারণের জন্যে বস্তুগত যে সব দ্রব্য সামগ্রী রয়েছে এবং যে সব মূল্যবান পদার্থ জীবনকে সমৃদ্ধ করে, সেইগুলোই যে মানুষকে পৃথিবীতে মর্যাদাবান করে তা নয়। তখনই মানুষের প্রকৃত মর্যাদা গড়ে ওঠে, যখন সে আখেরাতের জীবনকে সাফল্য মন্ডিত করার লক্ষ্যে তার জীবনকে পরিচালনা করে। বস্তুগত জীবন সামগ্রী, আরাম আয়েশের দ্রব্যাদি এবং মূল্যবান বস্তুনিচয়ের আকর্ষণ মানুষকে শুধু আখেরাতের জীবনের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে তা নয়, বরং দুনিয়ার বাস্তব জীবনেও তাকে বেইযযত করে ছাড়ে ও লাঞ্ছিত করে, যা আধুনিক বস্তুবাদী সমাজের মলিন চেহারাতে আমরা সাধারণভাবে লক্ষ্য করছি।

বস্তু ছাড়াও আর এক প্রকার মূল্যবোধ আছে, যা মানুষের জীবনকে আকর্ষণ ও প্রভাবিত করে এবং সেই মূল্যবান জিনিসটা মানুষের জীবনে স্থায়ী শান্তি সমৃদ্ধি ও সম্মান বয়ে আনতে পারে।

যে জীবন ব্যবস্থা মানুষের সামষ্টিক জীবনকে সার্থকভাবে পরিচালনা করে, সেটাই তাকে বস্তুগত দ্রব্যাদির মূল্য জানায়, জীবনের সর্বপ্রকার প্রয়োজন মেটানোর পথ দেখায় এবং বস্তুগত সকল দ্রব্য সম্মানজনকভাবে হাসিলে সহায়তা করে। বস্তুর এ মূল্যবোধই তাকে সম্মানজনক পদে সমাসীন করে সৌভাগ্যবান বানায়, আবার কখনো বা হতভাগা জাতিতে পরিণত করে। যেমন করে বস্তুর মূল্যায়ন ও বস্তুর আকর্ষণ মানুষকে উন্নতির পথে এগিয়ে দেয়, তেমনি তার পদস্খলন ঘটিয়ে তাকে রসাতলে ডুবানোর জন্যে পেছন দিকে প্রবল বেগে হাঁকিয়েও নিয়ে যায়!

বস্তুর আকর্ষণ ও বস্তুর ব্যবহারে মানুষের যখন এ হাল অবস্থা তখন, সেই কঠিন সন্ধিক্ষণে এগিয়ে এল মহান এ দ্বীন যার পূর্ণাংগ রূপ প্রকাশিত হয়েছিলো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর রসূল (স.)-এর হাতে আল্লাহ প্রদত্ত আইন কানুন চালু হওয়ার মাধ্যমে এ কেতাব মহীয়ান করলো এ দ্বীনের ধারক বাহকদেরকে এবং প্রতিষ্ঠিত করলো পৃথিবীর বুকে এ দ্বীনের মর্যাদা। এরশাদ হচ্ছে,

'হে বিশ্বের মানুষরা অবশ্যই এসেছে তোমাদের কাছে তোমাদের রব প্রতিপালকের কাছ থেকে এক মহামূল্যবান উপদেশমালা, যা তোমাদের অন্তরের মধ্যে বিদ্যমান (নানা প্রকার) রোগ ব্যাধির জন্যে এক মহা ঔষধ স্বরূপ এবং মোমেনদের জন্যে তা হচ্ছে হেদায়াত (সত্য সঠিক পথের দিশারী) আর মহাদয়াময় আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এ কেতাব হচ্ছে এক বাস্তব করুণা (রহমত)। বলো, (হে রসূল) আল কোরআনের এ অবতরণ হয়েছে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মেহেরবানী ও পরম দয়াতে। সুতরাং আনন্দিত হওয়া দরকার সেই জনতার, যারা আল কোরআন রূপ এ মহা নেয়ামত লাভে ধন্য হয়েছে। অবশ্য তিনি অতি উত্তম সেই সকল জিনিস (ধন সম্পদ ও সম্মান সাম্রাজ্য) থেকে যা ওরা একত্রিত করছে (সংগ্রহ করছে)।'

আর যাদের কাছে সর্বপ্রথম আল কোরআন নাযিল হয়েছিলো, তারা এ অমিয় সুধার ঝর্ণাধারা থেকে আকণ্ঠ পান করেছিলেন এবং ধন্য হয়েছিলেন এ মহামূল্যবান সম্পদ লাভে। এ সম্পদ ও মান মর্যাদারূপ নেয়ামত সম্পর্কে ওমর (রা.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যা বলছেন তা এটা নয়,

'বলো, আল্লাহর মেহেরবানী ও তাঁর দয়াতেই (ওরা এগুলো পেয়েছে)। সুতরাং এজন্যে ওদের খুশী হওয়া দরকার, যা কিছু (ধন সম্পদ ও মান মর্যাদা, ক্ষমতা ও শক্তি) ওরা সংগ্রহ করছে, সে সব কিছু থেকে তিনি উত্তম।'

হযরত ওমর (রা.) (যে তীব্র হৃদয়ানুভূতি নিয়ে দ্বীন ইসলামকে গ্রহণ করেছিলেন) সে দ্বীনকে তিনি সঠিকভাবে বুঝতেন, তিনি জানতেন, যে আল্লাহর মেহেরবানী ও রহমত সেই প্রথম শ্রেণীর মান মর্যাদার প্রতিরূপ, যা দান করার জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের কাছে এ মহান কেতাব নাযিল করেছিলেন। এপাক কালাম তাদের মালিক আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এক মহামূল্যবান উপদেশমালা, তাদের বুকের মধ্যে বিদ্যমান নানা প্রকার জটিল রোগ ব্যাধির নিরাময়কারী মহা ঔষধ এবং মোমেনদের জন্যে এ কেতাব হেদায়াত ও রহমত, মানুষ সাধারণভাবে ধন সম্পদ বলতে অর্থবিত্ত জীবন সামগ্রীর অর্থ নেয়, কিন্তু মোটেই এ আয়াতের ব্যাখ্যা তা নয়।

এ 'দ্বীন' ওদের জন্যে যে আদর্শ নিয়ে এসেছিলো তার থেকে অবশ্যই ওরা জীবনের সঠিক মূল্যবোধ পাচ্ছিলো, যা তাদেরকে সেই জাহেলিয়াতের হীন ও কদর্য অবস্থা থেকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে এসেছিলো, যার মধ্যে তারা এতদিন ধরে হাবুডুবু খাচ্ছিলো। আর প্রত্যেক যামানা ও প্রত্যেক এলাকাতে মূর্খতা ও বাপ দাদার অন্ধ অনুসরণ এমনি করে মানুষকে সত্য থেকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।(১) .... বিংশ শতাব্দীর তথাকথিত আলোকোজ্জ্বল সভ্যতার যুগেও আমরা অনুরূপ জাহেলিয়াত প্রত্যক্ষ করছি।(২)

বস্তুবাদী চিন্তাধারার সাথে ইসলামী চিন্তাধারার পার্থক্য

প্রাচীন জাহেলিয়াতের মধ্যে ইসলাম যে মৌলিক পরিবর্তন এনেছে তা হচ্ছে, আল্লাহর বান্দাদেরকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে, তাদেরকে মুক্ত করেছে সর্বপ্রকার গোলামী থেকে এবং তাদেরকে আল্লাহর দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। তাদের গোটা জীবনকে এক মযবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যা তাদের চিন্তাধারাকে করেছে সমুন্নত, ফিরে পেয়েছে তারা জীবনের হারানো গৌরব। এ মহান দ্বীন তাদেরকে দান করেছে অতি উন্নত চারিত্রিক মূল্যবোধ এবং তাদেরকে গোলামীর যিন্দেগী থেকে মুক্ত করে ভূষিত করেছে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার মর্যাদায়।

এরপর বস্তুগত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস, আরাম আয়েশের বস্তু এবং পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভের উপায় উপকরণ এসব কিছু এ স্বাধীনতারই অবদান। আর মুসলিম জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্বাধীনতার এ মহামূল্যবান সম্পদই তাদেরকে আশপাশের জাহেলিয়াত রূপ জঞ্জালকে ঝেঁটিয়ে বের করে দিতে সক্ষম হয়েছে, তাদের হাতে পৃথিবীর ক্ষমতার চাবিকাঠি তুলে দিয়েছে এবং মানুষকে বানিয়েছে আল্লাহমুখী– যাতে করে তারা তাঁরই মেহেরবানীতে তাঁর কথায় যথাযথভাবে কান দিতে পারে।

আর যারা বস্তুর মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে চলতে চেয়েছে, বস্তুর ফলাফলকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং মহামূল্যবান নৈতিকতার ভিত্তিকে উপেক্ষা করেছে, তারাই প্রকৃতপক্ষে মানবতার শত্রু, তারা চায় না মানুষ পশুত্বের স্তর থেকে মানবতার স্তরে উন্নীত হোক এবং পশুত্বের দাবী দাওয়া থেকে উন্নততর কোনো দাবী করুক।

দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে মুসলমানরা মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে স্বাধীন করার জন্যে আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু ইসলাম সরাসরি মানুষকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি দেয়ার

(১) দেখুন, 'ময়ালিক ফীত্তারীক' গ্রন্থের 'নাকলাতুন বাঈদাতুন' অধ্যায়
(২) দেখুন, উস্তাদ আবুল আলা রচিত কেতাব ইসলাম ও জাহেলিয়াত এবং মোহাম্মদ কুতুব রচিত 'বিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়াত।'

কথা বলেনি বরং তাদের জীবনের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে তুলে ধরেছে ঈমানকে এবং সকল কাজকে আল্লাহর ওপর বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিচালনা করা শিখিয়েছে। তাদেরকে দান করেছে সেই আকীদা, যা তাদের অন্তরকে সম্পর্কিত করেছে পশুসুলভ দাবী দাওয়ার উর্ধে উন্নততর কোনো সত্ত্বার সাথে। অবশ্য এর কারণে তাদের জীবনের মৌলিক প্রয়োজনে মেটানোর দাবী থেকে তারা উদাসীন হয়ে গেছে তাও নয়; বরং জীবনের প্রয়োজন ও জীবন্ত সত্ত্বা হিসাবে খাদ্য বাসস্থান রূপ মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যে অর্থোপার্জনকে ইসলাম উৎসাহিত করেছে।

অপরদিকে দেখা যায়, বস্তুগত দ্রব্যাদি লাভ করার জন্যে মানুষের মধ্যে রয়েছে সার্বক্ষণিক প্রতিযোগীতা ও প্রচেষ্টা এবং এ প্রচেষ্টার ফলে পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য মানুষকে পৃথিবীর জীবনের প্রতি মোহান্বিত করে, তাকে অহংকারী বানায় এবং একদিন মরতে হবে, আল্লাহর নিকট হিসাব দিতে হবে এ কথা ভুলিয়ে দেয়। এভাবে বস্তুবাদিতা ও বস্তুর মহব্বত আল্লাহকে ভুলিয়ে দেয় এবং পরকালের চিন্তা থেকে বিচ্যুত করে তাকে চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান ধারণায় বানায় সামগ্রিকভাবে দুনিয়া পাগল। আজকের যুগে এহেন দুনিয়াকেন্দ্রিক মানুষ এ জীবনকে সাজানো গুছানো ও সুখ সমৃদ্ধিতে ভরপুর করার জন্যে নানা প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তারা মনে করে এ জীবনটাই বড়ো, এটাই আসল। আর সারাক্ষণ এ ব্যস্ততার তুফানে তারা ভুলে যায় যে, এ জীবনেরও কোনো শেষ আছে, আর এর ফলে দেখা দেয় তার আত্মিক ও নৈতিক অবক্ষয়। বস্তুর প্রতি এ আকর্ষণ এবং ভোগ বিলাসী জীবনের জন্যে তীব্র আকাংখা ও প্রচেষ্টা এনে দেয় সার্বক্ষণিক ব্যস্ততা, যা তাকে কখনো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে দেয় না, বরং বস্তুর প্রতি এ মহব্বত তাকে এতোদূর জ্ঞান ও বিবেকহারা করে ছাড়ে জাহেলী যুগের মূর্তি পূজার অন্ধত্বকেও অতিক্রম করে এবং নীতি নৈতিকতার সকল মূল্যবোধ থেকে সরিয়ে এনে তাকে বস্তুর অধিকারী হওয়ার জন্যে পাগলপারা বানিয়ে দেয়!

আর এভাবে বস্তুগত জীবনকে মানুষ সব কিছুর ওপরে প্রাধান্য দিয়ে যখন এ বস্তু লাভের সংগ্রামে চরমভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এ বস্তুপ্রাপ্তির সংগ্রামকে দেবতার মতো পূজা শুরু করে দেয়, অর্থাৎ এর জন্যে জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন এর মোকাবেলায় নীতি নৈতিকতা, মানবতাবোধ পারিবারিক বন্ধন, মান সম্ভ্রম, ধর্ম কর্ম, ইত্যাদি সব কিছু তুচ্ছ হয়ে যায়, এমনকি দেব দেবতাদের পূজা অর্চনাও বস্তুবাদীদের কাছে আজকে মূল্যহীন হয়ে যাচ্ছে। আর এদের ধারণায় মনে হচ্ছে যদি বস্তু স্বার্থ বিঘ্নিত হয়ে যায়, তাহলে কি হবে এসব মানবতা প্রদর্শনে ও পরকালের চিন্তায়, কি হবে ধর্ম কর্ম বা দেব দেবতার পূজায়। দেব দেবতা বলতে পাথর বা কাঠ নির্মিত মূর্তিসমূহই নয়, বরং কোনো কিছুকে মাত্রাতিরিক্ত মূল্যায়ন করা, কোনো কিছু বিষয়কে বেশী গুরুত্ব দেয়া, কোনো নামাঙ্কিত ফলক ব্যবহার করা বা কাউকে অতিরিক্ত মর্যাদা দিতে গিয়ে তার জন্যে বিশেষ বিশেষ খেতাব ব্যবহার করা বস্তুর সাথে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে ওই সব ভাবাবেগ সম্পন্ন মানুষের কাছে যারা এক সময় ওইসব অলীক জিনিসের অন্ধ পূজারী ছিলো, কোনো কিছুরই মূল্য থাকছে না।

প্রকৃতপক্ষে বড় মর্যাদা আল্লাহর মেহেরবানী ও দয়াতেই আসে ও টিকে থাকে এবং এ মর্যাদাই হেদায়াতের প্রতীক যা অন্তরের ব্যাধিসমূহ নিরাময় করে, গোলামীর জিঞ্জির খান খান করে ভেংগে দেয়, আল্লাহর এ হেদায়াতই কোনো জনপদকে বিশ্ব মানবতার কাছে মর্যাদাবান বানায়। এ মহান হেদায়াতের আলোকেই মানুষ সেই অফুরন্ত ভান্ডার থেকে তাদের জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দ্রব্য লাভ করে, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে

রেখেছেন। এ হেদায়াতের পথ অনুসরণ করার ফলেই শিল্পজাত ভান্ডার মানুষের কল্যাণকর কাজে আসে, বস্তুর সঠিক ব্যবহার হয়, কোনো বস্তু পাওয়ার জন্যে কঠিন পরিশ্রম উক্ত জিনিস লাভ সহজ করে দেয়, আর বহু কষ্টে অর্জিত বস্তুর নানামুখী ব্যবহারের আবিষ্কার মানুষের জীবনের কঠোরতা দূর করতে সহায়ক হয় এবং বস্তুর এ সব সঠিক মূল্যায়নই গান বাজনা ও মাটি নির্মিত পুতুল পূজার অলীক গুরুত্ববোধকে ভেংগে চুরমার করে দেয়!

বস্তুর এ সঠিক মূল্যায়ন ও মানব জীবনে এর ব্যবহারের সঠিক চেতনার অভাবে জীবনের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি এবং জীবন যাপনকে সুশৃংখল ও সাবলীল বানানোর উপায় উপকরণ এবং এসব কিছু ব্যবহারের ফলে জীবনে যে সমৃদ্ধি ও শান্তি নেমে আসতে পারে, সে সব কিছু অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়, যার ফলে মানুষ কষ্ট পায়। কেননা এ নেয়ামতের মালিক না চেনায় ও তাঁর দেয়া বস্তুনিচয়কে তাঁর মর্জি মতো ব্যবহার না করায় এসব বস্তু শক্তি আত্মকেন্দ্রিক মানুষের হাতে পশুশক্তি ও যান্ত্রিক শক্তির প্রাধান্য বিস্তারকল্পে ব্যবহৃত হতে থাকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা প্রকৃত সঠিক কথা জানাতে গিয়ে বলছেন,

'হে মানবমন্ডলী, অবশ্যই তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক মহা উপদেশ এসেছে, এটা তোমাদের অন্তরের ব্যাধির ওষুধ এবং মোমেনদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত। বলো, এ উপদেশ এসেছে আল্লাহর মেহেরবানী ও রহমতেই। সুতরাং এজন্যে তাদের খুশী হওয়া উচিত; যা কিছু ওরা সঞ্চয় করছে, তার থেকে তিনি ভালো।'

সংবিধান রচনার অধিকার কোনো মানুষের নেই

এ আলোচনার আলোকে আল্লাহর মেহেরবানী ও রহমত বুঝার চেষ্টা করতে হবে, অর্থাৎ মানবমন্ডলীর জন্যে উপদেশবাণী, হেদায়াত ও বক্ষস্থিত রোগ ব্যাধির ওষুধ স্বরূপ যে সব আয়াত নাযিল হয়েছে তা সবই বান্দার জন্যে আল্লাহর অপার করুণা ও দয়া স্বরূপ এসেছে। এসব কথা জাহেলী মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে। মানুষের এ জেহালাত বা হঠকারিতাই তাদের বাস্তব জীবনকে প্রভাবিত করছে। তাদের হঠকারিতাপূর্ণ এসব চিন্তা ও ব্যবহার গড়ে উঠেছে কুপ্রবৃত্তি ও দুনিয়ার ধাঁধাবাজির কারণে, সেখানে আল্লাহর ইচ্ছা বা সন্তুষ্টির কোনো যোগ নেই। তারা আল্লাহর শক্তি, গুণাবলী ও বৈশিষ্টসমূহের কোনো পরওয়াই করে না, হালাল হারাম সম্পর্কিত যে সব বিধান আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন সেগুলোরও তারা ধার ধারে না।

তাই এ বিষয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, (ওদেরকে, হে রসূল) আল্লাহ রব্বুল আলামীন তোমাদের জন্যে যে সব রিযিক পাঠিয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে কোনোটাকে তোমরা বানাচ্ছ হারাম (নিষিদ্ধ), আর কোনোটাকে বানাচ্ছ হালাল। বলো, এ বিষয়ে তোমাদেরকে কি আল্লাহ তায়ালা কোনো অনুমতি দিয়েছেন? অথবা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তোমরা মিথ্যা বানিয়ে বানিয়ে বলছো? আর যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এভাবে মনগড়া মিথ্যা বলে, কেয়ামত সম্পর্কে তাদের ধারণা কি? অবশ্যই মানুষের জন্যে তিনি বড়ই করুণাময়, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শোকর গোযারি করে না।'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে ওদেরকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করতে বলছেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন, সে সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? আর মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর সুমহান মর্যাদা নিয়ে বড়ই করুণা করে মানুষকে যে মর্যাদা দান করেছেন সে তো একান্তই তাঁর মহানুভবতা। এখন যে রিযিক তিনি তাঁর নিজ খুশীতে এবং নিজ রীতি অনুসারে দিয়েছেন, যাতে করে তোমরা তাঁর অনুমতি ও নিয়মের অধীনে থেকে চলতে পারো। এ বিষয়ে তোমরা কী কারো? এসব কি তোমরা নিজেদের ক্ষমতা বলে অর্জন করেছো, না

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে বরাদ্দ করেছেন বলে পেয়েছো? যেভাবে তোমরা কোনো কোনো বস্তুকে হারাম করে নিচ্ছ এবং কোনো কোনো বস্তুকে হালাল করছো তাতে তো মনে হচ্ছে এগুলো তোমরা নিজেদের ক্ষমতা বলেই অর্জন করেছো। অথচ হারাম হালাল এক বিধান অনুযায়ী হয়েছে, সে বিধান আইনের মর্যাদা রাখে এবং সে আইন মহান শাসক আল্লাহ রব্বুল আলামীনেরই আইন। কিন্তু সে আইনকে উপেক্ষা করে নিজেদের ইচ্ছা মাফিক কোনোটাকে হালাল এবং কোনোটাকে হারাম বানাচ্ছ এ অধিকার তোমাদেরকে কে দিলো? এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা কি তোমাদেরকে এ ক্ষমতা দিয়েছেন? না আল্লাহর ওপর তোমরা মিথ্যা আরোপ করছো?'

বিষয়টা এমন কঠিন যে, এ সম্পর্কে আল কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বারবার উল্লেখ এসেছে এবং জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারীদেরকে এ বিষয়ে চিন্তা করার জন্যে নানা ভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে। এ আলোচনার মাধ্যমে আল্লাহ ছাড়া সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আর কেউ নেই– একথারই সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে, উপরন্ত জীবনের বাস্তব অবস্থাকে সামনে রেখে তুলনামূলক চিন্তা করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

যখনই মানুষ একথা মেনে নেয় যে, আল্লাহ তায়ালাই সবার সৃষ্টিকর্তা এবং রেযেকদাতা, জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল কিছু তিনিই সরবরাহকারী, তখনই এ কথাও চূড়ান্তভাবে স্বীকার করা হয়ে যায় যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিশর্তভাবে যাদের আনুগত্য করা হয়ে থাকে, তারা সবাই আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহ তায়ালাই সবার প্রতিপালক এবং মানুষের যাবতীয় বিষয় ও কাজকে তিনিই পরিচালনা করেন। এ সকল বিষয়ের মধ্যে যে সব রেযেক আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দিয়েছেন তাও অন্তর্ভুক্ত এবং এসব রেযেকের মধ্যে ওই নেয়ামতসমূহ সবই অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ তায়ালা আসমান ও যমীন থেকে দিয়ে থাকেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আরবের জাহেলরা আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করতো এবং আজকের অনেক নাম কাওয়াস্তে মুসলমানের মতো তারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও রেযেকদাতা বলেও মানতো .... এসব স্বীকার করার পরও আল্লাহ তায়ালা যে সব রেযেক তাদেরকে দিয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে মতো খাটিয়ে নিজেদের জন্যে কোনোটাকে হারাম করে নিতো এবং কোনোটাকে বানাতো হালাল যেমন করে আজকের এক শ্রেণীর মুসলমান নামধারী লোকেরা নিজেদের ইচ্ছামতো অনেক হারাম জিনিসকে হালাল বানিয়ে নিচ্ছে এবং বানাচ্ছে বহু হালালকে হারাম। আশ্চর্য, এরপরও তারা নিজেদেরকে 'মুসলমান' বলতে লজ্জা বোধ করে না। তাদের এ পরস্পর বিরোধী অবস্থানের কথা উল্লেখ করে কোরআনুল করীম তাদেরকে সম্বোধন করে বলছে, 'তোমরা আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার অস্তিত্বকে স্বীকার করছো, তাঁকে 'খালেক' ও 'রাজ্জাক' মানছো। এরপরও বাস্তবে তোমরা কিভাবে আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে আইনদাতা বলে মনে করো? কিভাবে তোমরা অন্য কাউকে আইনদাতা বা আইন প্রণয়ন করার যোগ্য মনে করো? তোমাদের মধ্যে যারাই এ পরস্পর বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকবে, তারা অবশ্যই শেরেকের গুনাহের মধ্যে লিপ্ত বলে গণ্য হবে।' এ পরস্পর বিরোধী ভূমিকা যারা যারা গ্রহণ করবে, সে আজ হোক কাল হোক, বা পৃথিবীর জীবনে যে কোনো সময়েই হোক, তারা নির্ঘাত শেরেকের মধ্যে জড়িত– নাম ও বেশভূষা তাদের যাই হোক না কেন! ইসলাম এক চূড়ান্ত সত্য এবং বাস্তবধর্মী জীবন ব্যবস্থা– এটা নিছক কোনো একটা নাম নয়।

আজকের যুগে যেমন এক শ্রেণীর নাম সর্বস্ব মুসলমান নিজেদেরকে মুসলমান মনে করে, তেমনি আরবের জাহেলরাও হারাম হালাল বিষয়সমূহে নিজেদের মন মতো চলেও নিজেদেরকে

ধার্মিক মনে করতো। বলতো, আল্লাহর অনুমতিক্রমেই তারা এটা করছে, অথবা বলতো, এটাই আল্লাহর বিধান!

তাদের এ দাবী সম্পর্কে সূরা 'আনয়াম'-এ বলা হয়েছে, তারা কিছু কিছু জিনিসকে হারাম করে নিতো এবং কোনো কোনো (হারাম) জিনিসকে হালাল করে নিতো– এটা আল্লাহর বিধান অনুসারেই তারা করত বলে দাবী জানাতো। তাই তাদের কথা উদ্ধৃত করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন, 'ওরা বলে, এসব পশু এবং এসব ক্ষেত্র (ও তার ফসল) বৈশিষ্ট্যমন্ডিত, এগুলো থেকে তারাই খাবে যাদেরকে আমরা খেতে দিতে চাই'......... এসব কথা তারা নিজেদের ধারণা ও দাবী থেকেই বলতো– কিছু কিছু পশুর ওপর আরোহণ করাকে তারা হারাম করে নিয়েছিলো, আর কিছু কিছু পশু যবাহ করার সময় নিজেদের খুশী মতো আল্লাহর নাম নিতো না.... শীঘ্রই তাদের এসব মনগড়া কাজের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উচিত সাজা দেবেন।'..... এসব কাজের যুক্তি হিসাবে তারা বলতো, নিশ্চয় এটাই আল্লাহ তায়ালা চান। কিন্তু না, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এসব চান না। এটা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তাদের মনগড়া ধারণা। এসব কথা তারা আজকের কিছু সংখ্যক মুসলমান নামধারী লোকদের মতোই বলতো, তারা নিজেদের পক্ষ থেকেই আইন কানুন তৈরী করতো এবং বলতো এটাই শরীয়তের (আল্লাহর) বিধান। তাদের এ মনগড়া কথার দরুন এখানে আল্লাহ তায়ালা তাদের কথাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করছেন। তারপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে বলছেন, তোমরা যে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এসব মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে বলছো, কেয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের রবকে এসব বিষয়ে কি জওয়াব দেবে বলে মনে করো। এরশাদ হচ্ছে,

'আর আল্লাহর প্রতি যারা মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে, কেয়ামত সম্পর্কে তাদের ধারণা কি?'

দেখুন, এখানে কাউকে সরাসরি সম্বোধন না করে অনুপস্থিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। এর ফলে ওই সকল ব্যক্তিও একথার লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা তৈরী করে বলে– এদের মূলত সবাই একই দলের মানুষ।...... সুতরাং এদের সম্পর্কে আপনারা কী বলেন? কেয়ামতের দিন এদের কী পরিণতি হতে পারে বলে মনে করা যায়। এ হচ্ছে এমন এক প্রশ্ন, যার সামনে যে কোনো ব্যক্তি নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এমনকি শক্ত বা কঠিন প্রাকৃতিক বস্তুসমূহও যেন এ প্রশ্নতে গলে যেতে থাকে। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়, আল্লাহ তায়ালা গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে মেহেরবান কিন্তু, ওদের অধিকাংশই শোকর গোযারি করে না।'

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির আদি থেকেই গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে তাঁর সীমাহীন দয়া ও করুণা বিতরণ করে চলেছেন এবং এ সকল নেয়ামত যাঁর কাছ থেকে এসেছে ওরা তাঁকে তাদের চেতনার মধ্যে খুঁজে বের করতে পারছে, তাদের সুপ্ত বিবেকের কাছে আল্লাহর সেই বিধান অনুভূত হচ্ছে যা শক্তি ক্ষমতার মালিকের কথা জানিয়ে দিচ্ছে। এমনি করে আবার তাদের এ বুঝ শক্তির মধ্যে পরিবর্তন আনার ক্ষমতাও আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দিয়েছেন, ক্ষমতা দিয়েছেন তাদেরকে যে কোনো চিন্তা ধারাকে আমূল পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার ..... সৃষ্টির সব কিছুর ওপর তাদেরকে পরিচালনার, আর এ সমস্ত জিনিস থেকেই তারা পাচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত রেযেক ....।

আর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সম্মানিত করেছেন তাঁর নিজের পক্ষ থেকে বরাদ্দকৃত রেযেক দ্বারা। তিনি মহা দয়াময় গোটা মানবমন্ডলীর ওপর, মহা মর্যাদাবান তিনি, তাই তিনি মানুষকে খেলাফাতের মর্যাদায় ভূষিত করে তাদের কাছে তাঁর নিয়ম অনুযায়ী সত্য সঠিক সরল পথের দিশা পাঠিয়েছেন, যা গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে পথ প্রদর্শক এবং মানব হৃদয়ের মধ্যে উৎপাদিত

ব্যাধির ওষুধ স্বরূপ, এ হেদায়াতনামা মাধ্যমেই তিনি মানুষকে সেই শক্তি ও বিভিন্নমুখী যোগ্যতা দান করতে চান, যা তার অস্তিত্বের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে, চান তাদের চেতনাকে জাগাতে ও তাদের জীবনের গতিপথকে নির্ণয় করতে। তিনিই দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করছেন, যেমন করে তিনি মানব প্রকৃতি ও সেই বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে চলেছেন যার মধ্যে তারা বাস করছে ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আল্লাহর হুকুম পালন করে যাচ্ছে। (১)

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ সব রিযিক এবং অন্য যা কিছু নেয়ামত সে আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছে, সেগুলোর জন্যে শোকরগুযারি করে না। আল্লাহর কাছ থেকে যখন তারা এক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ও শান্তিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি এবং আইন কানুন লাভ করে, তখন এ আইন কানুন রচনায় আরো কারো হাত আছে বলে তারা মনে করে। অর্থাৎ যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনিই বিধানদাতা– একথা তারা মানতে পারে না, বরং তারা মনে করে আল্লাহর আইন জীবন পরিচালনা ও জীবনের উন্নতি বিধানে যথেষ্ট নয়। তাদের বিবেচনায় আইন কানুন তৈরী করার ব্যাপারে মানুষেরও কিছু অধিকার ও কিছু ক্ষমতা অবশ্যই আছে– একথা বলে তারা আল্লাহর ক্ষমতায় মানুষকে অংশীদার বানিয়ে নেয়।..... এভাবে তারা অন্যায় ও সংকটের পথে চলতে শুরু করে দেয়। আর এরই ফলে তারা আল্লাহ প্রদত্ত সর্বাংগীণ সুন্দর জীবন ব্যবস্থা থেকে উপকার হাসিল করতে পারে না, যা অন্তরের রোগ ব্যাধির ওষুধও বটে।

আর অবশ্যই এক গভীর সত্য উপলব্ধির পথে এটা এক চমৎকার ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে.... অবশ্যই এ মহাগ্রন্থ আল কোরআন মানুষের মনে বিদ্যমান রোগ ব্যাধিসমূহের জন্যে নিরাময়কারী ওষুধ, অর্থাৎ সকল অর্থেই আল কোরআন অন্তরের ব্যাধিসমূহ দূর করার জন্যে মহৌষধ। এ পাক কালামের প্রতিটি ছত্র (জাহেলিয়াতের সংস্পর্শে থাকা) ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরসমূহের মধ্যে ধীরে ধীরে এবং অতি সংগোপনে কাজ করতে থাকে এবং মানুষের অজান্তেই এমন প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে দেয়, যা পূর্বাহ্নে কেউই অনুমান করতে পারে না! আল কোরআনের ভাষার সৌন্দর্য, ছন্দের লালিত্য, ঘটনা পরম্পরার সুমধুর বর্ণনাভংগি, যুক্তির শক্তি– এ সব কিছু মিলে দুনিয়া লোলুপ হৃদয়সমূহকে বিমোহিত করে ফেলে। তখন মানুষ এর প্রভাববলয় থেকে নিজেদেরকে আর দূরে সরিয়ে নিতে পারে না এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই জেগে উঠে তাদের ঘুমন্ত বিবেক, তাদের ভাবের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে তারা খুলে দেয় তাদের হৃদয় দুয়ার। তখন তারা সরাসরি মুখোমুখি হয়ে যায় পরম ও চরম সত্যের। এ পর্যায়ে এসে তারা আর স্থির থাকতে পারে না, ভক্তি গদগদ সাড়া দেয় পরম চিত্তে সম্মোহনী শক্তির চরম আকর্ষণে। তাদের মুগ্ধ হৃদয়ের অভ্যন্তরে ধীরমন্থর গতিতে প্রবিষ্ট হয় আল কোরআনে উপস্থাপিত সত্য সঠিক জীবন ব্যবস্থার সুনিপুণ সাংগঠনিক কাঠামো এবং মানব জীবনের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানে প্রদত্ত চূড়ান্ত ভারসাম্যপূর্ণ আইন কানুন বিদগ্ধ হৃদয়গুলোতে ঢেলে দেয় এ মহা পবিত্র বাণী তার অমিয় সুধা, তখন সমস্যা জর্জরিত মানবহৃদয় পরম পরিতৃপ্তির সাথে সে সুধা পান করে ধন্য হয়ে যায় এবং অজ্ঞাতসারে ঝুঁকে পড়ে পরম করুণাময় আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে, যাবতীয় উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দূরীভূত হয় পুলকিত মনে আকাংখিত হয়ে ওঠে তারা সুনিশ্চিত ও সুসামঞ্জস প্রতিদান পাওয়ার আশায়, নিশ্চিত হয়ে যায় সত্যের বিজয়ের সুসংবাদে এবং উন্মুখ হয়ে যায় তাদের হৃদয় সুন্দরতম বাসস্থানের আশ্বাসে।

---

(১) মায়ালেমু ফিতরীক' কেতাবের অধ্যায় 'শারীয়াতু কাওনিয়্যাহ আরো দেখুন, 'হাযাদ্দীনু' কেতাবের মধ্যে 'মিনহাজুন মুতাফাররিদুন' অধ্যায়।

সত্য বলতে কি, আলোচ্য আয়াতটি, অর্থ ও যুক্তি নিয়ে উপর্যুপরিভাবে হতভাগা দিশেহারা মানবমন্ডলীকে এমন উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে চলেছে যা সঠিকভাবে প্রকাশ করা মানুষের কোনো ভাষায় সম্ভব নয়।

কিন্তু হায়, কুক্ষিগত স্বার্থের অন্বেষায় মজে থাকা মানুষ (সাধারণভাবে) এ মহা মূল্যবান ভান্ডারকে তাদের একেবারে মুঠোর মধ্যে পেয়েও তার সঠিক কদর করছে না, মূল্যায়ন করছে না তারা যথাযথভাবে এ মহান নেয়ামতের, যার কারণে তারা মহা মহিম করুণানিধির কাছে নিজেদেরকে সোপর্দ করে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে হচ্ছে ব্যর্থ। অথচ মহান আল্লাহ তাদের সকল গোপন রহস্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় তাঁর জ্ঞানের পরিধির মধ্যে রয়েছে। তিনিই সেই সত্ত্বা, যাঁর জ্ঞানের বাইরে বা দূরে নেই পৃথিবী ও আকাশমন্ডলীর একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুও। আলোচ্য আয়াতে মানব চেতনা ও তার বিবেকের আর একটি নতুন ভাবনাও তুলে ধরা হচ্ছে, যাতে করে মানুষ আল্লাহর রসূল (স.) ও সাহাবায়ে কেরামের দিকে পরম পরিতৃপ্তির সাথে এবং নিশ্চিতভাবে তাকাতে পারে সাহাবায়ে কেরামের দিকে এজন্যে যে, তারা রসূল (স.)-এর সরাসরি পরিচালনায় গড়ে উঠেছিলেন। তাদেরকে কিছুতেই ওই মিথ্যা আরোপকারীরা ক্ষতি করতে পারেনি, যারা তাদের খেয়ালখুশী মতো আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতায় অন্যদেরকে অংশীদার বানিয়ে নিয়েছিলো।

সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তায়ালার উপস্থিতি

'তুমি যে অবস্থাতেই থাকো না কেন, আর কোরআনের যে কোনো অংশ থেকেই পাঠ করো না কেন, আর বাস্তব যে কাজই তুমি করো না কেন, সকল অবস্থাতেই আমি তোমাদেরকে দেখতে থাকি। আমি হাযির থাকি সেখানে, যেখানে তোমরা কোনো কাজে আত্মনিয়োগ করো।......... অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে (আল্লাহকে জানার ও তাঁর কাজ বুঝবার জন্যে) বহু নিদর্শন ওই জাতির জন্যে, যারা (খেয়াল করে) শোনে। (আয়াত ৬১-৬৭)

এ প্রসংগে যে আয়াতগুলো পেশ করা হয়েছে, তার প্রথম দিকে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে চেতনা সৃষ্টি করা হয়েছে। বলা হচ্ছে,

'যে অবস্থাতেই তোমরা থাকো না কেন এবং আল্লাহর কালামের যে কোনো জায়গা থেকেই তোমরা তেলাওয়াত করো না কেন, আর বাস্তব যে কাজই তোমরা কর না কেন, আমি সবই দেখি, হাযির থাকি সেখানে যেখানেই তোমরা কিছু করার জন্যে আত্মনিয়োগ করতে থাকো।(১) .... একথা বুঝতে পারায় মন যেমন নিশ্চিত হয়ে যায়, তেমনি হয়ে যায় ভীত সন্ত্রস্ত। আল্লাহর সাথে একই সাথে মহব্বত ও ভয় ভীতি পয়দা হয়ে যায়। এখন বলুন তো কি অবস্থা হবে মানব সন্তানের যে অনুভব করে যে, আল্লাহ তায়ালা তার সাথে আছেন, তিনি তার কাজ দেখছেন এবং সকল অবস্থায় তিনি তার সাথে হাযির থাকছেন, হাযির থাকছেন মহান আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে, তাঁর শক্তির দাপট নিয়ে, তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা ও শক্তি নিয়ে। আল্লাহ তায়ালা গোটা সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা, তবু তিনি সৃষ্টিকুলের জন্যে অতি সহজ ও সরল। তিনিই ছোট বড় সবার জন্যে সকল কিছু নিরূপণকারী। আল্লাহ তায়ালা গোটা মানব জাতির সাথেই আছেন, আছেন প্রতিটি অণু পরমাণুর সাথে, যা মহা শূন্যে বিচরণ করছে। এসব কিছু বিলীন হয়ে যেতো যদি তাঁর দয়া

(১) কিছু করার জন্যে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করো এবং তার মধ্যে ব্যস্ত হয়ে যাও (তখন বাইরের কোন চিং ভাবনা আর মনের মধ্যে বর্তমান রেখো না।

থাকতো ও তাঁর তদারকী সবাইকে ঘিরে না রাখতো! এটা একটা দূরন্ত চেতনা, কিন্তু একই সাথে এ চেতনার মধ্যে রয়েছে মহব্বতের পরশ ও প্রশান্তি। ভেবে দেখুন, এসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণু পরমাণুকে সৃষ্টি করে এমনি এমনিই ছেড়ে দেয়া হয়েছে তা নয়, এগুলোর কোনো সাহায্যকারী নেই বা মালিক কেউ নেই-তাও নয়, অবশ্যই এগুলোর সাথে আল্লাহ রব্বুল ইযযত আছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'তুমি যে কোনো অবস্থাতেই থাকো না কেন, কোরআন থেকে তুমি যাই পাঠ করো না কেন, আর যে কোনো কাজই তোমরা করো না কেন, সব কিছুই আমি (মহান আল্লাহ) দেখছি, দেখতে থাকি– যখনই তোমরা এগুলো করতে থাকো।'

আল্লাহ তায়ালা এসব শুধু জানেন তাই নয়, বরং তিনি সব কিছুকে পরিচালনা করেন এবং তিনি সব কিছুর তদারকীও করেন। আরো এরশাদ হচ্ছে,

'তোমার রবের ইলম থেকে পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে অবস্থিত কোনো একটি সূক্ষাতিসূক্ষ্ম অণু বা পরমাণু বা এর থেকেও ছোট কোনো জিনিস বা কোনো বড় জিনিস দূরে থাকে না, সবই সুস্পষ্ট কেতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ থেকে যায়।

আর পৃথিবী বা আকাশে যেখানে যতো অণু পরমাণু আছে, সেগুলোর সাথেই মানুষের খেয়ালও সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। এসব কিছুর সাথে আল্লাহর জ্ঞানও সর্বত্র বিরাজ করছে। এসব কিছু ছাড়াও আরো যেসব ছোট বা বড় বস্তু যা কিছু আছে সবই আল্লাহর ইলমের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে ...... এসব বিষয় মানুষ যখন চিন্তা করে, তখন ভয় ভীতির কারণে তার ভাবাবেগ প্রকম্পিত হতে থাকে এবং আল্লাহর মর্যাদার কথা স্মরণ করে ও তাঁর ভয়ে সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। অবশেষে এসব ভয় ভীতি দূর হয়ে তার ঈমান স্থির হয়ে যায় এবং আল্লাহর নৈকট্য ও আদরের পরশ পেয়ে তার প্রকম্পিত হৃদয় হয়ে যায় শান্ত পরিতৃপ্ত।

এমনই এক আদর মহব্বত লাভ করার পরিবেশে এবং আল্লাহর নৈকট্যধন্য হয়ে যখন বান্দার মন শান্ত হয়ে যায় ...... সেই সময়ে নেমে আসে তাঁর প্রকাশ্য ঘোষণা,

'শোনো, অবশ্যই আল্লাহর প্রিয় পাত্র ও বন্ধু যারা, তাদের নেই কোনো ভয় ভীতি এবং তারা দুঃখিতও হবে না। এরা হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি, যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর ভয়ে বাছ বিচার করে চলেছে। তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ দুনিয়ার জীবনে এবং আখেরাতেও। আল্লাহর এসব কথার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হবার নয়। এটাই মহা সাফল্য।'........... (আয়াত ৬২-৬৫)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যখন সংগে আছেন বলে নিজে জানাচ্ছেন তখন কেমন করে আল্লাহর ওলীরা ভয় পাবে অথবা দুঃখিত হবে! এভাবে প্রতিটি অবস্থায়, প্রতিটি কাজে এবং প্রত্যেক নড়াচড়া অথবা স্থির অবস্থার মধ্যে তারা কেমন করে বিচলিত হবে? তারা ও আল্লাহর বন্ধু তাঁর প্রতি বিশ্বাসী, তারা নেককার মানুষ। গোপনে ও প্রকাশ্যে তাঁর সর্বদা তদারকীতে (তারা) রয়েছে বলে তারা মনে করে।

'যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতে থেকেছে।'

কিভাবে তারা ভয় করবে এবং কি ভাবেই বা তারা দুঃখিত হবে, অথচ তারা তো আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। কারণ তারা আল্লাহর বন্ধু? কোন কারণে তারা দুঃখিত হবে আর কিসের জন্যেই বা তারা ভয় করবে। তাদের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতের সুসংবাদ তো রয়েছেই। অবশ্যই তাঁর এ ওয়াদা সত্য, যা কোনো দিন বদলাবে না, আল্লাহর কথায় কখনো কোনো পরিবর্তন নেই। এরশাদ হচ্ছে,

ঐটাই মহা সাফল্য ....

আলোচ্য আয়াতে যে সব ওলীআল্লাহদের সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে, তারাই প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার। তারা তাদের ঈমানের হক আদায় করেছে, তারাই সেই সব মুত্তাকী, যারা তাদের তাকওয়ার সঠিক পরিচয় দিয়েছে এবং তাকওয়াকে বাস্তব কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত করেছে। ঈমান তো হচ্ছে, যা অন্তরের মধ্যে উদ্গত হয়েছে এবং বাস্তব কাজ তার সাক্ষ্য দিয়েছে। আর কাজ হচ্ছে আল্লাহর হুকুমকে বাস্তবায়িত করা এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা..... এভাবেই আমরা 'বেলায়েত' বা আল্লাহর ওলী হওয়ার অর্থ বুঝি, তাদেরকে আমাদের ওলী মনে করি না যাদেরকে সাধারণ মানুষ ভুলক্রমে (তাদের বেশভূষা বা কিছু মেকী কাজের কারণে) ওলী মনে করে!

এ বিবেচনায় এবং এ অর্থে নবী (স.)-কে সম্বোধন করে ওলীদের ব্যাপারে কথা বলা হয়েছে, অথচ তিনি তো ছিলেন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ওলী। তিনি মিথ্যা আরোপকারী ও মিথ্যা প্রস্তুতকারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও নিশ্চিন্ত ও নির্লিপ্ত ছিলেন, অথচ বিরোধী যারা, তারা ওই শক্তি সম্পদ ও মান মর্যাদার অধিকারী ছিলো। এরশাদ হচ্ছে,

'ওদের (বিষাক্ত) ও কঠিন কথা যেন তোমাকে দুঃখে ভারাক্রান্ত না করে। নিশ্চয়ই সকল মান সম্ভ্রমের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই শুনেন, তিনিই দেখেন।'

এখানে একমাত্র আল্লাহকেই ইযযতের মালিক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অন্য জায়গার মতো এখানে মোমেন বা রসূলকেও ইযযতের অধিকারী বলা হয়নি। বলা হয়েছে, সকল মান ইযযতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। আর প্রকৃতপক্ষেই মান সম্ভ্রমের মালিক অবশ্যই একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। আর রসূল এবং মোমেনরা তাঁর কাছেই সাহায্য চায়। একথা বলার উদ্দেশ্য, যেন সকল মানুষ একমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য চায়। সকল মানুষের মধ্যে অহংকারী ও বিদ্রোহী কোরায়শরাও রয়েছে। রসূল (স.) সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহর সাহায্যের মধ্যে সারাক্ষণ আছেন এবং তাঁকে আল্লাহ তায়ালা বানিয়েছেন তাঁর সকল বন্ধুদের বড় বন্ধু। সুতরাং ওই মোশরেকদের কথায় রসূল (স.) যেন দুঃখিত না হন। আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে আছেন এবং তিনি শুনেন তিনি জানেন, যিনি তাদের কথা শোনেন এবং তাদের ষড়যন্ত্র জানেন। যে কোনো তিক্ত কথা বা ষড়যন্ত্রের সময় তিনি তাঁর বন্ধুদের সদা সর্বদা সকল ব্যাপারে সহায়তা করে থাকেন। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে মানুষ, জ্বিন ও ফেরেশতা যতো যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন রয়েছে, যারা তাঁকে ভয় করে চলে এবং যারা তাদের সাথে বিদ্রোহ করে, না ফরমানী করে তাঁর থেকে দূরে সরে যেতে চায়, তারাও তাঁর কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে, তারাও তাঁর নিয়ন্ত্রণে, শাসনের মধ্যে রয়েছে, যারা নিজেদেরকে বেশ শক্তিশালী মনে করে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'শোনো, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যারা আছে, তারা সবাই আল্লাহর, অর্থাৎ সব কিছুর মালিক আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা।'

খেয়াল করুন, এখানে 'মা' ব্যবহার না করে 'মান' ব্যবহার করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে, 'মান' সাধারণত শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখানে 'মান' ব্যবহার করে আল্লাহ তায়ালা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁর নযরে শক্তিশালী ও দুর্বলের পজিশন (ও মূল্য) একই, সবাই সমভাবে তাঁর নিয়ন্ত্রধীনে রয়েছে। আল্লাহর কাছে শক্তিশালী ও দুর্বলের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। অন্যত্র এটাও বলা হয়েছে, 'আর আল্লাহর সাথে অন্য আরো অনেককে

শরীক বানিয়ে, তাকে বাদ দিয়ে যারা অন্যদেরকে সাহায্যের জন্যে ডাকছে, তারা কিসের ওপর আছে?'

এরা তো (আল্লাহর ক্ষমতায়) কল্পিত অংশীদার। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ক্ষমতায় কারো কোনো অংশীদারিত্ব নেই। তারা নিজেরাই তো গোলাম, আল্লাহর ক্ষমতার মধ্যে ওদের কোনো অংশ আছে বলে ওরা যা মনে করে তা নিছক একটা আন্দাজ মাত্র, প্রকৃতপক্ষে ওরাও নিশ্চিতভাবে এটা বিশ্বাস করে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা নিছক আন্দাজ অনুমানের অনুসরণ করছে। প্রকৃতপক্ষে এটা ওদের কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ওরা শুধু কল্পনা বিলাসিতাই করে চলেছে।'

দিন ও রাত সৃষ্টি আল্লাহর এক অপার করুণা

এরপর, বিশ্বের বুকে বিরাজমান আল্লাহর কুদরতের আরো কিছু নিদর্শনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, যেগুলোর দিকে সচরাচর মানুষ খেয়াল করে না এবং স্মরণ করানো হলেও বারবার গাফেল হয়ে যায়। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তিনিই তো তোমাদের জন্যে রাত্রিকে বানিয়েছেন যাতে করে তোমরা (পরম সুখে নিদ্রা গিয়ে) শান্তি পাও এবং দিনকে বানিয়েছেন দেখার জন্যে। অবশ্য এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে সেই জাতির জন্যে, যারা শোনে (বুঝতে চায় ও যারা তাদের বুদ্ধিকে কাজে লাগায়)।

আর অবশ্যই এটা সত্য কথা যে, আল্লাহ তায়ালাই মানুষকে গতিদান ও বিশ্রামের মাধ্যমে শান্তি দান করার মালিক। তিনিই তো রাতের বেলায় বান্দাকে ঘুমানোর ব্যবস্থা দিয়ে শান্তি দান করেছেন। আর দিনকে বানিয়েছেন দেখে শুনে কাজ কর্ম করার সময় হিসাবে। তিনি তাদেরকে যে দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন, সেই শক্তিকে ব্যবহার করে তারা চলাফেরা ও কাজকর্ম করে ...... কাজকর্ম করার জন্যে নড়াচড়ার শক্তি ও নিদ্রার মাধ্যমে শান্তিপ্রাপ্তির নেয়ামত দান করার চাবিকাঠি একমাত্র তাঁর হাতেই রয়েছে। তিনিই মানুষকে পরিচালনা করতে সক্ষম এবং মানুষের দ্বারা মানুষের উপকার করানোর মালিকও তিনি। আর তাঁর প্রিয়পাত্র ও বন্ধু এবং সকল মোমেন ব্যক্তিদের ওপর মোহাম্মদ (স.)-কে সরদারী দান করার মালিকও তিনি। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই যারা শোনে, এমন জাতির জন্যে এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে।' তারা শোনে এবং যা শোনে তার ওপর চিন্তাও করে।

আর যে কোনো বুদ্ধিমান ও জ্ঞানপিপাসু লোকের জন্যে আল কোরআনের মধ্যে উপস্থাপিত বর্ণনা পদ্ধতি ও এর মধ্যে উল্লেখিত অসংখ্য দৃশ্যের বর্ণনা আল্লাহর ক্ষমতা ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে সম্পর্ক জানানোর জন্যে এক বিস্ময়কর ভূমিকা পালন করে। হাঁ, এ মহা বিশ্বের অস্তিত্ব এবং এর মধ্যস্থিত দৃশ্যাবলী আল্লাহর অস্তিত্ব ও ক্ষমতার কথা এমনভাবে প্রমাণ করে, যা রদ করার ক্ষমতা কারো নেই। এভাবে আল কোরআনের বর্ণনায় জানা যায় যে, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে এক নিবিড় বন্ধন এবং তারা তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা বাস্তবে বুঝতে পারে।

অতপর খেয়াল করুন এ রাতের দিকে, কেমন করে এ রাতের অস্তিত্ব মানুষের শান্তি লাভের কারণ হিসাবে ভূমিকা পালন করে। আবার তাকিয়ে দেখুন শুভ্র সমুজ্জ্বল দিনের দিকে। প্রভাকরের আগমনে দিনগুলো যখন ঝলমল করে ওঠে, তখন কিভাবে মানুষ দেখেশুনে কাজকর্ম করার প্রবল স্পৃহা অনুভব করে। এ দুটি অবস্থাই মানুষের সামনে প্রতিদিন আসছে এবং মানুষকে এদের পর্যায়ক্রমে আগমনের প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করাচ্ছে। অবস্থা দুটি মানুষকে একথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, এ অবস্থা দুটির ধারাবাহিক আগমন মানুষের জীবনের জন্যেই শুধু নয়, গোটা অস্তিত্বের জন্যে অপরিহার্য। আর হায়, মানুষ কেন এ আলোচনার দিকে গভীরভাবে মনোযোগ দেয় না এবং বৈজ্ঞানিক যে তথ্যাদির দিকে এখানে ইশারা করা হয়েছে, তা বুঝতে কেনই বা তারা চায় না। কেন বুঝতে চায় না এর অভ্যন্তরীণ প্রকৃতির কথা এবং এর ভাষার মধ্যে নিহিত

রহস্যরাজির কথা!

আর এমনি করে মানুষ এ পর্যন্ত সৃষ্টির ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞই রয়ে গিয়েছিলো। পরিশেষে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো তাদের চোখ খুলে দিলো, যার ফলে এখন মানুষের কাছে সৃষ্টির রহস্যরাজির বহু জট খুলে গেছে। অনাগত ভবিষ্যতে জ্ঞান বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষ সাধন হবে– একথা রব্বুল আলামীন জানতেন বিধায় মহা জ্ঞানী এবং সব কিছু ব্যাপারে ওয়াকেফহাল আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সম্বোধন করে আল কোরআনের মধ্যে এ রহস্যরাজির কথা বলেছেন। এজন্যে এর ভাষায় রয়েছে সেই নতুনত্ব, সেই অর্থের ব্যাপকতা, সেই রহস্যের সন্ধান এবং বিশ্ব প্রকৃতিকে বুঝার জন্যে সেই সব সূক্ষ্ম কথা, যা ইতিপূর্বে অবতীর্ণ কোনো গ্রন্থের মধ্যে ছিলো না বা নেই। আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতো উন্নতি হচ্ছে, ততো বেশী এ রহস্যরাজির দুয়ার মানুষের কাছে উন্মোচিত হয়ে চলেছে। আর যতো বেশী মানুষ এসব রহস্য জানতে পারছে, ততো বেশী তাদের ঈমান পোখতা হয়ে চলেছে, আর ততো বেশী আদিগন্ত পরিব্যাপ্ত আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার নূরের ঝলক মানুষকে মুগ্ধ করে চলেছে।

আল্লাহর উপর কাফের মোশরেকদের মিথ্যা অপবাদ

মিথ্যা যে কথাটা তৈরী করে আল্লাহর সাথে ও তাঁর কাজে অংশীদার মনে করা হয় তা হচ্ছে, মহান আল্লাহ তায়ালা পুত্র সন্তান গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে আরব মোশরেকরা মনে করতো ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা সন্তান।

আলোচ্য এই অধ্যায়ের শেষের দিকে শেরেক ও মিথ্যা বানোয়াট কথার আলোচনা দিয়ে শুরু করে আল কোরআন তার নিজস্ব বিশেষ ভংগিতে এ অপরাধের পরিণতিতে যে ভীষণ শাস্তি রয়েছে, তার বর্ণনা দিয়ে শেষ করেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা বললো, আল্লাহ তায়ালা পুত্র সন্তান গ্রহণ করেছেন, অবশ্যই তিনি এসব দুর্বলতা থেকে পবিত্র, তিনি চির মুখাপেক্ষীহীন। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে, সেসব কিছুর একচ্ছত্র মালিক তো একমাত্র তিনি..........তারপর তাদেরকে আমি স্বাদ গ্রহণ করাবো অত্যন্ত কঠিন আযাবের, যে কুফরী তারা করেছে তার শাস্তি হিসাবে আসবে এ কঠিন আযাব।

যে আল্লাহর পুত্র সন্তান আছে– এটা একটা সাধারণ বিশ্বাস। এধরনের একটা বিশ্বাস ওই সব দুর্বল মানুষের মধ্যে জন্ম নেয়, যাদের দৃষ্টিভংগি একটা নির্দিষ্ট সীমা পার হতে পারে না, তারা মহান আল্লাহর সীমাহীন শক্তি ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পর্কে চিন্তা করতে অক্ষম হয়ে গিয়ে এধরনের একটা ভুল চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছে। তারা তাদের নিজেদের সীমাবদ্ধ অস্তিত্বের ওপর কল্পনা করে ধরে নিয়েছে যে, মানুষ যেমন আদর মহব্বতের ধন হিসাবে পুত্র সন্তান কামনা করে, যদিও ইচ্ছা মতো তারা তা পেতে পারে না, কিন্তু আল্লাহ তো সর্বশক্তিমান, তিনি অবশ্যই পুত্র সন্তান রাখার অধিকারী এবং অবশ্য নিজ খাহেশমতো উপযুক্ত পুত্র সন্তান তিনি গ্রহণ করতে পারেন। আসলে এ চিন্তা মানুষের সীমাবদ্ধ কল্পনাশক্তির ফসল। কিন্তু দুর্বল এসব মানুষ আর একটু অগ্রসর হয়ে এতোটুকু চিন্তা করতে পারেনি যে, মহান, চিরন্তন ও সর্বময় ক্ষমতার মালিকের সন্তান তো সে হতে পারে না, যে মানুষের মতোই ক্ষয় ও লয়ের শেকলে বাঁধা।

মানুষের তো মৃত্যু আছে এবং জীবন তাদের একটা নির্দিষ্ট সীমার অধীন। এহেন সীমাবদ্ধতার জালে আবদ্ধ কোনো সৃষ্ট জীবকে তিনি তাঁর সাহায্যের জন্যে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করলে তো একথা মেনে নিতেই হবে যে, তাঁর সাহায্যের জন্যে কোনো সন্তান প্রয়োজন, আর তা মানলে তিনি চির অভাবমুক্ত, তিনি পরমুক্ষাপেক্ষীহীন– এসব কথা আর বলা যাবে না। বলা যাবে না যে, তিনি সর্বশক্তিমান।

আবার চিন্তা করে দেখুন, মানুষের বয়স বাড়ে, সে বৃদ্ধ হয় এবং ক্রমান্বয়ে বয়সের ভারে দুর্বল হয়ে পড়ে। আর সন্তান মানেই হচ্ছে বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার বিকল্প যুবশক্তি। এ যুবশক্তি তখন তার কাজে আসে, যখন সে বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে শক্তি হারিয়ে ফেলতে চায়, নুয়ে পড়ে এবং সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে যায়। আল্লাহর সন্তান থাকলে তাঁকেও তো এমনি সব দুর্বলতা ও বার্ধক্যজনিত শক্তিহারা হওয়ার অবস্থা মেনে নিতে হবে এবং মানতে হবে যে, তাঁর জীবনেরও একটা শেষ আছে। মানুষ তার সীমাবদ্ধ পরিবেশের মধ্যে টিকে থাকার জন্যে চেষ্টা সাধনা করে, জীব জানোয়ার ও মানুষের মধ্যে তাদের যেসব দুশমন আছে, তারাও নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যে সংগ্রাম করে চলেছে। তাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে, পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন আছে, আর সত্য বলতে কি, এসব অবস্থায় সন্তানরাই সব থেকে বেশী সাহায্য করতে পারে।

আর মানুষ বেঁচে থাকার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা-সাধনা করে যে সম্পদ সংগ্রহ করে, তা আরো বাড়াতে চায়– এটাই তার প্রকৃতির ধর্ম। সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে যে চেষ্টা সে করে, তাতে সন্তানই তাকে সব থেকে বেশী সাহায্য করে.......

এভাবে পৃথিবীতে মানুষের বসতি টিকিয়ে রাখার জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন নানা প্রকার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। অবশেষে মানুষের পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণের নির্দিষ্ট সময় এসে যায় এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর পূর্ব ফয়সালা অনুযায়ী সেই নির্দিষ্ট সময়ে তাকে দুনিয়া থেকে তুলে নেন।

কিন্তু, যিনি সৃষ্টিকর্তা, যিনি সর্বশক্তিমান, যার হাতে সকল ক্ষমতার চাবিকাঠি, যাঁর নিজের কোনো প্রয়োজন নেই, নেই যাঁর কোনো অভাব অভিযোগ, নেই যাঁর কোনো দুর্বলতা, নেই যাঁর কোনো ক্ষয় ও লয়, যিনি আদি ও অনন্ত, ওপরে বর্ণিত মানুষের ওইসব চাহিদার কোনোটাই তাঁর নেই, নেই তাঁর কোনো সাহায্যের প্রয়োজন, নেই বার্ধক্য তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সাহায্যের কোনো প্রয়োজন, কোনো সাহায্যকারীরও তাঁর কোনো দরকার নেই, নেই তাঁর কোনো ধন দৌলতের প্রয়োজন। আর বিপদ আপদে তাঁকে রক্ষা করা বা তাঁর কাজে আসার কোনো প্রশ্নই আসে না। সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় এসব জিনিসের সাথে স্রষ্টা মহান আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই।

এসব কারণেই সন্তান গ্রহণ করার তাঁর আর কোনো প্রয়োজনই থাকে না। কারণ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং সম্পূর্ণ– বাইরের কোনো কিছুরই তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই, যে কারণে সন্তান দরকার হতে পারে। আর মানুষের জন্যে আল্লাহ তায়ালা সন্তান গ্রহণ ও সন্তান পয়দা হওয়ার ব্যবস্থা এ জন্যেই রেখেছেন যে, তাদের প্রকৃতির মধ্যে তিনি এমন কমতি এবং এমন দুর্বলতা রেখে দিয়েছেন যে, সেগুলো পূরণ করার জন্যে সন্তানের প্রয়োজন। কোনো মানুষের সন্তান আগমন অবশ্যই এ প্রয়োজনের কারণেই– এটা কোনো এলোমেলো ব্যবস্থা নয়, সন্তান আগমন নয় কারো কোনো খামখেয়ালীর ফসল। ইচ্ছা করলেই কেউ সন্তান পেতে পারে না এবং একইভাবে ইচ্ছা করলেই কেউ সন্তান আসার পথ বন্ধ করে দিতে পারে না। পূর্ব পরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার অধীনেই সন্তান আগমনের এ প্রক্রিয়া পৃথিবীর বুকে বরাবর চলে এসেছে।

একারণেই ওই জলজ্যান্ত ও ডাহা মিথ্যা কথার জওয়াব দেয়ার প্রয়োজনে বলা হচ্ছে, 'ওরা বলেছে, আল্লাহ তায়ালা সন্তান গ্রহণ করেছেন ..... তিনি।

মহা পবিত্র তিনি (যাবতীয় দুর্বলতার উর্ধে তিনি) ...... তিনি সর্ব প্রকার অভাব থেকে মুক্ত, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সব তো তাঁরই।'

মহা পবিত্র তিনি! এ ভুল ধারণা, এ মিথা বুঝা এবং এ অলীক কল্পনা থেকে তাঁর মহান সত্ত্বার পবিত্রতা ঘোষণাকল্পে বলা হচ্ছে, তিনি মহাপবিত্র! যাবতীয় অভাবের উর্ধে তিনি। তিনি যে কোনো

অর্থে সকল প্রকার দুর্বলতা ও অভাব থেকে মুক্ত। তিনি সেই সকল প্রয়োজনের উর্ধে, যার বর্ণনা ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে, উর্ধে তিনি সেই সকল প্রকার প্রয়োজনের, যার কল্পনা আমরা করতে পারি আর যার কল্পনা আমরা করতে পারি না। সন্তানের অস্তিত্বের প্রয়োজন যে সব কারণে হয়ে থাকে সে সব থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। আর জীবনের জন্যে তো প্রয়োজন সেই সব জিনিসের যার কারণে মানুষ জীবিত থাকে। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, সৃষ্টির মধ্যে কোনো জিনিসকে বিনা উদ্দেশ্যে, বিনা প্রয়োজনে বিনা যুক্তিতে এবং বে-ফায়দাও পয়দা করা হয়নি। যা কিছু আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে আছে, সকল বস্তুই তাঁর শাসনাধীন, আর যে সব জিনিসের জন্যে সন্তানের সাহায্য দরকার, আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার সেই সব জিনিসের মধ্যে কোনোটারই কোনো প্রয়োজন নেই। সুতরাং সন্তান আল্লাহর জন্যে ফায়দাবিহীন ও অর্থহীন, বরং তাঁর সন্তান থাকার কথা বলাটা তাঁর জন্যে একটা উপহাস বৈ আর কিছুই নয়। এসব বে-ফায়দা জিনিস থেকে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র!

কোরআনুল কারীম আল্লাহর প্রকৃতি, তাঁর স্বভাব এবং তাঁর সম্পর্কে যে কোনো ধারণা দান করা থেকে বিরত থেকেছে। মানব প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু কল্পনা করা যায় আল্লাহ তায়ালা তার উর্ধে। অবশ্য যুক্তিবাদীরা তাঁর অস্তিত্ব বুঝার জন্যে বহু চিন্তা ভাবনা করেছে, অপরদিকে দার্শনিকরাও তাঁকে বুঝার জন্যে এবং তাঁর কাজ সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্যে বহু গবেষণা করেছে, কিন্তু তাদের সকল প্রকার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। যেহেতু তিনি মানব প্রকৃতি তথা সৃষ্টি জগতের সকল প্রাণীর প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ উর্ধে। মানুষের ধারণা কল্পনা তো তার আশেপাশের দৃশ্যমান বস্তু ও জীব জানোয়ারদেরকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। তার কল্পনাশক্তি অদৃশ্য কোনো কিছু সম্পর্কে কিইবা করতে পারে।

বাস্তব অবস্থার এ চিত্রকে তুলে ধরে আমরা মহান স্রষ্টা সম্পর্কে আলোচনা শেষ করতে চাই এবং আশা করা যায় এতোটুকু আলোচনা দ্বারা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সন্তান গ্রহণ করার অবাস্তব চিন্তা পরিহার করতে মানুষ সক্ষম হবে এবং তারা চির অভাবমুক্ত আল্লাহ সম্পর্কে আর তাদের কল্পনার ঘোড়াকে ছুটানো থেকে বিরত হবে, যেহেতু তাঁর উপযুক্ত ও সাধারণ মানুষের জন্যে বোধগম্য পরিচয় হচ্ছে, তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে, সবকিছুর এবং সবার মালিক। তাঁর এ পরিচয় দানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ যেন তার সাধ্যের বাইরের বিষয়ে খামাখা চিন্তা করা থেকে বিরত হয়ে যায় এবং অবাস্তব ও অসম্ভব বিষয়ের ওপর তর্ক বিতর্ক করা পরিহার করে, তাদের পক্ষে সহজে বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য বিষয়াদি নিয়ে যেন মাথা ঘামায়।

এরপর আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদেরকে বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা যে সব অলীক বিষয়ের দাবী করছে তা প্রমাণ করার মতো কোনো যুক্তি বা দলীল তাদের কাছে নেই। দলীল অর্থ ক্ষমতার প্রতীক, আর যেহেতু ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর— এজন্যে দলীল পেশ করার অধিকার ও সক্ষমতা একমাত্র তাঁরই রয়েছে এবং তিনিই একমাত্র শক্তিশালী। যে দাবী তোমরা করে থাক তা প্রমাণ করার মতো নেই তোমাদের কাছে কোনো সনদ অর্থাৎ তোমরা যে সব কথা বলছো, তা প্রমাণ করার মতো নেই তোমাদের কাছে কোনো যুক্তি বা কোনো দলীল নেই, যার দ্বারা তোমরা তোমাদের দাবীকে সাব্যস্ত করতে পারো। এরপর বলা হচ্ছে,

'তোমরা কি বলছো এমন সব কথা, যা (প্রকৃতপক্ষে) তোমরা জানো না।'

অর্থাৎ মানুষের পক্ষে অজানা কোনো বিষয় সম্পর্কে কথা বলা এক ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়, যা কোনো বুদ্ধিমান লোকের জন্যে শোভা পায় না। এমতাবস্থায় সৃষ্ট এক জীব মানুষ অসীম মালিক প্রভু ও সকল ক্ষমতার আধার আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে না জেনে কথা বলার দুঃসাহস করে কেমন করে! এটা শুধু অপরাধই নয়, বরং সকল অপরাধের বড় অপরাধ এটা। এর

দ্বারা প্রথমত বান্দার কাছে আল্লাহর যে অধিকার যে সে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করবে এবং তাঁকে তাযীম করবে 'তিনি সন্তান গ্রহণ করেছেন' বলায় তাঁর এ হক নষ্ট করা হয়, কারণ সন্তান গ্রহণ করার এ খাসলাতটি জানায় যে তাঁর লয় আছে, অক্ষমতা আছে, ত্রুটি আছে এবং কিছু দোষ আছে নাউযু বিল্লাহ। মহান আল্লাহ তায়ালা এসব দোষ ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, আর সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে পিতা পুত্রের সম্পর্কের কথা এক মারাত্মক গোমরাহী পথভ্রষ্টতা। এ আচরণ দ্বারা মানুষের জীবনের নানাবিধি সম্পর্ক ও তাদের যাবতীয় লেনদেনকে বিভ্রান্তিকর করে তোলা হয়। এ ধরনের সম্পর্কের চিন্তা দ্বারা তার প্রত্যেকটা কাজ সীমালংঘনের শামিল হয়ে যায়। আর দেখা গেছে, প্রত্যেক যামানাতেই ধর্মযাজকরা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এ ধরনের বহু মিথ্যা ও বানোয়াট কথা চালু করেছে এবং মূর্তিপূজা প্রবর্তনের মাধ্যমে তারা নিজেদের ক্ষমতাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারা এসব নতুন নতুন প্রথা (বিদায়াত) চালু করে গীর্জা বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব কায়েম করেছে। তারা আল্লাহর সাথে ফেরেশতাদেরকেও কন্যা হওয়ার সম্পর্কের কথা জানিয়েছে অথবা দেখা গেছে ঈসা ইবনে মারইয়ামকে আল্লাহর পুত্র আখ্যা দিয়ে আল্লাহর সাথে তাঁর বাপ বেটার সম্পর্ক নিরূপণ করেছে। এ হচ্ছে এক মারাত্মক অপরাধের ইতিহাস। এর থেকেই গড়ে উঠেছে শেরেকের সমস্যা, গড়ে উঠেছে ঈসা (আ.)-এর নামে গীর্জার প্রাধান্য। যেহেতু (কাল্পনিক) পিতার সম্মানের কারণেই তাঁর সম্মান মনে করা হয়েছে) পিতা-পুত্রের এই কাল্পনিক সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত জীবনের সর্ব পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করে ঈসায়ী ধর্মের অনুসারীদেরকে সত্য পথ থেকে বহু দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং তাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। সেখানে জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক কোনো কিছুই আর কাজ করতে পারেনি।

সুতরাং আল্লাহর পুত্র গ্রহণের প্রশ্ন শুধুমাত্র চিন্তা ক্ষেত্রেই বিপর্যয় ডেকে আনেনি, বরং মানুষের গোটা জীবনকে করেছে দিশেহারা। সেখানেও ক্ষমতার ভাগাভাগি করে নেয়া হয়েছে। স্রষ্টার ক্ষমতার কিছু অংশ সৃষ্ট মানুষ হাসিল করেছে বলে মেনে নেয়া হয়েছে এবং এভাবে ক্ষমতার ভাগাভাগি সমাজ জীবনে বহু অন্যায়, অনাচার, অবিচার সৃষ্টি করেছে, যার ফলে সমাজে নেমে এসেছে ব্যাপক বিপর্যয় ও অশান্তি। এর ফলে মানুষ বস্তুকেন্দ্রিক হয়ে গেছে এবং চরমভাবে হারিয়ে ফেলেছে মানবতাবোধ।

এরপর মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের ইসলামী আকীদার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে, যেহেতু এ আকীদার মধ্যে কোনো সন্দেহ বা অস্পষ্টতা নেই। আল্লাহ তায়ালা সবার সৃষ্টিকর্তা, তিনি চিরন্তন, তিনি অমর, তাঁর কোনো সন্তানের প্রয়োজন নেই। আর তাঁর ও গোটা মানবমন্ডলীর মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক— এর থেকে কেউই ব্যতিক্রম নয়। সৃষ্টিজগত, জীবন এবং জীবন্ত সকল প্রাণী অমোঘ নিয়মে বাঁধা। এ নিয়ম কেউই ভাংতে পারে না। এ নিয়মের ব্যতিক্রমও কেউ হতে পারে না, এ নিয়মকে উপেক্ষা করে কেউ কারো সাথে অতিরিক্ত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না। সুতরাং যে স্বেচ্ছায় ও খুশী খুশীতে এ নিয়ম মেনে চলে, অবশ্যই সে সাফল্যমন্ডিত হয়, আর যে এ নিয়ম লংঘন করতে চায়, সে সঠিক পথ থেকে দূরে চলে যায় এবং নানা প্রকার ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এব্যাপারে সকল মানুষের অবস্থা একই প্রকার এবং সবাইকেই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। কেউই সেদিন শাফায়াতকারী হবে না এবং কেউই সে দিন তাঁর শরীক থাকবে না। সবাইকে কেয়ামতের দিন একাকী হাযির হতে হবে এবং প্রত্যেককেই তার নিজের কর্মফল দেয়া হবে। আর তোমার রব কারো প্রতি যুলুম করবেন না।

ইসলামের এ বিশ্বাস অত্যন্ত ব্যাপক ও সুস্পষ্ট, এ বিশ্বাসের মধ্যে কোনো ভুল ব্যাখ্যা দান করার কোনো ক্ষেত্র বা কোনো সুযোগ নেই। জীবনের অসংখ্য বন্ধুর গিরি সংকটে বা কঠিন

কোনো পরিস্থিতিতে কঠোর সংগ্রাম করার সময়ে এবং দুর্বোধ্য কোনো অবস্থার কাছে এ আকীদা আত্মসমর্পণ করতে দেয় না।

পুনরায় জীবিত হয়ে উঠে আল্লাহর সামনে সবাইকে হাযির হতে হবে। রোয হাশরের সেই ময়দানে শরীয়তের হুকুম মতো জীবন যাপন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সবাইকেই প্রশ্ন করা হবে, কারণ শরীয়তের আইন মেনে চলার ব্যাপারে সবাই দায়িত্বশীল। সব বিশ্বাসের ভিত্তিতেই মানুষে মানুষে সুষ্ঠু সম্পর্ক সৃষ্টি হয়— তাদের এ সুন্দর সম্পর্কের কারণেই গড়ে ওঠে তাদের ও আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'বলে দাও (হে রসূল), নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে নানা প্রকার মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে বলে, কিছুতেই তারা সফলতা লাভ করবে না।'

অর্থাৎ তারা কোনো প্রকার সফলতা পাবে না সেই মহা ভয়ংকর দিনে, যখন কেউ কারো আপন হবে না এবং সবাই 'হায়'-'হায়' রব বলে ডাক ছাড়বে। তারা না নিজেদের দলের মধ্যে সাফল্যমন্ডিত হবে, আর না জীবনের পথে চলতে গিয়ে কোনো সফলতা লাভ করবে। এভাবে দুনিয়া ও আখেরাতের কোনো স্থানেই তারা সফল হবে না। আর আসল কৃতকার্যতা তো আসতে পারে একমাত্র আল্লাহর দেয়া জীবন পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করার মাধ্যমেই, যা তাদেরকে কল্যাণের দিকে এগিয়ে দেবে, মানব জাতির উন্নতি বিধান করবে, সমাজকে সংশোধন করবে, জীবনকে করবে সমৃদ্ধ এবং অগ্রগতির দিকে এগিয়ে দেবে। এটা দ্বারা তারা মানবতার মূল্যবোধকে ধ্বংস করে শুধু বস্তুগত উন্নতি বিধানই করবে এবং মানুষকে জীবজন্তুর মনোভাবের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে মানবতাকে পেছনের দিকে ঠেলে দেবে। এভাবে যে সফলতা আসবে তা হবে বাহ্যিক ও সাময়িক সফলতা। এ ধরনের সফলতাকে আলিংগন করলে তা হবে মানব জাতির পূর্ণাংগ সফলতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার শামিল। পূর্ণাংগ সফলতা তো সেই সফলতা, যা তার প্রকৃতিকে পৌঁছে দিতে পারে সৌন্দর্য ও সভ্যতার চূড়ান্ত পর্যায়ে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'দুনিয়ার জীবনে পাবে তারা সুখ সম্পদ। তারপর আমি ঘোষণা করছি, এরপর আমারই কাছে তাদের ফিরে আসতে হবে, তারপর যে কুফরী তারা করেছে, তার শাস্তি স্বরূপ আমি তাদেরকে কঠিন আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাবো— এটাই তাদের উপযুক্ত পুরস্কার।'

অর্থাৎ দুনিয়ার যা কিছু সম্পদ তা নিতান্তই সাধারণ, তা ক্ষণস্থায়ী এ জীবনের অল্প কিছু দিনের জন্যেই। মৃত্যুর সাথে সাথে সম্পদের সাথে এ সম্পর্কের অবসান ঘটবে। কারণ আখেরাতে যে সম্পদ কাজে আসবে তার সাথে এর কোনো দূরের সম্পর্কও নেই। এর পরিণতি হচ্ছে 'কঠিন আযাব'। এটা হচ্ছে আল্লাহর সেই বিধানের অন্তর্গত যার অধীনে সবাই রয়েছে এবং যা মানুষকে সেই সুমহান মর্যাদার স্তরে উন্নীত করবে, যা মানব জাতির জন্যে উপযোগী।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ م إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِىْ
وَتَذْكِيْرِىْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ
ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَىَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٧١﴾ فَاِنْ
تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۙ وَاُمِرْتُ اَنْ
اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٧٢﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ
خَلٰٓئِفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ

রুকু ৮

৭১. (হে নবী,) ওদের কাছে তুমি নূহের কাহিনী শোনাও। যখন সে তার জাতিকে বলেছিলো, হে আমার জাতি, যদি তোমাদের ওপর আমার অবস্থিতি ও আল্লাহর আয়াতসমূহ দ্বারা আমার উপদেশ (প্রদান) খুব দুঃসহ মনে হয়, তবে (শোনে রাখো), আমি (সম্পূর্ণরূপে) আল্লাহর ওপর ভরসা করি, অতপর তোমরা যাদের আমার সাথে শরীক বানাচ্ছো, তাদের (সবাইকে) একত্রিত করে (আমার বিরুদ্ধে তোমাদের) পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে নাও (দেখে নাও), যেন সে পরিকল্পনা (-এর কোনো বিষয় তোমাদের দৃষ্টির) আড়ালে না থাকে, অতপর আমার সাথে (তোমাদের যা করার) তা করে ফেলো এবং আমাকে কোনো অবকাশও তোমরা দিয়ো না। ৭২. (হাঁ,) যদি তোমরা (আমার থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও (তাহলে আমার ক্ষতি হবে না), আমি তো তোমাদের কাছ থেকে (এ জন্যে) কোনো পারিশ্রমিক দাবী করিনি; আমার পারিশ্রমিক– সে তো আমার আল্লাহ তায়ালার কাছে, (তাঁর পক্ষ থেকেই) আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন তাঁর অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। ৭৩. অতপর (এতো বলা-কওয়া সত্ত্বেও) লোকেরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, তখন আমি তাকে এবং তার সাথে যারা নৌকায় (আরোহী) ছিলো, তাদের (তুফান থেকে) উদ্ধার করেছি এবং (যাদের বাঁচিয়ে রেখেছিলাম) আমি তাদের (পূর্ববর্তী লোকদের) প্রতিনিধি বানিয়ে দিয়েছি, (পরিশেষে) যারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে, তাদের আমি (মহাপ্লাবনে) ডুবিয়ে দিয়েছি, অতপর (হে নবী), তুমি (চেয়ে) দেখো, তাদের কী ভয়াবহ পরিণাম হয়েছে, যাদের (বার বার আল্লাহর আযাবের) ভয় দেখানো হয়েছে। ৭৪. আমি তার পর অনেক (কয়জন) রসূলকে তাদের (নিজ নিজ) জাতির কাছে পাঠিয়েছি, তারা (সবাই) সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে নিজ জাতির কাছে এসেছে, কিন্তু এমনটি হয়নি যে, (আগের) লোকেরা ইতিপূর্বে যা অস্বীকার করেছিলো তার ওপর এরা ঈমান আনবে; এভাবে যারা (না-ফরমানীতে) সীমালংঘন করে, তাদের দিলে আমি মোহর মেরে দেই।

الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٧٤﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ

بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ

عِنْدِنَا قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٦﴾ قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا

جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ﴿٧٧﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا

وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ؕ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا

بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٨﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا

جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ

الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨٢﴾ ع

৭৫. তাদের পর আমি আমার সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে মূসা ও হারূনকে ফেরাউন এবং তার পারিষদবর্গের কাছে পাঠিয়েছি, কিন্তু তারা সবাই অহংকার করলো, (আসলে) তারা ছিলো বড়োই না-ফরমান জাতি। ৭৬. আমার পক্ষ থেকে সত্য যখন তাদের কাছে এলো, তখন ওরা বললো, নিশ্চয়ই এ হচ্ছে সুস্পষ্ট যাদু! ৭৭. মূসা বললো, তোমরা কি সত্য সম্পর্কে এসব (বাজে) কথা বলছো, যখন তা তোমাদের কাছে (প্রমাণসহ) এসে গেছে! (তোমরা কি মনে করো) এটা আসলেই যাদু? অথচ যাদুকররা কখনোই সফলকাম হয় না। ৭৮. তারা বললো, তোমরা কি এ উদ্দেশেই আমাদের কাছে এসেছো যে, যা কিছুর ওপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, তা থেকে তোমরা আমাদের বিচ্যুত করে দেবে এবং (আমাদের এ) ভূখন্ডে তোমাদের দু' (ভাই)-য়ের প্রতিপত্তি (প্রতিষ্ঠিত) হয়ে যাবে (না, তা কিছুতেই হবে না); আমরা তোমাদের দু'জনের ওপর কখনো ঈমান আনবো না। ৭৯. (এবার) ফেরাউন (নিজের দলবলকে) বললো, তোমরা আমার কাছে (রাজ্যের) সব সুদক্ষ যাদুকরদের নিয়ে এসো। ৮০. অতপর (ফেরাউনের নির্দেশে) যাদুকররা যখন এসে হাযির হলো, তখন মূসা তাদের (লক্ষ্য করে) বললো, তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা তোমরা নিক্ষেপ করো। ৮১. তারা যখন (তাদের যাদুর বাণ) নিক্ষেপ করলো, তখন মূসা বললো, তোমরা যা নিয়ে এসেছো তা (হচ্ছে আসলেই) যাদু; (দেখবে) অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তা ব্যর্থ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা কখনো ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজকর্ম শুধরে দেন না। ৮২. আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বাণী দ্বারা সত্যকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও না-ফরমান মানুষরা একে খুবই অপ্রীতিকর মনে করে।

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ اَنْ
يَّفْتِنَهُمْ ۭ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٨٣﴾
وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ
مُّسْلِمِيْنَ ﴿٨٤﴾ فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى
مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً
وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۭ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ
فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ
سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا

রুকু ৯

৮৩. ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের ভয়ে মূসার ওপর তার জাতির কতিপয় কিশোর (যুবক) ছাড়া অন্য কোনো লোক ঈমান আনেনি, (অবশ্যই) ফেরাউন ছিলো যমীনের মাঝে অহংকারী (বাদশাহ) এবং (মারাত্মক) সীমালংঘনকারী। ৮৪. মূসা (তার ওপর যারা ঈমান এনেছে তাদের) বললো, হে আমার জাতি, তোমরা যদি সত্যিই মুসলমান হয়ে থাকো, তাহলে (অধৈর্য না হয়ে) যিনি তোমাদের মালিক তোমরা তাঁর ওপর ভরসা করো, যদি তোমরা আল্লাহতে আত্মসমর্পণকারী হও। ৮৫. (মূসার কথায়) অতপর তারা বললো (হাঁ), আমরা আল্লাহর ওপরই ভরসা করি (এবং আমরা বলি), হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের যালেম সম্প্রদায়ের অত্যাচারের শিকারে পরিণত করো না। ৮৬. এবং তোমার একান্ত রহমত দ্বারা তুমি আমাদের (ফেরাউন ও তার) কাফের সম্প্রদায়ের হাত থেকে মুক্তি দাও। ৮৭. আমি (এরপর) মূসা ও তার ভাই (হারূন)-এর কাছে ওহী পাঠালাম, তোমরা তোমাদের জাতির (লোকদের) জন্যে মিসরেই ঘরবাড়ি বানাও এবং তোমাদের ঘরগুলোকে কেবলা (-মুখী করে) বানাও এবং (তাতে) তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো; (সর্বোপরি) ঈমানদারদের (মুক্তির সময় ঘনিয়ে এসেছে মর্মে তাদের) সুসংবাদ দাও। ৮৮. মূসা (আল্লাহ তায়ালাকে) বললো, হে আমাদের মালিক, নিসন্দেহে তুমি ফেরাউন ও তার (মন্ত্রী) পরিষদকে দুনিয়ার জীবনে সৌন্দর্য (-মন্ডিত উপকরণ) এবং ধন-সম্পদ দান করে রেখেছো, (এটা কি এ জন্যে) হে আমাদের মালিক, তারা (এ দিয়ে জনপদের মানুষকে) তোমার পথ থেকে গোমরাহ করে দেবে? হে আমাদের মালিক, তাদের (সমুদয়) ধন-সম্পদ বিনষ্ট করে দাও, তাদের অন্তরসমূহকে (আরো) শক্ত করে দাও, (মূলত) তারা

حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا
تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ
آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ
الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾ آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾ فَالْيَوْمَ
نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ
آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ

একটা কঠিন আযাব (নাযিল হতে) না দেখলে ঈমান আনবে না। ৮৯. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (হাঁ) তোমাদের উভয়ের দোয়াই কবুল করা হয়েছে, অতএব তোমরা (দ্বীনের ওপর) সুদৃঢ় হয়ে (দাঁড়িয়ে) থাকো, তোমরা দু'জন কখনো সেসব লোকের (কথার) অনুসরণ করো না, যারা কিছুই জানে না। ৯০. অতপর (ঘটনা এমন হলো), আমি বনী ইসরাঈলদের সাগর পার করিয়ে দিলাম, এরপর ফেরাউন এবং তার সৈন্য-সামন্ত বিদ্বেষপরায়ণতা ও সীমালংঘন করার জন্যে তাদের পিছু নিলো; এমনকি যখন (দলবলসহ) তাকে সাগরের অথৈ ঢেউ ডুবিয়ে দিতে লাগলো, (তখন) সে বললো, (এখন) আমি ঈমান আনলাম, যে মাবুদের ওপর বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, আমিও (তাঁর) অনুগতদের একজন। ৯১. (আমি বললাম,) এখন (ঈমান আনছো)? অথচ (একটু) আগেই তুমি না-ফরমানী করছিলে এবং (যমীনে) তুমি ছিলে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্যতম (নেতা)। ৯২. আজ আমি তোমাকে (অর্থাৎ) তোমার দেহকেই বাঁচিয়ে রাখবো, যাতে করে তুমি (তোমার এ দেহ) পরবর্তী (প্রজন্মের লোকদের) জন্যে একটা নিদর্শন হয়ে থাকতে পারো; অবশ্য অধিকাংশ মানুষই আমার (এসব) নিদর্শনসমূহ থেকে সম্পূর্ণ (অজ্ঞ ও) বেখবর।

রুকু ১০

৯৩. (ফেরাউনকে ডুবিয়ে মারার পর) আমি বনী ইসরাঈলের লোকদের (বরকতপূর্ণ ও) উৎকৃষ্ট আবাসভূমিতে বসবাস করালাম এবং তাদের জন্যে উত্তম জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করলাম, অতপর তারা (নিজেদের মধ্যে) মতবিরোধ শুরু করে দিলো, এমনকি যখন (দ্বীনের সঠিক) জ্ঞান তাদের কাছে এসে পৌঁছুলো (তারপরও তারা মতবিরোধ থেকে ফিরে এলো না); অবশ্যই তোমার মালিক কেয়ামতের দিন তাদের সেসব বিষয়ের ফয়সালা করে

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَاِنْ كُنْتَ فِىْ شَكٍّ مِّمَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ
اِلَيْكَ فَسْـَٔلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَاۤءَكَ الْحَقُّ
مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ
رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَاۤءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ
الْاَلِيْمَ ﴿٩٧﴾ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَاۤ اِيْمَانُهَاۤ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ؕ
لَمَّاۤ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٩٨﴾ وَلَوْ شَاۤءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ
جَمِيْعًا ؕ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ

দেবেন, যে বিষয়ে তারা (নিজেদের মাঝে) বিভেদ করতো। ৯৪. (হে নবী,) আমি তোমার ওপর যে কেতাব নাযিল করেছি, তাতে (বর্ণিত কোনো ঘটনার ব্যাপারে) যদি তোমার (মনে) কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে সেসব লোকের কাছে (এসব ঘটনা) জিজ্ঞেস করো, যারা তোমার আগে (তাদের ওপর নাযিল করা) কেতাব পড়ে আসছে, অবশ্যই তোমার কাছে তোমার মালিকের কাছ থেকে সত্য এসেছে, তাই তুমি কখনো সন্দেহবাদীদের (দলে) শামিল হয়ো না। ৯৫. আর তুমি তাদের দলেও শামিল হয়ো না যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, (এরূপ করলে) তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। ৯৬. (হে নবী,) অবশ্যই তাদের ব্যাপারে তোমার মালিকের কথা (সত্য) প্রমাণিত হয়ে গেছে, তারা কখনো ঈমান আনবে না। ৯৭. এমনকি তাদের কাছে আল্লাহর প্রত্যেকটি নিদর্শন এসে পৌঁছলেও (তারা ঈমান আনবে এমন) নয়, যতোক্ষণ না তারা কঠিন আযাব (নিজেদের চোখে) দেখতে পাবে। ৯৮. ইউনুস (নবীর) সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য (কোনো) জনপদ এমন ছিলো না, যে (জনপদ আযাব দেখে) ঈমান এনেছে এবং তার এ ঈমান তার কোনো উপকার করতে পেরেছে; তারা যখন আল্লাহর ওপর ঈমান আনলো, তখন আমি তাদের এ পার্থিব জীবনের অপমানকর আযাব তাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিলাম এবং তাদের আমি এক (বিশেষ) সময় পর্যন্ত জীবনের (উপায়) উপকরণও দান করলাম। ৯৯. (হে নবী,) তোমার মালিক চাইলে এ যমীনে যতো মানুষ আছে তারা সবাই ঈমান আনতো; (কিন্তু তিনি তা চাননি, তাছাড়া) তুমি কি মানুষদের জোরজবরদস্তি করবে যেন, তারা সবাই মোমেন হয়ে যায়! ১০০. কোনো মানুষেরই এ সাধ্য নেই যে, আল্লাহর অনুমতি

أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٠﴾ قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠١﴾ فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَانْتَظِرُوْا إِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

ব্যতিরেকে সে ঈমান আনবে; যারা (ঈমানের রহস্য) বুঝতে পারে না, আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তাদের ওপর (কুফুর ও শেরেকের) কলুষ লাগিয়ে দেন। ১০১. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা দেখো, আসমানসমূহ ও যমীনে কি কি জিনিস রয়েছে; কিন্তু যারা ঈমানই আনবে না তাদের জন্যে (আল্লাহর এসব) নিদর্শন ও (পরকালের) সাবধানবাণী কোনোই উপকারে আসে না। ১০২. তারাও কি সে ধরনের কোনো দিনের অপেক্ষা করছে, যে ধরনের (অপমানকর) দিন তাদের আগের লোকদের ওপর এসেছিলো; (যদি তাই হয় তাহলে) তুমি বলো, তোমরা (সেদিনের) অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করতে থাকবো। ১০৩. অতপর (যখন আযাবের সময় আসে তখন) আমি আমার রসূলদের এভাবেই (সে আযাব থেকে) বাঁচিয়ে দেই এবং তাদেরও (বাঁচিয়ে দেই, যারা) ঈমান আনে, আমি আমার ওপর এটা কর্তব্য করে নিয়েছি যে, আমি মোমেনদের (আযাব থেকে) উদ্ধার করবো।

তাফসীর

আয়াত ৭১-১০৩

অতীতে যারা নিজেদের কাছে প্রেরিত রসূলদের অস্বীকার করেছিলো, আলোচ্য সূরার প্রথম ভাগে তাদের পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি উম্মতে মোহাম্মদীকে ইপ্সীত পরীক্ষার লক্ষ্যে তাদের খলীফা বানাবার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

তোমাদের আগে অনেক কয়টি............. *(আয়াত ১৩-১৪)*

এর আগে এ কথারও উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই একেকজন রসূল রয়েছে। যখন তাদের কাছে তাদের রসূল এসে উপস্থিত হয়, তখন সে পূর্ণ ইনসাফসহকারে তাদের মাঝে বিচার ফয়সালা করে। এরশাদ হচ্ছে,

(মনে রাখবে), প্রত্যেক উম্মতের জন্যেই.............. *(আয়াত ৪৭)*

কোরআন মজীদ ওপরে বর্ণিত দু'টি ইংগিতের বিস্তারিত বর্ণনা এখান থেকে শুরু করেছে। তাই প্রথমে হযরত নূহ (আ.)-এর তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে কি ঘটনা ঘটেছিলো তা বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে তার সম্প্রদায়ের কি ঘটনা ঘটেছিলো তাও বর্ণিত হয়েছে। এ দুই ঘটনা বর্ণনার সাথে সাথে তাদের মধ্য থেকে যারা রসূলকে অস্বীকার করেছিলো, তাদের পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আরো উল্লেখ করা হয়েছে ওই সব উম্মতের পরিণামের কথা, যাদের কাছে রসূল এসেছে। তারা দ্বীনের দাওয়াত তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং বিরোধিতার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। এসত্তেও কাফেররা রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

এখানে হযরত ইউনুস (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। তার জনপদের লোকদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব নাযিল হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তারা তার ওপর ঈমান আনায় সেই নাযিল করা শাস্তি তাদের ওপর থেকে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং পরে তারা ঈমান আনার বদৌলতেই বেঁচে যায়। পাশাপাশি এ ঘটনা রসূলের অস্বীকারকারীদের সামনে ঈমানের সৌন্দর্য চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছে, তারা যেন সে আযাব থেকে বাঁচতে পারে, এজন্যে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো। কোনো অবস্থায় যেন তাদের পরিণাম হযরত নূহ এবং হযরত মূসা (আ.)-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের পরিণামের মতো না হয়।

পূর্বের অধ্যায়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রসূল মোহাম্মদ (স.)-কে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন সে সব লোকের পরিণাম সম্পর্কে ঘোষণা দেন যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে এবং তাঁর সাথে শরীক করে। এরশাদ হচ্ছে,

(হে নবী) তুমি বলো, যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে .... (আয়াত ৬৯-৭০)

আল্লাহ তায়ালা রসূলে কারীম (স.)-কে এমর্মে সান্ত্বনা দেয়ার পর ওপরের নির্দেশটি এসেছে।' হে নবী, তাদের কথায় দুঃখ নিয়ো না। আসলে সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর এবং যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোনো ভয় ভীতি আছে, না তারা হতাশ হবে।'

তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূলের ওপর নতুন নির্দেশ এসেছে, তা হচ্ছে, তিনি তাঁর উম্মতের কাছে নূহ (আ.)-এর কাহিনী বর্ণনা করে শুনাবেন, যে কাহিনীর ভেতরে রয়েছে নূহ (আ.)-এর স্বীয় উম্মতকে চ্যালেঞ্জ করা, যারা তাঁর ওপর ঈমান এনেছে, তাদের আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া, পরে ঈমানদারদের যমীনে স্থলাভিষিক্ত করা সর্বোপরি শক্তিশালী এবং অধিক হওয়া সত্তেও অস্বীকারকারীদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত বিবরণ।

এই সূরা এবং এর আলোচ্য বিষয়ের সাথে উপরোক্ত ঘটনাবলী সম্পর্ক সুস্পষ্ট। কোরআনে হাকীম কোনো বিশেষ ঘটনার অবতারণা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পেশ করে। একই ঘটনার অবতারণা যখন বিভিন্ন স্থানে করা হয় তখন তা বিভিন্ন ঢং ও বাচনভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়, যা একান্ত সে স্থানেরই উপযোগী। কোনো সুদীর্ঘ ঘটনা এ কাহিনীর অন্তর্গত বিভিন্ন উপাখ্যান একস্থানে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যা হয় সে স্থানের জন্যেই বিশেষ উপযোগী। আবার সেই একই ঘটনা, অপরস্থানে ভিন্ন উপাখ্যান উল্লেখ করা হয়। কারণ সেই স্থানেরই জন্যে সেই উপাখ্যানই উপযোগী। আমরা হযরত নূহ (আ.) ও মূসা (আ.)-এর ঘটনা এবং হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনার প্রতি যদি তাকাই, তাহলে দেখতে পাই যে, তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের যে রূপ নিয়ে হাযির হয়েছিলো, আরবের মোশরেকরাও রসূল (স.) ও তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারী মুষ্টিমেয় কিছু মুসলমানের সাথে সেই ভূমিকায় নিয়েই হাযির হয়েছে। সে দিক থেকে উভয় ঘটনার মাঝে চমৎকার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমনিভাবে পূর্ববর্তী নবী ও তাদের অনুসারীরা সংখ্যায় নগণ্য হওয়া সত্তেও ক্ষমতাধর শাসক ও তাদের অনুগতদের বিরুদ্ধে অটল ছিলো, তেমনিভাবে রসূল (স.) ও তাঁর অনুসারীরা বীরত্বসহকারে শেরেকপন্থী শাসক ও তাদের অনুগামীদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। আমরা এখানে বিভিন্ন ঘটনা, এদের টীকা টিপ্পনী ও উপসংহারের মধ্যকার সম্পর্কও খুঁজে পাই।

জাহেলী সমাজের প্রতি নূহ (আ.)—এর চ্যালেঞ্জ

(হে নবী) ওদের কাছে তুমি নূহের কাহিনী ....(আয়াত ৭১-৭৩)

হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনার যে উপাখ্যানটি এখানে উপস্থাপন করা হচ্ছে এটি হচ্ছে এ পর্যায়ের সর্বশেষ উপাখ্যান। দীর্ঘ সতর্কীকরণ, ভীতি প্রদর্শন ও উপদেশ দানের পরও যখন নূহের সম্প্রদায় তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করলো, তখন ওপরের আয়াতগুলোতে আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের

প্রতি সর্বশেষ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মারা হলো। এ উপাখ্যানে কিশতি, তার আরোহী এবং তুফান সংক্রান্ত বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করা হয়নি। কারণ এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, নূহ (আ.)-এর পক্ষ থেকে তার বিরোধীদের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া, একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া, রসূল এবং তার নগণ্য অনুসারীদের পানিতে ডুবে মরা থেকে মুক্তি পাওয়া এবং অধিকসংখ্যক অবিশ্বাসীদের ধ্বংস হওয়ার কথা বর্ণনা করা। তাই স্থান এবং আলোচনার চাহিদানুসারে বিরাট ঘটনাকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সেই উপাখ্যানের বিস্তারিত বর্ণনাকে সংক্ষেপে তার সর্বশেষ পরিণতির টেনে আনা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

(হে নবী) ওদের কাছে তুমি নূহের কাহিনী .... (আয়াত ৭১)

তোমাদের অবস্থা যদি এমন সংকীর্ণতার দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়ে থাকে যে, তোমরা তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি, আল্লাহর পথে তোমাদের আহ্বান করা এবং আল্লাহর আয়াত শুনিয়ে শুনিয়ে তোমাদের গাফলতি থেকে জাগিয়ে তোলা এসব কিছু তোমাদের কাছে অসহনীয় মনে হয়ে থাকে তাহলে তোমরা তোমাদের শরীকদের নিয়ে যা ভাল মনে কর তাই করো, আর আমি আমার প্রভুর ওপর ভরসা করে আমার রাস্তায় চললাম। আমি আমার একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করছি।

আমি একমাত্র তাঁরই ওপর ভরসা করলাম এবং তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। তিনিই আমার জন্যে যথেষ্ট– সাহায্যকারী। এখন তোমরা সবাই মিলে নিজেদের কাজ সম্পাদন করো এবং এতে তোমাদের শরীকদেরকে সমবেত করে নাও।

তোমরা তোমাদের কাজ এবং পরিকল্পনার উৎসসমূহকে ভালভাবে চিন্তা ভাবনা করে বেছে নাও এবং তোমরা ও তোমাদের শরীকরা সম্মিলিতভাবে তার প্রস্তুতি গ্রহণ করো।

'যাতে তোমাদের মাঝে নিজেদের কাজের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ সংশয় না থাকে।'

বরং তোমাদের অবস্থান সম্পর্কে নিজেদের অন্তরে স্পষ্ট ধারণা থাকে। তোমরা সম্মিলিতভাবে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছ, তাতে যেন কোনো সন্দেহ সংশয় না থাকে, যাতে তার কোনো একটি দিকও তোমাদের দৃষ্টির আড়ালে না থেকে যায় এবং যাতে করে তার মাঝে কোনো প্রকার ইতস্ততা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ও পিছুটান না থাকে।

'অতপর আমার সম্পর্কে যা কিছু করার করে ফেলো।'

সুতরাং ব্যাপক চিন্তা ভাবনার পর আমার ব্যাপারে তোমরা যে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছো, তা বাস্তবায়ন করে ফেলো।

'এবং আমাকে কোনো প্রকার অব্যহতি দিও না।'

তোমরা আমাকে প্রস্তুতি নেয়ার অবকাশ ও সুযোগ দিও না। আমার পূর্ণ প্রস্তুতি হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করা।

নিসন্দেহে এটা জেদ বাড়ানোর চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ একমাত্র সেই দিতে পারে, যার দু'হাত শক্তিতে পরিপূর্ণ এবং যে তার প্রস্তুতির ব্যাপারে পূর্ণ আস্থাবান, যে তার শত্রুদেরকে তার ব্যাপারে উত্তেজিত করতে পারে এবং সে উত্তেজক উক্তির মাধ্যমে শত্রুদেরকে তার প্রতি আক্রমণ করার জন্যে উৎসাহিত করতে পারে। সুতরাং এ বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত যে, নূহ (আ.)-এর কাছে কি শক্তি এবং প্রস্তুতি ছিলো এবং তখনকার পৃথিবীর কোন শক্তি তার সাহায্যকারী ছিলো?

এ প্রশ্নের জবাবে বলা হবে, নিসন্দেহে হযরত নূহ (আ.)-এর সাথে ঈমান নামক এক মহাশক্তি ছিলো, যার সামনে বিশ্বের সকল শক্তি ক্ষীন ও ম্লান হয়ে গিয়েছিলো। যার সামনে শত্রুদের আধিক্য নিস্প্রভ ও দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো। সর্বোপরি যার সামনে সকল প্রকার পরিকল্পনা বন্ধুদেরকে শয়তানের দোসরদের সামনে এমনিতেই ছেড়ে দিতে পারেন না।

নিসন্দেহে এ শক্তি হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ পাকের ওপর ঈমান আনা। আর যে এ মহান সত্ত্বার ওপর ঈমান আনবে, সে এ গোটা দুনিয়ার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বৃহত্তম শক্তির উৎসের সাথে মিলিত হতে সক্ষম হবে। উপরোক্ত চ্যালেঞ্জ অহমিকা, হঠকারিতা কিংবা আত্মহত্যার কোনোটারই শামিল নয়। বরং এটা হচ্ছে বৃহত্তম শক্তির বিরুদ্ধে নিষ্প্রভ এক দুর্বল শক্তির চ্যালেঞ্জ, এই শক্তি সর্বদাই ঈমানদারদের সামনে ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে।

যুগে যুগে এ পৃথিবীতে প্রেরিত নবী-রসূলদের জীবনীতে আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের জন্যে উত্তম আদর্শ স্থাপিত হয়েছে। তাই তাদের অন্তর কোনো পরিস্থিতিতে আস্থায় পরিপূর্ণ হওয়া উচিত। যে কোনো তাগূতের মুখোমুখি তাদের একমাত্র রাব্বুল আলামীনের ওপরই ভরসা করা উচিত।

আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদেরকে এ তাগুত পীড়া দেয়া ছাড়া আর কোনো প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা পরীক্ষা। এমন নয় যে, তিনি তাঁর বন্ধুদেরকে সাহায্য করতে অক্ষম। এমনও নয় যে, তিনি তাঁর বন্ধুদের হেফাযতের দায়িত্ব বাদ দিয়ে তাদেরকে তাঁর শত্রুদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। বরং এ পরীক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে ভালোভাবে যাচাই বাছাই করা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা এবং ভালোরূপে জেনে নেয়া যে, বিপদাপদে তারা দ্বীনের ওপর কতোটুকু অটুট। অতপর জানা কথাই যে,কালের চাকা মোমেনদের পক্ষেই ঘুরবে। তাদের সাহায্য ও প্রতিষ্ঠিত করার আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হবে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দা নূহ (আ.)-এর ঘটনা মানুষের সামনে বর্ণনা করে শুনাচ্ছেন। তিনি তাঁর যুগের সমস্ত শক্তির সামনে নিম্নোক্ত দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট চ্যালেঞ্জটি ছুঁড়ে মেরেছেন। চলুন আমরা কিছুক্ষণ সেই ঘটনার সাথে সাথে চলি এবং সেখান থেকে তার পরিণতিটাও প্রত্যক্ষ করি। এরশাদ হচ্ছে,

(হাঁ) যদি তোমরা (আমার থেকে) মুখ.............(আয়াত ৭২)

তোমরা যদি আমার নসীহত থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং দূরে সরে পড় এটা তোমাদের ব্যাপার। এতে আমার কোনো ক্ষতি হবে না। এমনও নয় যে, তোমাদের হেদায়াতের জন্যে আমি তোমাদের কাছে বিনিময় ও প্রতিদান চাচ্ছিলাম যে, তোমাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়ার দরুন আমার প্রতিদান কিছুটা কমে যাবে।

'আমার প্রতিদান তো আল্লাহর কাছে।'

তোমাদের এই বিমুখতা এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়া আমাকে আমার আকীদা বিশ্বাস থেকে বিন্দুমাত্র দূরে সরাতে পারবে না। কেউ স্বীকার করুক বা না করুক, আমার গোটা সত্তাকে আল্লাহর দরবারে পূর্ণ সমর্পণের জন্যে আদিষ্ট হয়েছি।

'আমি যেন মুসলমান হিসাবেই থাকি।'

আমি যখন উপরোক্ত হুকুমের সাথে আদিষ্ট হয়েছি, তখন আমি অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। অতপর কি ঘটেছিলো? নিম্নের আয়াতটি পড়লেই আমাদের সামনে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। এরশাদ হচ্ছে,

'তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। ফলে আমি তাকে এবং তার সাথে যারা নৌকায় ছিলো সবাইকে রক্ষা করেছি এবং তাদেরকেই পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছি। আর যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলেছিলো, তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছি।'

এখানে সংক্ষেপে হযরত নূহ (আ.) এবং কিশতীতে আরোহণকারী ঈমানদারদের মুক্তি লাভ, মোমেনদের সংখ্যা কম হওয়া সত্তেও যমীনে তাদের খেলাফতের দায়িত্ব দান এবং অবিশ্বাসীদের শক্তি ও সংখ্যা অধিক হওয়া সত্তেও তাদের পানিতে ডুবিয়ে মারার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

'কাজেই যাদেরকে ভীতি ও সতর্ক প্রদর্শন করা হয়েছিলো (এবং তারপরও তারা মেনে নেয়নি) তাদের পরিণাম কি হয়েছে ভালো করে দেখো।'

যারা অবিশ্বাসী ও যাদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে তাদের পরিণতি প্রত্যক্ষ করতে চায়, তারা যেন তা ভালো করে প্রত্যক্ষ করে এবং যারা মুক্তিপ্রাপ্ত মোমেনদের পরিণাম থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে চায় তারা তা গ্রহণ করতে পারে।

এখানে নূহ (আ.) এবং তার সাথীদের মুক্তির ব্যাপারটি প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ হযরত নূহ (আ.) এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী গুটিকতেক মোমেন অধিকসংখ্যক কাফেরের চ্যালেঞ্জের ভয়াবহতার মুখোমুখি হচ্ছিলেন। সুতরাং পরিণতি শুধু অসংখ্য অবিশ্বাসীর ধ্বংস হয়ে যাওয়াই ছিলো না, বরং তা ছিলো গুটি কতেক মোমেনকে যাবতীয় বিপদাপদ থেকে আগে মুক্তি দেয়া এবং যমীনে তাদের প্রতিষ্ঠা দান করা। তাদের যমীন আবাদ করে তাতে নতুন জীবন দান করে বহু দিন ধরে সে মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার পরিবেশ তৈরী করে দেয়া।

এটাই আল্লাহর বিধান। তাঁর বন্ধুদের প্রতি এটাই হচ্ছে প্রতিশ্রুতি। যদি এ কঠিন পথ মোমেনদের কাছে কখনো দীর্ঘ বলে মনে হয়, তবে তাদের এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হওয়া উচিত যে, এটাই হচ্ছে তাদের একমাত্র পথ। পাশাপাশি এ বিষয়েও একীন করা উচিত যে, আখেরাতের প্রতিফল এবং দুনিয়ার প্রতিনিধিত্ব মোমেনদের জন্যই নির্ধারিত। দ্বীনের দাওযাত দিতে গিয়ে বিচলিত হয়ে পড়লে চলবে না এবং আল্লাহর সাহায্যের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করলেও চলবে না। আল্লাহ তাঁর বন্ধুদের সাথে প্রতারণা করেন না। তিনি তাদের শক্তি দ্বারা সাহায্য করতে অক্ষম নন এবং তিনি কখনো তাদেরকে শত্রুদের কাছে সমর্পণ করবেন না। বরং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি তাদের এ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন যে, কিভাবে দ্বীনের কাজ করতে হবে এবং কিভাবে দ্বীনের পথে অটল থাকতে হবে।

হযরত নূহ (আ.)-এর পর যে সকল নবী রসূলের আগমন ঘটেছিলো, তারা যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শন ও মোজেযাসমূহ তাদের সাথে নিয়ে এসেছিলেন, ভ্রান্ত মিথ্যারোপকারীরা এগুলোকে কিভাবে গ্রহণ করেছিলো, তার সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র আল্লাহ তায়ালা আমাদের সামনে উপস্থাপন করছেন। এরশাদ হচ্ছে,

অতপর (নূহের পর) আমি অনেক কয়জন ....(আয়াত ৭৪)

সেসব রসূল (স.) তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। কোরআনের আয়াত বলছে,

'তারা যে দাওয়াতকে আগেই মিথ্যা বলেছিলো তাকে আর মেনে নিতে প্রস্তুত হলো না।' এখানে একাধিক ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমত, তারা সুস্পষ্ট নিদর্শন ও প্রকাশ্য দলীল প্রমাণাদি আসার পূর্বে যেমনিভাবে মিথ্যারোপ করেছিলো এগুলো আসার পরও এমনিভাবে তারা মিথ্যারোপ করলো। দ্বিতীয়ত, মিথ্যারোপকারীরা সর্বযুগে সর্বকালে একই সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে থাকে। কারণ তাদের স্বভাব এক ও অভিন্ন। সুতরাং তাদের পূর্ববর্তীরা যে বিষয়কে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে অথবা যে বিষয়ে তারা বলেছে যে, স্বয়ং পূর্ববর্তী পূর্ব পুরুষেরা যে ব্যাপারে মিথ্যারোপ করেছে তার প্রতি ঈমান আনা তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়, কারণ তারা তো তাদেরই লোক। তাদের স্বভাব এক। সুস্পষ্ট নির্দশন ও প্রমাণাদির ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা এক ও অভিন্ন। তারা সেসব নিদর্শনা দেখার জন্যে তাদের অন্তরকে উন্মুক্ত করে না এবং বিবেকের সাহায্যে সেগুলোতে চিন্তা ভাবনা করে হৃদয়ংগমও করে না। তারা সীমালংঘনকারী এবং হেদায়াতের ওপর অটল থাকা এবং মধ্যমপন্থার সীমা অতিক্রমকারী। আল্লাহ তায়ালা চিন্তা ভাবনার জন্যে মানব জাতিকে যে বুদ্ধি বিবেক ও অনুভূতি দিয়েছেন, তারা সেটাকে কাজে লাগায়নি। বরং তাকে বিকলাংগ করে দিয়েছে। আর এর দরুন তাদের অন্তরসমূহ এবং তার সকল দ্বার রুদ্ধ হয়ে।

'এভাবে আমি সীমা অতিক্রমকারীদের দিলে মোহর মেরে দেই।'

আল্লাহ পাকের চিরন্তন বিধান হচ্ছে এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি তার অন্তরকে সত্যের দাওয়াত শোনা থেকে স্বেচ্ছায় রুদ্ধ করে ফেলে, তবে সে তাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে তার অন্তর পাথরের ন্যায় স্থবির হয়ে পড়ে। সুতরাং সে অন্তর ভালো জিনিস গ্রহণ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। এর অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত গ্রহণ করা থেকে তাদের অন্তরকে প্রথম থেকেই রুদ্ধ করে রেখেছেন। বরং এটা হচ্ছে আল্লাহর চিরন্তন বিধান–যখন এ ধরনের পরিবেশ পাওয়া যাবে, তখনই এ অবস্থা সৃষ্টি হবে।

ইসলামী আন্দোলনের প্রতি তাগুতের শ্যোণদৃষ্টি

কোরআনে হাকীমে হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনার সূচনা হয়েছে এই মিথ্যাচার ও চ্যালেঞ্জের সূচনা থেকেই। আর তার ইতি টানা হয়েছে মিসরের নীল নদীতে ফেরাউন এবং তার সৈন্যবাহিনীর ঢুবে মারা যাওয়ার মাধ্যমে। হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনার তুলনায় মূসা (আ.)-এর ঘটনা ব্যাপক পরিধিতে বর্ণনা করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (স.) এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারী মুষ্টিমেয় মুসলমানের সাথে মক্কার মোশরেকরা যে ধরনের আচরণ করেছিলো, তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মূসা (আ.)-এর কওমের আচরণকে এখানে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনার যে ধারা এখানে উপস্থাপন করা হচ্ছে, তাকে মোট পাঁচটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। পরে এর সাথে একটি উপসংহার সংযোজিত হয়েছে। এ পর্বগুলো এখানে বর্ণনার পেছনে কি কি কারণ রয়েছে তাও বিবৃত হয়েছে। এ পাঁচটি পর্ব ধারাবাহিকভাবে নিম্নে প্রদত্ত হলো। (আয়াত ৭৫-৭৮)

ফেরাউন এবং তার সরদারদের কাছে যেসব নিদর্শনসহ হযরত মূসা (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন, তার সংখ্যা ছিলো নয়টি, সূরা আল আ'রাফে তা বিবৃত হয়েছে। আলোচনার প্রসংগের কোনো প্রয়োজন না থাকার দরুন সে নিদর্শনসমূহের অবতারণা এবং তার বিস্তারিত বর্ণনা এখানে করা হয়নি। সংক্ষেপে ইংগিত করাই এখানে যথেষ্ট ছিলো। মোট কথা হচ্ছে ফেরাউন এবং তার সরদারদের আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অগ্রাহ্য করার কথা বলা।

'অথচ তারা অহংকার করতে আরম্ভ করলো। বস্তুত তারা ছিলো অপরাধী সম্প্রদায়।'

'পরে যখন আমার কাছ থেকে তাদের সামনে সত্য এসে উপস্থিত হলো।' এখানে 'আমার কাছ থেকে' (আল্লাহর কাছ থেকে) শব্দটি বলার মাধ্যমে তাদের মারাত্মক অপরাধ চিত্রায়িত করাই উদ্দেশ্য, কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সত্য সম্পর্কে উল্টা-পাল্টা মন্তব্য করেছিলো।

'তারা বলে, এতো সুস্পষ্ট যাদু।'

দলীল প্রমাণাদির ওপর অনির্ভরশীল দম্ভপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে একথা বুঝানো হয়েছে যে, এটা এমন এক বাক্য, যা সর্বযুগের মিথ্যারোপকারীদের কাছে অতি পরিচিত। কোরআন এবং মূসা (আ.)-এর মোজেযার মধ্যকার দূরত্ব এবং স্থান কাল ভিন্ন হওয়া সত্তেও কোরায়শ গোত্রের মোশরেকরাও অনুরূপ মন্তব্য করেছিলো। যার বর্ণনা আলোচ্য সূরার সূচনাতে দেয়া হয়েছে।

'মূসা বললো, সত্য যখন তোমাদের সামনে এলো, তখন তোমরা তার সম্পর্কে এমন কথা বলছো? এ কি যাদু? অথচ যাদুকররা তো কখনো সফলকাম হয় না।'

ওপরের আয়াতে মূসা (স.)-এর অস্বীকৃতিপূর্ণ প্রথম প্রশ্নটি উহ্য করে রাখা হয়েছে, যেহেতু দ্বিতীয় প্রশ্নটি প্রথমটির কথা বুঝিয়ে দেয়। যেন মূসা (আ.) তাদের বলেছিলেন, সত্য যখন তোমাদের সামনে এলো, তখন তোমরা তার সম্পর্কে এমন কথা বলছো, এ কি যাদু? প্রথম প্রশ্নে সত্যকে যাদুর দ্বারা আখ্যায়িত করাকে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রশ্নে কেউ সত্যকে যাদু বলে বলুক তাতে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। যাদু মানুষকে সৎপথ দেখায় না। কোনো নির্দিষ্ট

আকীদা বিশ্বাসকে অন্তর্ভুক্ত করে না। যার খোদায়ীত্ব এবং স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্কের কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা নেই, যা জীবনের কোনো সাংগঠনিক বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে না। সুতরাং যাদুকে কখনো এসব জিনিসের সাথে মিলিয়ে দেখা যায় না। যাদুকররা এমন কোনো কাজ করে না, যা উল্লেখিত উদ্দেশ্যসমূহ সাধনে সহায়ক হতে পারে এবং এ ধরনের মিশন বাস্তবায়ন করতে পারে। তারা কখনো কৃতকার্য হয় না। কারণ তাদের সকল কাজই কল্পনাপ্রসূত এবং ভেজালে পরিপূর্ণ। এখানে আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনের সরদারদের কাছে ওই সকল বাস্তব কারণ উন্মোচন করেছেন, যা তাদেরকে আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনসমূহ মেনে নেয়া থেকে বাধা প্রদান করে। এরশাদ হচ্ছে,

তারা বললো, তোমরা কি এই উদ্দেশ্যেই ....(আয়াত ৭৮)

সুতরাং সে আসল কারণটি হচ্ছে, উত্তরাধিকার সূত্রে যে চিন্তা চেতনা ও আকীদা বিশ্বাস তারা পেয়ে আসছে তা ভেংগে চুরমার হয়ে যাওয়ার আশংকা, যার ওপর মূলত তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিলো। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, যমীনের কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশংকা, যে কর্তৃত্ব তারা তাদের পৈতৃক ভ্রান্ত আকীদা থেকে গ্রহণ করেছিলো।

নিসন্দেহে এটা ছিলো এক সার্বজনীন কারণ, যা যুগে যুগে স্বৈরাচারী যালেম শাসকদের, দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নানাবিধ ওযর আপত্তি পেশ করা, আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের প্রতি অপবাদ দেয়া এবং আল্লাহর রাহে আহ্বান ও আহ্বানকারীদের প্রতিরোধ করতে অশ্লীলতার আশ্রয় নেয়ার প্রতি উৎসাহিত করে। নিসন্দেহে সে কারণ হচ্ছে পৃথিবীতে প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য বিস্তার করা। জানা কথাই তা ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রভাব প্রতিপত্তিশালীরা চায় ধারণা কল্পনা এবং কুসংস্কারে পরিপূর্ণ এবং দূর্নীতি ও ভেজালে পরিপূর্ণ ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাস সর্বসাধারণের অন্তরে বিদ্যমান থাকুক। কারণ বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি অন্তর উন্মোচিত হওয়া এবং বুদ্ধি-বিবেকের আলোর দিশা পাওয়াটা পৈতৃক মূল্যবোধের ওপর একটা বিপদ স্বরূপ, স্বৈরাচারী যালেমদের মর্যাদা এবং জনসাধারণের তাদের প্রতি যে ভীতি বিদ্যমান, তার জন্যে ঝুঁকিস্বরূপ এবং যেসব নিয়ম নীতির ওপর এ ভয় ভীতি প্রতিষ্ঠিত এবং নির্ভরশীল, তার জন্যে এটা হচ্ছে বিপজ্জনক। পরিশেষে কল্পনা এবং মূর্তিপূজার ওপর প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বের জন্যেও এটা সমস্যা। যুগে যুগে বিভিন্ন নবী রসূলরা যে এক আল্লাহ এবং দ্বীন ইসলামের প্রতি মানুষকে আহ্বান করেছেন, সেই আল্লাহ ছাড়া মানুষকে অসংখ্য রবের বান্দা ও গোলাম বানাবার ওপর প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বের ওপরও বিরাট আশংকা ও মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা নবী রসূলদের ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্যে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তাদের দাওয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো সারা জাহানের প্রভুত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যে প্রতিষ্ঠিত করা এবং ভ্রান্ত প্রভুদের থেকে মানুষদেরকে। জনসাধারণকে অবমূল্যায়নকারী এসব প্রভুর হক এবং হেদায়াতের বাণী সর্বসাধারণের কাছে পৌছার পথে যারা প্রতিবন্ধক ছিলো এবং ওই সাধারণ ঘোষণার পথেও যারা বাধা দিয়েছিলো, তারা সমগ্র জগতের প্রভুত্ব এক আল্লাহর জন্যে প্রতিষ্ঠা এবং বান্দার দাসত্ব থেকে মানব সমাজকে মুক্ত করার যে বাণী ইসলাম বহন করে নিয়ে এসেছিলো, তার পথেও প্রতি বন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলো। কারণ তারা এটা ভালো করেই জানতো যে, এটা হচ্ছে তাদের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তাদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিপ্লব, তাদের রাজত্বের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং মানব সমাজের জন্যে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতার পানে অগ্রসর হওয়ার এক অমূল্য ঘোষণা।

উল্লিখিত কারণটি মজুত ছিলো সর্বযুগেই। যখনই কেউ মহান রাব্বুল আলামীনের পথে মানব সমাজকে আহ্বান করেছে তখনই তারা একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে।

কোরায়শ গোত্রের প্রতিভাবান পুরুষরা মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালাতের সত্যতা ও মর্যাদা সম্পর্কে যেমন অবহিত ছিলো, তেমনি তারা শেরেকী আকীদা বিশ্বাসের ধস ও ভ্রান্ততা সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকিফহাল ছিলো। কিন্তু তারা তাদের পৈতৃক মর্যাদা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা করতো, যা কুসংস্কার এবং প্রাচীন রীতি নীতিতে পরিপূর্ণ আকীদা-বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। যেমন ফেরাউন সম্প্রদায়ের নেতারা যমীনের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব চলে যাওয়াকে ভয় পেতো। তাই তারা টিটকারীর সুরে বললো, 'তোমাদের উভয়ের কথা আমরা মেনে নিতে প্রস্তুত নই।'

ফেরাউন এবং তার সরদাররা যাদুবিদ্যা বর্ণনায় মত্ত হয়ে পড়লো। তারা সর্বসাধারণকে এ যাদু বিদ্যার সাথে নিমজ্জিত রাখার ইচ্ছা পোষণ করলো। তাই তারা তখনকার সমাজের যাদুকরদের বৈঠক অনুষ্ঠিত করলো, যেখানে তারা তাদের যাদুবিদ্যার দ্বারা মূসা এবং বাহ্যদৃষ্টিতে যাদুসাদৃশ নিদর্শনাবলীকে চ্যালেঞ্জ করে, যাতে জনগনকে বুঝাতে পারে যে, হযরত মূসা (আ.) অভিজ্ঞ যাদুকর বৈ আর কিছুই নয়। পৈতৃক আকীদা বিশ্বাস এবং যমীনের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব অবসানের যে আশংকা তারা করেছিলো এর মাধ্যমে একদিন তার অবসান ঘটবে। ফেরাউন সম্প্রদায় প্রত্যাশিত এই প্রকৃত বিপদে অনুভূতি ব্যক্ত করাই যাদুকরদের সম্মেলন অনুষ্ঠানের বাস্তব কারণ ছিলো। এরশাদ হচ্ছে,

(এবার) ফেরাউন (নিজের দলবলকে) বললো, তোমরা .... (আয়াত ৭৯-৮২)

আমরা এখানে একটি ছোটো খাটো প্রতিযোগিতা প্রত্যক্ষ করছি। এর পরিণাম এখানে মূসা (আ.)-এর উক্তিতে বর্ণিত হয়েছে, 'তোমরা যা কিছু নিক্ষেপ করেছো এগুলো যাদু।'

হযরত মূসা (আ.)-কে যাদুকর বলে যে অপবাদ দেয়া হয়েছিলো এখানে তা খন্ডন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছিলেন। তা যাদু নয়, বরং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য নিদর্শনাবলী। ফেরাউনের যাদুকররা মূসার সামনে যা পেশ করেছিলো তাই ছিলো যাদু। কারণ যাদু তো কল্পনা, হাতের চালাকি এবং চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। যার উদ্দেশ্য মানুষের বিবেকের সাথে খেল তামাশা এবং কৌতুক করা। যার সাথে কোনো সত্যের আহ্বান সংযোজিত হয় না এবং যার ওপর কোনো আন্দোলনও প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র কালামে ঘোষণা করেন, 'আল্লাহ তায়ালা অচিরেই একে ব্যর্থ করে দিবেন।'

এখানে মোমেনের আস্থা পরিস্ফুটিত হয়েছে যে, তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও আস্থাশীল এবং তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, তাদের প্রভু যাদুবিদ্যা সফলকাম হোক– এটা কখনো চাবেন না। কারণ এটা অশুদ্ধ ও অঠিক কাজ। এরশাদ হচ্ছে,

'ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজকে আল্লাহ সার্থক হতে দেন না।'

ফাসাদ সৃষ্টিকারী হচ্ছে তারা, যারা মানুষকে যাদু বা অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে পথভ্রষ্ট করে। অথবা ফাসাদ সৃষ্টিকারী হচ্ছে ফেরাউনের সরদার ও নেতারা, যারা বিপর্যয় সৃষ্টি এবং ভ্রান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উদ্দেশ্যে যাদুকরদের নিয়ে এসেছিলো।

'আল্লাহ তায়ালা তাঁর ফরমান ও নির্দেশের সাহায্যে সত্যকে সত্য করেই দেখিয়ে দেন।'

তাঁর সৃষ্টি সংক্রান্ত ফরমান হচ্ছে, যখন তিনি কোনো বস্তু হয়ে যাওয়ার নির্দেশ করে বলেন, 'হয়ে যাও, সাথে সাথে তা হয়ে যায়।'

এটা আল্লাহর কোনো কিছু উদ্ভাবন করার অভিলাষ অথবা তাঁর ফরমান হচ্ছে তার সুস্পষ্ট আয়াত এবং নিদর্শনসমূহ। 'যদিও অপরাধীরা তা পছন্দ করে না।'

তাদের অপছন্দ আল্লাহর ইচ্ছাকে বিনষ্ট করে না এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের সামনে প্রতিবন্ধক হিসাবেও দাঁড়ায় না। সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং যাদুবিদ্যার ভ্রান্ততা মানুষের কাছে দিবালোকের

হিসাবেও দাঁড়ায় না। সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং যাদুবিদ্যার ভ্রান্ততা মানুষের কাছে দিবালোকের মতো পরিষ্কার হলো। এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র না থাকার দরুন এ সংক্রান্ত আলোচনা এখানেই শেষ করা হচ্ছে।

ঈমানের পথে যুবকদের অগ্রণী ভূমিকা

এখানে হযরত মূসা (আ.)-এর ওপর যারা ঈমান এনেছিলো, তাদের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, তারা ছিলো সমাজের গুটিকতেক নওজোয়ান। বয়োবৃদ্ধরা এতে অংশগ্রহণ করেনি। হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনার শিক্ষণীয় বস্তুর এটি অন্যতম। এরশাদ হচ্ছে,

মূসার ওপর তার জাতির কতিপয় কিশোর .... (আয়াত ৮৩-৮৭)

আলোচ্য আয়াতগুলো বর্ণনা করছে যে, বনী ইসরাঈলদের মধ্য হতে যারা হযরত মূসা (আ.)-এর ওপর ঈমান এনেছিলো এবং তার আনীত নতুন দ্বীনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলো, তারা ছিলো কিশোর এবং যুবক সম্প্রদায়। বনী ইসরাঈলের সকল স্তরের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেনি। ফেরাউনের ভয়ে এবং তাদের নিজেদেরই কওমের প্রতাপশালী নেতৃস্থানীয় লোকদের ভয়ে তাদের আশংকা ছিলো ফেরাউন তাদের ওপর নির্যাতন চালাবে এবং মূসার আনুগত্য থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনবে। কারণ ফেরাউন যেমন ছিলো ব্যাপক কর্তৃত্বের অধিকারী ও প্রতাপশালী, তেমনি ছিলো মাত্রাতিরিক্ত যালেম। যালেম কোনো নির্দিষ্ট সীমানায় অবস্থান করে না এবং কঠোর কোনো পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে না।

এখানে এমন ঈমানের কথা বলা হয়েছে, যা ভয়-ভীতিকে ভ্রূক্ষেপ করে না, বিপদে আপদে মনকে সান্ত্বনা দেয় এবং যে সত্যকে সত্য বলে জ্ঞান করে তার ওপর তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে।

'আর মূসা বললো, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যদি আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাকো, তবে তাঁরই ওপর ভরসা করো– যদি তোমরা ফরমাবরদার হয়ে থাকো।'

আল্লাহর ওপর ভরসা হচ্ছে সত্যিকার ঈমানের পরিচায়ক ও দাবী। শক্তির উপাদান ও উৎস, যা সীমালংঘনকারী যালেম শাসকের সামনে অসহায় দুর্বল গুটিকতেক ঈমানদারের ভান্ডারে এসে সংযোজিত হয়, মূসা (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের সামনে ঈমান এবং ইসলাম উভয়ের উল্লেখ করেছেন এবং আল্লাহর ওপর ভরসাকে ঈমান এবং ইসলামের দাবী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। অনুরূপভাবে এ তাওয়াক্কুল হচ্ছে আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস, আত্মাকে তাঁর কাছে পূর্ণ সমর্পণ এবং সে অনুসারে আমল করার নাম।

নবীদের মুখে ঈমানের আহ্বানে যে মোমেনরা সাড়া দিয়েছিলো, তারা জবাবে বললো, আমরা আল্লাহরই ওপর ভরসা করলাম।'

অতপর তারা আল্লাহর দরবারে এ বলে দোয়া করলো, 'হে আমাদের রব। আমাদেরকে যালেমদের নির্যাতনের শিকারে পরিণত করো না।'

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক তাদেরকে যালেমদের নির্যাতনের শিকার না করার দোয়ার অর্থ হচ্ছে, তিনি যেন তাদেরকে মুসলমানদের ওপর প্রভাবশালী এবং প্রভাব বিস্তারকারী না করেন, যাতে সাধারণ মানুষ এ ধারণা করে না বসে যে, আল্লাহ তায়ালা বিধর্মীদেরকে মুসলমানের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তার অর্থ হচ্ছে বিধর্মীদের আকীদা বিশুদ্ধতম বিধায় তারা যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে এবং মোমেনরা পরাজয় বরণ করেছে। এটা মূলত একটা ফেতনার নামান্তর। যার ফলে তারা তাদের গোমরাহীতে আরো বেশী ঝুঁকে পড়বে। সুতরাং মোমেনরা আল্লাহর দরবারে এ দোয়া করে যে, তাদের ওপর যালেমদের প্রাধান্য বিস্তার করা থেকে তিনি যেন তাদেরকে হেফাযত করেন। উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে পরবর্তী আয়াতটি প্রথম আয়াতটির চেয়েও স্পষ্ট।

মোমেনদেরকে যালেম সম্প্রদায়ের নির্যাতনের শিকারে পরিণত না করা এবং তাদেরকে তাঁর রহমতের সাহায্যে কাফেরদের হাত থেকে রক্ষা করাটা কিন্তু আল্লাহর ওপর ভরসা করা এবং তাঁর দ্বারা শক্তিশালী হওয়াকে কিন্তু নিষেধ করে না। বরং এটা আল্লাহর প্রতি ভরসা ও নির্ভর করার দিকে ধাবিত হওয়ারই পরিচায়ক। কোনো মোমেনেরই বালা মুসীবত ও বিপদ আপদ কাম্য নয়। কিন্তু যখন সে এগুলোর মুখোমুখি হবে, তখন তাতে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে এবং অবিচল থাকতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনা বিশেষ করে মূসা (আ.)-এর ওপর ঈমান আনয়নকারীদের বর্ণনার পর আল্লাহ তায়ালা মূসা এবং তার ভাই হারুন (আ.)-কে এমর্মে নির্দেশ পাঠালেন যে, তারা যেন বনী ইসরাঈলের জন্যে নির্দিষ্ট আবাসস্থল নির্ধারণ করেন। এটা ছিলো তাদের শ্রেণী বিন্যাস করা ও তাদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে এবং পছন্দসই সময়ে মিসর ত্যাগের প্রস্তুতি। পাশাপাশি তিনি তাদের বাসস্থলকে পবিত্র এবং তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার নির্দেশ দান করেন এবং আল্লাহর সাহায্যের সুসংবাদ দান করেন। এরশাদ হচ্ছে,

আমি (অতপর) মূসা ও তার ভাই (হারুন)-এর কাছে ....(আয়াত ৮৭)

নিয়মতান্ত্রিক একত্রীকরণের সাথে এটা হচ্ছে আত্মিক একত্রীকরণ। এ দুটোই ব্যক্তি এবং সমষ্টির জন্যে নিতান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে যুদ্ধ এবং বিপদাপদের মুহূর্তে। সমাজের লোকেরা কখনো এই আত্মিক বা আধ্যাত্মিক একত্রীকরণ ও সমবেত হওয়াকে খাঁটো করে দেখে। এ পর্যন্ত যে অভিজ্ঞতা এ পর্যায়ে জমা হয়েছে তা বলে যে, একমাত্র আকীদা-বিশ্বাসই হচ্ছে যুদ্ধ ক্ষেত্রের প্রধান অস্ত্র। ভীরু ও দুর্বল আকীদা বিশ্বাসের অধিকারী সৈন্যের হাতে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র কঠিন মুহূর্তে একটুও কাজে আসে না।

এ ধরনের অভিজ্ঞতা আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের সামনে এ জন্যে উপস্থাপন করেন যেন এটা তাদের জন্যে আদর্শ হিসাবে বিবেচিত হয়। এটা বনী ইসরাঈলের জন্যেই নির্দিষ্ট নয়। এটা হচ্ছে নিরেট ঈমানী অভিজ্ঞতা। মোমেনরা একদা ছিলো জাহেলী সমাজ থেকে বিতাড়িত। কখনো ফেতনা ব্যাপক আকার ধারণ করে, তাগুত পরাক্রমশালী হয়, মানুষের মনমস্তিস্ক নষ্ট হয়ে যায় এবং পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়ে, ফেরাউনের যুগে এমন একটি অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছিলো। এখানে কয়েকটি বিষয়ের দিকে আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলদেরকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন,

১. যথাসম্ভব বিপর্যয় এবং অনিষ্ট সাধনকারী জাহেলিয়াতকে বর্জন করা ও তাদের পবিত্র করা, পরিশুদ্ধ করা, প্রশিক্ষণ দান করা এবং সংঘটিতকরণের লক্ষ্যে পরিচ্ছন্ন ও সৎ মোমেন দলের একত্রিত করা যাতে করে আল্লাহর ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি তাদের জন্যে নাযিল হতে পারে।

২. জাহেলী সমাজের উপাসনালয়গুলোকে বর্জন করা এবং মোমেন সম্প্রদায়ের ঘরসমূহকে মাসজিদ হিসাবে গ্রহণ করা, যেখানে মুসলমানরা জাহেলী সমাজ থেকে দূরে অবস্থান করছে বলে অনুভব করতে পারবে, বিশুদ্ধ পন্থায় তারা তাদের প্রভুর এবাদাতের অনুশীলন করছে বলে মনে করবে। পাশাপাশি তারা এ এবাদাতের মাধ্যমে ও পবিত্র এবাদাতের পরিবেশে তাকে এক প্রকার সুবিণ্যস্তকরণ ও সুসংঘটিতকরণের চর্চা করছে বলে ধারণা করতে পারে।

হযরত মূসা (আ.) যখন উপলব্ধি করলেন যে, ফেরাউন এবং তার দল-বলের মাঝে কল্যাণের ছিটা ফোঁটাও অবশিষ্ট নেই এবং তাদের মংগলের কামনা থেকে নিরাশ হয়ে পড়লেন, তখন তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়ায় মনোনিবেশ করলেন, যারা দুনিয়ার জীবনে শোভা সৌন্দর্য ও ধন সম্পদের মালিক ছিলো, যার সামনে অধিকাংশ লোকের অন্তর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মনোবল ভেংগে যায় এবং যারা পথভ্রষ্টতার দিকে এগিয়ে যায়। মূসা আল্লাহর কাছে এ দোয়া করলেন যে,

তিনি যেন তাদের সকল ধন সম্পদ বিনষ্ট করে দেন এবং এদের অন্তরে এমনভাবে মোহর মেরে দেন যাতে মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত এরা আর ঈমান না আনে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করেন। এরশাদ হচ্ছে,

মূসা (দোয়ার হাত উঠিয়ে আল্লাহকে) বললো.......... (আয়াত ৮৮-৮৯)

'হে আমাদের রব! তুমি ফেরাউন এবং তার সরদারদেরকে পার্থিব জীবনের শোভা সৌন্দর্য ও ধন সম্পদ দান করেছো।'

দুনিয়ার জীবনের শোভা সৌন্দর্য ও ধন দৌলত মানুষকে তোমার রাস্তা থেকে দু'ভাবে পথভ্রষ্ট করে। প্রথমত, লোভ দেখানোর মাধ্যমে, যা নেয়ামতের চাকচিক্য দেখানোর ফলে মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। সম্পদশালীদের সম্পদই হয় সেই শক্তির উৎস। সম্পদ মানুষকে অপমানিত এবং পথভ্রষ্ট করতে সাহায্য করে। পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের হাতে যদি সম্পদ আসে, তা নিসন্দেহে অনেক মানুষের ঈমানকে নড়বড়ে করে ফেলে। যারা এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি যে, ধন দৌলত, টাকা পয়সা ও সহায় সম্পদ আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্যে পরীক্ষা বৈ আর কিছুই নয়, তারা জানেনা যে, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ প্রদত্ত কল্যাণের তুলনায় এ সম্পদ কোনো মূল্যবান বিষয়ই নয়। হযরত মূসা (আ.) এখানে সাধারণ মানুষের মাঝে দৃশ্যমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করছেন। তাই তিনি যাবতীয় মাধ্যম থেকে গোমরাহকারী ও সীমালংঘনকারী শক্তিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আল্লাহর দরবারে এ ফরিয়াদ করেন যে, তিনি যেন তাদের সকল সহায় সম্পদ এমনভাবে ধ্বংস করে দেন এবং ছিনিয়ে নিয়ে যান যার ফলে তারা এর দ্বারা উপকৃত না হয়। পক্ষান্তরে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর কাছে এ মর্মে বদদোয়া করেন, তিনি যেন তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন, যাতে বেদনাদায়ক শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত এরা ঈমান না আনে, এটা ওই ব্যক্তির দোয়ার মতো যে তাদের অন্তরের কল্যাণ এবং তাদের ভাগ্যে তাওবা এবং আল্লাহর পথে ফিরে আসার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। তিনি এ মর্মে দোয়া করেনি যেন আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরের কঠোরতা ও রুদ্ধতা বৃদ্ধি করে দেন, যাতে তারা আযাব আসার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ঈমান আনতে অগ্রসর না হয়। আর যখন আযাব চলেই আসে, তখন তারা ঈমান আনতে চেষ্টা করলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ আযাব ও শাস্তি দেখে ঈমান আনলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। আর ঐ ঈমানটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বাস্তব তাওবার পরিচায়ক নয়। আল্লাহ জবাবে বললেন,

'তোমাদের দু'জনের দোয়া কবুল করা হলো।'

এখানে মূসা এবং হারুন (আ.)-এর দোয়া কবুল করার কথা বলা হয়েছে। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, মৃত্যু আসা পর্যন্ত 'তোমরা হেদায়াতের রাস্তায় অবিচল থাকো।'

'এবং তোমরা মূর্খদের পথ কখনো অনুসরণ করো না।' যারা জ্ঞান না থাকার দরুন যন্ত্রতন্ত্র পরিচালিত হয়, পরিকল্পনা ও কর্মপন্থা গ্রহণ করতে ইতস্তত করে, যারা অস্থিরতায় ভোগে, তারা জানে না তারা কি সঠিক রাস্তায় চলছে, না পথভ্রষ্ট হয়ে ভবঘুরের ন্যায় ইতস্তত ঘোরাফেরা করছে।'

পরবর্তী দৃশ্য হচ্ছে বাস্তবায়নের দৃশ্য। এরশাদ হচ্ছে,

অতপর (ঘটনা এই হলো যে,) আমি .... (আয়াত ৯০-৯২)

চ্যালেঞ্জ এবং অস্বীকারের ঘটনার এটা সর্বশেষ দৃশ্য এবং তাদের ক্ষেত্রে ও আল্লাহ তায়ালার চূড়ান্ত ফয়সালা। উল্লিখিত আয়াতগুলো ঘটনার সর্বশেষ দৃশ্য অতি সংক্ষেপে এখানে উপস্থাপন করছে। কারণ আলোচ্য সূরায় উক্ত ঘটনার ধারা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার পরিসমাপ্তি বর্ণনা

করা, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বন্ধুদের প্রতি করুণাবর্ষণ এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের উল্লেখ এবং তাঁর শত্রুদের প্রতি আযাব ও ধ্বংস নেমে আসার বর্ণনা দান– বিশেষ করে যারা তাঁর জাগতিক নিদর্শনাবলী এবং তাঁর রসূলদের সাথে প্রেরিত যুক্তি প্রমাণ থেকে বেখবর থাকে। এ অবস্থা তাদের চলতে থাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, কিন্তু যখন উর্ধশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়, তখন তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ হকের পথে ফিরে আসতে চায়, তার তাওবা ও লজ্জিত হওয়া তখন কোনো কাজেই আসে না।

ফেরাউনের সলিল সমাধি ও লাশ সংরক্ষণ

আলোচ্য সূরায় পূর্বে বর্ণিত আয়াতে অবিশ্বাসীদের জন্যে যে সতর্কবাণী ও শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা এখানেও প্রযোজ্য। এরশাদ হচ্ছে,

(মনে রাখবে), প্রত্যেক উম্মতের........... (আয়াত ৪৭-৫১)

উল্লিখিত শাস্তির সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে এখানে উক্ত ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে।

আর আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করে নিয়ে গেলাম, নিয়ে গেলাম আমার নেতৃত্বে, পথ প্রদর্শনে এবং রক্ষণা বেক্ষণে। এ ক্ষেত্রে এ সম্পর্কের বিশেষ অর্থ রয়েছে।

'তারপর ফেরাউন ও তার সেনাদল তাদের পেছনে চললো।' এ অনুসরণ হেদায়াত পাওয়া, ঈমান গ্রহণ বা বৈধ প্রতিরক্ষার জন্যে নয়, বরং এ হচ্ছে 'যুলুম নির্যাতন ও সীমালংঘন করার উদ্দেশ্যে।'

দুরাচার, বাড়াবাড়ি এবং সীমালংঘনের দৃশ্য থেকে এখন সরাসরি ডুবার দৃশ্যে চলে আসা হচ্ছে।

অবশেষে যখন ফেরাউন ডুবতে থাকলো এবং স্বচক্ষে মৃত্যুর দৃশ্য দেখতে লাগলো, আর এর থেকে মুক্তি পাবার কোনো অবলম্বনই যখন তার সামনে অবশিষ্ট রইল না।

'তখন বললো, আমি মেনে নিলাম যে, বনী ইসরাঈল যার ওপর ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং আমিও আনুগত্যের শির নতকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

প্রতাপশালী সীমালংঘনকারী যালেম ফেরাউনের যাবতীয় দম্ভ ও অহংকার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো, যা সে মানুষের সামনে সদা সর্বদা প্রকাশ করতো। সে হীন ও নীচ হয়ে গেলো এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলো। বনী ইসরাঈল যে মাবুদের ওপর ঈমান এনেছে, তার ওপর ঈমান আনার ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হলো না, বরং আত্মসমর্পণের মাত্রা আরো বাড়িয়ে বললো, 'আমি অনুগতদেরই অন্তর্ভুক্ত।' অর্থাৎ আত্মসমর্পকারীদেরই একজন।

'এখন ঈমান আনছো! অথচ এর আগে পর্যন্ত নাফরমানী চালিয়ে এসেছো এবং তুমি ছিলে বিপর্যয়কারীদের একজন।'

এখানে বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হচ্ছে যে, এখন তুমি আত্মসমর্পণ করলে! যখন তোমার কোনো স্বাধীনতা ও পালাবার এখতিয়ারই নেই। অথচ তুমি ইতিপূর্বে যথেষ্ট অবাধ্যতা, সীমালংঘন ও দাম্ভিকতা করেছিলে? এসব দম্ভ, অহংকার সীমালংঘন ও হঠকারিতা তোমার এখন কোথায় গেলো?

'এখন তো আমি কেবল তোমার লাশটাকেই রক্ষা করবো।'

মাছ একে খাবে না। এ লাশ স্রোতের টানে কোথাও এমনভাবে হারিয়ে যাবে না, যার হদীস মানুষের কাছে থাকবে না। এ লাশের সংরক্ষণ আল্লাহ পাক এজন্যই করবেন যাতে পরবর্তীকালে মানুষ তোমার পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল থাকে।

'যাতে তুমি পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকো।'

মানুষ এ ঘটনা থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহর শক্তির মুখোমুখি হওয়ার পরিণাম এবং তাকে অস্বীকার করার শাস্তি স্বচক্ষে দেখতে পায়।

'যদিও অনেক মানুষ এমন আছে, যারা আমার নিদর্শনসমূহ থেকে উদাসীন।'

মানুষ এমন যে, নিজের এবং তার আশেপাশে বিদ্যমান আল্লাহ পাকের অসংখ্য নেয়ামত ও নিদর্শনাবলীর প্রতি চোখ তুলে তাকায় না এবং তাতে বিবেক খাটিয়ে তা হৃদয়ঙ্গম করে না।

সীমালংঘন, বিপর্যয়, চ্যালেঞ্জ এবং অবাধ্যতা সংক্রান্ত ট্রাজেডি ও শোকাবহ ঘটনার চূড়ান্ত দৃশ্যের ওপর এখানে পর্দা টেনে দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি সংক্ষেপে বনী ইসরাঈলের পরবর্তী প্রজন্মের পরিণতির একটি চিত্র পেশ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

(ফেরাউনকে ডুবিয়ে মারার পর) আমি .... (আয়াত ৯৩)

'মুবাউওয়া' শব্দটির অর্থ নিরাপদ আবাসস্থল। 'সিদক' (কল্যাণজনক ও উপযোগী) শব্দের প্রতি 'মুবাউওয়া' শব্দের সম্বন্ধ উপরোল্লিখিত আবাসস্থলের নিরাপত্তা, স্থিরতা ও স্থায়িত্বকে বৃদ্ধি করেছে। এ স্থিরতা ওই (সিদক) সত্যের স্থিরতার ন্যায় যা কখনো অস্থির হয় না এবং মিথ্যা ও অপবাদের অস্থিরতার ন্যায় প্রকম্পিত হয় না, দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর বনী ইসরাঈলদের জন্যে নতুন আবাসস্থল (মিসরের পরিবর্তে ফিলিস্তীন) ছিলো অত্যন্ত কল্যাণকর ও উপযোগী।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা এখানে করা হয়নি। কারণ এটা এখানে উদ্দেশ্যও নয়। তারা সেখানে অতি উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ উপভোগ করেছে, হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রী আহার্য হিসাবে গ্রহণ করেছে, অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় সুস্বাদু বস্তু সামগ্রী ও আরাম আয়েশ তারা ভালোভাবে উপভোগ করেছে। অবশেষে তারা আবার আল্লাহর যমীনে ফাসেকী ও আল্লাহদ্রোহী কাজে জড়িয়ে পড়লো। তাই উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ তাদের ওপর হারাম করে দেয়া হলো। আলোচ্য আয়াত এখানে তাদের পারস্পরিক মতৈক্যের পর মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়ার কথা উল্লেখ করেছে । সেই মতবিরোধ ছিলো তাদের দ্বীন ও দুনিয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে। আর এটা অজ্ঞতাবশত নয় বরং তাদের কাছে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও দলীল প্রমাণাদি আসার পর, তারা তাদের জ্ঞানকে ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় ব্যবহার করার দরুন পরস্পর মতবিরোধ করেছিলো।

যেহেতু এই স্থান হচ্ছে ঈমানের সাহায্য আসা এবং অবাধ্যতাকে অপমানিত করার কথা বলার। শেষ যমানার নবী মোহাম্মদ (স.)-এর নবী হওয়ার যাবতীয় প্রমাণাদি এবং তাওরাতে বাতলানো তার যাবতীয় নিদর্শন তাদের সামনে সুস্পষ্ট হলো, তারপর তারা পরস্পরে মত বিরোধে লিপ্ত হলো, কোরআনে হাকীম এই জায়গায় এর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেনি বরং সংক্ষেপে তা পেশ করেছে। অতপর কেয়ামত দিবসে মতবিরোধের ফায়সালার দায়িত্ব রাব্বুল আলামীনের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই তোমার রব কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সেই জিনিসের ফায়সালা করে দেবেন, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত ছিলো।'

সকল যুগের ওপর উক্ত ঘটনার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে, যেমন থাকবে ঘটনার সর্বশেষ দৃশ্যের প্রভাবটিও।

এমনিভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারি কোরআনে কেন বিভিন্ন ঘটনাবলীর অবতারণা করা হয়েছে?' এবং কোরআন কিভাবে তা উপস্থাপন করেছে। কোরআনে হাকীম বিভিন্ন ঘটনার অবতারণার উদ্দেশ্য শুধু ঘটনা বর্ণনা নয়। বরং তার পেছনে অনেক উদ্দেশ্য লক্ষ্য, ইশারা-ইংগিত এবং হেকমত নিহিত থাকে।

ঈমানকে সংশয়মুক্ত করণ

ওপরের আলোচনার পর এখানে হযরত নূহ (আ.) ও মূসা (আ.)-এর ঘটনার সমাপনীর ওপর একটি পর্যালোচনা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে তাঁর পূর্বেকার রসূলদের সাথে তাদের সমাজের লোকেরা কি ধরনের আচরণ করেছিলো এবং কিভাবে তাকে

মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো, সেদিকে ইংগিত করেছে এবং বলেছে তাদের সমাজের লোকেরা তাদেরকে এজন্যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেনি যে, তাদের কাছে রেসালাতের নিদর্শন ও দলীল প্রমাণাদির ঘাটতি ছিলো। পাশাপাশি রসূলকে এ বলে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, এটা আল্লাহর সুন্নাত ও বিধান, যেমনিভাবে পূর্বেকার নবী-রসূলদের সাথে তাদের সমাজের লোকেরা আচরণ করেছিলো তোমার সমাজের লোকেরাও তোমার সাথে ঠিক তেমনি আচরণ করবে, তাতে ঘাবড়াবার বা মন খারাপ করার কিছুই নেই। কারণ আল্লাহর চিরন্তন নিয়ম হচ্ছে তিনি সৃষ্টিলগ্ন থেকে মানুষের মাঝে ভালো মন্দ, হেদায়াত ও গোমরাহী গ্রহণ করার শক্তি দিয়েই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

এ পর্যালোচনার মাঝে সংক্ষেপে হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা এবং তাঁর সমাজের লোকদের ওপর গযব নাযিল হওয়ার পর ঈমান আনা ও তাদের ওপর থেকে শাস্তি রহিত করার হুকুমও বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবত এতে অস্বীকারকারীকে সময় শেষ হওয়ার পূর্বে শেষবারের মতো একটু সুযোগ দেয়া হয়েছিলো। বিভিন্ন নবী রসূলের ঘটনাবলী বর্ণনার পর উপসংহারে একথা বলা যায় যে, পূর্বেকার নবী রসূলদের ক্ষেত্রে যে বিধান চলে আসছিলো, সে একই বিধান পরবর্তীদের জন্যেও প্রযোজ্য। আর তা হচ্ছে অস্বীকারকারীদের ওপর প্রথমত আল্লাহর আযাব, তারপর ধ্বংস অনিবার্য। পক্ষান্তরে নবী রসূল এবং তাদের ওপর ঈমান আনয়নকারীদের জন্যে মুক্তির এ বিধানকে আল্লাহ তায়ালা নিজের ওপর পালনীয় কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন এবং তা চিরন্তন বিধান হিসাবে ধার্য করেছেন, যার কোনো ব্যতিক্রম হয় না। এরশাদ হচ্ছে,

(হে নবী) আজ আমি তোমার ওপর যে কেতাব ....(আয়াত ৯৪-১০৩)

সর্বশেষ আলোচনা ছিলো বনী ইসরাঈলদের সম্পর্কে, যারা ছিলো আহলে কেতাব। তারা নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর ঘটনা এবং ফেরাউনের সাথে মূসা (আ.)-এর ঘটনা জানতো। কারণ তারা তা তাদের কেতাবে পড়েছে। এখানে আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (স.)-কে বলছেন, যদি তিনি তার ওপর নাযিল করা মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বর্ণিত ওই সমস্ত ঘটনার ব্যাপারে সন্দিহান হন, তিনি যেন এ ব্যাপারে ওই সমস্ত লোকদেরকে প্রশ্ন করেন, যারা পূর্ব থেকে আসমানী কেতাব পড়ে আসছে। কেননা ওই সংক্রান্ত জ্ঞান তাদের মাঝে বিদ্যমান। এরশাদ হচ্ছে,

(হে নবী) আজ আমি তোমার ওপর যে কেতাব............ (আয়াত ৯৪)

আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ (স.)-এর ওপর যা অবতির্ণ করেছেন, সে বিষয়ে তিনি মোটেও সন্দিহান ছিলেন না। হাদীস শরীফে এসেছে, রসূল বলেন, 'আমি আমার ওপর নাযিল করা বিষয়ে সন্দিহান নই, আর এ বিষয়ে আমি কাউকে জিজ্ঞাসও করবো না।' প্রকৃত অবস্থা যদি এটাই হয়ে থাকে, তবে কেনই বা রসূল (স.)-কে বলা হলো, যদি তিনি সন্দিহান হন, তবে যেন জিজ্ঞেস করেন? তার পরক্ষণেই বলা হলো, 'প্রকৃতপক্ষে তোমার রবের পক্ষ হতে তোমার কাছে এ কেতাব মহাসত্য হয়েই এসেছে।' এ বাক্যটি তার ওপর নাযিল করা বিষয়ে পূর্ণ আস্থা রাখার জন্যে যথেষ্ট।'

এ বাক্যের মাঝে রসূল (স.)-এর মেরাজ ও মেরাজের জন্যে সে রাতের সফরের ঘটনা পরবর্তী মক্কার কঠিন মুহূর্ত ও সমস্যাসংকুল অবস্থার প্রতি ইংগিত রয়েছে। মে'রাজের ঘটনায় বিশ্বাস না করে তখন মুসলমানদের মধ্য হতে কিছু কিছু লোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো। রসূলের প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা.) এবং বিপদাপদের একমাত্র সহায় চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পর তাঁর ও তাঁর সাথীদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা অধিক হারে বেড়ে গিয়েছিলো। মক্কার কোরায়শদের প্রচন্ড বিরোধিতার দরুন দ্বীনের দাওয়াতের কাজ সেখানে অনেকটা স্থবির হয়ে পড়েছিলো। এসব কিছু রসূলের মনে বিরাট দাগ কেটেছিলো। বিভিন্ন নবীর ঘটনাবলী বর্ণনার

মাধ্যমে রসূলকে এ বলে সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে, দাওয়াতের পথে ফুল সাজানো থাকে না বরং তা অত্যন্ত বন্ধুর।

অতপর অবিশ্বাসী সন্দেহ পোষণকারীদের প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে– (আয়াত ৯৫)

উক্ত ইংগিতে সন্দেহকারীদেরকে এ সুযোগ দেয়া হয়েছে যে, তাদের মধ্য থেকে যারা হকের পথে ফিরে আসতে চায় আসতে পারে। কারণ যেখানে স্বয়ং রসূল (স.) এ বিষয়ে অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন যে, যদি তিনি তাঁর প্রতি নাযিল করা হেদায়াতের ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহ পোষণকারী হন তিনি যেন সে বিষয়ে আহলে কেতাবদের জিজ্ঞেস করেন, সেখানে তিনি সন্দেহ পোষণ করেননি এবং জিজ্ঞেসও করেননি। সুতরাং তিনি এ বিষয়ে পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে যে মহাগ্রন্থ আল কোরআন নিয়ে এসেছেন, তা মহাসত্য। এ বাক্যের মাঝে অবিশ্বাসীদের জন্যে ইংগিত রয়েছে তারা যেন এ মহাসত্যের ব্যাপারে ইতস্তত না করে এবং সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হয়।

আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মোহাম্মদীর জন্যে এ বিধান নির্ধারিত করেছেন যে, যদি তারা কোনো বিষয়ে আস্থাবান হতে না পারে, তারা যেন সে বিষয়ে জ্ঞানী ও পন্ডিতদেরকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়। আর সে বিষয়টি আকীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত বিশেষ মাসয়ালাও হতে পারে। কারণ শরীয়ত ও আকীদার ব্যাপারে পূর্ণ আস্থাবান হওয়ার জন্য একজন মুসলমান সর্বদাই আদিষ্ট থাকে। সে যেন এক্ষেত্রে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা আশ্বস্ত না হয়ে শুধু অনুকরণের ওপরই নির্ভরশীল না হয়।

কোনো বিষয়ে সন্দেহ জাগলে প্রশ্ন ও জিজ্ঞেস করা বৈধ। এটা এবং আল্লাহ পাকের ফরমান 'তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' এ দু'য়ের মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব, অসংগতি ও বৈপরীত্য নেই।

কারণ নিষিদ্ধ হচ্ছে সন্দেহ পোষণ করা এবং তারই ওপর এমনভাবে অবিচল থাকা যে, তা একটি স্থায়ী বিশেষণে পরিণত হয়ে যায়। 'তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, আর এ বিশেষণধারী তথা সন্দেহকারী কখনো বিশ্বাস ও হক পর্যন্ত পৌঁছুতে সক্ষম হবে না।

রসূল (স.)-এর কাছে যে হেদায়াত এসেছে তা যদি সন্দেহাতীতভাবে সত্য হয়ে থাকে, তবে তাঁর সমাজের লোকদের তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা এবং তার বিরোধিতা করার কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে? জবাবে এটা বলা যেতে পারে যে, আল্লাহর বাণী ও বিধানের দাবী হচ্ছে, যে ব্যক্তি হেদায়াতের উপায় উপকরণ গ্রহণ করে না, সে হেদায়াত পায় না। যার দৃষ্টিশক্তি আলোর ওপর পড়ে না, সে দেখে না। যে স্বীয় ইন্দ্রিয়সমূহকে বেকার করে রাখে, সে তার দ্বারা উপকৃত হয় না। তার সামনে যতোই নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থাকুক না কেন। তার পরিণাম হবে পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহী। কারণ সে এগুলো থেকে উপকৃত হয় না। আর তখনই আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত ও বিধান তাদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হয়ে যায়।

মৃত্যুর সময়ের ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়

(হে নবী) যাদের ঈমান না আনার ব্যাপারে .... (আয়াত ৯৬-৯৭)

যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে চাক্ষুষ দেখে নেবার পর ঈমান গ্রহণ করলে তা তাদের কোনো কাজে আসবে না। কারণ সে ঈমান গ্রহণ স্বেচ্ছায় হয়নি। আর তখন সে ঈমান গ্রহণ করলেও তার দাবী পূরণ করা দুনিয়ার জীবনে তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না। কারণ সে সুযোগ সে আর পাচ্ছে না। কিছু পূর্বে এমন একটি দৃশ্য আমাদের সামনে এসেছিলো যা বর্তমান দৃশ্যের সত্যতারই স্বীকৃতি দেয়। সে দৃশ্য হচ্ছে ফেরাউনের দৃশ্য। যখন সে পানিতে ডুবে মারা যাচ্ছিলো, তখন সে বলে উঠলো, 'আমি মেনে নিলাম, বনী ইসরাঈল যার ওপর ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ

নেই এবং আমিও আনুগত্যের শির নতকারীদের অন্তর্ভুক্ত।' জবাবে তাকে বলা হয়েছিলো, 'এখন ঈমান আনছো! অথচ এর আগে পর্যন্ত তুমি না-ফরমানী চালিয়ে এসেছো এবং তুমি ছিলে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের একজন।'

এটা এমন একটা পর্যায়, যেখানে আল্লাহর শাশ্বত বিধানের অনিবার্যতার প্রকাশ ঘটে এবং এখানে তার চূড়ান্ত পরিণতি প্রকাশও ঘটে। এ বিধানকে যখন মানুষ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে, তখন তার সামনে আলোর নতুন দ্বার খুলে যায়, যার মাধ্যমে সে মুক্তির সর্বশেষ আশার আলো দেখতে পায়। আর এ কারণেই সত্যের অস্বীকারকারীরা আযাবে পতিত হওয়ার আগ মুহূর্তে নিজেদের অবস্থান থেকে এভাবে সরে আসতে বাধ্য হয়। এরশাদ হচ্ছে,

ইউনুস (নবীর) সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য (কোনো) জনপদ .... (আয়াত ৯৮)

এ আয়াত আমাদেরকে পেছনের দিকে ফিরে তাকাবার নির্দেশ দিচ্ছে। পেছনে ফিরে তাকালে এ বিষয়টি আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ কখনো বাস্তবায়িত হওয়ার নয়। 'এমন কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি যে, উল্লেখিত জনবসতির মধ্য হতে একটি জনবসতি চাক্ষুষ আযাব দেখে ঈমান এনেছে।' এদের মধ্য হতে অতি নগণ্য সংখ্যক জনবসতিই ঈমান এনেছে। তাই বলা হয়েছে একটি জনবসতি ছাড়া তারা ঈমান আনেনি। আর যে জনবসতি ঈমান এনেছিলো তা ছিলো হযরত ইউনুস (আ.)-এর জনবসতি। 'কারইয়া' বলতে সভ্য ও শহুরে জনবসতিকে বুঝায়। এভাবে বলার মাধ্যমে একথার দিকেই ইংগিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা সকল রসূলকেই সভ্য শহুরে জনবসতির কাছে পাঠিয়েছিলেন, বেদুইন জনবসতির কাছে পাঠাননি। আলোচ্য আয়াতে হযরত ইউনুস এবং তাঁর সমাজের বিস্তারিত ঘটনাবলী বর্ণিত হয়নি। বরং সেই ঘটনার পরিসমাপ্তির দিকে এখানে ইংগিত করা হয়েছে। আর এ পরিসমাপ্তিটি বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। সুতরাং আমি এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করবো না। এক্ষেত্রে আমাদের এতোটুকু জানাই যথেষ্ট যে, কুফরী ও অবাধ্যতার দরুন অপমানকর আযাব ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের দ্বার প্রান্তে এসে উপনীত হলো। আযাব নাযিল হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ঈমান আনার দরুন সেই আযাব তাদের থেকে দূরীভূত হয়ে যায়। অতপর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তারা দুনিয়ার জীবন উপভোগ করে। যদি তারা ঈমান আনা থেকে বিরত থাকতো, তবে তাদের আচরণের দরুন আল্লাহর চিরাচরিত বিধানানুসারে তাদের ওপর আযাব নাযিল হতো। এখানে আমাদের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপলব্ধি করা দরকার।

১. অস্বীকারকারীদের মুক্তির সর্বশেষ অবলম্বনের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। যাতে তারা সম্ভাব্য আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারে- যেমনিভাবে ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় দুনিয়ার জীবনে অপমানকর আযাব থেকে মুক্তি পেয়েছিলো। ইউনুস (আ.)-এর ঘটনার এখানে অবতারণার পেছনে প্রধান উদ্দেশ্য এটাই।

২. আল্লাহর বিধান নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি এবং সে বিধান ইউনুস (আ.) সম্প্রদায়ের ওপর থেকে আযাব দূরে সরে যাওয়া এবং তাদেরকে দুনিয়াতে উপভোগ করার জন্যে পুনরায় ছেড়ে দেয়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং সে বিধান এখানে চলমান ও কার্যকরী অবস্থায় আছে। কারণ আল্লাহর বিধানের দাবী হচ্ছে আযাব আসা পর্যন্ত যদি তারা মিথ্যারোপের ওপর অটল থাকতো, তবে তাদের ওপর আযাব চলে আসতো। যখন তারা মিথ্যারোপ থেকে ফিরে আসলো, তখন তাদেরকে আযাব থেকে মুক্ত করার জন্যে তাঁর বিধান কার্যকরী হলো। সুতরাং মানুষের আচার আচরণ এবং কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, বরং তার প্রভাবের ধারাবাহিকতায় বাধ্যবাধকতা নিহিত রয়েছে। এটা এভাবেও বলা যেতে পারে যে, মানুষের আচার আচরণ ও কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে সব কিছুই নিয়তি নির্ধারিত এ বিশ্বাস প্রযোজ্য নয়, বরং তার প্রভাবের ধারাবাহিকতা বর্তাবার ক্ষেত্রে এ বিশ্বাস প্রযোজ্য।

হেদায়াত প্রাপ্তির উপায় ও তা থেকে বঞ্চিত হওয়া

পরবর্তী আয়াতে কুফর এবং ঈমানের ক্ষেত্রে সাধারণ একটি নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

(হে নবী) তোমার মালিক চাইলে এ যমীনে যতো মানুষ............. (আয়াত ৯৯- ১০০)

যদি তোমার রবের ইচ্ছা হতো, তবে তিনি মানব জাতিকে এমন সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করতেন যে, একটি মাত্র পথ ছাড়া আর কিছুই জানতো না। আর সেটা হচ্ছে ফেরেশতাদের ন্যায় ঈমান আনার পথ। অথবা তিনি তাদের মাঝে এমন এক ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করতেন যা তাদের সকলকে ঈমানের দিকে টেনে নিয়ে যেতো।

যদি আল্লাহ তায়ালা চাইতেন যে, এ পৃথিবীতে শুধুমাত্র তাঁর আদেশ পালনকারী অনুগতরাই বাস করবে এবং কুফরী ও নাফরমানীর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না, তবে তিনি সকল মানুষকে ঈমান গ্রহণ করার প্রতি এমনভাবে বাধ্য করতেন যে, তাদের স্বেচ্ছায় ঈমান বা কুফর গ্রহণ করার ক্ষমতাই থাকতো না। আসলে সৃষ্টির অন্তরালে আল্লাহর হেকমত আমরা কখনও বুঝতে সক্ষম হই, আবার কখনো সক্ষম হই না। তিনি মানব জাতিকে ভালো মন্দ এবং হেদায়াত ও গোমরাহীর ক্ষমতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। পাশাপাশি এ দুয়ের যে কোনোটি গ্রহণ করার শক্তিও দিয়েছেন। যদি মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি জাতীয় শক্তির সঠিক ব্যবহার করে এবং সে তাকে সৃষ্টি এবং আত্মার মধ্যকার হেদায়াতের দলীল প্রমাণাদি এবং বিভিন্ন রসূল কর্তৃক আনীত সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহের প্রতি দিক নির্দেশনা দেয়, তবে সে ঈমান আনতে বাধ্য। আর ঈমান আনার মাধ্যমে সে মুক্তির পথ পাবে। পক্ষান্তরে যদি সে তাঁর অনুভূতি এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে নিষ্ক্রিয় ও রুদ্ধ রাখে এবং ঈমানের বিভিন্ন দলীল প্রমাণ থেকে এগুলোকে দূরে রাখে, তবে তার অন্তর শক্ত হয়ে যায়, বিবেক রুদ্ধ হয়ে যায়। পরিণামে সে মিথ্যারোপ ও অস্বীকারের প্রতি ধাবিত হয়। তার পরিণতি হয় অস্বীকারকারীদের পরিণতি। সুতরাং ঈমান স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা এবং না করার বিষয়। রসূল (স.) ঈমান গ্রহণ করার জন্যে কাউকে বাধ্য করেননি। কারণ অন্তরের আবেগ অনুভূতি এবং বিবেকের গতি বিধি নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্য করার কোনো সুযোগ নেই।

'তবে কি তুমি মোমেন হবার জন্যে লোকদের ওপর জবরদস্তি করবে?'

এ প্রশ্নটি একটি নেতিবাচক প্রশ্ন। কারণ এ জবরদস্তি কখনো বাস্তবায়িত হবার নয়। 'আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারে না।'

আল্লাহর চিরন্তন বিধান- যা আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি- অনুসারে যদি কোনো ব্যক্তি এমন পথের অনুসরণ করে, যা তাকে ঈমান পর্যন্ত পৌঁছায় না, কখনো সে ঈমান পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হবে না। উপরোক্ত আয়াতের অর্থ এটা নয় যে, সে ঈমান গ্রহণ করার লক্ষ্যে ঈমানের রাস্তার অনুসরণ করে, অতপর তাকে ঈমান গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা হয়। এ আয়াতের মূল অর্থ হচ্ছে, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর বিধান ও অনুমতি মোতাবেক সঠিক পথের অনুসরণ করে, তবেই সে ঈমান পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। তখন আল্লাহ তায়ালাও তাকে সঠিক পথের দিশা দেবেন যাতে ঈমান তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে বান্দার অন্তরে প্রবেশ করতে পারে। প্রত্যেক বস্তু একটি নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্তই কার্যকর হয়ে থাকে। মানুষ যখন স্বেচ্ছায় কোনো রাস্তার অনুসরণ করে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে সে রাস্তার পরিণাম নির্ধারিত করে থাকেন। সঠিক পথ পাওয়ার জন্যে তারা যতোটুকু চেষ্টা চালিয়ে থাকে, তার বিনিময় স্বরূপ তিনি সেই পরিণাম ধার্য্য করেন। আয়াতের শেষাংশ উপরোক্ত কথার দিকেই ইংগিত বহন করে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর আল্লাহর রীতি হচ্ছে, যারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তাদের ওপর কলুষতা চাপিয়ে দেন।'

যারা নিজেদের বিবেককে চিন্তা ভাবনা থেকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে, তিনি তাদের ওপর কলুষতা চাপিয়ে দেন। কলুষতা সর্বনিকৃষ্ট আত্মিক অপবিত্রতা। তারা তাদের ইন্দ্রিয়সমূহকে চিন্তা ভাবনা করা থেকে নিষ্ক্রিয় করার দরুন এ কলুষতা ও অপবিত্রতা তাদেরকে পেয়ে বসে। যার পরিণাম হচ্ছে মিথ্যারোপ ও অস্বীকার করা।

চোখ মেলে সৃষ্টি জগতের দিকে তাকানোর আহ্বান

এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হচ্ছে এভাবে যে, যারা ঈমান আনতেই চায় না কোনো নিদর্শন ও ভীতি প্রদর্শন তাদের কোনো কাজে আসে না। কারণ সে সকল নিদর্শন তাদের চোখের সামনে আকাশ ও যমীন থাকা সত্ত্বেও তারা চিন্তা ভাবনা করে না এবং সেগুলোর দিকে চোখ তুলে দেখে না। এরশাদ হচ্ছে,

(হে নবী) তুমি (মানুষদের) বলো, তোমরা..........(আয়াত ১০১)

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশ প্রশ্নবোধক হোক বা হাঁ বাচক হোক, উভয়ের অর্থ এক ও অভিন্ন। কারণ আসমান যমীন নিদর্শনাবলীতে পরিপূর্ণ। কিন্তু সে নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন যারা ঈমান আনে না, তাদের কোনো উপকারে আসে না। কারণ তারা পূর্বে এদিকে ভ্রুক্ষেপ করেনি এবং চিন্তা গবেষণাও করেনি।

শেষ পর্বে যাওয়ার পূর্বে নিম্নোক্ত আয়াতের সামনে আমাদের কিছুক্ষণ অবস্থান করা উচিত। এরশাদ হচ্ছে,

(হে নবী) তুমি (মানুষদের) বলো, তোমরা .... (আয়াত ১০১)

পবিত্র কোরআনের দ্বারা সর্বপ্রথম যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিলো, তাদের কাছে পৃথিবী ও আকাশের পর্যাপ্ত জ্ঞান ছিলো না। কিন্তু বাস্তব সত্য বিষয়টি যেদিকে আমি বারংবার ইংগিত করেছি তা হচ্ছে, মানব প্রকৃতি এবং যে দুনিয়ায় আমরা বসবাস করি, তার মাঝে ব্যাপক সুপ্ত ভাষা রয়েছে। মানব প্রকৃতি যখন গভীরভাবে লক্ষ্য করে তখন পৃথিবীর এসব ভাষা বুঝে।

মানব অনুভূতিতে ইসলামী চিন্তা চেতনা গঠন করার ক্ষেত্রে কোরআনী বিধান আসমান যমীনে যা কিছু আছে তার ওপর নির্ভর করে, সৃষ্টি জগতকে হৃদয়ংগম করে এবং তার প্রতি দৃষ্টি, কান, অন্তর এবং বিবেককে নিবদ্ধ করার নির্দেশ দেয়। পরিচয়হীন জড়বাদীরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবমাননা করে। তারা এ অবমাননাকে বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করে। যার ওপর তারা তাদের সমূদয় সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। তারা এর নাম দিয়েছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র।

আকাশ পাতালে বিদ্যমান বস্তুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে অন্তর ও বিবেকের আবেগ অনুভূতি, চিন্তা চেতনা জেগে উঠে, সাথে সাথে এতে সাড়া দেয়া ও এর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া, সহজ হয়ে উঠে। এসব কিছুই মানব অস্তিত্বকে তার জাগতিক ছন্দে পরিপূর্ণ করে, যা আল্লাহর অস্তিত্ব, মাহাত্ম্য, পরিচালনা, কর্তৃত্ব এবং জ্ঞানের প্রতি ইংগিত প্রদান করে।

কালের আবর্তে এ জগত সংক্রান্ত মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদি মানুষ জাতি জ্ঞানের পাশপাশি আল্লাহর নূরে নূরানী হয়ে পথ চলে, তবে এ জ্ঞান তাকে এমন সামগ্রী উপহার দেয়, যা সে এ তার সাথে হৃদ্যতা অর্জন করা, তার পরিচিতি গ্রহণ করা ও আল্লাহর তাসবীহে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে।

এরশাদ হচ্ছে, 'এ ধরার সব কিছুই আল্লাহর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু তোমরা তাদের প্রশংসা ও তাসবীহ বুঝো না। 'যার অন্তর সদা আল্লাহর সাথে সংযুক্ত, সে ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ এ প্রশংসার ভাষা বুঝে না। আর এ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরিচিতি ঈমানের ঔজ্জ্বল্য ও এর আলোর সাথে যদি সংশ্লিষ্ট না হয়, তবে তা অধিক দুর্ভাগ্যের দিকে টেনে নিয়ে যায়। পরিণামে তারা আল্লাহ তায়ালা থেকে অনেক দূরে সরে পড়ে এবং ঈমানের ঔজ্জ্বল্য ও আলো থেকে ও বঞ্চিত হয়।

'আর যারা ঈমান আনতেই চায় না তাদের জন্যে নিদর্শন ও উপদেশ তিরস্কার কীইবা উপকারে আসতে পারে।'

যদি অন্তর তার রুদ্ধ হয়ে যায়, বিবেক তার স্থবির হয়ে পড়ে, প্রকৃতি থেকে গ্রহণ করার যন্ত্রাদি তার নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং এ দুনিয়া থেকে গোটা মানবজাতি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সে যদি এ প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনার ধ্বনি ও ছন্দ না শুনে, তবে নিদর্শন ও ভীতিপ্রদর্শন তাদের কীইবা উপকারে আসতে পারে।

আল্লাহর সঠিক পরিচয় দিতে গিয়ে কোরআনে করীম জগত ও জীবনকে এই অভিনব প্রদর্শনীতে রূপান্তরিত করেছে, যার মাঝে এ পরিচয় কার্যকরভাবে প্রকাশ পায়। এর উপস্থিতিতে মানব অস্তিত্বের হৃদয়গ্রাহ্য বিভিন্ন দিক পরিপূর্ণতা লাভ করে। কোরআনে হাকীম আল্লাহর অস্তিত্বকে বিরোধপূর্ণ বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করে না, কোরআনী দর্শন ও বাস্তব পর্যবেক্ষণের আলোকে মানব অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা এমনভাবে পরিপূর্ণ করে দেন যে, তাঁর সম্পর্কে কোনো বিরোধে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কোরআনে করীম সরাসরি গোটা বিশ্বে আল্লাহর অস্তিত্বের এই প্রভাব সংক্রান্ত আলোচনা করেছে।

কোরআনে হাকীম উল্লিখিত পরিকল্পনা অনুসরণ করার ক্ষেত্রে এই মৌলিক সত্য বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকর্তা, তিনি মানুষকে কি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও অবগত আছি।'

দ্বীন গ্রহণ করা এবং মাবুদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার দিকে মানব প্রকৃতির একটি স্বভাবগত প্রয়োজন রয়েছে। এ প্রকৃতি যদি সুস্থ হয়, তবে সে নিজের মাঝেই এক মাবুদের প্রতি টান এবং তাঁর অস্তিত্ব ও উপস্থিতির এক শক্তিশালী অনুভূতি টের পায়। মাবুদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাঁর মনোনিবেশ করার উপরোক্ত অনুভূতি সৃষ্টি করাই বিশুদ্ধ আকীদার কাজ নয়। কারণ এটা মানব প্রকৃতিতে স্বভাবগতভাবেই বিদ্যমান থাকে, তাকে সৃষ্টি করতে হয় না। বরং তার কাজ হচ্ছে মাবুদের প্রতি মানুষের চিন্তা চেতনাকে বিশুদ্ধ করা,তাকে আসল মাবুদের পরিচিতি দান করা, যিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই। আল্লাহর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য তার সামনে উপস্থাপন করা এবং তার জীবনে উপাস্যত্বের দাবী ও চাহিদাসমূহও তার সামনে পেশ করা। এটা হচ্ছে, আল্লাহকে রব (প্রভু) মানা, তাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা এবং তাঁকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসাবে গ্রহণ করা। আল্লাহর অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করা বা তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা মানব অস্তিত্বে স্পষ্ট ত্রুটি বিদ্যমান থাকার প্রমাণ বহন করে এবং এটা তার অনুভূতিশক্তি অকেজো হওয়ার ওপর দলীল, সুতরাং এ অকেজো হওয়ার চিকিৎসা বিরোধের মাধ্যমে সম্ভব নয়। আর এটা চিকিৎসার সঠিক পথও নয়।

নিসন্দেহে এ সৃষ্টি জগতে মোমেন হচ্ছে একজন আত্মসমর্পণকারী। সে তার স্রষ্টাকে চিনে, তাঁর অনুগত হয়। এ দুনিয়ায় সকল কিছু এবং কিছু মানুষ ছাড়া অন্য সকল প্রাণী ওই স্রষ্টার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মানুষ এ দুনিয়ায় বসবাস করে, যার প্রত্যেকটি অংশ ঈমান, ইসলাম, তাসবীহ ও সেজদার প্রতিধ্বনির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। এ দুনিয়ায় অণু-পরমাণু এমনকি তার শূন্যস্থানগুলোও এ প্রতিধ্বনিতে অংশগ্রহণ করে এবং এগুলো আল্লাহ নির্ধারিত বিধানসমূহের প্রতি অনুগত হয়। যে এসব প্রতিধ্বনিকে উপলব্ধি করে না, এতে খোদায়ী বিধানের ছন্দকে অনুভব করে না এবং যার প্রকৃতিক জাগতিক তরংগকে গ্রহণ করে না, বুঝতে হবে তবে প্রাকৃতিক সাড়া দেয়ার সকল যন্ত্রপাতিগুলো অকেজো হয়ে গেছে। সুতরাং বিবেকের সামনে এ ক্ষেত্রে বিরোধ করার পথ অবশিষ্ট থাকে না। তার চিকিৎসার একমাত্র পথ হচ্ছে, এতে সাড়া দেয়ার ইন্দ্রিয়গুলোকে সতর্ক

করে দেয়া এবং এতে সুপ্ত প্রকৃতি জাগাবার পুনরায় প্রচেষ্টা চালানো। যাতে এগুলো গতি ও কর্মস্পৃহা নতুন করে ফিরে পায়।

আসমান ও যমীনে যা কিছু বিদ্যমান, তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার জন্য অনুভূতি, অন্তর এবং বিবেককে জাগ্রত করা তথা মানব অন্তরকে পুনর্জীবন দান করার কোরআনী বিধানের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে এটিও একটি মাধ্যম। এর ফলে সে স্পন্দন ও গতি ফিরে পায় এবং এতে সাড়া দিতে পুনরায় অভ্যস্ত হয়।

কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয় যে, অস্বীকারকারী আরব জাহেল ও তার অনুসারীরা আকাশ পাতালে যা কিছু আছে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না এবং এর ডাকে সাড়াও দেয় না। তাহলে তারা কিসের অপেক্ষায় আছে?

আল্লাহর বিধানের কোনো ব্যতিক্রম নেই। মিথ্যারোপকারী অবিশ্বাসীদের পরিণাম সবার জানা। সুতরাং আল্লাহর বিধান তাদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবে, এরূপ আশা করার তাদের সুযোগ নেই। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন। তিনি আযাবের মাধ্যমে তাদেরকে নিঃশেষ করে দেননি। কিন্তু যারা মিথ্যারোপ ও অবিশ্বাসের ওপর অটল অবিচল থাকে, তাদের শাস্তির প্রয়োজন রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'এখন তারা এছাড়া আর কিসের প্রতীক্ষায় আছে যে, তাদের আগে চলে যাওয়া লোকেরা যে দুঃসময় দেখেছে তারাও তাই দেখবে?' 'তাদেরকে বলো, ঠিক আছে, অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।'

ওপরের আয়াতের সতর্কীকরণ যা যাবতীয় বিরোধকে শেষ করে দেয় এবং অন্তরের বিরোধসমূহেরও মূলোৎপাটন করে ফেলে।

প্রত্যেকটি রেসালাত এবং প্রত্যেকটি মিথ্যারোপের শেষ পরিণাম সম্পর্কে সর্তক করা এবং আলোচ্য ঘটনার সর্বশেষ উপদেশের মাধ্যমে এ অধ্যায়ের সমাপ্তি টানা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

অতপর (সত্যি সত্যিই যখন আযাবের............(আয়াত ১০৩)

নিসন্দেহে এটা এমন এক বাণী, যা আল্লাহ তায়ালা নিজের ওপর ফরয করে নিয়েছেন। আর তা হচ্ছে, ঈমানের অংকুর অবশিষ্ট থাকবে, গজাবে এবং তা প্রত্যেক কষ্ট, বিপদ, মিথ্যারোপ এবং শাস্তির পর আযাব মুক্তি পাবে।

আল্লাহর এ বিধান অতীতে ছিলো (আলোচ্য সূরার ঘটনাবলী তার সুস্পষ্ট প্রমাণ) এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, সুতরাং মোমেনদের এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া উচিত।

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِىْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ
تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ ۚ وَاُمِرْتُ اَنْ
اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾ وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ
مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ
فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا
كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ۗ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ
يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۗ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٧﴾ قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ
الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا

রুকু ১১

১০৪. (হে নবী,) তুমি (লোকদের) বলো, হে মানুষরা, তোমরা যদি আমার (আনীত) দ্বীনে কোনো সন্দেহ করো (তাহলে শুনে রাখো), আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য যাদের তোমরা এবাদাত করো, আমি তাদের এবাদাত করি না, আমি তো বরং তাঁর (মহান সত্তার) এবাদাত করি, যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন মোমেনদের অন্তর্ভুক্ত থাকি। ১০৫. (আমাকে বলা হয়েছে,) তুমি আল্লাহর দ্বীনের জন্যে একনিষ্ঠভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং কখনো তুমি মোশরেকদের দলে শামিল হয়ো না। ১০৬. (আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে,) তুমি কখনো আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডেকো না, যে তোমার কোনো কল্যাণ (যেমন) করতে পারে না, (তেমনি) তোমার কোনো অকল্যাণও সে করতে পারে না, (এ সত্ত্বেও) যদি তুমি অন্যথা করো, তাহলে অবশ্যই তুমি যালেমদের মধ্যে গণ্য হবে। ১০৭. যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কোনো দুঃখ-কষ্ট দেন তাহলে তিনি ছাড়া অন্য কেউই নেই তা দূরীভূত করার, (আবার) তিনি যদি (মেহেরবানী করে) তোমার কোনো কল্যাণ চান তাহলে তাঁর সে অনুগ্রহ রদ করারও কেউ নেই; তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে চান তাকেই কল্যাণ পৌঁছান; আল্লাহ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ১০৮. (হে নবী,) তুমি বলো, হে মানুষ, তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সত্য (দ্বীন) এসেছে; অতএব যে হেদায়াতের পথ অবলম্বন করবে সে তো তার নিজের ভালোর জন্যেই হেদায়াতের পথে চলবে, আর যে গোমরাহ থেকে যাবে সে তো গোমরাহীর ওপর চলার কারণেই গোমরাহ

يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ

حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَٰكِمِينَ ﴿١٠٩﴾

হয়ে যাবে, আমি তো তোমাদের ওপর কর্মবিধায়ক নই (যে, জোর করে তোমাদের গোমরাহী থেকে বের করে আনবো)। ১০৯. (হে নবী,) তোমার ওপর যে হেদায়াত নাযিল করা হয়েছে তুমি তার অনুসরণ করো এবং ধৈর্য ধারণ করো, যে পর্যন্ত আল্লাহ কোনো ফয়সালা না করেন, (কেননা) তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

তাফসীর
আয়াত ১০৪-১০৯

(হে নবী) তুমি (লোকদের) বলো, হে মানুষরা .... *(আয়াত ১০৪-১০৯)*

এটি হচ্ছে আলোচ্য সূরার সমাপনী বক্তব্য। এর মাধ্যমে দীর্ঘ ভ্রমণের যবনিকা টানা হচ্ছে, যেখানে মানব জাতিকে সৃষ্টিজগত ও নিজেদের নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করার কথা বলা হয়েছে। এ সমাপনী বক্তব্য আকীদা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। যেমন আল্লাহকে একমাত্র রব ও প্রভু মানা, তাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা এবং তাঁকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসাবে গ্রহণ করা, অসংখ্য অংশীদার এবং সুপারিশকারীকে অস্বীকার করা, সকল বিষয় আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর নির্ধারিত বিধানের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা। এই বিধানসমূহকে পরিবর্তন করা বা স্থানান্তরিত করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। ঐশী বাণী এবং তার সত্যতা স্বীকার করার সাথে এটাও স্বীকার করা যে মহাসত্য নিয়ে রসূল (স.) এ দুনিয়ায় এসেছেন– পুনরুত্থান, পরকাল এবং ইনসাফপূর্ণ প্রতিদান ইত্যাদিরও পরিবর্তন সম্ভব নয়।

এগুলো হচ্ছে আকীদার প্রধান প্রধান মূলনীতি। গোটা সূরাতে এগুলো বর্ণিত হয়েছে। এ মূলনীতিগুলো স্পষ্ট করার জন্যে আলোচ্য সূরায় বিভিন্ন ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে এবং সাথে সাথে একাধিক উপমা ও দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে।

এসব কিছু এ সূরার উপসংহারে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে রসূল (স.) আল্লাহর পক্ষ থেকে এ মর্মে আদিষ্ট হয়েছেন যে, তিনি যেন এ সমাপনী বক্তব্যকে মানুষের সামনে সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে জানিয়ে দেন এবং চূড়ান্ত বক্তব্যকে এভাবে পেশ করেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ফয়সালা আসা পর্যন্ত তিনি তাঁর পরিকল্পনায় এবং তাঁর পথে অটল থাকবেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকৌশলী। এরশাদ হচ্ছে,

(জান্নাতে প্রবেশ করার সময়) তাদের .... *(আয়াত ১০)*

হে নবী! তুমি বলে দাও, হে মানব জাতি, আমি যে হক দ্বীনের প্রতি তোমাদের আহ্বান করছি, যদি তোমরা এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করো, তবে এটা আমাকে আমার বিশ্বাস থেকে এক চুলও বিচ্যুত করতে পারবে না এবং আমাকে তোমরা যে মাবুদসমূহের গোলামী করো, তার গোলামী করতে বাধ্য করতে পারবে না।

'বরং আমি কেবলমাত্র এমন আল্লাহর গোলামী করি, যার হাতে রয়েছে তোমাদের মৃত্যু।'

আমি ওই আল্লাহর গোলামী করি, যিনি তোমাদের মৃত্যু, বয়স এবং জীবনের একচ্ছত্র অধিপতি। এখানে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করার বিশেষ অর্থ রয়েছে। এর মাধ্যমে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আয়ু শেষ হওয়ার পর তাঁর কাছেই তাদের ফিরে যেতে

হবে। তাঁর শক্তি তাদের চেয়ে অনেক বেশী। তিনি পরাক্রমশালী। সুতরাং তিনি ওই সমস্ত উপাস্যের তুলনায় এবাদাতের বেশী হকদার, যারা হায়াত ও মওতের মালিক নয়।

'আমাকে মোমেনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। সুতরাং আমি নির্দেশের সীমালংঘন করবো না। এরশাদ হচ্ছে,

(আমাকে আরো বলা হয়েছে) তুমি.............(আয়াত ১০৫)

এখানে সাধারণ বর্ণনা থেকে সরাসরি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেন রসূল (স.) সকলের উপস্থিতিতে আল্লাহর নির্দেশ গ্রহণ করছেন। প্রভাবের দিক থেকে এটা অত্যন্ত শক্তিশালী ও গভীর। 'আর আমাকে বলা হয়েছে, তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে ঠিকভাবে এ দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করো।' এখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে এ মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন একনিষ্ঠভাবে তাঁর পূর্ণ অনুগত হয়ে দ্বীনে ইসলামের ওপর অটল অবিচল থাকেন এবং কখনো যেন মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত না হন।' ঈমান গ্রহণ করার জন্যে সরাসরি নির্দেশ দেয়ার পর শেরেক থেকে বিরত থাকার জন্যে সরাসরি নিষেধের মাধ্যমে দ্বীনের ওপর অটল থাকা এবং খাঁটি মোমেনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টিকে জোরদার করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

(আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে) তুমি............ (আয়াত ১০৬)

তুমি আল্লাহকে বাদ দিয়ে ওই সকল অংশীদার এবং সুপারিশকারীদের ডেকো না, যারা তোমার না কোনো উপকার করতে পারে– না ক্ষতি করতে পারে। অথচ মোশরেকরা ওদেরকে উপকার এবং ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যেই ডাকতো। হে মোহাম্মদ, তুমি যদি তাদের মতো কাজ করো, তবে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং এ বিষয়টি ভালো করে জেনো রাখো যে, আল্লাহর তায়ালা কারো পক্ষপাতিত্ব করবে না এবং তাঁর ইনসাফ কারো ক্ষেত্রে শিথিল করা হবে না। এরশাদ হচ্ছে,

যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের .... (আয়াত ১০৭)

বিপদ ও অনিষ্ট আল্লাহর বিধানের অবশ্যম্ভাবী ফল ও প্রতিদান। আর এ বিপদ মানুষের দ্বারপ্রান্তে তখনই করাঘাত করে, যখন সে তার উপায় উপকরণগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কল্যাণও ঠিক তারই অনুরূপ। যদি আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিধান চালু রাখার মতো কোনো বিপদে ফেলেন, তাহলে কোনো মানুষই এ বিপদ তোমার থেকে দূর করতে পারবে না। এ বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে তাঁর বিধানের অনুসরণ করা এবং বিপদ ও অনিষ্টের ওই সমস্ত কারণ থেকে নিজেকে বিরত রাখা, অবশ্য যদি ওইগুলো ঠিকমতো জানা থাকে। যদি ওই কারণগুলো জানা না থাকে তবে ওইগুলোর উপকরণ থেকে বিরত থেকে সঠিক পথে অবিচল থাকার জন্যে আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়া এবং তাঁর কাছে দোয়া করা। আর তিনি যদি তাঁর বিধানানুসারে তোমার কাজের বিনিময়ে তোমার কোনো মংগল চান, তাহলে এ সৃষ্টিজীবের কেউই এ অনুগ্রহ তোমার থেকে রদ করতে পারবে না। তিনি তাঁর এ সকল বান্দাকে অনুগ্রহ করেন, যারা তাঁর মরযী এবং বিধানানুসারে ওই কল্যাণের উপায় উপকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়।

'তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' তিনি তাওবা করার পর বান্দার অপরাধ ক্ষমা করেন এবং তাঁর বান্দাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করেন। তাওবা, নেক আমল এবং সঠিক পথে ফিরে আসার মাধ্যমে তাদের অপরাধসমূহ তিনি ক্ষমা করে দেন।

আলোচ্য সূরা যে আকীদার কথা বলে এই হচ্ছে তার সারসংক্ষেপ। আল্লাহ তায়ালা রসূলকে এমর্মে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি যেন উপস্থিত জনশক্তিকে মৌলিক আকীদার এ সার সংক্ষেপটি ঘোষণার মাধ্যমে জানিয়ে দেন, নিসন্দেহে এটা অন্তরে প্রভাব বিস্তারকারী ইংগিতবাহী একটি

মৌলিক নির্দেশ। রসূল (স.) এ আকীদার বাণী নিয়েই বিশাল শক্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন। জাহেলিয়াতের ভ্রান্ত আকীদার প্রতি আংগুল দিয়ে মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি শেরেকে পরিপূর্ণ মোশরেকদের দীর্ঘ ইতিহাসের প্রতিও দিক নির্দেশনা তিনি দান করেছেন। শক্তির পাল্লা মোশরেকদের সাথে থাকা সত্তেও তিনি মক্কার মুষ্টিমেয় মোমেনের সামনে অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীনভাবে এ ঘোষণা দিয়েছিলেন। রসূল (স.) দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা এ জন্যেই দিতে পেরেছিলেন যে, এটা ছিলো দ্বীনের দাওয়াত এবং হকের দাওয়াত। এ দাওয়াত ছিলো বিশ্বাস এবং শক্তিতে পরিপূর্ণ।

অতপর মানবতার উদ্দেশ্যে সর্বশেষ ঘোষণা হচ্ছে,

(হে নবী) তুমি (এদের আরো) বলো..........(আয়াত ১০৮)

এটা সর্বশেষ ঘোষণা, হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক সূচক বাণী। এটা হচ্ছে সেই মহাসত্য যা রসূল (স.) তাঁর মালিকের কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিই এখানে স্বাধীন, যা ইচ্ছা সে গ্রহণ ও বর্জন করতে পারে।

'এখন যারা সোজা পথ অবলম্বন করবে, তাদের সোজা পথ অবলম্বন তাদের জন্যে কল্যাণকর হবে এবং যারা ভুল পথ অবলম্বন করবে, তাদের ভুল পথ অবলম্বন তাদের জন্যেই ধ্বংসকর হবে।'

মানুষদেরকে টেনে হেঁচড়ে হকের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্যে রসূল (স.) কখনোই আদিষ্ট হননি, তিনি হচ্ছেন মূলত সত্যের একজন প্রচারক মাত্র। মানুষকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, তারা স্বীয় ইচ্ছা এখতিয়ার, তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে হেদায়াতের পথ গ্রহণ করবে, কি করবে না।

পরিশেষে রসূলকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তিনি যেন ওহীর মাধ্যমে যে হেদায়াত পেয়েছেন, শুধু তারই অনুসরণ করেন। আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর সম্পর্কে ফয়সালা দান করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি যেন বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করেন। এরশাদ হচ্ছে,

(হে নবী) তোমার ওপর যে হেদায়াত............(আয়াত ১০৯)

এই হচ্ছে সূরার যথাযথ সমাপ্তি। সূরার সূচনার সাথে তার গভীর একটা যোগসূত্র রয়েছে এবং এটা কোরআনের সমন্বয় ও নীতি অনুসারে গোটা সূরার আলোচ্য বিষয়সমূহে সাথেও সমন্বিত।

সূরা হুদ

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরাটি পুরোপুরিই মক্কায় অবতীর্ণ। তবে কারো কারো মতে এর ১২, ১৭ ও ১১৪ নং আয়াতগুলো মদীনায় অবতীর্ণ। এ তিনটিট আয়াতকে সূরার সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে পড়লে মনে হয়, আয়াত তিনটি সূরার যথাস্থানেই আছে এবং ওখান থেকে ওগুলোকে সরিয়ে নেয়া হলে বেখাপ্পা শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এর আলোচ্য বিষয়গুলো মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট মক্কী বিষয়। এই আকীদা বিশ্বাসের ব্যাপারে কোরায়শ বংশীয় মোশরেকদের দৃষ্টিভংগি, তাদের এই দৃষ্টিভংগির কারণে রসূল (স.) ও তার সাথী মুষ্টিমেয় সংখ্যক মুসলমানের মনে সৃষ্ট উদ্বেগ ও অস্থিরতা এবং এই অস্থিরতা নিরসনে কোরআনের ভূমিকাও এ সূরায় আলোচিত হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ ১২নং আয়াতের কথাই ধরা যাক। এ আয়াতে বলা হয়েছে, 'মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে ধন সম্পদ নেমে আসুক তো দেখি কিংবা তার সাথে কোনো একজন ফেরেশতা আসুক তো দেখি'– এ কথা কাফেররা বলার কারণে হয়তো তুমি তোমার কাছে ওহীযোগে প্রেরিত বিধানের কিছু অংশ ছেড়েই দেবে এবং এর দরুন তোমার বক্ষ সংকুচিত হয়ে আসছে..........' এ কথা বলাই বাহুল্য যে, কোরায়শের পক্ষ থেকে ধরনের চ্যালেঞ্জ, এ ধরণের হঠকারী বক্তব্য প্রদানের কারণে রসূল (স.)-কে সান্ত্বনা দেয়া ও তাকে ওহীর বিধানের ওপর অবিচল থাকতে উদ্বুদ্ধ করা জরুরী হয়ে পড়ে, এটা মক্কাতেই ঘটেছিলো বিশেষত হযরত খাদিজা ও আবু তালিবের মৃত্যু, মেরাজের ঘটনা, স্বয়ং রসূল (স.)-এর ওপর মোশরেকদের হামলা করার উদ্যোগ গ্রহণ এবং দাওয়াতী তৎপরতা প্রায় স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পরে। এটা ছিলো মক্কায় ইসলামী আন্দোলনের সবচেয়ে কঠিন ও নৈরাশ্যজনক সময়।

আর ১৭ নং আয়াতের বক্তব্য হলো,

'আচ্ছা বলো তো, যে ব্যক্তি তার প্রভুর সুস্পষ্ট পথে রয়েছে আর সাথে সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সাক্ষীও বর্তমান রয়েছে এবং তার পূর্ববর্তী মূসার কেতাবও সাক্ষী, যা ছিলো পথ নির্দেশক ও রহমত স্বরূপ, (তিনি কি অন্যদের সমান)? ....এ আয়াতের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ সূরাটা কোরআনের মক্কী অংশেরই অন্তর্ভুক্ত এবং কোরায়শকে লক্ষ্য করেই তা নাযিল হয়েছে। কেননা কোরআন নিজেই রসূল (স.)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাঁর কাছে নাযিল হয়। তাছাড়া পূর্ববর্তী কেতাবসমূহ এবং বিশেষত মূসার কেতাবও এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিছু সংখ্যক আহলে কেতাবও এ মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছিলো। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, আহলে কেতাবের কিছু লোক মক্কায়ও বাস করতো। এই সাথে মোশরেকদের নীতি ও দৃষ্টিভংগির নিন্দা, তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে কুফরী করার জন্যে দোযখের আযাবের হুমকি দান, রসূল (স.)-কে এ বলে প্রবোধ দান যে, তিনি সত্যের ওপরেই আছেন, কাজেই তাঁর বিচলিত হওয়া ও দাওয়াত বন্ধ করার প্রয়োজন নেই এবং মক্কা ও তার আশপাশের অধিকাংশ গোত্রের হঠকারিতা– এ সব বক্তব্য দান থেকে বুঝা যায় যে, এ আয়াতটাও আসলে মক্কী। মূসার কেতাবের উল্লেখ দ্বারা কারো কারো সন্দেহ হয়ে থাকতে পারে যে, আয়াতটা মদীনায় অবতীর্ণ। কিন্তু এটা আসলে বনী ইসরাঈলকে লক্ষ্য করে বলাও হয়নি কিংবা তাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জও নয়, যা মাদানী কোরআনে সুপরিচিত। আসলে মূসার কেতাবের উল্লেখ এসেছে আহলে কেতাবের কিছু কিছু লোকের স্বীকৃতির পক্ষে সাক্ষ্য হিসাবে এবং মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে নাযিল করা ওহীর প্রতি মূসার কেতাবের সমর্থনের জন্যে। সূরাটা নাযিল হবার সময় মক্কায় যে কঠিন প্রতিকূল পরিস্থিতি

বিরাজ করছিলো এবং সেই পরিস্থিতির যা সুস্পষ্ট দাবী ছিলো, তার সাথে এই ব্যাখ্যা অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১১৪নং আয়াতটার পূর্বে রসূল (স.)-কে প্রবোধ দেয়া হয়েছে। কারণ হযরত মূসা (আ.)-এর কেতাবের ওপর ইতিপূর্বে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো বলে তিনি নিজের ব্যাপারেও শংকিত ছিলেন। এ আয়াতের পূর্বে রসূল (স.) ও তাঁর সাথে তাওবাকারীদেরকে সত্যের ওপর অবিচল থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মোশরেকদের পক্ষ নিতে নিষেধ করা হয়েছে। আর নামায ও ধৈর্যের সাহায্য নিতে বলা হয়েছে, যাতে সেই কঠিন সময়টার মোকাবেলা করা যায়। এ সব বক্তব্য ধারাবাহিকভাবে ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪ ও ১১৫ নং আয়াতগুলো পড়ে দেখলে স্পষ্টতই মনে হবে যে, ১১৪নং আয়াত মক্কী আয়াত।

সমগ্র সূরাটা সূরা ইউনুসের পরে নাযিল হয়েছে। আর সূরা ইউনুস নাযিল হয়েছে সূরা বনী ইসরাঈলের পর। এর ফলে সূরাটা ঠিক কোন সময়ে নাযিল হয়েছে, তার কিছু লক্ষণ নির্দিষ্টভাবে জানা যায়। মক্কায় ইসলামী দাওয়াতের ইতিহাস প্রসংগে আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, ওই সময়টা ছিলো সবচেয়ে কঠিন ও কষ্টকর সময়। কেননা তখন আবু তালিব ও খাদিজা (রা.) ইন্তিকাল করেছেন। আবু তালিব বেঁচে থাকতে মোশরেকরা রসূল (স.)-এর সাথে যে সব আচরণ করতে সাহস পায়নি, এ সময় সেই ধরনের আচরণও করতে শুরু করে দিয়েছিলো। বিশেষত অতীত বিস্ময়কর মেরাজের ঘটনার পর তারা তার সাথে ব্যংগ বিদ্রূপ করতে থাকে এবং কিছু কিছু মুসলমান মুরতাদ পর্যন্ত হয়ে যায়। এ সাথে রসূল (স.) খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকালে দুঃসহ একাকীত্ব অনুভব করতে থাকেন। এটা এমন এক সময়ে ঘটে, যখন রসূল (স.) ও তার আন্দোলনের ওপর কাফেরদের দৌরাত্ম্য ও দাপট মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়। যখন তাঁর ও তাঁর আন্দোলনের বিরুদ্ধে মোশরেকদের ঘোষিত যুদ্ধ নিষ্ঠুরতম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতি প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায় এবং মক্কা ও তার আশেপাশে আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলো না। এর অব্যবহিত পরই আল্লাহ প্রথম আকাবা ও দ্বিতীয় আকাবার বায়াতের মাধ্যমে রসূল (স.) ও মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্যের দ্বারোদঘাটন করেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, খাদিজা বিনতে খুওয়ায়লিদ ও আবু তালিব একই বছর মারা গেলে রসূল (স.)-এর ওপর বিপদ মুসীবতের পাহাড় নেমে আসে। খাদিজা ছিলেন ইসলামের ব্যাপারে তাঁর একনিষ্ঠ উপদেষ্টা। আর আবু তালেব ছিলেন তাঁর কাজের সহায়ক, শক্তির যোগানদাতা এবং তাঁর গোত্রের লোকদের অত্যাচার থেকে তাঁকে রক্ষাকারী। এই উভয় ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে রসূল (স.) বিপদাপদের মুখোমুখি হতে থাকেন। এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে রসূল (স.)-এর মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পূর্বে। আবু তালিবের জীবদ্দশায় মোশরেকরা রসূল (স.)-কে এমনভাবে নির্যাতন করার সাহস করেনি, যেমনটি তার তিরোধানের পর করেছিলো। এমনকি কোরায়শের একজন নগণ্য ব্যক্তিও তাঁর সামনে এসে তাঁর মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে।......... এরপর রসূল (স.) মাথায় মাটি নিয়ে যখন বাড়ীতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর এক মেয়ে তাঁর কাছে আসেন। তিনি তাঁর মাথার মাটি ধুয়ে সাফ করতে ও কাঁদতে থাকেন। রসূল (স.) তাঁকে বলেন, কেঁদনা মা, আল্লাহ তোমার আব্বাকে রক্ষা করবেন। তিনি আরো বলেন, আবু তালেবের মৃত্যুর আগে কোরায়শরা আমার সাথে এমন অবাঞ্জিত আচরণ কখনো করেনি।'

মিকরীনী 'ইমতাউল আসমা' গ্রন্থে বলেন, উভয়ের মৃত্যুর ফলে রসূল (স.)-এর ওপর আরো কঠিন মুসিবত নেমে আসে। তাই তিনি ওই বছরটাকে 'আমুল হুযন' অর্থাৎ দুঃখের বছর' নাম

দেন। তিনি বলতেন, 'আবু তালেব বেচে থাকতে কেউ আমার সাথে খারাপ আচরণ করেনি।' বস্তুত তার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আবু তালেব ছাড়া আর কেউ এমন ছিলো না, যে তাকে রক্ষা করতে বা সাহায্য করতে পারে।

এ সময়েই সূরা হূদ নাযিল হয়। এর অব্যবহিত পূর্বে নাযিল হয় সূরা ইউনুস। আর এ উভয় সূলার আগে নাযিল হয় সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা ফোরকান। এ সময়কার পরিস্থিতি কেমন ছিলো এবং কোরায়শের চ্যালেঞ্জ ও রাতারাতি কতখানি বেড়ে গিয়েছিলো, তার আলামত এই সূরাগুলোতে পাওয়া যায়। বিশেষত সূরা হূদের পটভূমি ও আলোচ্য বিষয়েও এবং বিশেষত রসূল (স.) ও তার সংগীদের মনোবল বৃদ্ধি করা ও প্রবোধ দেয়া সংক্রান্ত আয়াতগুলোতে এর আলামতগুলো সুস্পষ্ট।

এ সময়টার প্রকৃতি ও তার দাবী এ সূরায় যতোটুকু প্রকাশ পেয়েছে, তার কিছু কিছু তুলে ধরছি,

এ সূরায় সমগ্র মানব ইতিহাসে ইসলামী আকীদা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার পর্যালোচনা করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে হযরত নূহ (আ.) থেকে শুরু করে মোহাম্মদ (স.)-এর যুগ পর্যন্ত। বলা হয়েছে যে, এ আন্দোলন একই মৌলিক তত্ত্ব ও নীতিমালার ভিত্তিতে চলেছে। সেই মৌলিক তত্ত্ব হলো, একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে এবং এতে কাউকে শরীক করা যাবে না। একমাত্র তারই গোলামী বা দাসত্ব করা যাবে, আর কারো নয় এবং এ আনুগত্য ও দাসত্বের পন্থা সমগ্র মানবেতিহাস জুড়ে কেবলমাত্র আল্লাহর রসূলদের কাছ থেকেই শিখতে হবে। এই সাথে এ বিশ্বাসও রাখতে হবে যে, দুনিয়ার জীবন ফলাফল ভোগ করার জীবন নয় বরং পরীক্ষার জীবন। ফলাফল শুধুমাত্র আখেরাতের জন্যেই নির্দিষ্ট রয়েছে। হেদায়াত ও গোমরাহী এই দুটোর যে কোনো একটার পথ বেছে নেয়ার জন্যে আল্লাহ মানুষকে যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, সেটাই এ পরীক্ষার মূল বিষয়।

হযরত মোহাম্মদ (স.) 'এমন এক কেতাব নিয়ে এসেছিলেন, যার আয়াতগুলো সুরক্ষিত ও বিস্তারিত।' (আয়াত-১) আর এ গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় হলো, আল্লাহ ছাড়া আর আরো এবাদাত করো না........(আয়াত ২,৩ ও ৪) অর্থাৎ তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত।

কিন্তু এই দাওয়াত নতুন নয়। ইতিপূর্বে নূহ, হূদ সালেহ, শোয়ায়ব, মূসা প্রমুখ নবীও এ দাওয়াত দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, আমি নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম............' (আয়াত ২৬ ও ২৭) 'আদ জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই হূদকে। ....' (আয়াত ৫১, ৫২ ও ৫৩) সামুদ জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই সালেহকে।........ (আয়াত ৬২) 'মাদায়েনের কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই শোয়ায়বকে।..........' (আয়াত ৮৫, ৮৬ ও ৮৭) এভাবে দেখা যায় যে, প্রত্যেক নবী একই কথা বলেছেন এবং একই শাশ্বত দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহর নবীদের নীতি ও অবস্থান সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। একদিকে তাঁরা তাদের জাতির পক্ষ থেকে ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান, ব্যংগ বিদ্রূপ, উপহাস, হুমকি ও নির্যাতন ভোগ করেছেন। অপরদিকে তাঁদেরকে এর মোকাবেলায় ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাস বহাল রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বস্তুত তারা যে সত্যের ওপর আছে, তাঁদের কাছে আল্লাহর সাহায্য যে অবশ্যই আসবে, কাফেররা যে দুনিয়া ও আখেরাতে শোচনীয় পরিণতি ভোগ করবে এবং নবীদের অভিভাবক মহান আল্লাহ যে কাফেরদেরকে ধ্বংস করতে ও মোমেনদেরকে নিস্কৃতি দিতে সক্ষম, সে ব্যাপারে তারা দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করতেন।

হযরত নূহের ঘটনায় আমরা নিম্নরূপ দৃশ্য দেখতে পাই,

‘কাফেরদের নেতারা বললো, তোমাকে তো আমরা আমাদের মতই মানুষ দেখতে পাচ্ছি এবং আমাদের কাছে আপাতদৃষ্টিতে যারা একেবারেই নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ, তারা ছাড়া আর কেউ তোমার অনুসারী হচ্ছে এমন তো দেখতে পাচ্ছি না। ....ঠিক আছে, তুমি যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে এসো।.............(আয়াত ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৪)

হযরত হূদের কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই নিম্নরূপ দৃশ্য,

‘তারা বললো, ওহে হূদ, তুমি আমাদের কাছে কোনো অকাট্য প্রমাণ আনতে পারনি। তোমার কথায় আমরা আমাদের দেবতাদেরকে ছাড়তে প্রস্তুত নই এবং তোমার ওপর ঈমান আনতে প্রস্তুত নই।

..........অতপর যখন আমার ফয়সালা এলো, আমি হূদ ও তার মোমেন সাথীদেরকে কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করলাম.......... আ'দ জাতিকে এই দুনিয়ায় ও কেয়ামতের দিন অভিশাপ দেয়া হলো। সাবধান, আ'দ তাদের প্রভুর প্রতি কুফরী করেছিলো। সাবধান, হূদের জাতি আদের ওপর অভিসম্পাত।’......(আয়াত ৫৪-৬১)

সালেহ (আ.)-এর ঘটনায় নিম্নরূপ দৃশ্য দেখতে পাই,

‘সামুদ বললো, ওহে সালেহ, তুমি আমাদের অনেক আশা ভরসার পাত্র ছিলে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যার পূজা করে গেছে তার পূজা করতে কি তুমি আমাদের নিষেধ করছো?........যখন আমার আযাব এলো, তখন আমি সালেহ ও তার মোমেন সাথীদেরকে রক্ষা করলাম........ ফলে তারা তাদের ঘরেই পড়ে রইলো।........(আয়াত নং ৬৩, ৬৪ এবং ৬৭ ও ৬৮)

শোয়ায়ব (আ.)-এর ঘটনায় নিম্নরূপ দৃশ্য দেখতে পাই,

‘তারা বললো, ওহে শোয়ায়ব, তোমার নামায কি তোমাকে আদেশ দেয়, যেন আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের উপাসিত দেবদেবীর পূজা করবো না?........ অতপর যখন আমার আযাব এলো, আমি শোয়ায়ব ও তার মোমেন সাথীদেরকে অব্যহতি দিলাম, আর যালেমদেরকে বিকট শব্দ আক্রমণ করলো। ফলে তারা তাদের ঘরেই উপুড় হয়ে পড়ে রইলো। যেন তারা কোনো দিন সেখানে বাস করেনি। শুনে রাখো, সামুদের মতো মাদায়েনবাসীর ওপরও অভিসম্পাত!’ (আয়াত নং ৮৮ থেকে ৯৬ পর্যন্ত)

এই কেসসা কাহিনীর ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন, তার সম্মানিত সাথীদের ওপর যে নির্যাতন হয়েছে, সে ব্যাপারে তাকে প্রবোধ দেয়া হয়েছে, তাদের ওপর আল্লাহ যে সাহায্য নাযিল করেছেন, তার উল্লেখ করা হয়েছে এবং অন্যান্য নবীর মতো তাকেও প্রত্যাখ্যানকারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বলা হয়েছে। কেননা তাঁর ওহী ও রেসালাত সংক্রান্ত দাবী সম্পূর্ণ সত্য।

নূহ (আ.)-এর ঘটনার শেষে নিম্নরূপ মন্তব্য দেখতে পাই,

‘এ হচ্ছে অদৃশ্য জগতের কিছু খবর, যা আমি ওহীর মাধ্যমে তোমাকে অবহিত করি। তুমি বা তোমার জাতি এগুলো ইতিপূর্বে জানতে না। অতএব, ধৈর্যধারণ করো। সর্বশেষ সাফল্য সংযমশীল লোকদের জন্যে।’

এ সূরার সব কটা ঘটনার শেষে সূরার শেষ পর্যন্ত নিম্নরূপ দীর্ঘ মন্তব্য দেখতে পাই,

‘এ হচ্ছে গ্রামসমূহের অধিবাসীদের কিছু কাহিনী, যা আমি তোমাকে শোনাচ্ছি।.......... আমি কিন্তু তাদের ওপর যুলুম করিনি, বরং তারাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।.......... তোমার প্রভু

যখন কোনো যালেম জনপদকে পাকড়াও করেন, তখন এভাবেই করেন। তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক........ (আয়াত ১০১ থেকে ১১৭ পর্যন্ত)

এভাবেই কোরআনের নির্দেশাবলীতে আন্দোলনের দিকটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা দেখতে পাই, কোরআন দাওয়াত ও আন্দোলনকে প্রত্যেক পর্যায়ে উপযুক্ত নির্দেশাবলী দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে। এভাবেই দেখতে পাই, কোরআনের কেসসা কাহিনী আন্দোলনের দাবী এবং জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দাবীকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে ও জীবন্তভাবে তুলে ধরে। এ কেসসা কাহিনী সূরার অন্যান্য অংশের বক্তব্যের সাথে পুরোপুরিভাবে সংগতিশীল, চাই তা আইন ও বিধানের আকারে হোক বা সাধারণ নীতিমালা ও উপদেশমালার আকারে হোক।

ইতিপূর্বে একাদশ পারায় সূরা ইউনুসের ভূমিকায় আমি বলেছি,

'যিলালিল কোরআনে' আমরা সর্বশেষ যে মক্কী সূরা দেখতে পেয়েছি, তা ছিলো সূরা আনয়াম ও সূরা আরাফ। ওই দুটো সূরা কোরআনে ধারাবাহিকভাবে সংকলিত হয়ে থাকলেও নাযিল হওয়ার সময় তা ধারাবাহিকভাবে নাযিল হয়নি। এরপর এসেছে মাদানী সূরাসুলভ সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট, প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু সম্বলিত সূরা আনফাল ও তাওবা। এক্ষণে আমরা যখন পুনরায় মক্কী সূরাসমূহে প্রত্যাবর্তন করছি, তখন সূরা ইউনুস ও হূদকে এমন দুটো সূরা হিসাবে পাচ্ছি, যা কোরআনে ধারাবাহিকভাবে সংকলিত হয়েছে, নাযিলও হয়েছে ধারাবাহিকভাবে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, বিষয়বস্তু ও বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের পদ্ধতির দিক দিয়ে ইউনুস ও হূদের সাথে আনয়াম ও আরাফের বিরাট সাদৃশ্য রয়েছে। সূরা আনয়ামে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসকে তুলে ধরা হয়েছে, তা দিয়ে জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করা হয়েছে এবং আকীদা, এবাদাত ও আমল সর্বক্ষেত্রেই জাহেলিয়াতের অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে। আর সূরা আরাফে ইসলামী আকীদার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও তা নিয়ে জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। একই ধরনের প্রকৃতি দেখতে পাই সূরা ইউনুস ও হূদেরও। বিষয়বস্তু ও তার উপস্থাপনা পদ্ধতিতে উভয়ের রয়েছে যথাক্রমে আনয়াম ও আরাফের সাথে বিরাট সাদৃশ্য। পার্থক্য শুধু এতোটুকু যে, সূরা আনয়ামের ভাষা অত্যন্ত শানিত, তীব্র ও জোরদার। এর সুর, তাল ও লয় অত্যন্ত উচু। এর স্পন্দন অত্যন্ত শক্তিশালী ও দ্রুত। এর দৃশ্য অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং গতি খুবই প্রচন্ড। কিন্তু সূরা ইউনুসের সুর ও লয় মৃদু, স্পন্দন শান্ত ও ভাষা প্রাঞ্জল। পক্ষান্তরে সূরা হূদ আলোচ্য বিষয়, আলোচ্য বিষয় উপস্থাপনের পদ্ধতি, সুর, লয় ও স্পন্দন– সব দিক দিয়েই সূরা আরাফের সাথে অত্যধিক সাদৃশ্যময়। এসব সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য সত্তেও প্রত্যেক সূরার নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্ত্বা ও প্রতীকী বৈশিষ্ট্য রয়েছে।'

এ সারসংক্ষেপের আর একটু বিশদ ব্যাখ্যা দিলে বলতে হয় যে, সূরা ইউনুসে হযরত নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের সংক্ষিপ্ত কাহিনী, হযরত মূসার অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত কাহিনী এবং হযরত ইউনুসের অতীব সংক্ষিপ্ত কেসসা আলোচিত হয়েছে। তবে এ সূরায় কেসসা কাহিনী যা কিছুই আলোচিত হয়েছে, তা সূরার কাংখিত আকীদা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর উদাহরণ ও সাক্ষ্য হিসাবেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সূরা হূদে কেসসা কাহিনী হয়ে উঠেছে সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়। যদিও এ সূরায়ও কেসসা কাহিনী তার আলোচিত আকীদা বিষয়ক তথ্যাবলীর উদাহরণ ও সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবেই এসেছে, কিন্তু উপস্থাপনের ধরন দেখে মনে হয় যে, মানবেতিহাসে ইসলামী আকীদা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের গতি ও পরিণতি পর্যালোচনা করাই এর প্রধান ও সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য।

এ জন্যেই এ সূরাকে আমরা আলোচ্য বিষয়ের দিক দিয়ে তিন ভাবে বিভক্ত দেখতে পাই,

প্রথম ভাগে আকীদা বিষয়ক তথ্যাবলী রয়েছে, যা সূরার শুরুতে একটু সীমিত পরিসরে বিদ্যমান।

দ্বিতীয় ভাগে এই আকীদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে এবং এটাই এ সূরার বেশীর ভাগ জায়গা জুড়ে বিরাজ করছে।

তৃতীয় ভাগে রয়েছে এ আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য এবং তা খুবই সীমিত পরিসরে।

এটাও সুস্পষ্ট যে, মৌলিক আকীদা বিষয়ক যে তথ্যাবলীর আলোচনা এ সূরার সার্বিক ও প্রধান লক্ষ্য, সেই বিষয় সংক্রান্ত আলোচনার সাথে এ সূরার সব কটা অংশের পরিপুর্ণ সমন্বয় ও সাযুজ্য রয়েছে। প্রত্যেকটি অংশেই ওই অংশের স্বতন্ত্র প্রকৃতি ও বর্ণনাভংগি অনুসারে আকীদা বিষয়ক আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এই বর্ণনাভংগি কেসসা কাহিনী, নির্দেশাবলী ও সাধারণ আলোচনা থেকে অনেকাংশে পৃথক।

যে মৌলিক আকীদাগত তথ্যাবলী আলোচনা করা এ সূরার সার্বিক লক্ষ্য, তা নিম্নরূপ,

রসূল (স.) যে মৌল তত্ত্ব নিয়ে এসেছেন এবং পূর্বেকার নবীরা যে মৌল তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন তত্ত্ব। আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীযোগে অবতীর্ণ এ মৌল তত্ত্বের সারকথা হলো, এক আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, এ আনুগত্যের পন্থা ও পদ্ধতি আল্লাহর রসূলদের কাছ থেকে শিখতে হবে এবং এ তত্ত্বের ভিত্তিতে মানবজাতি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে।

রসূল (স.)-এর দাওয়াতের মৌল তত্ত্ব সম্পর্কে সূরার প্রথম ভাগে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে,

'আলিফ লাম রা, এটা এমন কেতাব, যার আয়াতগুলোকে মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংহত করা ও তার পর বিস্তৃত করা হয়েছে। তুমি বলো, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো এবাদাত করো না, আমি তোমাদের জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী।' (আয়াত ১ ও ২)

'তারা কি বলে যে, এ কোরআন তার মনগড়া? বলো, তাহলে তোমরা এ ধরনের দশটা আয়াত নিয়ে এসো........'। (আয়াত ১৩ ও ১৪)

নবীদের কাহিনী বর্ণনা করার সময়ও তাদের দাওয়াতের মূল বিষয় এবং ওই আকীদার ভিত্তিতে তাঁদের জাতি ও আপনজনদের সাথে তাদের বিচ্ছেদের কথা ঘোষিত হয়েছে। যথা,

'আমি নূহকে তাঁর জাতির কাছে পাঠালাম যেন সে তাদেরকে বলে, আমি তোমাদের জন্যে প্রকাশ্য সতর্ককারী এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো এবাদাত করো না।............. (আয়াত ২৫, ২৮, ৪৫ ও ৪৬)

'আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিলো, হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো এবাদাত করো না........। (আয়াত ৫০)

'সামুদ জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই সালেহ (আ.)-কে। সে বলেছিলো, 'হে আমার জাতি। তোমরা আল্লাহর এবাদাত করো এবং তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই।.......' (আয়াত ৬১ ও ৬৩)

'আর মাদায়েনে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই শোয়ায়বকে। সে বলেছিলো যে, তোমরা শুধু আল্লাহর এবাদাত করো, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই....(আয়াত ৮৩ এবং ৮৮)

সূরার উপসংহারে দাওয়াতের মূলতত্ত্ব ও মূলতত্ত্বের ভিত্তিতে জনগণের সাথে রসূলদের বিচ্ছেদের বিষয়টা নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

'যালেমদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না। তাহলে আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে। ...... (১১৩)

আল্লাহর হাতেই রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত অজানা তথ্য। (আয়াত ১২৩)

এভাবে সূরার তিনটি অংশেই আকীদা বিষয়ক আলোচনা রয়েছে।

মানুষ যাতে একমাত্র আল্লাহর হুকুমের অনুগত হয়, সেজন্যে সূরাটা আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরেছে। এতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র মানবজাতি পৃথিবীতে আল্লাহর মুঠোর মধ্যে রয়েছে এবং কেয়ামতের দিন তারা আবার আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে। তখন তিনি তাদেরকে চূড়ান্ত কর্মফল দেবেন। এ বিষয়টাও এ সূরার তিনটি অংশেই আলোচিত হয়েছে। যেমন প্রথমাংশে বলা হয়েছে,

'সাবধান, তারা তারা কাছ থেকে নিজেদেরকে লুকানোর জন্যে তাদের বুককে সংকুচিত করে থাকে। সাবধান, তারা যখন তাদের পোশাকে আবৃত হয়, তখন আল্লাহ জানেন তারা কী কী লুকাচ্ছে এবং কী কী প্রকাশ করছে। ....' (আয়াত ৫-৮)

'যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার সুখ সৌন্দর্যের জন্যে লালায়িত, তাকে আমি তার সৎকর্মের প্রতিফল দুনিয়াতেই পুরো মাত্রায় দিয়ে দেবো। .... (আয়াত ১৫ ও ১৬)

নবীদের ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে নিম্নরূপ আয়াতসমূহ এসেছে,

'আমি আমার ও তোমাদের প্রভু আল্লাহর ওপর নির্ভর করেছি। এমন কোনো প্রাণী নেই, যার জীবন আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ নয়।.......... (আয়াত ৫৬ ও ৫৭)

'সামুদের কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম।........... (আয়াত ৬১)

আর উপসংহারে বলা হয়েছে,

'তোমার প্রভু যখন অপরাধী জনপদগুলোকে পাকড়াও করেন, তখন এ রকমই করেন।.... (আয়াত ১০২, ১১১, ১১৭, ১১৮, ১১৯)

এভাবে তিনটে অংশেই আল্লাহর ও আখেরাতের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে,

এ সূরার লক্ষ্য আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করা নয়, বরং একমাত্র আল্লাহই যে পালনকর্তা তথা আইনদাতা, হুকুমদাতা ও মানবজীবনের আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী, সেটা প্রমাণ করাই এর লক্ষ্য। আল্লাহর এ নিয়ন্ত্রণ প্রাকৃতিক জগতে যেমন প্রতিষ্ঠিত, তেমনি মানবজাতির নৈতিক জীবনেও প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। বস্তুত আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে কখনো মতভেদ হয়নি। মতভেদ হয়েছে শুধু আল্লাহই একমাত্র আইনদাতা ও হুকুমদাতা মনিব কিনা তা নিয়ে। সকল নবীকে এ বিষয়টা প্রতিষ্ঠিত করতেই সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং সর্বশেষ নবীকেও আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তার আইনগত কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যেই সংগ্রাম করতে হয়েছে। একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব করা, একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং মানুষের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান কেবল আল্লাহর আইন ও বিধান অনুসারে করার অপরিহার্যতা এ সূরার প্রতিটি অংশেই আলোচিত হয়েছে।

উল্লেখিত আকীদাগত বিষয়গুলো মন মগযে বদ্ধমূল করা, সমগ্র অন্তরাত্মায় তার চেতনা সঞ্চারিত করা, সমগ্র মানবসত্তার শিরায় শিরায় তাকে সঞ্চালিত করা, সমগ্র মেরুমজ্জায় তাকে চলন্ত ও জীবনীশক্তির আকারে এমনভাবে প্রবাহিত করা যেন তা একটা ইতিবাচক, প্রেরণাদায়ক 'এবং মানুষের ভাবাবেগ, চিন্তাধারা, কাজ ও গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিতে পরিণত হয়– এ সূরার অন্যতম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আর উল্লেখিত আকীদাগত বিষয়গুলোকে এরূপ একটা কার্যকর শক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে সূরাটাতে বিভিন্ন ধরনের উদ্দীপনাময় বক্তব্যের সমাবেশ ঘটানো

হয়েছে, যা মানব সত্ত্বাকে প্রবলভাবে আন্দোলিত ও আলোড়িত করে এবং তাতে গভীর আবেগ ও প্রেরণার সৃষ্টি করে।

প্রথমত এমন বহু আয়াত এ সূরায় সন্নিবেশিত হয়েছে, যাতে যুগপৎ ভীতি প্রদর্শন করা ও আশ্বাস দেয়া হয়। একদিকে কাউকে শরীক না করে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের দাওয়াতকে যে ব্যক্তি মনে প্রাণে গ্রহণ করে, তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণ লাভের জন্যে এবং মানব জাতির কল্যাণ, সংস্কার ও উৎকর্ষ সাধনের জন্যে আশান্বিত ও আগ্রহী করে তোলে। অপরদিকে যারা এই দাওয়াতকে অগ্রাহ্য করে এবং খোদাদ্রোহীদের পথ অনুসরণ করে, তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং দুনিয়া ও আখেরাতে আযাব ভোগ করার ভীতি প্রদর্শন করে। নিম্নে এই ভীতি প্রদর্শন ও আশ্বাস দানের কিছু নমুনা দেয়া গেলো,

' তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো এবাদাত করো না। আমি তোমাদের জন্যে তার পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতা।......... (আয়াত ২-৩)

'যারা শুধু পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য সুষমাই কামনা করে, তাদের কাজের প্রতিদান আমি দুনিয়াতেই পুরোপুরি দিয়ে দেবো।...........' আখেরাতে তাদের জন্যে আগুন ছাড়া আর কিছু নেই............।' (আয়াত ১৫ ও ১৬)

'আচ্ছা, যে ব্যক্তি তার প্রভুর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত, ... সে তো তার ওপর ঈমান রাখে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রতি কুফরী করে, আগুনই তার প্রতিশ্রুত কর্মফল........... (আয়াত ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪)

'আর হে আমার জাতি, তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা চাও, অতপর তাওবা করো, তাহলে তিনি আকাশ থেকে তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন............। (আয়াত ৫২)

আর যদি এ কথা অমান্য করো, তাহলে আমি কিন্তু তোমাদের কাছে আমার আনীত বার্তা পৌছিয়ে দিয়েছি.........। (আয়াত ৫৭)

'আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়ে পাঠিয়েছি ফেরাউন ও তার দলবলের কাছে............ দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের ওপর অভিসম্পাত......।' (আয়াত ৯৬-৯৯)

এ সতর্কবাণী ও আশ্বাসবাণী যে দীর্ঘ কেসসা কাহিনীর মধ্য দিয়ে সত্য প্রমাণিত হয়েছে, ইসলামী আন্দোলনের গোটা ইতিহাস জুড়ে অবিশ্বাসীদের ধ্বংস ও বিশ্বাসীদের মুক্তির মধ্য দিয়ে, বিশেষত বন্যার ঘটনার মধ্য দিয়ে যা প্রমাণিত হয়েছে, তাও এ সূরায় সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন, 'নূহকে ওহীযোগে জানানো হলো যে, তোমার জাতির মধ্য থেকে যারা ইতিমধ্যে ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া কেউ কখনো ঈমান আনবে না।......... তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার ওহীর নির্দেশের সাহায্যে জাহাজ তৈরী করো।........... (আয়াত ৩৬-৪৪)

সুখ সমৃদ্ধি ও দুঃখ কষ্ট দ্বারা চলমান ঘটনাবলীর মোকাবেলা করার সময় মানব মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে, তারও কিছু কিছু প্রতিচ্ছবি এ সূরায় অংকন করা হয়েছে। যারা রসূলের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আযাব তাড়াতাড়ি আসুক বলে নবী রসূলদের চ্যালেঞ্জ দেয়ার ধৃষ্টতা দেখায়, তাদের সামনে তাদের সেই সময়কার দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, যখন তারা সত্য সত্যই আযাবের কবলে পড়বে। পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে ও সুখ সমৃদ্ধি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে যে শোচনীয় দুর্দশার কবলে পড়বে, তাও মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পুনরায় সংকট ঘুচে গেলে ও সুখ সমৃদ্ধির মুখ দেখলে মানুষ নতুন করে যে দাম্ভিকতায় লিপ্ত হয়, তাও চিত্রিত করা হয়েছে। যেমন,

'আর আমি যদি আযাবকে কিছুদিনের জন্যে বিলম্বিত করি, তাহলে তারা বলে যে, আযাবকে থামিয়ে রাখলো কে? সাবধান, আযাব যেদিন আসবে, সেদিন তা কেউ প্রতিহত করতে পারবে না।............' (আয়াত ৮, ৯, ১০ ও ১১)

কোনো কোনো স্থানে কেয়ামতের কিছু দৃশ্য, সেদিন কাফেরদের শোচনীয় দুর্দশা, আল্লাহর ওহীকে অস্বীকার ও তার রসূলদেরকে অমান্য করার পর তাঁর সামনে তাদের উপস্থিতি, অপমান এবং দেব দেবী ও সুপারিশকারীদের সুপারিশ না পাওয়ার দৃশ্য তুলে ধারা হয়েছে। যেমন, 'সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে আছে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে? (আয়াত ১৮-২৩, ১০৩-১০৮)

মানুষের কাছে আল্লাহ সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকেন এবং তার মনের কোণে লুকানো কথাবার্তা পর্যন্ত তিনি জানেন– এ সত্য মানুষের মনে ত্রাস সঞ্চার করতে সক্ষম। বিশেষত যে কাফেররা আল্লাহর উপস্থিতিকে মানে না, তার সর্বব্যাপী জ্ঞানের ধারণা রাখে না এবং তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে তাঁর মুঠোর মধ্যে রাখার কথা কল্পনাও করে না, তাদের জন্যে এ উক্তি অত্যন্ত ভীতিসঞ্চারক। বস্তুত তারা যতই অস্বীকার করুক, তারা নিজেরাই অন্যান্য সৃষ্টির মতো আল্লাহর মুঠোর মধ্যে অবস্থিত।

'আল্লাহর কাছেই তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে। ....(আয়াত ৪, ৫,৬ ও ৫৬)

সূরার আরেকটা প্রেরণাদায়ক উপাদান হলো, যুগে যুগে নবীদের নেতৃত্বে যে ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন সত্যের বাণীর সাহায্যে জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করেছে, তাদের কাহিনী। সত্যের এ কাফেলাগুলোর ছিলো অবিচল ঈমান ও অটুট প্রত্যয়। এ সংক্রান্ত কিছু পর্যালোচনা ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। বাকীটা করা হবে যথাস্থানে তাফসীর প্রসংগে। এ কথা নিসন্দেহে বলা যায় যে, নবীদের অভিন্ন ভূমিকা ও অভিন্ন মূলনীতি, সর্বকালে তারা যে সত্য দ্বারা জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করেছেন, সেই সত্যের অভিন্নতা, এমনকি তাদের বক্তব্যের পর্যন্ত অভিন্নতা ইসলামী আন্দোলনের জন্যে চিরস্থায়ী শক্তি ও প্রেরণার উৎস। সূরার ভূমিকায় এ কটা কথাই যথেষ্ট মনে করি এবং এবার তাফসীরে মনোনিবেশ করতে চাই।

সূরা হূদ

আয়াত ১২৩ রুকু ১০

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ قف كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۝١ اَلَّا
تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ط اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ۝٢ وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ
تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ
فَضْلٍ فَضْلَهٗ ط وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ۝٣ اِلَى
اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٤ اَلَآ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ
لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ط اَلَا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ لا يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. আলিফ-লাম-রা। এ (কোরআন হচ্ছে এমন একটি) কেতাব, যার আয়াতসমূহ অত্যন্ত সুস্পষ্ট (ও সুবিন্যস্ত) করে রাখা হয়েছে, অতপর (এর বর্ণনাসমূহও এখানে) বিশদভাবে বলে দেয়া হয়েছে, (এ কেতাব) এক প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ সত্তার কাছ থেকে (তোমার কাছে এসেছে।) ২. (এর বক্তব্য হচ্ছে,) তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো গোলামী করবে না, আর আমি তো তোমাদের জন্যে তাঁর কাছ থেকে (আযাবের) ভয় প্রদর্শনকারী ও (জান্নাতের) সুসংবাদদানকারী মাত্র। ৩. (এর উদ্দেশ্য হচ্ছে,) তোমরা যেন তোমাদের মালিকের (দরবারে তোমাদের গুনাহখাতার জন্য) ক্ষমা চাইতে পারো, অতপর (গুনাহ থেকে তাওবা করে) তাঁর দিকে ফিরে আসতে পারো, (তাহলে) তিনি তোমাদের একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত উত্তম (জীবন) সামগ্রী দান করবেন এবং প্রতিটি মর্যাদাবান ব্যক্তিকে তার মর্যাদা অনুযায়ী (পাওনা আদায় করে) দেবেন; আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্যে একটি কঠিন দিনের আযাবের ভয় করছি। ৪. (কেননা, এ জীবনের শেষে) তোমাদের সবাইকে আল্লাহ তায়ালার কাছেই ফিরে যেতে হবে এবং তিনি সর্ব-বিষয়ের ওপর একক ক্ষমতাবান। ৫. সাবধান, এ (নির্বোধ) লোকেরা (মনের কথা দিয়ে কিন্তু) নিজেদের অন্তরসমূহকে ঢেকে রাখে, যেন আল্লাহর কাছ থেকে তা লুকিয়ে রাখতে পারে; কিন্তু এরা কি জানে না, যখন তারা কোনো কাপড় দিয়ে (নিজেদের) ঢেকে দেয়, তখন আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই জানেন তারা (তার ভেতরে) কোন্ বিষয় লুকিয়ে রাখছে,

يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا

عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى

الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ

الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا

عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ

لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ وَلَئِنْ أَذَقْنَا

الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ۝ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ

আর কোন্ বিষয় তারা প্রকাশ করছে, অবশ্যই তিনি মনের ভেতরের সব কথা জানেন। ৬. যমীনের ওপর বিচরণশীল এমন কোনো জীব নেই, যার রেযেক (পৌঁছানোর দায়িত্ব) আল্লাহর ওপর নেই, তিনি (যেমন) তার আবাস সম্পর্কে অবহিত, (তেমনি তার মৃত্যুর পর) তাকে যেখানে সোপর্দ করা হবে তাও তিনি জানেন; এসব (কথা) একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে (লিপিবদ্ধ) আছে। ৭. আর তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন, (সে সময়) তাঁর 'আরশ' ছিলো পানির ওপর (এ সৃষ্টি কৌশলের লক্ষ্য), যেন তিনি এটা যাচাই করে নিতে পারেন, তোমাদের মধ্যে কে তার কাজে কর্মে উত্তম; (হে নবী,) আজ যদি তুমি এদের বলো, মৃত্যুর পর তোমাদের অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে, তাহলে যেসব মানুষ কুফুরের রাস্তা গ্রহণ করেছে তারা সাথে সাথেই বলবে, এ (কেতাব) তো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। ৮. আমি যদি নির্দিষ্ট একটা মেয়াদের জন্যে তাদের (এ) আযাব তাদের কাছ থেকে সরিয়ে রাখি, তাহলে (তামাশাচ্ছলে) ওরা বলবে, কোন্ জিনিস এখন এ (আযাব)-কে আটকে রেখেছে; (অথচ) যেদিন এ আযাব তাদের ওপর এসে পতিত হবে, সেদিন এ আযাব তাদের কাছ থেকে সরাবার কেউই থাকবে না, যে (আযাব) নিয়ে তারা হাসি-বিদ্রূপ করছিলো, তা তাদের পরিবেষ্টন করে ফেলবে।

রুকু ২

৯. আমি যদি মানুষকে (একবার) আমার রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই এবং পরে (কোনো কারণে) যদি তা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিই, তাহলে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। ১০. আবার কোনো দুঃখ-দৈন্য তাকে স্পর্শ করার পর যদি তাকে আমি

نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿١٠﴾
إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ
كَبِيرٌ ﴿١١﴾ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن
يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ۚ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ
مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾
فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا
هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٤﴾ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

অনুগ্রহের স্বাদ ভোগ করাই, তখন সে বলতে শুরু করে (হ্যাঁ), এবার আমার থেকে সব বিপদ-মসিবত কেটে গেছে, (আসলে) সে (অল্পতেই যেমন) উৎফুল্ল (হয়ে ওঠে, তেমনি সহজেই আবার) অহংকারী (হয়ে যায়), ১১. কিন্তু যারা পরম ধৈর্য ধারণ করে এবং নেক আমল করে, এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের জন্যে রয়েছে (আল্লাহর) ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। ১২. (হে নবী, কাফেররা মনে করে,) সম্ভবত তোমার কাছে যা ওহী নাযিল হয় তার কিয়দংশ তুমি ছেড়ে দাও এবং এ কারণে তোমার মনোকষ্ট হবে যখন তারা বলে বসবে, এ ব্যক্তির ওপর কোনো ধন-ভান্ডার অবতীর্ণ হলো না কেন, কিংবা তার সাথে (নবুওতের সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে) কোনো ফেরেশতা এলো না কেন (তুমি এতে মনোক্ষুণ্ন হয়ো না); তুমি তো হচ্ছো (আযাবের) ভয় প্রদর্শনকারী (একজন রসূল মাত্র); যাবতীয় কাজকর্মের (আসল) কর্মবিধায়ক তো হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। ১৩. অথবা এরা কি (একথা) বলে, (মোহাম্মদ নামের) সে (ব্যক্তি কোরআন) নিজে নিজে রচনা করে নিয়েছে! (হে নবী,) তুমি (তাদের) বলো, তোমরা (যদি তাই মনে করো) তাহলে নিয়ে এসো এর অনুরূপ (মাত্র) দশটি (তোমাদের স্বরচিত) সূরা এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য যাদের তোমরা সাহায্যের জন্যে ডাকতে পারো তাদের ডেকে নাও, যদি তোমরা তোমাদের (দাবীতে) সত্যবাদী হও। ১৪. আর যদি তারা তোমাদের (কথায়) সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রেখো, এটা আল্লাহর জ্ঞান (ও কুদরত) দ্বারাই নাযিল করা হয়েছে, তিনি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই, (বলো,) তোমরা কি মুসলমান হবে? ১৫. যদি কোনো ব্যক্তি শুধু এ পার্থিব জীবন ও তার প্রাচুর্য ভোগ করতে চায়, তাহলে আমি তাদের সবাইকে তাদের কর্মসমূহ এ (দুনিয়ার) মধ্যেই যথাযথ আদায় করে দেই এবং সেখানে তাদের (বৈষয়িক পাওনা) কম করা হবে না। ১৬. (আসলে) এরাই হচ্ছে সে সব (দুর্ভাগা) লোক, যাদের

لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا

يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾ اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ

كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ

الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۗ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٧﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ

كَذِبًا ؕ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ

كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٨﴾ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٩﴾ اُولٰٓئِكَ لَمْ

يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ

জন্যে পরকালে (জাহান্নামের) আগুন ছাড়া আর কিছুই থাকবে না, (দুনিয়ার) জীবনে সেখানে যা কিছু তারা বানিয়েছে তা সব হবে বেকার, যা কিছু তারা (দুনিয়ায়) করে এসেছে তা সবই হবে নিরর্থক। ১৭. অতপর যে ব্যক্তি তার মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল করা সুস্পষ্ট (কোরআনের) প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং তা সে তেলাওয়াত করে, (যার ওপর স্বয়ং) তাঁর পক্ষ থেকে সে (মোহাম্মদ) সাক্ষী (হিসেবে মজুদ) রয়েছে, (তদুপরি রয়েছে) তার পূর্ববর্তী মূসার কেতাব, (যা তাদের জন্যে) পথপ্রদর্শক ও রহমত; এরা এর ওপর ঈমান আনে; (মানব) দলের মধ্যে যে অতপর একে অস্বীকার করবে তার প্রতিশ্রুত স্থান হচ্ছে (জাহান্নামের) আগুন, সুতরাং তুমি সে ব্যাপারে কোনো রকম সন্দিগ্ধ হয়ো না, এ সত্য হচ্ছে তোমার মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল করা, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ঈমান আনে না। ১৮. আল্লাহ তায়ালা সম্বন্ধে যে মিথ্যা রচনা করে, তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে? এ লোকদের যখন কেয়ামতের দিন তাদের মালিকের সামনে হাযির করা হবে এবং তাদের (বিপক্ষীয়) সাক্ষীরা যখন বলবে (হে আমাদের মালিক), এরাই হচ্ছে সে ব্যক্তি, যারা তাদের মালিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা রচনা করেছিলো, হ্যাঁ, আজ যালেমদের ওপর আল্লাহ তায়ালার অভিসম্পাত, ১৯. (সে যালেমদের ওপরও আল্লাহর লানত) যারা (অন্য মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর পথে দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায়– (সর্বোপরি) যারা শেষ বিচারের দিনকেও অস্বীকার করে। ২০. এরা এ যমীনের বুকেও (আল্লাহ তায়ালাকে) কখনো ব্যর্থ করে দিতে পারেনি, না আল্লাহর মোকাবেলায় তাদের (সেখানে) কোনো অভিভাবক ছিলো, এদের

يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ؕ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ ﴿٢٠﴾

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢١﴾ لَا

جَرَمَ أَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُوْنَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

الصّٰلِحٰتِ وَأَخْبَتُوْٓا إِلٰى رَبِّهِمْ ۙ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا

خٰلِدُوْنَ ﴿٢٣﴾ مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْأَعْمٰى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ؕ هَلْ

يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ؕ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾

জন্যে আযাব হবে দ্বিগুণ; এরা কখনো (দ্বীন-ঈমানের কথা) শুনতে সক্ষম হতো না, না এরা (সত্য দ্বীন নিজেরা) দেখতে পেতো! ২১. এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যারা নিজেদের দারুণ ক্ষতি সাধন করলো, (দুনিয়ায়) যতো মিথ্যা তারা রচনা করেছিলো, (আখেরাতে) তা সবই তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে। ২২. অবশ্যই এরা হবে আখেরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ। ২৩. (পক্ষান্তরে) যারা আল্লাহর ওপর নিশ্চিত ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, (উপরন্তু) নিজেদের মালিকের প্রতি সদা বিনয়াবনত থেকেছে, তারা হবে জান্নাতের বাসিন্দা, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। ২৪. (জাহান্নামী আর জান্নাতী এ) দুটো দলের উদাহরণ হচ্ছে এমন, যেমন (একদল হচ্ছে) অন্ধ ও বধির, (আরেক দল হচ্ছে) চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তিসম্পন্ন; এ দুটো দল কি সমান? তোমরা কি এখনো শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

তাফসীর

আয়াত ১-২৪

সূরার এ প্রথম পর্বটা হচ্ছে এর ভূমিকা স্বরূপ। এই ভূমিকা ও উপসংহারের মাঝে এসেছে কেসসা কাহিনী। ভূমিকায় আলোচিত বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে ইসলামী আকীদার মূল তত্ত্বসমূহ। এ মূলতসমূহের মধ্যে প্রধান হলো তাওহীদ। তাওহীদের মূল কথা হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহর আদেশের শর্তহীন ও তর্কাতীত আনুগত্য এবং একমাত্র আল্লাহর এবাদাত। এরপর আলোচিত হয়েছে দুনিয়ার পরীক্ষাপূর্ণ ও কর্মবহুল জীবনের কৃতকর্মের হিসাব দেয়া ও প্রতিফল পাওয়ার জন্যে কেয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া ও মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার অনিবার্যতায় বিশ্বাস বা ঈমানের প্রসংগ। সেই সাথে মানুষকে পরিচিত করা হয়েছে তাদের আসল প্রভু ও মনিবের সাথে, তাঁর সেই গুণাবলীর সাথে, যা তাদেরকে ও তাদের চারপাশের সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব দান করেছে। বর্ণনা করা হয়েছে দাসত্ব ও প্রভুত্ব কী জিনিস, মানব জীবনে তার প্রয়োজন ও দাবী কী। আরো আলোচিত হয়েছে দুনিয়ার জীবনের ন্যায় আখেরাতের জীবনেও আল্লাহর আনুগত্যের অপরিহার্যতার প্রসংগ।

অনুরূপভাবে এ ভূমিকা পর্বে রেসালাত কী ও রসূল কে, তাও বর্ণনা করা হয়েছে। মক্কী জীবনের কঠিনতম পর্যায়ে কাফেরদের পক্ষ থেকে ক্রমাগত হঠকারী আচরণ, প্রত্যাখ্যান, ঔদ্ধত্য ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে রসূল (স.) যে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পতিত হয়েছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আমি সূরার ভূমিকায় আলোচনা করেছি। এ সাথে মোশরেকদের পাল্টা চ্যালেঞ্জও দেয়া হয়েছে যে, যে কোরআনকে তারা মানুষের তৈরী ভেবে

প্রত্যাখ্যান করছে, সেই কোরআনের মতো মাত্র দশটা সূরাও তারা রচনা করে আনুক তো দেখি। কেননা তারা তো দাবী করে থাকে যে, এ কোরআন মানুষের মনগড়া। রসূল (স.) ও তাঁর মুষ্টিমেয় সংখ্যক সাথী মোমেনের মনোবল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই আল্লাহর পক্ষ থেকে এ চ্যালেঞ্জ প্রদান ও মোশরেকদের এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় অক্ষম করে দেয়া হয়েছে।

এ চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি অবিশ্বাসীদেরকে আখেরাতের সেই আযাবের হুমকিও দেয়া হয়েছে, তারা অস্বীকার করে ও দ্রুত হাযির করার জন্যে রসূল (স.)-কে চ্যালেঞ্জ দেয়। অথচ তাদের ওপর থেকে পার্থিব রহমত প্রত্যাহার করা হলে এবং বিপদ মুসীবত দিলে তাও তারা সহ্য করতে পারে না, যদিও তা আখেরাতের আযাবের চেয়ে সহজতর।

এরপর এ হুমকিকে কেয়ামতের একটি দৃশ্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। অবিশ্বাসী মোশরেকদের কী শোচনীয় অবস্থা হবে, কত লাঞ্ছনা, অবমাননাও কত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তারা ভোগ করবে এবং তা থেকে তাদেরকে উদ্ধার করতে তাদের বন্ধুরাও কত অসহায় হয়ে যাবে, সেটাই দেখানো হয়েছে কেয়ামতের এ দৃশ্যে। অপরদিকে সৎকর্মশীল মোমেনরা কতো দুর্লভ ও অমূল্য নেয়ামত ভোগ করবে এবং কতো সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে, তাও বর্ণনা করা হয়েছে, এই উভয় গোষ্ঠীর উপমা দেয়া হয়েছে এভাবে,

'উভয় পক্ষের উদাহরণ অন্ধ ও বধির এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন দু'জন লোকের মতো। উভয়ে কি সমান? তবু কি তোমরা শিক্ষা নেবে না?' (আয়াত ২৪)

এবার আমরা তাফসীরে মনোনিবেশ করছি।

তাওহীদ ও রেসালাতের প্রকৃতি

'আলিফ-লাম-রা,................।' (আয়াত ১, ২, ৩ ও ৪)

'এ আয়াত ক'টিতে নিম্নোক্ত মৌলিক আকীদাগত তত্ত্বসমূহ আলোচিত হয়েছে।'

'ওহী ও রেসালাতের সত্যতা প্রমাণ করা।'

'একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব, আনুগত্য ও গোলামী করা। এতে অন্য কাউকে শরীক না করা।'

'যারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে চলে, তাদের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর প্রতিদান ও পুরষ্কার ঘোষণা করা।'

'আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে আখেরাতে শাস্তি এবং আল্লাহকে মান্যকারী ও অমান্যকারী সবাইকে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তনের অপরিহার্যতার কথা বলা।

'আল্লাহর সীমাহীন শক্তি ও অবারিত ক্ষমতার বর্ণনা করা।'

'আলিফ-লাম-রা..............' অর্থাৎ এ সব অক্ষর দিয়ে লেখা এ কেতাবকেই তারা অস্বীকার করে। অথচ তারা এমন কেতাব রচনা করতে অক্ষম! ফলে তার ভিত্তি অটুট হয়েছে। কেননা এ কোরআনের প্রতিটি আয়াতের সুনির্দিষ্ট অর্থ ও মর্ম রয়েছে এবং এর প্রতিটি শব্দ তাৎপর্যময়। এর প্রতিটি আদেশ নিষেধ প্রয়োজনীয় এবং প্রতিটি ইশারা ইংগিতের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। এসবই অত্যন্ত সাযুজ্যময় এবং এগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ বিসম্বাদ নেই। সমস্ত আয়াত সুনির্দিষ্ট শৃংখলা মন্ডিত। অতপর সেগুলো বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য ও বক্তব্য অনুসারে তাকে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক বিষয়ের জন্যে যতোটুকু স্থান প্রয়োজন, ততোটুকুই বরাদ্দ করা হয়েছে।

কে এ আয়াতগুলোকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং কেইবা এগুলোকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলো? আল্লাহই করেছেন, রসূল করেননি।

'মহাবিজ্ঞানী ও সুদক্ষ এক সত্ত্বার পক্ষ থেকে।'

যিনি প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞান সম্মতভাবে কেতাবকে মযবুত ও অটুট করেছেন এবং দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে যথাস্থানে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এভাবেই তাঁর কাছ থেকে এসেছে এবং এভাবেই রসূলের কাছে নাযিল হয়েছে। এতে কোনো রদবদল বা হেরফের হয়নি।

এতে কী বিষয় আলোচিত হয়েছে?

এতে মৌলিক আকীদাসমূহ আলোচিত হয়েছে।

'যেন তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো এবাদাত না করো।'

অর্থাৎ আর কারো আনুগত্য, দাসত্ব, অনুকরণ ও অনুসরণ না করো।

'আমি তোমাদের জন্যে তাঁর পক্ষ থেকে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।'

এ হচ্ছে রেসালাত। আর সুসংবাদ দান ও সতর্কীকরণ রেসালাতেরই অন্তর্ভুক্ত।

'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও, অতপর তাওবা করো।

'তাওবা হচ্ছে শেরেক ও নাফরমানী থেকে একত্ববাদ ও আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসা।

'তাহলে তিনি তোমাদেরকে উত্তম সম্পদ এবং প্রত্যেক সম্মানী ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য সম্মানী দেবেন।' এ হচ্ছে তাওবাকারী ও ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের জন্যে সুসংবাদ।

'আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে আমি তোমাদের জন্যে এক ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা করি।' যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জন্যে এটা হুমকি ও দুসংবাদ।'

'আল্লাহর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন।' অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গাতেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

'আর তিনিই সকল বিষয়ের ওপর শক্তিশালী।'

বস্তুত তিনি সর্বময় ক্ষমতার মালিক এবং সর্বশক্তিমান।

এ হচ্ছে আল্লাহর কেতাব বা কেতাবের আয়াতসমূহ। উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সমাধান দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ কেতাব এসেছে।

উল্লেখিত আকীদাগত তত্ত্বসমূহ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন কায়েম হতে পারে না এবং মানব জাতির জন্যে কোনো আইন ও বিধান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একমাত্র আল্লাহর জন্যে আনুগত্যকে নির্দিষ্ট করার কাজটা আকীদা বিশ্বাসের জগতে শৃংখলা আনা ও নৈরাজ্য বন্ধ করার একমাত্র উপায়, মানব জাতিকে অলীক কল্পনা, কুসংস্কার, অবৈধ ক্ষমতার শৃংখল থেকে মুক্ত করার একমাত্র পন্থা এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, প্রভুত্ব, আইন ও বিধান দানের ক্ষমতা প্রভৃতি গুণাবলীকে অবৈধভাবে হস্তগত করতো যে সব মিথ্যা মাবুদরা মানব জাতিকে অন্যায়ভাবে নিজের দাসত্বের শৃংখলা আবদ্ধ করতে চায়, তাদের খপ্পর থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করার একমাত্র চাবিকাঠি।

তাওহীদ ভিত্তিক আকীদা বিশ্বাস এরূপ নিখুঁতভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক বা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এমন কোনো সুস্পষ্ট ও স্থিতিশীল ভিত্তির ওপর কায়েম হতে পারে না, যা প্রবৃত্তির লালসা, ভাবাবেগ ও স্বার্থ তাড়িত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ওপর নির্ভরশীল নয়।

অনুরূপভাবে, আল্লাহকে একমাত্র সার্বভৌম, সর্বশক্তিমান ও সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী প্রভু না মানা পর্যন্ত মানুষের পক্ষে অপমান, ভয়ভীতি ও উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি পাওয়া এবং প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা লাভ করা সম্ভব নয়।

সমগ্র ইতিহাস জুড়ে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মাঝে এবং হক ও বাতিলের মাঝে যে লড়াই চলেছে, তার কারণ এটা ছিলো না যে, মহাবিশ্বের জন্যে একজন রব থাকা ও প্রকৃতিক জগতের ওপর তার সর্বময় কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকা সম্পর্কে কোনো মানব সমাজে কোনো মতবিরোধ ছিলো। সমস্ত লড়াই ও মতবিরোধের একমাত্র কারণ ছিলো এ যে, মানবজাতির আইন ও বিধান দাতা মনিব ও প্রভু কে, তাদের সর্বময় ক্ষমতা সম্পন্ন ও সর্বোচ্চ শাসক কে এ বিষয় নিয়ে

পৃথিবীতে সব সময়ই কিছু কিছু অপরাধ প্রবণ আল্লাহদ্রোহী শক্তি ছিলো, যারা আল্লাহর উপরোক্ত অধিকার (অর্থাৎ আইন ও বিধান রচনা করা এবং আদেশ নিষেধাজ্ঞা জারী করার) অন্যায়ভাবে ভোগ দখল করতো এবং তা মানুষের ওপর প্রয়োগ করে তাদেরকে নিজের গোলামে পরিণত করতো। নবী রসূলরা ও ইসলামী আন্দোলন সব সময় এই ক্ষমতা ও অধিকারকে তাগুতী শক্তির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আল্লাহর কাছেই ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে সংগ্রাম করতেন।

আল্লাহ তায়ালা সারা বিশ্বের কোথাও কারো মুখাপেক্ষী নন, নাফরমানদের না-ফরমানী ও আল্লাহদ্রোহীদের অবাধ্যতায় তাঁর কোনোই ক্ষতি হয় না এবং অনুগতদের আনুগত্য ও এবাদাতে তাঁর কোনো লাভ হয় না, বরং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যের আনুগত্য ও দাসত্ব করে মানুষ নিজেই নিজেকে লাঞ্চিত ও অপমানিত করে এবং গোলামদের গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহর গোলামী ও এবাদাত করার মাধ্যমে নিজেকেই সম্মানিত ও মহিমান্বিত করে। আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর বান্দাদেরকে সম্মানিত ও মহিমান্বিত করতে ইচ্ছুক হন, তখনই তিনি নিজের রসূলকে মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি মানুষকে আল্লাহর বান্দাদের গোলামী থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্ব ও বন্দেগীতে পুর্ণবহাল করতে পারেন। এ কাজটা তিনি মানুষেরই কল্যাণের জন্যে করেন। কেননা তাঁর নিজের জন্যে কোনো কল্যাণের প্রয়োজন নেই।

মানুষ এক আল্লাহর এবাদাত ও আনুগত্যের সংকল্প না করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদের প্রভুত্বের জোয়াল নিজের ঘাড়ের ওপর থেকে ছুড়ে ফেলে না দেয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাকে যে উচ্চতর সম্মানে ভুষিত করতে চান, সেই সম্মানের যোগ্য হয় না।

আল্লাহর একক আনুগত্যের অর্থই হলো সমগ্র মানবজাতির ওপর আল্লাহর একচ্ছত্র প্রভুত্ব ও সর্বময় কর্তৃত্ব মেনে নেয়। আর আল্লাহর প্রভুত্বের অর্থই হলো মানুষের ওপর আল্লাহর আইন জারী করার সর্বময় ক্ষমতা প্রয়োগ এবং একমাত্র আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের আলোকে তাদের জীবনকে পরিচালনা করা অন্য কারো আদেশ নিষেধের আলোকে নয়।

সূরার প্রথম আয়াতে উল্লেখিত বিষয়টাকে আল্লাহর কেতাবের অন্যতম আলোচ্য বিষয় বলা হয়েছে। যেমন,

‘এ হচ্ছে সেই কেতাব, যার আয়াতগুলো সুদৃঢ় এবং তারপর তাতে বিভিন্ন বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে এক মহাজ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে, যেন তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো এবাদাত না করো।’

বস্তুত এবাদাতের অর্থও এটাই এবং আরবরা এটা জানতো ও বুঝতো, কেননা আল্লাহর এ মহান কেতাব তাদেরই মাতৃভাষায় নাযিল হয়েছিলো।

রসূলকে মেনে নেয়ার অর্থ দাঁড়ায় রসূল (স.) যা কিছু এনেছেন তার সব কিছু মেনে নেয়া। এ ক্ষেত্রে কোনো একটি বিষয়েও আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণের অর্থ দাঁড়ায় বিবেকের কাছে রেসালাতের মর্যাদাকে ধ্বংস করে দেয়া।

যারা মনে করতো যে, কোরআন মোহাম্মদ (স.)-এর নিজের মনগড়া– তাতে যতোই মোহাম্মদ (স.)–এর অসাধারণ মনীষার স্বীকৃতি দেয়া হোক না কেন, তাদের পক্ষ থেকে কোরআনের যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা কখনো সম্ভব হতো না। বস্তুত কোরআন ও তার মধ্যে আলোচিত আকীদা বিশ্বাসের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করলেই তার ছোট-বড় প্রতিটি কথা মেনে চলা সম্ভব। কোরআনে বর্ণিত আকীদা বিশ্বাস আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে– এ চেতনা গোনাহগার লোকদের বিবেককেও ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তাওবা করে আল্লাহর ফরমাবরদারীতে প্রত্যাবর্তন করে থাকে। আর এই চেতনা আল্লাহর অনুগত লোকদের বিবেককে সৎপথে অবিচল রাখে এবং গোমরাহ হবার সম্ভাবনা থাকে না।

অনুরূপভাবে রসূলের প্রতি ঈমান আনার ফলে মানুষ আল্লাহর সত্যের পথে বহাল থাকার পন্থা খুঁজে পায়। সেই পন্থাটা হলো, আল্লাহর রসূলের অনুকরণ ও অনুসরণ। আল্লাহর আনুগত্য করার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল নিয়ম বিধি সে রসূলের কাছ থেকেই পেতে পারে। ফলে নিত্য নতুন ছদ্মবেশী ভন্ড এসে আল্লাহর বিধানের নামে নিজের মনগড়া বিধানের শেকলে সরলপ্রাণ মানুষকে আবদ্ধ করবে– সেটা সম্ভব হবে না।

প্রত্যেক জাহেলিয়াতেই এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটে থাকে, যে নিজেই আইন ও নিয়ম বিধি রচনা করে এবং তাকে আল্লাহর আইন ও বিধান বলে চালানোর চেষ্টা করে। আল্লাহর নামে এই ভন্ডামি চালাকী ও নৈরাজ্য একমাত্র এভাবেই বন্ধ হতে পারে যে, আল্লাহর বাণী লাভের একমাত্র মাধ্যম থাকবেন আল্লাহর রসূল, অন্য কেউ নয়।

শেরেক ও পাপাচার থেকে ক্ষমা চাওয়া হৃদয়ের স্পর্শকাতরতা ও অনুশোচনার লক্ষণ এবং গুনাহের অনুভূতি ও গুনাহ পরিত্যাগের আগ্রহের লক্ষণ। এরপর তাওবা হলো কার্যত গুনাহ বর্জন ও সৎ কাজ শুরু করার নাম। এ দুটো লক্ষণ পরিস্ফুট না হলে তাওবা পূর্ণাংগ হয় না। এ দুটো বর্জন ও সৎকাজ শুরু করা হলো তাওবার বাস্তব রূপ এবং এ দুটোর মধ্য দিয়েই তাওবা কার্যকরভাবে অস্তিত্ব লাভ করে। এরূপ পরিপূর্ণ তাওবা দ্বারাই ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা করা যায়। সুতরাং কেউ যদি পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করার পর ইসলাম গ্রহণ করেই দাবী করে যে, তার তাওবা পূর্ণতা লাভ করেছে, অথচ সে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য ও নবীর অনুসরণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তাহলে তার ওই দাবীর কোনো মূল্য নেই। কেননা বাস্তবে সে যে গায়রুল্লাহর আনুগত্য করে চলেছে, তা তার দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। তাওবাকারীদের জন্যে সুসংবাদ এবং পাপীদের জন্যে হুমকি প্রদান– এ দুটো বিষয় রেসালাত ও নবুওতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং দাওয়াত ও তাবলীগের অপরিহার্য উপাদান। এ দুটো বিষয় সৎকাজে উৎসাহ দান ও অসৎ কাজ থেকে ভীতি প্রদর্শনের এমন জরুরী উপকরণ যে, আল্লাহ তায়ালা এ দুটোকে মনুষ্য স্বভাবের সাথে সংগতিশীল অত্যন্ত শক্তিশালী ও গভীর প্রেরণাদায়ক জিনিস বলে জানেন।

দুনিয়া ও আখেরাতে মোমেনের পুরস্কার

আখেরাতে বিশ্বাস অত্যন্ত তাৎপর্যময় একটা আকীদা। জীবন সৃষ্টির পেছনে যে গভীর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা সক্রিয় রয়েছে, সেই ধারণার পূর্ণতা দানের জন্যেই আখেরাত বিশ্বাস জরুরী। নবীরা যে কল্যাণের দিকে আহ্বান জানান, সেটাই জীবনের আসল উদ্দেশ্য। তাই মানুষের জন্যে তার কর্মফলপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। এ কর্মফল যদি সে দুনিয়াতে না পায়, তবে আখেরাতে তাকে পেতেই হবে। কেননা আখেরাতেই তার জীবনের পূর্ণতা লাভ হবে। যারা আল্লাহর বিধান থেকে বিপথগামী হয়, তারা সেখানে আযাব ভোগ করবে এ পরিণতির ভীতি সুস্থ স্বভাবের মানুষকে

বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা দেয়। কখনো যদি প্রবৃত্তির লালসা প্রবল হয়ে যাওয়া এবং ঈমান দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে কেউ অন্যায় করে ফেলে, তবে সে তাওবা করে এবং গুনাহ অব্যাহত রাখে না। এভাবেই এ পৃথিবীটা মানব জীবনের উপযোগী হয় এবং জীবন সততার পথে ধাবিত হতে থাকে। সুতরাং আখেরাত বিশ্বাস শুধু আখেরাতের সাফল্যেরই পথ নয়, যেমন অনেকে মনে করে থাকে বরং তা পার্থিব জীবনেই কল্যাণ ও সততার পথ প্রদর্শক এবং পার্থিব জীবনের উন্নয়ন ও সংশোধনের প্রেরণাদায়ক বিশ্বাস। পার্থিব জীবনের এই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে, এটাই চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়– বরং এটা স্রেফ আল্লাহর সর্বোত্তম সৃষ্টি মানুষের উপযুক্ত জীবন যাপনের সহায়ক। এই মানুষকে তিনি তার সকল সৃষ্টির উর্ধে স্থান দিয়েছেন। তাই তিনি চান, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অন্য সকল সৃষ্টির চেয়ে উন্নত হোক।

তাই এক আল্লাহর আনুগত্য ও রসূলের অনুসরণের পর রসূলের ও আসমানী কেতাবের সর্বপ্রধান বক্তব্য একটাই– শেরেক থেকে তাওবা করা ও ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান। এটা হলো সৎ কাজের পথে যাত্রার শুরু। সৎকাজ শুধু মনের সদিচ্ছা ও ফরয এবাদাতের নাম নয়। সৎ কাজ হলো পার্থিব জীবনে সর্বাত্মক সংস্কার ও সংশোধনের নাম। উন্নয়ন, উৎপাদন, সমৃদ্ধি ও সব ধরনের নির্মাণ ও গঠনমূলক কাজ এর আওতাভুক্ত।

যে শর্ত সাপেক্ষে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার প্রতিদান পাওয়া যাবে তা হলো, 'আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উত্তম সম্পদে সমৃদ্ধ করবেন এবং প্রত্যেক সংৎকর্মশীল ব্যক্তিকে তার উপযুক্ত বদলা দেবেন।'

যে 'উত্তম সম্পদের' কথা এখানে বলা হয়েছে, তা পার্থিব জীবনে গুণগতভাবেও হতে পারে, আবার পরিমাণগতভাবেও হতে পারে। তবে আখেরাতে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় রকমের হবে এবং মানুষ কল্পনাও করতে পারে না এমন ধরনেরও হবে। প্রথমে পার্থিব জীবনে কি ধরনের হয়ে থাকে, সে দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক।

দুনিয়ায় আমরা বহু সৎ ও পুণ্যবান লোককে জীবিকার সংকীর্ণতায় ও অর্থাভাবে কষ্ট পেতে দেখে থাকি। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে যে, 'উত্তম সম্পদ' থেকে সে কি বঞ্চিত?

আমার বিশ্বাস যে, এ প্রশ্ন অনেকেরই।

কোরআনের উল্লেখিত আয়াতটার তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্যে জীবনের প্রতি আমাদের ব্যাপকতর ও প্রশস্ততর দৃষ্টি দিতে হবে। কেবল জীবনের চলমান কোনো বৈশিষ্টের মধ্যে দৃষ্টিকে সীমিত রাখলে চলবে না।

ধরা যাক, একটা মানব গোষ্ঠী কোথাও বসবাস করছে। তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে। তারা আল্লাহর আইন ও বিধানেরও অনুগত। একমাত্র আল্লাহকেই তারা তাদের মনিব, প্রভু, হুকুমদাতা ও আইনদাতা হিসাবে মানে। তারা সবাই সৎকর্মশীল এবং পার্থিব জীবনে উৎপাদন ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত। সামগ্রিকভাবে তাদের মধ্যে সততা ও ন্যায়নীতি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ ধরনের একটা সমাজ বা রাষ্ট্র সঠিকভাবে সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নয়নশীল ও প্রগতিশীল না হয়ে পারে না। তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার, শান্তি, সন্তোষ, তৃপ্তি এবং শ্রম ও মজুরীর ন্যায়সংগত ব্যবস্থা না থেকে পারেই না। এ ধরনের একটা সামষ্টিক ব্যবস্থায় যদি দেখা যায় যে, সৎ, কর্মঠ ও উৎপাদনশীল লোকেরা জীবিকার সংকীর্ণতায় ও অর্থাভাবে কষ্ট পাচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে ওই সমাজে আল্লাহর প্রতি ঈমানভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা চালু নেই এবং সেখানে ইনসাফভিত্তিক শ্রম ও মজুরীর ব্যবস্থা কার্যকর নেই।

এ কথা সত্য যে, সৎ, কর্মঠ ও উৎপাদনশীল লোকেরা জীবিকার সংকীর্ণতা ও অভাবে ভোগা সত্তেও এবং সমাজের লোকদের দ্বারা উৎপীড়িত ও নির্যাতিত হওয়া সত্তেও এক ধরনের 'উত্তম সম্পদে' সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। মক্কার মোশরেকরা যেমন সংখ্যালঘু মুসলমানদেরকে কষ্ট দিতো এবং সকল যুগের জাহেলী সমাজ আল্লাহর পথে আহ্বানকারী সংখ্যালঘু মোমেনদেরকে উৎপীড়ন করে থাকে, কিন্তু তবু তারা মানসিক শান্তি নামক উত্তম সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। এটা কোনো কল্পনা নয় এবং অসার দাবীও নয়। আখেরাতের অবধারিত সুখ ও শান্তি, আল্লাহর সাথে মিলিত হবার নিশ্চিত বিশ্বাস এবং আল্লাহর সাহায্য, অনুগ্রহ ও সম্মানের আশা সেই সব মানুষের জন্যে অত্যন্ত বড় ও উত্তম সম্পদ, যারা বস্তুগত আবেগ অনুভূতির ঊর্ধে উঠতে পারে।

তাই বলে যারা তাদের শ্রমের ন্যায্য মজুরী পায় না, সেই মযলুমদেরকে আমরা এই অবিচারমূলক সমাজ ব্যবস্থা চোখ বুঁজে মেনে নিতে বলি না। ইসলাম এ ধরনের অবিচার বরদাশত করে না। এ ধরনের পরিস্থিতিকে নীরবে মেনে নেয়া ঈমানেরও দাবী নয়। মোমেন ব্যক্তি ও দল মাত্রেরই কর্তব্য এ ধরনের পরিস্থিতির অবসান ঘটানো, যাতে করে সৎ লোকদের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় সুখ ও শান্তি নিশ্চিত হয়। সৎ লোকেরা পার্থিব জীবনের অভাব, নিপীড়নের মধ্যেও যে মানসিক শান্তি ও তৃপ্তি বোধ করে, সে কথা বললাম এ জন্যে যে, ওটা আসলেই সত্য কথা এবং আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত মোমেনরা তা অনুভবও করে। কিন্তু তা সত্তেও তারা অন্যান্য সৎ লোকদের জন্যে দুনিয়ায় সুখময় জীবন নিশ্চিত করার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে থাকে।

'এবং প্রত্যেক সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে তার যথাযোগ্য বদলা দেবেন।'

কিছু কিছু মোফাসসেরের মতে, এটা আখেরাতের প্রতিদানের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু আমার মতে, এটা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গার সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন আমি 'আল-মাতাউল হাসান' বা 'উত্তম সম্পদ'-এর ব্যাখ্যা করেছি, যা সর্বাবস্থায় মানানসই। সৎকর্মশীল ব্যক্তি যে মুহূর্তে সৎকর্ম করে, সেই মুহূর্তেই তার প্রতিদান পায়। মানসিক তৃপ্তি, সন্তোষ ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যমে এই বদলা পায়, চাই তার এ সৎকাজ কোনো কাজ বা আর্থিক দানের আকারে হোক না কেন। এরপর দুনিয়ায় ও আখেরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথকভাবে এর প্রতিদান প্রদান একটা বাড়তি অনুগ্রহ ও পুরস্কার।

'আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে আমি তোমাদের ওপর কঠিন দিনের আযাবের আশংকা করি।'

অর্থাৎ কেয়ামতের আযাব। কিছু কিছু মোফাসসের যে এ দ্বারা বদর যুদ্ধের আযাবকে বুঝিয়েছেন, তা ঠিক নয়। কেননা 'কঠিন দিনের আযাব' দ্বারা সাধারণত কেয়ামতের দিনের আযাবকেই বুঝানো হয়ে থাকে। এ ছাড়া পরবর্তী আয়াতের প্রথম বাক্যটাও এই অর্থের দিকেই ইংগিত করছে।

'তোমাদের সকলকে আল্লাহর দিকেই ফিরে আসতে হবে।'

যদিও দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় এবং সর্বাবস্থায় ও প্রতি মুহূর্তে আমরা আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে থাকি, কিন্তু কোরআনের পরিভাষায় প্রত্যাবর্তন দ্বারা পার্থিব জীবনের পরবর্তী প্রত্যাবর্তনকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

'এবং তিনি সর্বশক্তিমান।'

অর্থাৎ আখেরাতে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনে সমগ্র মানব জাতিকে বাধ্য করতে তিনি পর্যাপ্ত ক্ষমতাশালী, যদিও মোশরেকরা একে কঠিন ও অসম্ভব মনে করে থাকে।

আল্লাহর দৃষ্টি থেকে পালানোর ব্যর্থ চেষ্টা

এভাবে আল্লাহর কেতাবে আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরার পর সূরার পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, কেতাবের এই বিষয়গুলো রসূল (স.) পেশ করার পর মোশরেকেরা তা কিভাবে গ্রহণ করে। বলা হচ্ছে যে, তারা নিজেদেরকে লুকানোর উদ্দেশ্যে মাথা নুইয়ে ও বুক ঘুরিয়ে চলে। কিন্তু তাদের এই গোপন করার চেষ্টা বৃথা যায়। কেননা এই চেষ্টা সত্তেও তাদের সব খবরই আল্লাহ তায়ালা জানেন। আর শুধু তাদের কেন, পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীরই সব খবর তিনি রাখেন।

'সাবধান, তারা নিজেদের বুককে ঘুরিয়ে চলে, যাতে আল্লাহর দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করতে পারে। ....' (আয়াত ৫ ও ৬)

এ দুটো আয়াত খুবই বিরল দৃশ্য তুলে ধরে। যার কথা চিন্তা করলে অন্তর কেঁপে ওঠে। আর আল্লাহর উপস্থিতি ও সর্বব্যাপী জ্ঞানের কথা যখন মানুষের মন কল্পনা করে, তখন তাতে যে কি সাংঘাতিক ভীতি সঞ্চারিত হয়, তা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, রসূল (স.) যখন আল্লাহর আয়াতগুলো পাঠ করেন, তখন দুর্বল বান্দারা নিজেদেরকে লুকানোর চেষ্টা করে।

'সাবধান! তারা নিজেদের বুককে ঘুরিয়ে নেয়, যাতে আল্লাহর কাছ থেকে নিজেকে লুকাতে পারে। সাবধান, যখন তারা কাপড় দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকে, তখন তারা যা কিছু লুকায় ও প্রকাশ করে, সবই আল্লাহ তায়ালা জানেন।............' (আয়াত ৫)

সম্ভবত এ আয়াতে হুবহু মোশরেকদের একটা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। যখন রসূল (স.) তাদেরকে আল্লাহর কালাম শোনাতেন, তারা মাথা নীচু করে ও বুক ঘুরিয়ে চলে যেতো, যাতে আল্লাহর কাছ থেকে নিজেদের লুকোতে পারে। কেননা তারা অন্তরের অন্তস্থল থেকে অনুভব করতো, কোরআন মোহাম্ম (স.)-এর রচিত নয়; বরং আল্লাহ তায়ালাই এ কেতাব নাযিল করেছেন। তাদের এ উপলব্ধি মাঝে মাঝে প্রকাশও পেতো।

কিন্তু তাদের এই লুকানোর চেষ্টা যে নিষ্ফল, তা বর্ণনা না করে আয়াতটা শেষ হয়নি। তারা যখন আত্মপ্রকাশ এবং আত্মগোপন করে, তখন এই আয়াতের রচয়িতা আল্লাহ তাদের সাথেই থাকেন। এ বিষয়টা অত্যন্ত ভীতিপ্রদ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, যা কোরআনের ঐতিহ্যবাহী রীতি। তারা যখন খুবই গোপনীয় পরিবেশে অবস্থান করে, যখন বিছানায় আশ্রয় নেয়, একেবারেই নিভৃতে অবস্থান করে এবং রাতের অন্ধকার ও পোশাক পরিচ্ছদ তাদেরকে ঢেকে রাখে, তখনো আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছে থাকেন, তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন এবং তাদের ওপর প্রবল ও পরাক্রান্ত থাকেন। এই গোপনীয় ও নিভৃত অবস্থায়ও তিনি সব কিছুই জানেন। আয়াতের শেষাংশে এ কথাই বলা হয়েছে।

বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে গোপনীয় জিনিসও জানেন। তারা যতো পর্দার ভেতরেই লুকাক, আল্লাহর জ্ঞানের আড়ালে যেতে পারে না। কিন্তু মানুষ এ ধরনের নিভৃত পরিবেশে সাধারণত অনুভব করে যে, সে একেবারেই একাকী রয়েছে এবং কেউ তাকে দেখছে না।

এ বর্ণনাভংগিটা এমন যে, তা তার চেতনাকে স্পর্শ করে ও জাগ্রত করে। তাকে প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে এই সত্য সম্পর্কে সজাগ করে, যা সে ভুলে যেতে পারে যে, অমন গোপন পরিবেশে তার দিকে কোনো চোখ তাকিয়ে নেই।

'বস্তুত তিনি বুকের ভেতরে লুকানো গোপন রহস্যগুলোও জানেন।'

'বুকের ভেতরে লুকানো' কথাটা দ্বারা অত্যধিক গোপনীয় রহস্যকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যতো গোপনীয়ই হোক, তা আল্লাহর কাছে সুবিদিত। আসলে আল্লাহর কাছে কোনো বিষয় বা গতিবিধি অজানা থাকে না।

সকল সৃষ্টির জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর

'পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই, যার জীবিকার ভার আল্লাহর ওপর ন্যস্ত নেই .... (আয়াত ৬)

আল্লাহর ভীতিপ্রদ ও সর্বব্যাপী জ্ঞানের এও একটা রূপ। পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রাণী মাত্রই, চাই তা মানুষই হোক বা অন্য কিছু হোক, তা ভূপৃষ্ঠে অথবা ভূগর্ভের নিচুতম স্তরে অবস্থান করুক, চাই তা যতো অগুণিত সংখ্যকই হোক, আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তাদের জীবিকার দায়িত্ব বহন করেন। কোথায় অবস্থান করে ও কী করে, কোথা থেকে আসে ও কোথায় যায়– সবই তিনি জানেন। তাঁর নির্ভুল ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের আওতার বাইরে কিছুই নেই।

বস্তুত আল্লাহর জ্ঞান যখন সৃষ্টিজগতের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তখন তা এতো ব্যাপক আকার ধারণ করে, যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

শুধু জ্ঞান দিয়েই তিনি সৃষ্টিজগতের ওপর কর্তৃত্ব করেন না, বরং অকল্পনীয় সংখ্যক সৃষ্টির জন্যে জীবিকারও ব্যবস্থা করেন। তিনি স্বেচ্ছায় সারা পৃথিবীর সকল প্রাণীর জীবিকার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিজ কুদরতী কাঁধে তুলে নিয়েছেন। সেজন্যে পৃথিবীকে তাঁর সৃষ্টিজগতের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতা দান করেছেন। আর সৃষ্ট প্রাণীদেরকে যোগ্যতা দিয়েছেন পৃথিবীর জীবিকা ভান্ডার থেকে কোনো না কোনো উপায়ে নিজের জীবিকা আহরণের। কোথাও বা সাধারণ কাঁচামালের আকারে, কোথাও কৃষিজাত ফসলের আকারে, কোথাও শিল্প পণ্যের আকারে, আবার কোথাও মিশ্র আকারে। এক কথায় জীবিকা প্রস্তুত ও উৎপাদনের যতো রকমের পন্থা এ যাবত উদ্ভাবিত হয়েছে, তার মধ্য থেকে যে কোনো উপায়ে এ জীবিকা আহরণের প্রক্রিয়া বলে থাকে। এমনকি কোনো কোনো প্রাণী জ্যান্ত প্রাণীর রক্ত খেয়েও জীবন ধারণ করে থাকে-যেমন মশা, ছারপোকা ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক জগতকে যে আকৃতিতে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন এবং অন্য সমস্ত সৃষ্টিকে যে সব যোগ্যতা ও ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, বিশষত মানুষকে, সেই আকৃতি, যোগ্যতা ও ক্ষমতা প্রদানে আল্লাহর যে করুণা ও প্রজ্ঞা সক্রিয় ছিলো, তার সাথে জীবিকা আহরণের এই বিচিত্র উপায় খুবই মানানসই। মানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি বানানো হয়েছে। তাকে বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণ, উৎপাদন, বিবর্তন, ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন ও জীবন যাপনের পরিবেশেষের পরিবর্তন সাধনের যোগ্যতা ও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সে জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করতে গিয়েই এ সব কাজ করে থাকে। সে কোনো কিছু সৃষ্টি করে না। বরং সৃষ্টিজগতে আল্লাহ তায়ালা যে সব শক্তি ও উপাদান সৃষ্টি করে জমা করে রেখেছেন, তার দ্বারাই সে বিভিন্ন জিনিস তৈরী করে। এ কাজে তাকে আল্লাহর সেই সব ফেরেশতা সাহায্য করে থাকে, যারা প্রকৃতিকে তার লুকানো ভান্ডার উজাড় করে দিতে এবং সকল প্রাণীকে তাদের খাদ্য দিতে বাধ্য করে।

তাই বলে এ আয়াত দ্বারা এ কথা বুঝানো হচ্ছে না যে, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের জন্যে নির্ধারিত জীবিকা সুনিশ্চিত রয়েছে, যা চেষ্টার ওপর নির্ভরশীল নয়। যা নিস্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলেও পাওয়া যায় এবং যা অলসতা দ্বারা হাতছাড়া হয় না, যেমনটি এক শ্রেণীর লোকের ধারণা করে থাকে। নচেৎ (অর্থাৎ জীবিকা যদি চেষ্টার ওপর নির্ভরশীল না হতো, তাহলে) আল্লাহ যে সব

উপায় উপকরণ অবলম্বন করতে আদেশ দিয়েছেন এবং যাকে তিনি তার প্রাকৃতিক নিয়ম বিধির আওতাভুক্ত করেছেন, তার অবস্থান কোথায় থাকতো? বিভিন্ন প্রাণীকে তিনি যে জীবিকা উপার্জনের এতো রকমারি দক্ষতা ও কৌশল শিখিয়েছেন, তার যৌক্তিকতা কোথায় থাকতো? দুনিয়ার জীবনকে উন্নতির যে উচ্চতর মার্গে উন্নীত করা আল্লাহর পরিকল্পনাধীন ছিলো, তা কিভাবে সম্পন্ন হতো? সে কাজটা সম্পন্ন করার জন্যে মানুষ যাতে নিজের ভূমিকা রাখে, সে জন্যেই তো তাকে পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা করে পাঠানো হয়েছে!

এ কথা নিসন্দেহে সত্য যে, প্রত্যেক সৃষ্টির জন্যে কিছু না কিছু জীবিকা নির্ধারিত রয়েছে। তবে সেই জীবিকা এই প্রকৃতির মধ্যেই সংরক্ষিত রয়েছে এবং তা আল্লাহর সেই নীতি ও পরিকল্পনার আওতাভুক্ত রয়েছে, যে নীতি ও পরিকল্পনা চেষ্টা সাধনাকে উৎপাদনক্ষম ও ফলপ্রসূ বানায়। সুতরাং চেষ্টা সাধনা ত্যাগ করে কারো চুপ করে বসে থাকা উচিত নয়। কেননা সবাই জানে যে, আকাশ থেকে সোনা রূপা বর্ষিত হয় না। কিন্তু আকাশ ও পৃথিবী সকল সৃষ্টির জন্যে পর্যাপ্ত জীবিকা সরবরাহ করে। তবে আল্লাহর অমোঘ ও অলংঘনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে যখন প্রাণীকূল এই জীবিকা আহরণের চেষ্টা চালায়, কেবল তখনই তাকে জীবিকা দেয়। এ ব্যাপারে আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান অত্যন্ত কঠোর, নিরপেক্ষ ও নির্মম। কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা স্বজনপ্রীতিও করে না এবং কাউকে তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিতও করে না।

দুনিয়ার জীবনে দু'ধরনের জীবিকা উপার্জনের সুযোগ রয়েছে– হালাল ও হারাম। এই দুটোই শ্রম ও চেষ্টার ফল হিসাবে অর্জিত হয়। তবে সেই চেষ্টা ও শ্রমের ধরন ভিন্ন এবং ঐ দু'ধরনের জীবিকা ভোগ করার পরিণামও দু'রকমের হয়ে থাকে। হালাল জীবিকা ভোগ করার পরিণাম ভালো, আর হারাম জীবিকা ভোগ করার পরিণাম খারাপ।

এ আয়াতে বিচরণশীল প্রাণী ও তার জীবিকার কথা বলা হয়েছে। আর ইতিপূর্বে যে 'আল মাতাউল হাসান' অর্থাৎ 'উত্তম সম্পদ'-এর কথা বলা হয়েছে- এই দুটোর মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ সংযোগের কথা আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কেননা আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় ও সংযোগ কোরআনের একটা চিরন্তন বৈশিষ্ট্য এবং তা তার আয়াতগুলোর প্রেক্ষাপট রচনায় ভূমিকা রাখে।

আলোচ্য আয়াত দুটোর (৫ ও ৬) মধ্য দিয়ে মানুষকে তার সেই প্রতিপালকের সাথে পরিচিত করার কাজ শুরু করা হয়েছে, যিনি পরম সত্য এবং একমাত্র যার আনুগত্য করা মানুষের কর্তব্য। কেননা তিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান রাখেন এবং তাঁর কোনো সৃষ্টিকেই তিনি জীবিকা থেকে বঞ্চিত করেন না। এই পরিচিতি মানুষ ও তার স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও সংযোগ রক্ষার জন্যে জরুরী। মানুষকে তার সেই সর্বময়, প্রভুর সর্বাত্মক আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করার জন্যেও জরুরী, যিনি শুধু তার স্রষ্টাই নন, বরং তার রেযেকদাতাও এবং তার গোপন প্রকাশ্য সর্ব বিষয়েও ওয়াকেফহাল।

বিজ্ঞাননির্ভর তাফসীরের সীমাবদ্ধতা

পরবর্তীতেও আল্লাহর এই পরিচয় দান অব্যাহত রয়েছে। অব্যাহত রয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় আকাশ পৃথিবীকে সৃষ্টি করার ব্যাপারে তাঁর অপার ক্ষমতা ও কুশলতার নিদর্শনাবলীর বিবরণী। এখানে বিশেষভাবে সেই নিদর্শনাবলীই তুলে ধরা হয়েছে, যা মানুষের আখেরাতের জীবন, হিসাব নিকাশ, কর্ম ও কর্মফলের সাথে মানানসই।

৭ নং আয়াত লক্ষ্য করুন :

'তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি ছয় দিনে আকাশ সৃষ্টি করেছেন, যখন তাঁর আরশ ছিলো পানির ওপর, যাতে তিনি পরখ করতে পারেন তোমাদের মধ্যে কে বেশী সৎকর্মশীল ....'

ছয়দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়টি নিয়ে আমরা সূরা ইউনুসে আলোচনা করে এসেছি। এখানে ওই বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে প্রাকৃতিক বিধি ব্যবস্থার সাথে মানব সমাজের সামষ্টিক বিধি ব্যবস্থার সংযোগ ও সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে।

'যেন তিনি পরখ করতে পারেন তোমাদের মধ্যে কে বেশী সৎকর্মশীল।'

আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির প্রসংগটিতে সূরা ইউনুসের চেয়ে অতিরিক্ত যে কথাটা এখানে সংযোজিত হয়েছে তাহলো, 'যখন তাঁর আরশ ছিলো পানির ওপর'। এ দ্বারা মোটামুটিভাবে যে বিষয়টা বুঝা যায় তা হলো, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির প্রক্রিয়া যখন পূর্ণ হয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন তাতে পানি ছিলো এবং মহান আল্লাহর আরশও ছিলো পানির ওপর।

এখন এই পানি কিভাবে ছিলো, কোথায় ছিলো, কি অবস্থায় ছিলো এবং কিভাবেই আল্লাহর আরশ পানির ওপর অবস্থান করছিলো– এ সব বাড়তি তথ্য আয়াতে দেয়া হয়নি। যিনি কোরআনের তাফসীর করেন এবং তাফসীরের ক্ষেত্রে নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন, তার আয়াতের মূল বক্তব্যে বাড়তি কোনো তথ্য সংযোজন করার অধিকার থাকে না, বিশেষত এমন একটা গায়েবী বা অদৃশ্য বিষয়ে, যার সম্পর্কে এই আয়াত বা এর সীমার ভেতরে ছাড়া আর কোনো জ্ঞানের উৎস আমাদের হাতে নেই।

কোরআনের কোনো উক্তিকে কোনো 'বৈজ্ঞানিক মতবাদে'র উৎস্য বা প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সমীচীন নয়। এমনকি কোরআনের কোনো উক্তির ভাষা যদি বাহ্যত এ ধরনের কোনো মতবাদের সমর্থক বলে মনে হয়, তাহলেও নয়। কেননা যে কোনো সময় বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলোর আমূল পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। বৈজ্ঞানিকরা যখনই নতুন কোনো ধারণা বা অনুমানের দিকে ঝুঁকে পড়েন, সেই ধারণা বা অনুমানের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান এবং এই পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে ইতিপূর্বেকার ধারণার চেয়ে নতুন ধারণাটাকেই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাখ্যার নিকটতম মনে করেন, তখনই প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক মতবাদের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। কোরআনের বক্তব্যে যে তথ্য প্রকাশ পায়, বিজ্ঞান সে তথ্যের সন্ধান পাক বা না পাক কোরআনের তথ্যই অকাট্য সত্য। বৈজ্ঞানিক তথ্য ও বৈজ্ঞানিক মতবাদ বা তত্ত্বে অনেক পার্থক্য রয়েছে। বৈজ্ঞানিক তথ্য বা উপাত্ত যদিও অকাট্য নয় এবং সন্দেহাতীত নয়, কিন্তু তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করা চলে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা মতবাদ এমন একটা ধারণা বা অনুমানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, যা কোনো এক বা একাধিক প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাখ্যা দেয় এবং যার নতুন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিবর্তন ও পরিবর্তন সব সময়ই সম্ভব। তাই কোরআনকে কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সমর্থক বা কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে কোরআনের ব্যাখ্যা বলে মনে করা যাবে না। বিজ্ঞানের পথ ও বিচরণক্ষেত্র কোরআনের পথ ও বিচরণ ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক মতবাদের সাথে কোরআনের মতৈক্য অনুসন্ধানের চেষ্টা কোরআনের প্রতি ঈমানের পরিপক্কতাকে পরাভূত করে, কোরআনের বিষয়বস্তুর প্রতি প্রত্যয়ের বলিষ্ঠতা ক্ষুণ্ন করে এবং আল কোরআন আল্লাহর কেতাব হওয়ার বিশ্বাসের দৃঢ়তাকে বিনষ্ট করে। বিজ্ঞান নিয়ে অহেতুক দম্ভ এবং বিজ্ঞানকে তার সুনির্দিষ্ট পরিমন্ডলের বাইরে বিচরণের সুযোগ দানের কারণেই ঈমানের এই পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

সুতরাং যারা মনে করে, কোরআনের সাথে বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটাতে পারলেই কোরআনের যথার্থ সেবা এবং ইসলামের প্রকৃত খেদমত সাধিত হয়, তাদের সাবধান হওয়া দরকার। কেননা তাদের এ ধারণা আসলে ঈমানের পর্যায়ক্রমিক বিলুপ্তির পথই সুগম করবে। মনে রাখতে হবে, যে ঈমান নিজের দৃঢ়তার জন্যে নিত্য পরিবর্তনশীল বিজ্ঞানের মতামতের অপেক্ষায় থাকে, সেটা আদৌ ঈমান কিনা, নতুন করে ভেবে দেখা দরকার। সত্যিকার ঈমানদারের দৃষ্টিতে কোরআনই অটল, অনড় আসল ও শাশ্বত সত্য। বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলো তার সমর্থন করুক বা বিরোধিতা করুক– তাতে কোরআনের কিছুই যায় আসে না। তবে পরীক্ষা-নির্ভর বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীর ক্ষেত্র কোরআনের ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কোরআন এই ক্ষেত্রটাকে মানুষের বিবেক বুদ্ধির বিচরণের জন্যে উন্মুক্ত রেখে দিয়েছে এবং এখানে তাকে কাজ করার ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে, হওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। কোরআন মানুষকে তার এ বিবেক-বুদ্ধির প্রশিক্ষণ দান, তাকে চিন্তার বিশুদ্ধতা ও নিষ্কলুষতা দান এবং তাকে কুসংস্কারের আবিলতা থেকে মুক্তি দানের ক্ষমতা ও অধিকার দিয়েছে। সেই সাথে তাকে এমন জীবন বিধানও দিয়েছে, যা তার বিবেক-বুদ্ধির নির্ভুলতা, স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করে। তারপর তাকে বিশেষ পরিমন্ডলে কাজ করা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে খুঁটিনাটি বাস্তব তথ্যাবলী উদ্ভাবনের সুযোগ দেয়। এ জন্যে কোরআন নিজে খুব কমই বৈজ্ঞানিক তথ্য বর্ণনা করে। যে দু'একটা বৈজ্ঞানিক তথ্য কোরআন বর্ণনা করে তার উদাহরণ হলো, পানি জীবনের উৎস এবং সকল প্রাণীর মধ্যে এটা অভিন্ন মৌল উপাদান হিসাবে বিরাজমান, সকল প্রাণী এমনকি উদ্ভিদও জোড়ায় জোড়ায় যথা নারী ও পুরুষের আকারে সৃজিত হয়েছে।

আকীদা বিশ্বাসের সাথে জড়িত কিছু মৌলিক বিষয়

এই অন্তর্বর্তী আলোচনার পর আমি পুনরায় ৭ নং আয়াতে ফিরে যাচ্ছি, যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আকীদা গঠন ও জীবনের পর্যায়ক্রমিক বিবর্তন।

'তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি ছয় দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ....'

এখানে অনেকগুলো বাক্য উহ্য রয়েছে। পরবর্তী বাক্যে তার প্রতি ইংগিত থাকায় তার উল্লেখের প্রয়োজন পড়েনি। কথাটা এ রকম ছিলো, 'তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তা মানব জাতির জীবন যাপনের যোগ্য হয়। আর তিনি আকাশ ও পৃথিবীসহ সমগ্র বিশ্বজগতের একচ্ছত্র অধিপতি হয়েও তোমাদের জন্যে আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের অনুগত করেছেন, যাতে তিনি পরখ করতে পারেন তোমাদের মধ্যে কে বেশী সৎকর্মশীল।' বস্তুত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির সমস্ত কৌশল আল্লাহর করায়ত্ত থাকা সত্তেও ছয় দিনে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ছিলো মানুষকে পরীক্ষা করা, পরীক্ষাটাকে গুরুত্বপূর্ণ করা এবং মানুষকে তার ও তার পরীক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করানো।

মহান সৃষ্টিকর্তা রব্বুল আলামীন আল্লাহ একদিকে যেমন আকাশ ও পৃথিবীকে মানুষের জীবন যাপনের উপযোগী উপকরণাদি দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। অপরদিকে তেমনি মানুষকে নানা রকমের যোগ্যতা, ক্ষমতা ও প্রতিভা দ্বারা সজ্জিত করেছেন। তার ফিতরত বা স্বভাব প্রকৃতিকে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন করেছেন। তার জীবনের একটা অংশে তাকে স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা দিয়েছেন। এ অংশে সে ইচ্ছা করলে সৎভাবে জীবন যাপন করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা তাকে সাহায্য করবেন ও সৎপথ প্রদর্শন করবেন। আবার ইচ্ছা করলে অসৎভাবে জীবন যাপন করার সিদ্ধান্তও নিতে পারে এবং তা করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে সে সুযোগও দেবেন।

মানুষকে আল্লাহ তায়ালা কাজ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য পরীক্ষা করা যে, কে বেশী সৎকর্মশীল। এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য আল্লাহর কোনো অজানা বিষয় জানা নয়। কেননা তিনি ভালোভাবেই জানেন, কে বেশী সৎকর্মশীল। এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো, মানুষের যে কর্মকান্ড অন্যান্য মানুষের দৃষ্টির অগোচরে ছিলো, তাকে গোচরে আনা এবং তার যে কর্মফল আল্লাহর সুবিবেচনা ও ন্যায়বিচার অনুসারে প্রাপ্য, তা যেন সে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে।

এ প্রেক্ষাপটে পরকালীন জীবন, হিসাব নিকাশ ও কর্মফল লাভের বিষয়টাকে অস্বীকার করা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার বলে পরিগণিত হয়। কেননা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, পরীক্ষা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির সাথে যুক্ত এবং প্রাকৃতিক নিয়ম ও সৃষ্টির রীতিতে তা একটা মৌলিক ব্যাপার। যারা এ সত্যকে অস্বীকার করে, তারা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক আচরণ করে এবং বিশ্বজগত সৃষ্টি সংক্রান্ত মহাসত্যগুলোকেই অস্বীকার করে ও বিস্ময়োদ্দীপক মনে করে।

'যদি তুমি বলো যে, তোমরা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হবে, তাহলে কাফেররা বলে যে, এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছু না।' (আয়াত-৭)

বস্তুত তাদের এই উক্তিই এক জলজ্যান্ত বিস্ময়। পরকালের জীবনকে তারা যেভাবে অস্বীকার করে এবং পরকালীন জীবনের সাথে প্রাকৃতিক নিয়মের সংযোগ সম্পর্কে তারা যেমন অজ্ঞতার পরিচয় দেয়, তেমনি দুনিয়াবী আযাব সম্পর্কেও তারা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। দুনিয়াবী আযাবকে আল্লাহ যখন কোনো যুক্তিসংগত কারণে পিছিয়ে দেন, তখন তারা আযাবকে ত্বরান্বিত করার দাবী জানায় এবং কি কারণে আযাব আসতে বিলম্ব ঘটছে, তা জানতে চায়। এ প্রসংগে ৮ নং আয়াত লক্ষ্য করুন,

'আমি যদি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আযাবকে বিলম্বিত করি, তবে তারা বলবে, কিসে আযাবকে আটকে দিলো? সাবধান, আযাব যেদিন তাদের কাছে আসবে, সেদিন তা কেউ ফেরাতে পারবে না এবং যা নিয়ে তারা ব্যংগ বিদ্রূপ করতো, তা-ই তাদেরকে ঘিরে ফেলবে।'

প্রাচীন জাতিগুলোর কাছে তাদের রসূলরা তাদের দাবী মোতাবেক অলৌকিক ঘটনাবলী নিয়ে আসার পরও যখন তাদেরকে অস্বীকার করতো, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন আযাব আসতো যে, তাতে তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যেতো। এর কারণ ছিলো এই যে, সেকালে এক একজন রসূল এক একটা নির্দিষ্ট মানব গোষ্ঠী এবং এক একটা নির্দিষ্ট প্রজন্মের জন্যে আসতেন। তাই তাদের আনীত মোজেযা বা অলৌকিক ঘটনাও একটা নির্দিষ্ট প্রজন্মই দেখবার সুযোগ পেতো এবং ওই নবীর ইন্তেকালের সাথে সাথে ওই মোজেযাও শেষ হয়ে যেতো। পরবর্তী প্রজন্ম ওই মোজেযা দেখে হয়তো পূর্ববর্তী প্রজন্মের চেয়েও বেশী ঈমান আনতো। কিন্তু সে সুযোগ তারা পেতো না। কেননা তাদের যুগে ওই মোজেযা অবশিষ্টই থাকতো না।

পক্ষান্তরে মোহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বকালের ও সকল প্রজন্মের জন্যে সর্বশেষ রসূল। তিনি যে মোজেযা নিয়ে এসেছিলেন, তা কোনো বস্তুগত মোজেযা ছিলো না। তাই তা স্থায়ী হওয়ার যোগ্য ছিলো এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম তা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করতে ও তার প্রতি ঈমান আনতে সক্ষম। এ জন্যে এ রসূলের উম্মতকে কোনো সর্বব্যাপী ও সর্বনাশা আযাব দিয়ে নিশ্চিহ্ন না করে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ওপর আযাব নাযিল হওয়াই সমীচীন ও যুক্তিসঙ্গত। ইহুদী ও খৃষ্টানদের ব্যাপারটাও তদ্রূপ। তাদের ওপরও কখনো সর্বব্যাপী আযাব আসেনি।

'কিন্তু মোশরেকরা মানব সৃষ্টি সংক্রান্ত আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান সম্পর্কে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পর্কে এবং নবী রসূল, মোজেযা ও আযাব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে পরকালকে

অস্বীকার করে এবং আযাবে কেন দেরী হচ্ছে, তা জিজ্ঞেস করে। তারা জানে না যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ভালোমন্দ ও ন্যায় অন্যায় বাছবিচারের ক্ষমতা এবং এর যে কোনো একটির দিকে আকৃষ্ট হওয়ার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তারা জানে না, আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবীকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, এখানে তার কাজ করার ও পরীক্ষা দেয়ার অনেক সুযোগ রয়েছে। তারা আল্লাহর রহমত ও কৌশলকে উপলব্ধি করে না। তারা বোঝে না যে, যে আযাব নিয়ে তারা উপহাস করছে ও ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে, তা তাদেরকে ঘিরে ফেলবে এবং এমনভাবে আসবে যে, কেউ তা ঠেকাতে পারবে না।

'সাবধান! আযাব যখন আসবে, কেউ ফেরাতে পারবে না ....'

আসলে কোনো ঈমানদার ও সচেতন মানুষ আল্লাহর আযাবকে ত্বরান্বিত করার দাবী জানাতে পারে না। আযাব যখন বিলম্বিত হয়, তখন বুঝতে হবে যে, ওটা আল্লাহর দয়া ও কৌশল মাত্র, যাতে ঈমান আনার যোগ্যতা যাদের মধ্যে রয়েছে, তারা ঈমান আনার সুযোগ পায়।

ইতিহাস সাক্ষী যে, কোরায়শদের ওপর আল্লাহ তায়ালা যে সময়টুকুর জন্যে আযাব বিলম্বিত করেছিলেন, সে সময়টুকুতে তাদের মধ্য থেকে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে ভালো মুসলমান হয়েছে। বহু অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং তাদের মধ্য থেকে বহু কাফেরের বংশধর পরবর্তীকালে মুসলমান হয়েছে। এ থেকে কিছু সুস্পষ্ট যৌক্তিকতা প্রতিভাত হয়েছে। এছাড়া আরো বহু যৌক্তিকতা এমন থাকতে পারে, যা শুধু আল্লাহই জানেন। আমাদের মতো অজ্ঞ, অক্ষম ও দ্রুততাপ্রিয় লোকেরা তা জানে না।

ধৈর্যহীন মানুষের চরিত্র

আযাবকে ত্বরান্বিত করা প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে পরবর্তী তিনটে আয়াতে আল্লাহর আজব সৃষ্টি মানুষের মানসিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, ঈমান ছাড়া আর কোনো উপায়ে তার মধ্যে স্থিতিশীলতা আসে না এবং সোজা ও সরল পথের অনুসারী হয় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি মানুষকে সুখ দিয়ে আবার তা কেড়ে নিলে সে হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। আর যদি দুঃখ কষ্টের পর তাকে সুখ সমৃদ্ধি দেই, তাহলে সে বলে, আমার সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে গেছে। সে আনন্দ ও গর্বে মেতে ওঠে। কেবল ধৈর্যশীল ও সৎকর্মশীল লোকদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার।' (৯, ১০ ও ১১)

সীমিত ক্ষমতার অধিকারী ও দ্রুততাপ্রিয় মানুষের নিখুঁত ও নির্ভুল বিবরণ দেয়া হয়েছে এ তিনটি আয়াতে। সে শুধু তার বর্তমান নিয়েই বিভোর ও মাতোয়ারা থাকে। অতীতকে সে মনে রাখে না এবং ভবিষ্যতকে নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। ভবিষ্যতে আর কোনো সুখ আসবে না ভেবে সে হতাশায় ভেংগে পড়ে এবং অতীতের সুখ কেড়ে নেয়া হলেই সে অতীতের সুখকে অস্বীকার করে। অথচ ওই সুখ ছিলো আল্লাহর দান। তাই আল্লাহ তায়ালা তা কেড়ে নিলে এতোটা বেসামাল হওয়া তার পক্ষে শোভনীয় নয়। দুঃখ পেরিয়ে সুখের মুখ দেখলেই সে বেপরোয়া ও দাম্ভিক হয়ে ওঠে। দুঃখের সময়ে সে কোনো সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের পরিচয় দেয় না এবং আল্লাহর রহমত ও সুখের আশা পোষণ করে না। আর সুখের সময়েও তার আনন্দ ও দম্ভের কোনো সীমা পরিসীমা থাকে না এবং ওই সুখেরও যে অবসান ঘটতে পারে, তা সে ভাবতেই পারে না।

'কেবল যারা ধৈর্যশীল ....'

অর্থাৎ যারা সুখে ও দুঃখে উভয় অবস্থায় সহিষ্ণুতা ও সংযমের পরিচয় দেয়। দুঃখ কষ্টে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যধারণ অনেকেই করে, যাতে দুর্বলতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ ফুটে উঠতে না পারে। কিন্তু সুখ সমৃদ্ধির সময়ে ধৈর্য ধারণ করে এবং দম্ভ গর্বে মেতে ওঠে না এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম।

'এবং যারা সৎকর্মশীল ....'

অর্থাৎ উভয় অবস্থায় সততার পথ অবলম্বন করে। দুঃখ কষ্টের সময় সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যধারণ এবং সুখ সমৃদ্ধির সময় শোকর আদায় ও দান করে।

'তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও .... '

দুঃখে ধৈর্য ও সুখে শোকরের কারণে তাদেরকে ক্ষমা ও পুরস্কার দ্বারা পুরস্কৃত করা হবে।

যে খাঁটি ও বলিষ্ঠ ঈমান সৎ কর্মের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়, একমাত্র সেই ঈমানই মানুষকে কষ্টের সময় কুফরীর ঝুঁকিপূর্ণ হতাশা থেকে এবং সুখের সময় পাপের পথে ঠেলে দেয়ার মত আত্মম্ভরিতা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। এই ঈমানই সুখে ও দুঃখে মানুষের মনকে অবিচল রাখে এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখতে সাহায্য করে। তাই সুখ ও দুঃখ দুটোই মোমেনের জন্যে কল্যাণ বয়ে আনে এবং একমাত্র মোমেনের জন্যেই কল্যাণ বয়ে আনে। রসূল (স.) একটি হাদীসে এ কথাই বলেছেন।

সৃষ্টির রহস্য ও প্রকৃতির বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ ওই অক্ষম, উদাসীন, হতাশাগ্রস্ত, অকৃতজ্ঞ, আনন্দে ও গর্বে বিভোর লোকেরা রসূল প্রেরণের যৌক্তিকতা ও মূল্য বোঝে না। তাই তারা দাবী জানায়, রসূলের হয় ফেরেশতা হওয়া উচিত, নতুবা তার সাথে ফেরেশতা আসা উচিত, অথবা রসূলের কাছে বিপুল ধন সম্পদ থাকা উচিত। হে রসূল, ওই সব হঠকারী, অবিশ্বাসীর সাথে হে রসূল, তুমি কেমন আচরণ করবে?..........

'সম্ভবত তোমার কাছে যে ওহী পাঠানো হয়, তার কিছু অংশ তুমি ছেড়ে দেবে এবং তোমার বক্ষ সংকুচিত হয়ে আসে শুধু এ জন্যে যে, তারা বলে, ওর কাছে সম্পদ আসে না কেন ....' (আয়াত-১২)

এখানে 'লাআল্লা' অব্যয়টা প্রশ্নবোধক হলেও পুরোপুরি প্রশ্নবোধক নয়। এ দ্বারা এটাও বুঝানো হয়েছে যে, এই অজ্ঞতা ও হঠকারিতার দরুন এবং রেসালাতের দায়িত্ব ও প্রকৃতি না বোঝার কারণে ওই সব নির্বোধসুলভ দাবীর প্রেক্ষিতে মানুষ মাত্রেরই মন সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। এখন হে মোহাম্মদ, তোমার মন কি সংকীর্ণ হয়ে গেছে এবং সে জন্যে তুমি কি ওহীর কিছু অংশ তাদের কাছে পৌঁছানোর সংকল্প ত্যাগ করবে, যাতে তারা তাদের স্বভাবসুলভ আচরণ না করে? না, কখনো নয়। তুমি কখনো তোমার কাছে পাঠানো ওহী ত্যাগ করবে না এবং মনকে সংকীর্ণ করবে না। কেননা–

'তুমি তো সতর্ককারী মাত্র।'

সুতরাং তোমার একমাত্র দায়িত্ব হলো, সতর্ক করা। তাই তুমি তোমার এই দায়িত্ব পালন করো।

'আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক।'

তিনি তাদের তত্ত্বাবধায়ক, নিজের নীতি অনুযায়ী যেমন ইচ্ছা তাদের পরিচালনা করেন। অতপর তাদের কাজের হিসাবও নেন। তুমি তাদের ঈমান বা কুফরের তত্ত্বাবধায়ক নও। তুমি শুধু সতর্ককারী।

এ আয়াত দ্বারা ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসের সেই কষ্টকর সময়টা কিভাবে কাটছিলো এবং কিভাবে রসূল (স.)-এর বুক সংকুচিত হয়ে আসছিলো, তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে, ভয়ংকর হঠকারী ও আগ্রাসী জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করার দায়িত্ব যে কতো কঠিন ছিলো, বিশেষত যখন সকল সহায়তাকারী আপনজনও মারা গেছে এবং জাহেলিয়াতের আগ্রাসী থাবার কবলে পড়ে রসূল (স.) ও মুসলমানদের মন চরম একাকীত্ব ও অসহায়ত্ব অনুভব করছিলো, তখনকার পরিস্থিতিও এ আয়াতে ফুটে উঠেছে।

এ আয়াতের ভাষার ভেতর দিয়ে আমরা অনুভব করি যে, সেই উদ্বেগপূর্ণ পরিস্থিতিতেও এ আয়াতে কিছুটা সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেয়া হয়েছে, যা হৃদয় ও স্নায়ুকে কিছু স্বস্তি দেয়।

আল কোরআনের চ্যালেঞ্জ

আর একটা কথা তারা বলে থাকে এবং ইতিপূর্বেও বহুবার বলেছে। সেই কথাটা হলো, এ কোরআন আল কোরআনের চ্যালেঞ্জ মানবরচিত। সুতরাং তাদেরকে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে যে, কোরআনের সূরাগুলোর মতো যে কোনো দশটা সূরা রচনা করে আনুক এবং এ কাজে যার সাহায্য নিতে চায় নিক।

'তবে কি তারা বলে যে, মোহাম্মদ (স.) এই কেতাব নিজেই রচনা করেছে ....?'

সূরা ইউনুসে একটা সূরা রচনা করার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। এরপর দশটি সূরার চ্যালেঞ্জ দেয়ার হেতু কী?

প্রাচীন মোফাসসেররা বলেছেন, চ্যালেঞ্জ তিন পর্যায়ে দেয়া হয়েছে। প্রথমে গোটা কোরআনের, তারপর দশটা সূরার এবং তারপর একটা সূরার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। তবে এই ধারাবাহিকতার কোনো প্রমাণ নেই। বরঞ্চ সূরা ইউনুস আগে নাযিল হয়েছে এবং তাতে একটা সূরার চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আর সূরা হূদ পরে নাযিল হয়েছে এবং তাতে দশটা সূরার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। আসল কথা, নাযিল হওয়ার দিক দিয়ে আয়াতের ধারাবাহিকতা সূরার ধারাবাহিকতার অনুসারী নাও হতে পারে। এমন অনেক হয়েছে যে, কোনো আয়াত নাযিল হয়ে পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী সূরার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে এর সপক্ষে প্রমাণ প্রয়োজন। নাযিলের উপলক্ষসমূহের মধ্যে এমন কোনো প্রমাণ নেই, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূরা ইউনুসের আয়াত সূরা হূদের আয়াতের পরে নাযিল হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অনুমান ভিত্তিক ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা বৈধ নয়।

জনাব রশীদ রেযা তাফসীর 'আল মানারে' 'দশ সূরা'র উল্লেখের একটা কারণ দর্শানোর চেষ্টা করেছেন। এ কাজ করতে যেয়ে তিনি অনেক গলদঘর্ম হয়েছে। তিনি বলেছেন, এখানে চ্যালেঞ্জের উদ্দেশ্য হলো কোরআনে বর্ণিত এই ঘটনাবলী বর্ণনা করার জন্যে আহবান জানানো। সূরা হূদ পর্যন্ত যে ক'টি বড় বড় কেসসা কাহিনী সম্বলিত সূরা নাযিল হয়েছে, তার সংখ্যা আনুমানিক দশ। এ জন্যে এখানে দশটা সূরা রচনার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। কেননা একটা সূরার চ্যালেঞ্জ দশটা সূরার চ্যালেঞ্জের চেয়েও তাদেরকে বেশী অক্ষম করে দিতে পারতো। কাহিনীর প্রকারভেদ, বাচনভংগির বৈচিত্র্য ও সম্ভাব্য কাহিনী বর্ণনায় সক্ষম হতে চ্যালেঞ্জপ্রাপ্তদের অনুরূপ দশটা কাহিনী সম্বলিত সূরার মুখাপেক্ষী হতে হতো।

আমি মনে করি, ব্যাপারটা এমন জটিল কিছু নয়। কেননা চ্যালেঞ্জটা আসলে আপত্তি উত্থাপনকারীদের অবস্থা ও আপত্তির পরিবেশ বিবেচনা করে দেয়া হয়েছে। কারণ কোরআন সুনির্দিষ্ট বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন ছিলো এবং বাস্তবসম্মতভাবেই তার মোকাবেলা করেছিলো। এ জন্যে কখনো বলে, এই কোরআনের মতো একটা কোরআন রচনা করে নিয়ে এসো, কখনো বলে,

একটা সূরা রচনা করে আনো, কখনো বলে, দশটা সূরা রচনা করে আনো। এখানে কোনো কালগত ধারাবাহিকতার প্রশ্ন ওঠে না। কেননা আসল উদ্দেশ্য হলো, কোরআনের যে কোনো একটা অংশের সমকক্ষ কিছু রচনা করার চ্যালেঞ্জ প্রদান, তা সে যতো বড় বা ছোট হোক না কেন। চ্যালেঞ্জটা মূলত কোরআনের মানের দিক দিয়ে দেয়া হয়েছে। পরিমাণের দিক দিয়ে নয়। আর কাফেরদের কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণে অক্ষমতাও ছিলো গুণগত, পরিমাণগত নয়। সুতরাং কোরআনের অংশ, বা সমগ্র বা সূরা সবাই এ ক্ষেত্রে সমান। এখানে ধারাবাহিকতাও নিষ্প্রয়োজন। শুধু শ্রোতাদের পরিস্থিতি, পরিবেশ ও কোরআন সম্পর্কে তাদের বক্তব্যের ধরনের মোকাবেলা করাটাই ছিলো আসল প্রয়োজনীয় বিষয়। এ প্রয়োজন অনুসারেই একটা সূরা, দশটা সূরা বা সমগ্র কোরআনের উল্লেখ করা হয়। কোরআন কি পরিস্থিতিতে কোন্ কথা বলেছিলো, তা যখন নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেনি, তখন আমাদের পক্ষেও সেটা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়।

'আর আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকতে পারো ডাকো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।'

অর্থাৎ তোমাদের যতো বড় বড় সাহিত্যিক, কবি ও বক্তা আছে, জ্বিন ও মানুষদের মধ্যে যে যেখানে আছে, তাদের সবার সাহায্য নিয়ে মাত্র দশটা সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। কোরআনের ব্যাপারে তোমাদের এই দাবী যদি সত্য হয় যে, কোরআন মানুষের রচিত, তাহলে তোমাদের পক্ষে এর সমমানের দশটা সূরা রচনা করে আনা উচিত।

'কিন্তু তারা যদি তোমাদের ডাকে সাড়া না দেয়'

অর্থাৎ দশটা সূরা রচনা করতে না পারে, এই অসম্ভব কাজে তোমাদের সাহায্য করতে না পারে এবং তোমরাও তা না পারো। আর এটা সুবিদিত যে, তোমরা অক্ষম হওয়ার কারণেই অন্যদের সাহায্য চেয়েছো।

'তাহলে জেনে রাখো যে, যা কিছু ওহী নাযিল হয়েছে, তা আল্লাহর জ্ঞান থেকেই হয়েছে।'

বস্তুত তিনি একাই এ ধরনের ওহী নাযিল ও রচনা করতে সক্ষম। আল্লাহর জ্ঞানই এ ধরনের বাণী নাযিল করতে পারে, যাতে বিশ্বজগতের বর্ণনা, মানুষের অবস্থা, তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত এবং তাদের প্রয়োজনীয় সকল দিক সম্পর্কে বিপুল তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে।

'এবং এও জেনে রাখো যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।'

অর্থাৎ তোমাদের উপাস্যরাও যখন দশটা সূরা রচনা করে দিতে পারলো না, তখন এ দ্বারা বুঝা যায় যে, মাত্র মাবুদ একজনই আছেন, যিনি কোরআন রচনা ও নাযিল করেছেন।

দুনিয়ার মোহ ক্ষতির একটি বড়ো কারণ

এরপর এমন একটা প্রশ্ন তোলা হয়েছে, যার একটা মাত্র জবাবই সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের কাছে রয়েছে। সেটি হলো,

'তাহলে তোমরা কি মুসলমান?'

এই চ্যালেঞ্জ ও তার মোকাবেলায় অক্ষমতার পর এ ছাড়া আর কি উপায়ই বা আছে?

কিন্তু তারা এরপরও হঠকারিতা চালিয়ে যায়।

সত্য কি, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তারা পার্থিব জীবনে যে স্বার্থ, ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করছিলো, তা হাতছাড়া হওয়ার আশংকা এবং সাধারণ মানুষকে গোলাম বানিয়ে রাখার অভিলাষ হেতু তারা এ দাওয়াতকে গ্রহণ করেনি। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষকেও তারা সুযোগ দিতো না সম্মান, স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচারের আহবায়ক এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর আহবায়কের ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে। তাই পরবর্তী আয়াতে তাদের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। বলা হয়েছে।

'যে ব্যক্তি শুধুই পার্থিব জীবনকে ও তার সৌন্দর্যকে চায়। ....' (আয়াত ১৫ ও ১৬)

পৃথিবীতে প্রত্যেক চেষ্টার ফল রয়েছে। চাই চেষ্টাকারী তার চেষ্টার দীর্ঘমেয়াদী ও উৎকৃষ্টতর ফল কামনা করুক অথবা স্বল্পমেয়াদী ও নিকটতর ফল কামনা করুক। যে ব্যক্তি কেবল দুনিয়ার জীবনের সুখ সমৃদ্ধিই চায় এবং তার জন্যে চেষ্টা করে, সে তার ফলাফল দুনিয়াতেই পায়। কিন্তু আখেরাতে তার আর কোনো প্রাপ্য থাকে না। সেখানে সে আগুন ছাড়া আর কিছু পাবে না। কেননা সে তো সেখানকার জন্যে কিছু করেনি। তাই তার দুনিয়াবী কাজের ফল সে দুনিয়াতেই পাবে। আখেরাতে তা বৃথা যাবে এবং তার কোনো মূল্যায়ন সেখানে হবে না। ('হাবেতা' অর্থ বাতিল ও নিষ্ফল হয়ে যাওয়া। শব্দটা মূলত উষ্ট্রীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এক ধরনের বিষাক্ত ঘাস খেয়ে উষ্ট্রী পেট ফুলে মরে গেলে বলা হয়, 'হাবেতাত্ নাকাতুহু'– 'তার উষ্ট্রীটি পেট ফুলে মরে গেছে'। পৃথিবীতে আপাতত খুবই লাভজনক অথচ পরিণামে ধ্বংস অনিবার্য করে তোলে– এমন কাজের ক্ষেত্রে 'হাবেতা' ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পৃথিবীতে আমরা আজকাল এমন বহু লোক ও জনগোষ্ঠী দেখতে পাই, যারা দুনিয়ার জন্যেই কাজ করে, দুনিয়াতেই তার সুফল পায়, সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করে এবং আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়। এ ক্ষেত্রে এমন কেন হয়– এটা জিজ্ঞাসা করা সম্পূর্ণ অন্যায়। কেননা এটাই পৃথিবীতে আল্লাহর নিয়ম। এ নিয়মটার কথাই বলা হয়েছে এ আয়াতটাতে, 'যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করে। তাকে আমি তার কাজের সুফল দুনিয়াতেই দিয়ে দিই, এতে তার প্রাপ্তিতে কোনো কমতি থাকে না।'

তবে আল্লাহর এ নিয়ম ও এর ফলাফল মেনে নেয়ার পরও আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, যারা দুনিয়ার জন্যে লাভজনক কাজ করে দুনিয়াতে তার সুফল ভুগছে, তারা একই কাজ করে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই লাভবান হতে পারতো, যদি তা দ্বারা আখেরাতের কল্যাণ লাভকেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করতো এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে তা উপার্জন ও ভোগ করতো। এমনটি হলে তাদের দুনিয়াতেও ঠকতে হতো না, আখেরাতেও সফলতা লাভ করতো।

'বস্তুত আখেরাতের জন্যে কাজ করলে তা দুনিয়ার জন্যে কাজ করতে বাধা দেয় না; বরং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করলে ওই একই কাজ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় কাজে পরিণত হয়। আল্লাহর অসন্তোষ এড়িয়ে কাজ করলে কাজের মাত্রা ও সুফল– কোনোটাই হ্রাস পায় না; বরং কর্ম ও তার সুফল বৃদ্ধি পায়। এতে উপার্জন ও উপার্জিত সম্পদ পবিত্র ও হালাল সম্পদে পরিণত হয় এবং দুনিয়ার সম্পদের ওপর আখেরাতের সম্পদও যুক্ত হয়। অবশ্য দুনিয়ার সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্য যদি হয় অবৈধ লালসা চরিতার্থ করা, তবে সেটা ভিন্ন কথা। এমন হলে এ উপার্জন শুধু আখেরাতের জন্যেই নয়। বরং দুনিয়ার জন্যেও বিপর্যয় ডেকে আনে, যদিও তা তাৎক্ষণিক না হয়ে একটু বিলম্বিত হতে পারে। এটা ব্যক্তি বা জাতি সবার জীবনেই সমানভাবে কার্যকর। যুগে যুগে যে সব জাতি প্রবৃত্তির লোভ লালসা চরিতার্থ করেছে, তাদের ঐতিহাসিক পরিণতি থেকে এ শিক্ষাই পাওয়া যায়।

ঘরে বসে কোরআন বোঝার ব্যর্থ প্রচেষ্টা

পরবর্তী আয়াত ক'টাতে রসূল (স.) ও তাঁর কাছে আগত ওহীর ব্যাপারে মোশরেকদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে এ কোরআন সম্পর্কে, যা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, রসূল (স.) সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকেই

প্রেরিত। এ সাক্ষ্য ইতিপূর্বে মূসার কেতাবও তাঁর পক্ষে দিয়েছে। রসূল (স.), তাঁর দাওয়াত ও রেসালাত সংক্রান্ত এ সব যুক্তি-প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্য রসূল (স.) ও তাঁর সাথী মোমেনদের মনকে সান্ত্বনা দেয়া। তাঁকে অস্বীকারকারী মোশরেকদেরকে দোযখের আগুনের ভীতি প্রদর্শন, তাদেরকে কেয়ামতের আযাবের দৃশ্য প্রদর্শন এবং তাদেরকে তাদের অহংকার ও হঠকারিতার প্রতিফল হিসাবে যে ভয়াবহ লাঞ্ছনা ও অবমাননার সম্মুখীন করা হবে, তা অবহিত করা এবং এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী ও বাতিলকে গ্রহণকারী এ হঠকারী লোকেরা আল্লাহর আযাব থেকে কিছুতেই রেহাই পাবে না, আর আল্লাহ ছাড়া কোনো বন্ধু এসে তাদেরকে উদ্ধার করবে না। সেই সাথে মোশরেকদের ও মোমেনদের স্বভাবে, নীতিতে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের পরিণতিতে যে আকাশ পাতাল পার্থক্য, তার বর্ণনা করা এ আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য। ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ নং আয়াতগুলোতে এ বিষয়গুলো কিভাবে আলোচিত হয়েছে, লক্ষ্য করুন।

এ আয়াতগুলোতে যে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে এবং যে বিচিত্র ইশারা ইংগিত ও প্রভাব বিস্তারকারী বক্তব্য পেশ করা হয়েছে, তা ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসের সেই সংকটজনক মুহূর্তে মুষ্টিমেয় সংখ্যক মুসলমান কি পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিলো, তা তুলে ধরেছে। সেই সাথে তুলে ধরেছে এই সংগ্রামী প্রেরণায় উজ্জীবিত ভাষণের প্রতি সমর্থন দানের প্রয়োজনীয়তা, কোরআনের সংগ্রামী চরিত্র এবং সেই সময়কার কঠিন বাস্তবতার বিরুদ্ধে কোরআনের পরিচালিত তেজস্বী সংগ্রাম।

এ ধরনের সংগ্রামে যারা কার্যকরভাবে অংশ গ্রহণ করে না, যারা শুধু ঘরের কোণে বসে বসে কোরআনের অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করে, ঠান্ডা ও নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশে কোরআনের আলংকারিক বা শৈল্পিক সৌন্দর্য উপভোগ করার চেষ্টা করে এবং আন্দোলন ও সংগ্রাম থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে, তারা আর যাই করুক, কোরআনের প্রকৃত স্বাদ কখনো পাবে না এবং তার মর্ম ও তাৎপর্য কখনো অনুধাবন করবে না। আরাম কেদারায় বসে কোরআনের তাৎপর্য বুঝা যায় না। আল্লাহদ্রোহী শক্তির গোলামী করে শান্তি ও নিরাপত্তা পাওয়াকে যারা অগ্রাধিকার দেয়, তাদের কাছে কোরআনের গুপ্ত রহস্য কখনো ধরা দেয় না।

১৭ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অকাট্য প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে, তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত এক সাক্ষী তাকে অনুসরণ করে এবং তার পূর্বে মূসার কেতাবও পথ প্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ এসে তাকে অনুসরণ করেছে,-তারা সকলেই তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। আর যে তাঁকে অস্বীকার করে, তার জন্যে প্রতিশ্রুত রয়েছে আগুন। অতএব, তার সম্পর্কে সন্দেহে লিপ্ত হয়ো না। এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সত্য। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই ঈমান আনে না।'

এখানে যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অকাট্য প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে।' ও 'এক সাক্ষী তাকে অনুসরণ করে' ইত্যাদি উক্তির ব্যাখ্যা সম্পর্কে নানা রকমের মতামত রয়েছে। তবে আমার দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য মত এই যে, 'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অকাট্য প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে,' এ কাথাটা দ্বারা রসূল (স.)-কে বা রসূলের আনীত বিধানের প্রতি আহ্বানকারীকে এবং 'তার পক্ষ থেকে আগত এক সাক্ষী.........' দ্বারা কোরআনকে বুঝানো হয়েছে। কোরআন একদিকে রসূল (স.)-এর রেসালাত ও নবুয়তের সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য

দেয়, অপরদিকে সে নিজেও নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ওহী। কেননা কোনো মানুষ তার মত একটি সূরাও রচনা করতে পারে না। 'মূসার কেতাব' দ্বারা তাওরাতকে বুঝানো হয়েছে। তাওরাত রসূল (স.)-এর আগমনের পূর্বাভাস দান এবং মৌলিকভাবে রসূল (স.)-এর আনীত বিধানের অনুরূপ বিধান আনয়নের মাধ্যমে তার সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে।

আমার উক্ত ব্যাখ্যার কারণ এই যে, সমগ্র সূরাটায় নবীদের কাছে আগত ওহীর ব্যাপারে তাঁদের সংশয়াতীত সুদৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণার বাচনভংগি অনেকটা একই রকম। যেমন নূহ (আ.) বলেন, 'হে আমার জাতি, তোমরা ভেবে দেখছো কি যে, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটা অকাট্য প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি আমাকে নিজের পক্ষ থেকে করুণা দান করেন, আর তার ব্যাপারে তোমরা অন্ধের মত আচরণ করো, তাহলে তোমাদের অপছন্দ করা সত্তেও কি সেই করুণা তোমাদের ওপর বর্ষণ করবো?' হযরত সালেহ (আ.)-ও একই কথা বলেন, 'হে আমার জাতি, তোমরা ভেবে দেখেছ কি। আমি যদি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আগত অকাট্য প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি............' অনুরূপভাবে হযরত শোয়ায়ব (আ.) ও বলেন, 'হে আমার জাতি, তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আমি যদি আমার মনিবের পক্ষ থেকে অকাট্য প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি............'

বস্তুত আল্লাহর সাথে রসূলদের একই অবস্থা, ওহীর মাধ্যমে তাঁর সাথে তাদের একই সম্পর্ক এবং তাঁদের নিজ নিজ অন্তরে আল্লাহর সর্বময় প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের একই স্বরূপ এ সব আয়াত দ্বারা প্রতিফলিত হয়েছে। সূরাটাতে ভাষার এমন ঐক্য ইচ্ছাকৃতভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। যাতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর সাথে ও তাঁর কাজে থেকে আগত ওহীর সাথে তাঁর সম্পর্ক পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীদের মতোই, যাতে তাঁর সম্পর্কে মোশরেকদের মিথ্যা অপবাদ অপনোদিত হয় এবং যাতে রসূল (স.) ও তাঁর সাথী মোমেনদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। কেননা তারা বুঝতে পারবে যে, রসূল (স.) অবিকল সেই সত্যকে বয়ে এনেছেন, যা সকল নবী বয়ে এনেছিলেন এবং যার ওপর সকল নবীর অনুসারীরাই ঈমান এনেছিলো।

এভাবে ১৭ নং আয়াতের সঠিক অর্থ দাঁড়াচ্ছে এ রকম, 'যে নবীর নবুওতের সত্যতা ও তার বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে এতো সব অকাট্য সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে, যার কারণে তিনি নিজেকে অকাট্য প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত মনে করেন, যে নবীর সত্যতার সাক্ষী এই কোরআন, যা আল্লাহর রচিত বলে অকাট্যভাবে প্রমাণিত, যে নবীর নবুয়তের সত্যতার সাক্ষ্য মূসার কেতাব তাওরাতও দিয়েছে, যা বনী ইসরাইলের পথ-প্রদর্শক ও করুণা হয়ে এসেছিলো। রসূল (স.) সম্পর্কে পূর্বাভাস দিয়েছিলো এবং রসূলেরই অনুরূপ আকীদা বিশ্বাস পেশ করেছিলো, সেই নবীকে যা কি অস্বীকার করা সম্ভব, যেমনটি মোশরেকরা করেছিলো?

এরপর আয়াতের শেষভাগে এসেছে কোরআনে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের প্রসংগ এবং তাদের জন্যে নির্ধারিত আখেরাতের প্রতিফলের প্রসংগ। এর মাধ্যমে রসূল (স.) ও অন্যান্য মোমেনদের মনোবল বাড়ানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তৎকালের অধিকাংশ মানুষ যদিও ইসলামী দাওয়াতের বিরোধী ছিলো, কিন্তু তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা মনে রেখে কেউ যেন উদ্বিগ্ন ও হতোদ্যম না হয়।

'তারা তার প্রতি ঈমান আনে আর যে তার প্রতি কুফরী করে তার জন্যে প্রতিশ্রুত স্থান হচ্ছে আগুন। অতএব এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ পোষণ করো না।........'

'তারা তার প্রতি ঈমান আনে' কথাটায় বহুবচনের শব্দ প্রয়োগ নিয়ে কিছু জটিলতা রয়েছে। কেননা আয়াতের শুরুতে ' যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অকাট্য প্রমাণের ওপর

প্রতিষ্ঠিত থাকে' কথাটায় একবচন প্রয়োগ করা হয়েছে এবং তা দ্বারা রসূল (স.)-কে বুঝানো হয়েছে। এ জটিলতার সমাধান এই যে, এখানে 'তারা ঈমান আনে' কথাটা দ্বারা মোমেনদের দলকে বুঝানো হয়েছে, কোনো ব্যক্তি বিশেষকে নয়। 'তার প্রতি ঈমান আনে' বাক্যটাতে 'তার প্রতি' অর্থ কোরআনের প্রতি। সুতরাং এতে আর কোনো জটিলতা নেই।

'আর যে ব্যক্তি ও দল কোরআনকে অস্বীকার করবে, তার জন্যে প্রতিশ্রুত রয়েছে আগুন।' আর এই প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ভংগ করেন না। কেননা তিনি অনেক ভেবে চিন্তে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

'অতএব তুমি সন্দেহ করো না ....'

রসূল (স.) কখনো সন্দেহ করেননি। তিনি তো বরং তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে অকাট্য প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে এ উক্তি দ্বারা বুঝা যায়, আন্দোলনে লোকবল বৃদ্ধি না পাওয়া এবং অস্বীকারকারীদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে কখনো কখনো তিনি কিছুটা হতোদ্যম হয়ে পড়তেন। তাই তাঁকে এভাবে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে মোমেনদেরকেও প্রবোধ দেয়া হয়েছে। কেননা তারাও খুবই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলো।

পৃথিবীর সর্বত্র যখন ইসলামী আন্দোলন এরূপ অবস্থারই সম্মুখীন, সর্বত্রই যখন জাহেলী শক্তি তার বিরুদ্ধে খড়গহস্ত। সর্ব প্রকার যুলুম নির্যাতন, ব্যংগ বিদ্রূপ ও আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে, তখন এ আয়াত থেকে সকল ইসলামী আন্দোলনকেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। নবীদের মতো সন্দেহ সংশয়মুক্ত হওয়া ও সকল বাধা উপেক্ষা করে সত্যের সংগ্রাম অব্যাহত রাখার প্রয়োজনেই এ আয়াতকে সকলের বুঝতে সচেষ্ট হতে হবে।

হযরত সালেহ (আ.) বলেছিলেন, 'হে আমার জাতি! তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আমি যদি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে অকাট্য প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে করুণা করেন, এর পরও আমি যদি তাঁর অবাধ্যতা করি, তবে আল্লাহর আযাব থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে? তোমরা তো আমার ক্ষতি বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছু করতে পারবে না।'

আসলে ইসলামী আন্দোলনগুলো এ যুগে সর্বত্র নবী ও রসূলদের সময়ের মতোই জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করছে। রসূল (স.)ও তাঁর আমলে তার পূর্ববর্তী নবী ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, তাঁর পৌত্ররা, ইউসুফ (আ.), মূসা (আ.), হারুন (আ.), দাউদ (আ.), সোলায়মান (আ.), ইয়াহিয়া, ঈসা (আ.) এবং অন্য সমস্ত নবীর মতো একই ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন এবং জাহেলিয়াতকে উৎখাত করে তার জায়গায় ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আবার আমাদের যুগটাও রসূলের যুগের মতো হয়ে গেছে। এখনও ইসলামী আন্দোলন জাহেলিয়াতের সাথে সংঘাতে লিপ্ত।

আজকের জাহেলিয়াত আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করুক বা না করুক, তা পৃথিবীতে মানুষের এমন অনেক প্রভু সৃষ্টি করেছে, যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান ছাড়াই মানুষকে শাসন করে এবং তাদের ওপর এমন সব আইন কানুন, নিয়ম বিধি, রীতি প্রথা ইত্যাদি চাপিয়ে দেয়, যা মানুষকে আল্লাহর পরিবর্তে ওইসব প্রভুর অনুগত দাসানুদাসে পরিণত করে। পক্ষান্তরে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন ঠিক এর বিপরীত কাজে নিয়োজিত। তার কাজ হলো, মানুষকে এ সব ভুয়া প্রভু ও তাদের রচিত আইন কানুন, শাসন, নিয়ম বিধি, মূল্যবোধ ও বিধি বিধান থেকে মুক্ত করা, তাদেরকে তাদের একমাত্র আসল প্রভু আল্লাহর অনুগত বানানো, তাদেরকে আল্লাহর সাথে আর কাউকে প্রভু ও মনিব হিসাবে না মানতে এবং আল্লাহর আইন বিধান ছাড়া আর কারো আইন বিধান ও আদেশ নিষেধ না মানতে উদ্বুদ্ধ করা। এ কারণে শেরেক ও তাওহীদের মধ্যে, ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে এবং ইসলামী আন্দোলন ও ইসলাম বিরোধী সংগঠনগুলোর মধ্যে এক চিরন্তন সংঘাত অনিবার্যভাবে লেগে রয়েছে।

তাই পৃথিবীর দিকে দিকে ও দেশে দেশে যে সব ইসলামী দল ও সংগঠন কর্মরত রয়েছে, তাদেরকে আজকের দিনে কোরআন থেকেই শিক্ষা নিতে হবে। ইতিপূর্বে আমি নিম্নোক্ত উক্তি দ্বারা এ কথাই বুঝাতে চেয়েছি,

'এ ধরনের সংগ্রামে যারা কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করে না, যারা শুধু ঘরের নিভৃত কোণে বসে কোরআনের অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করে, ঠান্ডা ও নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশে কোরআনের আলংকারিক ও শৈল্পিক সৌন্দর্য উপভোগ করার চেষ্টা করে এবং আন্দোলন ও সংগ্রাম থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে, তারা আর যাই হোক, কোরআনের প্রকৃত স্বাদ কখনো পাবে না এবং তার মর্ম ও তাৎপর্য কখনো অনুধাবন করবে না। আরাম কেদারায় বসে কোরআনের তাৎপর্য বুঝা যায় না। খোদাদ্রোহী শক্তির গোলামী করে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভকে যারা অগ্রাধিকার দেয়, তাদের কাছে কোরআনের গুপ্ত রহস্য কখনো ধরা দেয় না।'

আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপের পরিণতি

পরবর্তী কয়েকটা আয়াতে আবারো সেই কাফেরদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যারা কোরআনকে মানব রচিত বলে দাবী করে এবং আল্লাহ ও রসূলের দাওয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও অস্বীকার করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তাদেরকে কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে হাযির করা হবে। আল্লাহর প্রতি এই মিথ্যা আরোপ এভাবেও হতে পারে যে, 'আল্লাহ আদৌ এ কেতাব নাযিল করেননি'– এ কথা বলা হবে, অথবা আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক মানা হবে। অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব ও আইন রচনার অধিকার দেয়া হবে, যা আল্লাহর একচেটিয়া অধিকার ও বৈশিষ্ট্য। আয়াতে অনির্দিষ্টভাবে শুধু 'মিথ্যা আরোপ' কথাটার উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপের পর্যায়ে পড়ে এমন প্রতিটি কাজই এর আওতাভুক্ত হয়।

এ মিথ্যা আরোপকারী কাফেরদেরকে কেয়ামতের মাঠে অপমানিত করা ও চিহ্নিত করার জন্যে জনসমক্ষে হাযির করা হবে। অপরদিকে মোমেনরা থাকবে তাদের প্রভুর সান্নিধ্যে পরম শান্তিতে এবং অফুরন্ত নেয়ামত উপভোগ করবে। এই দুটো গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য কতো, তা ব্যাখ্যা করার জন্যে উদাহরণ দেয়া হয়েছে এভাবে যে, তারা অন্ধ ও চক্ষুষ্মানদের মতো এবং বধির ও শ্রবণশক্তিসম্পন্নদের মতো। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় যালেম কে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে ...? আয়াত নং ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ ও ২৪

মিথ্যা আরোপ যার বিরুদ্ধেই করা হোক, মূলতই তা একটা জঘন্য অপরাধ। আর এ কাজটা যদি স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধে করা হয়, তা হলে সেটা হয় সবচেয়ে বড় অপরাধ।

'তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে হাযির করা হবে। আর দর্শকরা বলবে, এই তো সেই সব লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। এখানে 'এই তো সেই সব লোক, যারা মিথ্যা আরোপ করেছে' কথাটার মধ্যে যে ইংগিত করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হলো মিথ্যা আরোপকারীদেরকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা ও নিন্দিত করা। আর তারা কার ওপর মিথ্যা আরোপ করে? স্বয়ং তাদের প্রতিপালকের ওপর– আর কারো ওপর নয়। অবমাননার প্রেক্ষাপটটা এ দৃশ্যটাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে এবং আয়াতের শেষে তাদেরকে অভিশপ্ত আখ্যায়িত করার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, তাদের অপরাধটা কতো জঘন্য!

'সাবধান, যালেমদের ওপর আল্লাহর লা'নত।'

কথাটা শুধু আল্লাহ তায়ালা বলবেন না, দর্শকরাও বলবে। আর 'দর্শক' বলতে বুঝানো হয়েছে ফেরেশতাদের, রসূলদের ও মুসলমানদেরকে অথবা সমগ্র মানব জাতিকে। এ ঘোষণা

অপমান ও প্রসিদ্ধকরণের উদ্দেশ্যেও হতে পারে। অথবা সেই সাথে আল্লাহর সিদ্ধান্ত প্রকাশর উদ্দেশ্যেও হতে পারে।

এখানে 'যালেম' অর্থ মোশরেক। যারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফেরানোর জন্যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে।

'এবং তারা বক্রতা অনুসন্ধান করে।'

অর্থাৎ তারা সরল ও সোজা পথে চলতে চায় না। বক্র ও পেঁচানো পথে চলতে চায়। চলার পথই হোক, জীবন যাপনের পদ্ধতিই হোক, কিংবা অন্য কোনো বিষয় হোক, সব কিছুতেই তারা বক্রতা চায়।

'এবং তারা আখেরাতকে অস্বীকার করে।'

এ কথাটা দ্বারা তাদের অপরাধকে অধিকতর প্রসিদ্ধ ও নিন্দা করা হয়েছে।

যে যালেমরা আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক করে, তারা ইসলামের সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গোটা জীবনেই বক্রতার সন্ধান করে থাকে। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য যে কোনো সত্ত্বার আনুগত্যের পরিণাম মানব মনের সবদিকে এবং মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে বক্রতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্ত্বার দাসত্ব মানুষের মনে হীনতা ও নীচতার জন্ম দেয়। অথচ আল্লাহ তায়ালা মানুষের মনে মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো গোলামী মানুষের জীবনে যুলুম ও বাড়াবাড়ির জন্ম দেয়। অথচ আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন মানুষকে ন্যায় নীতি ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে। দুনিয়ার প্রভুদেরকে আসল প্রভুর স্থানে বসানোর কারণে মানুষের সমস্ত চেষ্টা সাধনা বৃথা যায়। এই সমস্ত প্রভু আসলে ক্ষুদ্র ও নগণ্য হওয়ায় প্রকৃত প্রভু আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। তাই ওইসব ভুয়া প্রভুর গোলামরা স্বাভাবিকভাবেই চিরস্থায়ী দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত থাকে। আর দিবারাত্র ওই সব ভুয়া প্রভুর চারপাশে শিংগা ফুঁকে, ঢোল নাকাড়া বাজায়, গান গায় ও নাম জপে। এর ফলে মানুষের কল্যাণমুখী তৎপরতা এই সব নিরর্থক ও নিষ্ফল তপজপে পরিণত হয়। এর চেয়ে বড় বক্রতা ও বিকৃতি আর কী হতে পারে?

'ওইসব লোক পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করে দিতে পারবে না।'

অর্থাৎ ওই সব অভিশপ্ত যালেম ও মোশরেক এমন কোনোই ক্ষমতা রাখে না, যা পৃথিবীতে আল্লাহর ক্ষমতাকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। বরং আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে তাদেরকে দুনিয়ার জীবনেই আযাব দিতে পারেন।'

'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদের আর কোনো অভিভাবক বা বন্ধু নেই।'

অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে ও সাহায্য করতে পারে এমন কেউ নেই। তবে তাদেরকে দুনিয়াতে আযাব না দিয়ে আখেরাতের আযাবের জন্যে ছেড়ে দেন, যাতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গার প্রাপ্য আযাব এক সাথে পায়।

'তাদের আযাব দ্বিগুণ করা হবে।'

কেননা তারা তাদের দৃষ্টিশক্তি ও বোধশক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে, যেন তাদের চোখ কান কখনো ছিলোই না।

'তারা দেখা ও শোনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলো।' (আয়াত ২০)

'তারাই সেই সব লোক, যারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ করেছে।'

বস্তুত এটাই সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতি। যে ব্যক্তি নিজের ক্ষতি নিজেই করে, সে অন্যের সৎকাজ দ্বারা উপকৃত হয় না। তারা দুনিয়াবী জীবনে নিজেদের মানবোচিত মর্যাদা উপলব্ধি

করেনি। আর এই মর্যাদা আল্লাহর গোলামদের গোলামী না করা এবং দুনিয়ার সম্পদ ও ভোগ বিলাসের লোভের ঊর্ধে উঠে অধিকতর উন্নত জীবনের সন্ধান লাভ দ্বারাই এই মর্যাদা নিশ্চিত হয়। কিন্তু আখেরাতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে হবে না একথা ভেবে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে তারা নিজেদের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। এ অপমান ও শাস্তি দ্বারা তারা আখেরাতে নিজেদের সর্বনাশ করেছে।

'আর তাদের সমস্ত মিথ্যা অপবাদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।'

অর্থাৎ এই সব মিথ্যা অপবাদ একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ফলে তার কোনো খোঁজই তারা পায় না। (আয়াত-২১)

'আখেরাতে যে তারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সেটা অবধারিত।'(আয়াত ২২)

কেননা তারা দুনিয়া ও আখেরাত সবই হারিয়েছে। তাই তাদের ক্ষতির কোনো তুলনা হয় না।

অপরদিকে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলেরা আল্লাহর কাছে পরম নিশ্চিন্তে ও শান্তিতে থাকবে তাদের কোনো অভিযোগ থাকবে না।

'যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে ও আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তারা হবে জান্নাতবাসী।............' (আয়াত-২৩)

'ইখবাত' শব্দের অর্থ হচ্ছে নির্ভর করা, আত্মসমর্পণ করা, স্থির ও অবিচল থাকা ও নিশ্চিন্ত থাকা। এ আয়াতটা আল্লাহর সাথে মোমেনের সম্পর্ক কেমন হয়, কিভাবে সে তার ওপর নির্ভর করে, কিভাবে সকল ঘটনায় সে নিশ্চিন্ত থাকে, তার মনের স্থিরতা, প্রশান্তি, নিশ্চিন্ততা ও সন্তোষ কতো গভীর হয়, সেটাই বুঝানো হয়েছে।

'উভয় পক্ষের উদাহরণ অন্ধ ও বধিরের মতো এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির মতো।'

এ একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্য, যা উভয় পক্ষের অবস্থা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। প্রথম পক্ষটা অন্ধের মতো, যে দেখতে পায় না এবং বধিরের মতো, যে শুনতে পায় না। অর্থাৎ যে নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে ও অংগ-প্রত্যংগকে তার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন থেকে বিরত ও নিষ্ক্রিয় রাখে। সেই প্রধান উদ্দেশ্যটা হলো মন ও বিবেকের সাথে পারিপার্শ্বিক জগতের দ্রব্যাদির সংযোগ ঘটায়, যাতে মন ও বিবেক বুঝতে ও চিন্তা করতে পারে। এই নিষ্ক্রিয় করে রাখার কারণে সে ওই সব অংগ প্রত্যংগ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তির মতো হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় পক্ষ হলো দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির মতো। ফলে তার চোখ ও কান তাকে পথ দেখায়।

'উভয়ে কি এক রকম?'

সুস্পষ্ট দৃশ্য দেখানোর পর এ প্রশ্নটা রাখা হয়েছে, যার জবাব নিষ্প্রয়োজন। কেননা জবাব সবার জানা।

'তবু কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?'

বস্তুত বিষয়টা এতো সহজ যে, এ 'থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে কোনো চিন্তা ভাবনারই প্রয়োজন হয় না।'

কোরআনের বর্ণনাভংগিতে দৃশ্য তুলে ধরার এ পদ্ধতিটা অত্যন্ত ব্যাপক। এ পদ্ধতি অনুসারে একটা গভীর ও সূক্ষ্ম চিন্তা ভাবনার বিষয়কে এমন সহজ ও স্বতসিদ্ধ বিষয় হিসাবে তুলে ধরা হয়, যে তাতে একটু দৃষ্টি দেয়া ও স্মরণ করার চেয়ে বেশী কিছুর দরকার হয় না।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴿٢٨﴾ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٩﴾ وَيَا قَوْمِ

রুকু ৩

২৫. আমি অবশ্যই নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছি (সে তাদের বললো), আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী, ২৬. (আমার দাওয়াত হচ্ছে,) যেন তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো এবাদাত না করো, (অন্যথায়) আমি আশংকা করছি তোমাদের ওপর এক ভয়াবহ দিনের আযাব এসে পড়বে। ২৭. অতপর তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা– যারা কুফরী করছিলো, বললো, আমরা তো তোমার মধ্যে এর বাইরে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না যে, তুমি আমাদের মতোই একজন মানুষ, আমরা এও দেখতে পাচ্ছি না যে, আমাদের মধ্যেকার কিছু নিম্নস্তরের লোক ছাড়া কেউ তোমার অনুসরণ করছে এবং তারাও তা করছে (কিছু না বুঝে) শুধু ভাসা ভাসা দৃষ্টি দিয়ে, (আসলে) আমরা আমাদের ওপর তোমাদের জন্যে তেমন কোনো মর্যাদাই দেখতে পাচ্ছি না, (মূলত) আমরা তোমাদের মনে করি (তোমরা হচ্ছো) মিথ্যাবাদী। ২৮. সে বললো, হে আমার জাতি! তোমরা কি (একথা) ভেবে দেখেছো, আমি যদি আমার মালিকের (পাঠানো) একটি সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) থাকি, অতপর তিনি যদি আমাকে তাঁর (নবুওতের) বিশেষ রহমত দিয়ে (ধন্য করে) থাকেন, যাকে তোমাদের দৃষ্টির বাইরে রাখা হয়েছে, তাহলে সে (বিষয়টার) ব্যাপারে আমি কি তোমাদের বাধ্য করতে পারি, অথচ তোমরা তা অপছন্দও করো। ২৯. হে আমার জাতি, আমি (যা কিছু তোমাদের বলছি) এর ওপর তোমাদের কাছ থেকে কোনো অর্থ-সম্পদ চাই না, আমার বিনিময় তো আল্লাহ তায়ালার কাছেই আছে এবং যারাই আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে, (গরীব হওয়ার কারণে) তাদের তাড়িয়ে দেয়ার (মানুষ) আমি নই; (কেননা) তাদেরও (একদিন) তাদের মালিকের সাথে সাক্ষাত করতে হবে, বরং আমি তো তোমাদেরই দেখতে পাচ্ছি তোমরা সবাই হচ্ছো এক (নিরেট) অজ্ঞ সম্প্রদায়। ৩০. হে আমার জাতি, আমি যদি

مَنْ يَنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ إِنْ طَرَدْتُّهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَلَآ أَقُوْلُ لَكُمْ
عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ أَقُوْلُ إِنِّيْ مَلَكٌ وَّلَآ أَقُوْلُ
لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْٓ أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ۚ اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ
أَنْفُسِهِمْ ۚ إِنِّيْٓ إِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ
جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيْكُمْ بِهِ
اللّٰهُ إِنْ شَآءَ وَمَآ أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ إِنْ أَرَدْتُّ
أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ أَنْ يُّغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ ۗ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٤﴾ أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ إِجْرَامِيْ وَأَنَا

তোমাদের কথায় গরীবদের তাড়িয়ে দেই, তাহলে (এ জন্যে) আল্লাহ তায়ালা (-র শাস্তি) থেকে আমাকে কে বাঁচিয়ে দেবে; তোমরা কি অনুধাবন করতে পাচ্ছো না? ৩১. আমি তো তোমাদের (কখনো) একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন-ভান্ডার আছে, না আমি গায়ব জানি, না আমি একজন ফেরেশতা, না আমি সেসব লোকের ব্যাপারে– যাদের তোমাদের দৃষ্টি হেয় করে দেখে, এটা বলতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা কখনো তাদের কোনো কল্যাণ দান করবেন না; আল্লাহ তায়ালা নিজেই তা ভালো জানেন, তাদের মনে যা কিছু লুকিয়ে আছে। (আমি যদি এমন কিছু বলি), তাহলে সত্যি সত্যিই আমি যালেমদের দলে শামিল হয়ে যাবো। ৩২. লোকেরা বললো, হে নূহ (এ বিষয়টা নিয়ে) তুমি আমাদের সাথে বাকবিতন্ডা করছো এবং বিতন্ডা তুমি একটু বেশীই করেছো, তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে সে (আযাবের) জিনিসটাই আমাদের জন্যে নিয়ে এসো, যার ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছো। ৩৩. সে বললো, তা তো আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের কাছে আনবেন যদি তিনি চান, আর (তেমন কিছু হলে) তোমরা কখনো তাঁকে ব্যর্থ করে দিতে পারবে না। ৩৪. (আসলে) তোমাদের জন্যে আমার (এ) শুভ কামনা কোনো কাজেই আসবে না, আমি তোমাদের ভালো কামনা করলে (তাও কার্যকর হবে না) যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গোমরাহ করে দিতে চান; (কারণ) তিনিই হচ্ছেন তোমাদের মালিক এবং তাঁর কাছেই তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে; ৩৫. (হে নবী,) এরা কি বলছে, এ (গ্রন্থ)-টা সে (ব্যক্তি নিজেই) রচনা করে নিয়েছে? তুমি বলো, যদি আমি তা রচনা করে থাকি তাহলে এ অপরাধের দায়িত্ব আমার ওপর, (তবে এ মিথ্যা অভিযোগ

بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُجۡرِمُونَ ﴿٣٥﴾ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُۥ لَن يُؤۡمِنَ مِن قَوۡمِكَ إِلَّا
مَن قَدۡ ءَامَنَ فَلَا تَبۡتَئِسۡ بِمَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَٱصۡنَعِ ٱلۡفُلۡكَ بِأَعۡيُنِنَا
وَوَحۡيِنَا وَلَا تُخَٰطِبۡنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِنَّهُم مُّغۡرَقُونَ ﴿٣٧﴾ وَيَصۡنَعُ
ٱلۡفُلۡكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيۡهِ مَلَأٞ مِّن قَوۡمِهِۦ سَخِرُواْ مِنۡهُۚ قَالَ إِن تَسۡخَرُواْ
مِنَّا فَإِنَّا نَسۡخَرُ مِنكُمۡ كَمَا تَسۡخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوۡفَ تَعۡلَمُونَ مَن يَأۡتِيهِ
عَذَابٞ يُخۡزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيۡهِ عَذَابٞ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَمۡرُنَا وَفَارَ
ٱلتَّنُّورُ قُلۡنَا ٱحۡمِلۡ فِيهَا مِن كُلّٖ زَوۡجَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَأَهۡلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ
عَلَيۡهِ ٱلۡقَوۡلُ وَمَنۡ ءَامَنَۚ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٞ ﴿٤٠﴾ ۞ وَقَالَ ٱرۡكَبُواْ فِيهَا
بِسۡمِ ٱللَّهِ مَجۡر۪ىٰهَا وَمُرۡسَىٰهَآۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴿٤١﴾ وَهِيَ تَجۡرِي بِهِمۡ

আরোপ করে) যে অপরাধ তোমরা করছো তা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত। ৩৬. নূহের ওপর ওহী পাঠানো হলো, তোমার জাতির লোকদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া আর কেউই (নতুন করে) ঈমান আনবে না, সুতরাং এরা যা কিছু করছে (হে নবী), তুমি তার জন্যে দুঃখ করো না, ৩৭. তুমি আমারই তত্ত্বাবধানে আমারই ওহীর (আদেশ) দিয়ে একটি নৌকা বানাও এবং যারা যুলুম করেছে তাদের ব্যাপারে তুমি আমার কাছে (কোনো আবেদন নিয়ে) কিছু বলোনা, নিশ্চয়ই তারা নিমজ্জিত হবে। ৩৮. (পরিকল্পনা মোতাবেক) সে নৌকা বানাতে শুরু করলো। যখনই তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা তার পাশ দিয়ে আসা-যাওয়া করতো, তখন (নৌকা বানাতে দেখে) তাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করে দিতো; সে বললো, (আজ) তোমরা যদি আমাদের উপহাস করো (তাহলে মনে রেখো), যেভাবে (আজ) তোমরা আমাদের নিয়ে হাসছো (একদিন) আমরাও তোমাদের নিয়ে হাসবো; ৩৯. অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কার ওপর (এমন) আযাব আসবে যা তাকে (দুনিয়াতে) অপমানিত করবে এবং পরকালে (কঠিন ও) স্থায়ী আযাব কার জন্যে (নির্দিষ্ট)। ৪০. অবশেষে (তাদের কাছে আযাব সম্পর্কিত) আমার আদেশ এসে পৌঁছলো এবং চুলো (থেকে একদিন পানি) উথলে ওঠলো, আমি (নূহকে) বললাম, (সম্ভাব্য) প্রত্যেক জীবের (পুরুষ-স্ত্রীর) এক এক জোড়া এতে উঠিয়ে নাও, (সাথে) তোমার পরিবার-পরিজনদেরও (ওঠাও) তাদের বাদ দিয়ে, যাদের ব্যাপারে আগেই সিদ্ধান্ত (ঘোষিত) হয়েছে এবং (তাদেরও নৌকায় ওঠিয়ে নাও) যারা ঈমান এনেছে; (মূলত) তার সাথে (আল্লাহর ওপর) খুব কম সংখ্যক মানুষই ঈমান এনেছিলো। ৪১. সে (তার সাথীদের) বললো, তোমরা এতে ওঠে পড়ো, আল্লাহর নামে

فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۚ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب
مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ
الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا
الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿٤٣﴾ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ
أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ۖ وَقِيلَ
بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ
أَهْلِي ۚ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ
لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ

এর গতি ও স্থিতি (নির্ধারিত হবে); নিশ্চয়ই আমার মালিক ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ৪২. অতপর সে (নৌকা) পাহাড়সম বড়ো বড়ো ঢেউয়ের মধ্যে তাদের বয়ে নিয়ে চলতে থাকলো। নূহ তার ছেলেকে (নৌকায় আরোহণ করার জন্যে) ডাকলো, সে (আগে থেকেই) দূরবর্তী এক জায়গায় (দাঁড়িয়ে) ছিলো– হে আমার ছেলে, আমাদের সাথে (নৌকায়) ওঠো, (আজ এমনি এক কঠিন দিনে) তুমি কাফেরদের সাথী হয়ো না। ৪৩. সে বললো, (পানি বেশী দেখলে) আমি কোনো পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেবো (এবং) তা আমাকে পানি থেকে বাঁচিয়ে দেবে; নূহ বললো, (কিন্তু) আজ তো কেউই আল্লাহর (গযবের) হুকুম থেকে (কাউকে) বাঁচাতে পারবে না, তবে যার ওপর আল্লাহ তায়ালা দয়া করবেন (সে-ই শুধু আজ রক্ষা পাবে, পিতা-পুত্র যখন কথা বলছিল তখন) হঠাৎ করে একটা (বিশাল) ঢেউ তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলো, (মুহূর্তের মধ্যেই) সে নিমজ্জিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো। ৪৪. (অতপর) বলা হলো, হে যমীন, তুমি (এবার) তোমার পানি গিলে নাও, হে আসমান, তুমিও (পানি বর্ষণ থেকে) ক্ষান্ত হও, অতএব, পানি (-র প্রচন্ডতা) প্রশমিত হলো এবং (আল্লাহর) কাজও সম্পন্ন হলো, (নূহের) নৌকা গিয়ে স্থির হলো জুদী (পাহাড়)-এর ওপর, (আল্লাহর ঘোষণা) ধ্বনিত হলো, যালেম সম্প্রদায়ের লোকেরা (নিশেষিত হয়ে) বহুদূর চলে গেছে। ৪৫. নূহ (তার ছেলেকে ডুবতে দেখে) তার মালিককে ডেকে বললো, হে আমার মালিক, আমার ছেলে তো আমারই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। (আমার আপনজনদের ব্যাপারে) তোমার ওয়াদা অবশ্যই সত্য, আর তুমিই হচ্ছো সর্বোচ্চ বিচারক। ৪৬. আল্লাহ বললেন, হে নূহ, সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে তো হলো এক অসৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি, অতএব তোমার যে বিষয়ের জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে আমার কাছে তুমি কিছু চেয়ো না; আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি,

عِلْمٌ ؕ اِنِّیْۤ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِیْنَ ﴿٤٦﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّیْۤ اَعُوْذُ بِكَ

اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَیْسَ لِیْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِیْ وَتَرْحَمْنِیْۤ اَكُنْ مِّنَ

الْخٰسِرِیْنَ ﴿٤٧﴾ قِیْلَ یٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَیْكَ وَعَلٰۤی اُمَمٍ

مِّمَّنْ مَّعَكَ ؕ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ یَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِیْمٌ ﴿٤٨﴾ تِلْكَ مِنْ

اَنْۢبَآءِ الْغَیْبِ نُوْحِیْهَاۤ اِلَیْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَاۤ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ

قَبْلِ هٰذَا ۛؕ فَاصْبِرْ ۛؕ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِیْنَ ﴿٤٩﴾

নিজেকে কোনো অবস্থায় জাহেলদের দলে শামিল করো না। ৪৭. সে বললো, হে আমার মালিক, যে বিষয় সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই, সে ব্যাপারে কিছু চাওয়া থেকে আমি তোমার কাছে পানাহ চাই; তুমি যদি আমাকে মাফ না করো এবং আমার ওপর দয়া না করো, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। ৪৮. তাকে বলা হলো, হে নূহ (বন্যার পানি নেমে গেছে), এবার তুমি (নৌকা থেকে) নেমে পড়ো, তোমার ওপর, তোমার সাথে যারা আছে তাদের ওপর আমার দেয়া সালাম ও বরকতের সাথে এবং (অন্য) সম্প্রদায়সমূহ! (হাঁ) আমি (আবার) তাদের জীবনের (যাবতীয়) উপকরণ প্রদান করবো, (তবে নাফরমানীর জন্যে) আমার কাছ থেকে মর্মান্তিক শাস্তিও তাদের ভোগ করতে হবে। ৪৯. (হে নবী,) এগুলো হচ্ছে অদৃশ্য জগতের (কিছু) খবর, যা আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছি, এর আগে না তুমি এগুলো জানতে, না তোমার জাতি এগুলো জানতো; অতএব, তুমি ধৈর্য ধারণ করো, কারণ (ভালো) পরিণাম ফল সব সময় পরহেযগার লোকদের জন্যেই (নির্দিষ্ট থাকে)।

তাফসীর

আয়াত ২৫-৪৯

একথা সত্য যে, কেসসা কাহিনী এ সূরার প্রধান উপাদান। কিন্তু কেসসা কাহিনী স্বতন্ত্রভাবে আসেনি; বরং এসেছে যে মহাসত্যগুলো সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে, তার উদাহরণ হিসাবে। এই মহাসত্যগুলো হলো আল্লাহর একত্ব, তাঁর কেতাবের অকাট্যতা, তাঁর রসূলের সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা হিসাবে আগমন, আল্লাহর কাছে তাওবা করা ও ক্ষমা চাওয়ার সুফল এবং তা না করলে আল্লাহর আযাবের আশংকা, সকলের আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার অনিবার্যতা ইত্যাদি, যা সূরার প্রথম ক'টি আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে।

সূরার প্রথমাংশে এ সব মহাসত্যের বিভিন্ন দিক, বিশেষত আকাশ ও পৃথিবীর বিভিন্ন তথ্য, মানুষের মনের অবস্থা এবং হাশরের মাঠের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে এবং সেই অনুপাতে ইতিহাসের বর্ণনাদান ও অতীত জাতিগুলোর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এ দ্বারা যুগ-যুগ-কাল ধরে ইসলাম কিভাবে জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

এ সূরায় বর্ণিত কেসসা কাহিনী ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অনুকরণ করেছে। হযরত নূহ (আ.) দিয়ে শুরু করে, তারপর হূদ (আ.) ও সালেহ (আ.)-এর ঘটনা, অতপর হযরত ইবরাহীম (আ.) ও লুত (আ.)-এর ঘটনা, অতপর হযরত শোয়ায়ব (আ.) ও তারপর হযরত মূসা (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা করেছে।

এ সূরার কেসসাগুলো কিছুটা বিস্তারিত, বিশেষত হযরত নূহ (আ.) ও বন্যার কাহিনী। সূরার শুরুতে যে মৌলিক আকীদা সংক্রান্ত বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে, তা নিয়ে কিছু বিতর্কের বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং তার সমাধান দিতেই রসূল (স.) এসেছেন। সূরা থেকে বুঝা যায় যে, যারা আল্লাহর নবীর আনীত সত্যকে অস্বীকার করেছে, তাদের স্বভাব চরিত্র ও মানসিকতা চিরদিন একই রকম।

সমাজপতিদের বাধাবিপত্তির মুখে নূহ (আ.)—এর অগ্রযাত্রা

'সূরার প্রথম কাহিনী হযরত নূহ (আ.) সংক্রান্ত। এটা ইতিহাসেরও প্রথম ঘটনা।

'আমি নূহকে তাঁর জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম। (সে বলেছিলো) আমি তোমাদের জন্যে প্রকাশ্য সতর্ককারী, যেন তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো গোলামী না করো। অন্যথায় আমি তোমাদের ওপর কঠিন আযাব নাযিল হবার আশংকা করছি।' *(আয়াত ২৫ ও ২৬)*

এ শব্দগুলো এমন যে, স্বয়ং মোহাম্মদ (স.)-ও এই শব্দগুলোই উচ্চারণ করে থাকতে পারেন এবং এগুলোই হয়তো কোরআনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রত্যেক নবীর ক্ষেত্রে এই একই ভাষা ব্যবহার করার উদ্দেশ্য রসূলদের দায়িত্ব ও আকীদা যে একই ধরনের, তা বর্ণনা করা। অবশ্য আসলে এর মাধ্যমে হযরত নূহের বক্তব্যের মর্মটাই তুলে ধরা হয়েছে– হুবহু ভাষা নয়। কেননা হযরত নূহ কোন ভাষায় কথা বলতেন, সেটাই তো আমরা জানি না।

'আমি নূহকে পাঠিয়েছিলাম' এ কথার পরে 'সে তার জাতিকে বলেছিলো'– এ কথাটার এখানে উল্লেখ নেই। কেননা কোরআনের বর্ণনাভংগি এমন যে, তা আসল দৃশ্যটাকেই তুলে ধরে। ফলে তা অতীতের নয়, বরং বর্তমানের দৃশ্যের রূপ ধারণ করে। যেন হযরত নূহ (আ.) তার জাতিকে এখনই বলছেন। আর আমরা সবাই তা শুনছি। অপরদিকে, এটা রসূলের দায়িত্বকে সংক্ষিপ্ত করেছে এবং তাকে একটি মাত্র বক্তব্যের আকারে তুলে ধরেছে। যেটি হলো,

'আমি তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী।'

শ্রোতাদের চেতনায় রেসালাতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে এর চেয়ে শক্তিশালী ভাষায় পেশ করা সম্ভব নয়।

পরবর্তী আয়াতে আর একবার রেসালাতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে! 'যেন তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো গোলামী না করো।' বস্তুত এটা হলো প্রত্যেক রসূলের রেসালাতের মূলকথা ও প্রাথমিক দায়িত্ব। এর কারণ কী? এর জবাব পরবর্তী বাক্যে, 'আমি তোমাদের জন্যে একটা যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির আশংকা করছি।'

এভাবে এই ক্ষুদ্র বাক্যটির মধ্য দিয়ে প্রচার ও ভীতি প্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করা হলো।

'আলীম' শব্দটার অর্থ হচ্ছে যন্ত্রণাদায়ক। 'যন্ত্রণাদায়ক দিন' কথাটা দ্বারা বুঝানো হয়েছে, সেই দিনটাই কষ্টদায়ক।

'তার জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বললো, ... ' *(আয়াত ২৭)*

প্রায় এ ধরনেরই জবাব হয়তো বা কোরায়শরাও রসূল (স.)-কে দিয়েছিলো। একই ধরনের সন্দেহ, একই ধরনের অভিযোগ, একই ধরনের অহংকার এবং একই ধরনের বর্বরোচিত সাড়া!

অজ্ঞ মানুষদের মনে রসূল সম্পর্কে যে ধ্যান ধারণা ছিলো, তা হলো,

'মানুষ এত ক্ষুদ্র ও নগণ্য সৃষ্টি যে, মহান আল্লাহর বার্তা বয়ে আনা তাদের সাধ্যাতীত। এ ধরনের বার্তা বয়ে আনার জন্যে ফেরেশতা বা অন্য কোনো সৃষ্টি প্রয়োজন। এটা আসলে মূর্খসুলভ ধারণা। এ ধারণার জন্ম হয়েছে মানুষের প্রতি আস্থাহীনতা থেকে। অথচ মানুষ হলো পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা, যা অত্যন্ত বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আল্লাহ তায়ালা যখন তাকে খলীফা বানিয়েছেন, তখন তার ভেতরে রসূল হবার মতো যোগ্যতা, ক্ষমতা ও প্রতিভা অবশ্যই দিয়ে থাকবেন। অবশ্য তিনি কার ভেতরে কী গুণাবলী দিয়ে রেখেছেন, সেটা তিনিই ভালো জানেন।

আরো একটা মূর্খজনোচিত ধারণা তারা পোষণ করতো। সেটা হলো, আল্লাহ তায়ালা যখন কাউকে রসূল নিযুক্ত করতেই চান, তখন সংশ্লিষ্ট জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে নিয়োগ করলেই তো পারেন। মানুষের প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা না বুঝার কারণেই এরূপ ধারণা জন্মে। আসলে মানুষকে সাধারণভাবেই পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা করা হয়েছে। তাই খলীফা বা রসূল হবার জন্যে যে গুণাবলী প্রয়োজন, তা যে কোনো সাধারণ মানুষের মধ্যেই থাকতে পারে। এর সাথে প্রতিষ্ঠিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হওয়া, বা ধন সম্পদ ও বিত্ত বৈভবের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা মানুষের মনের সাথে সংশ্লিষ্ট। মানুষের আল্লাহর সাথে কেমন সম্পর্ক রক্ষা করার যোগ্যতা আছে, তার মন মগয কতখানি উন্মুক্ত, ধারালো ও গ্রহণ ক্ষমতা সম্পন্ন, আমানত বা দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা, ক্ষমতা ও ধৈর্য কেমন– ইত্যাদির সাথে এর সম্পর্ক। এ সব গুণের সাথে অর্থ বিত্ত ও পদমর্যাদার কোনো সম্পর্ক নেই।

কিন্তু অন্য নবীদের জাতির নেতৃবর্গের মতোই নূহের জাতির কর্ণধাররাও তাদের পার্থিব আভিজাত্য ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার কারণে এমন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো যে, এই উচ্চতর গুণাবলী তাদের চোখে পড়ছিলো না। তাই তারা রসূলদের সাথে রেসালাতের সংশ্লিষ্টতার যৌক্তিকতা বুঝতে পারছিলো না। তারা মনে করতো, মূলত কোনো মানুষই এ কাজের যোগ্য নয়। আর যদিও বা হয়, তবে তাদের মতো উচ্চস্তরের চিত্ত বৈভব ও পদমর্যাদাধারী ব্যক্তিরাই হতে পারে এর যোগ্য।

'আমরা তো তোমাকে দেখছি আমাদের মতই একজন মানুষ।'...............

এতো গেলো অস্বীকার করার একটা ওজুহাত। পরবর্তীটা আরো জঘন্য!

'আর দেখতে পাচ্ছি, আমাদের কেবল দৃশ্যত নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই তোমাকে অনুসরণ করছে।'

তারা দরিদ্র মানুষদের 'নিম্ন শ্রেণীর মানুষ' মনে করতো। যেমন সমাজের উঁচুস্তরের লোকেরা চিরকাল বিত্তহীন ও ক্ষমতাহীন লোকদেরকে মনে করে থাকে। সম্ভবত প্রাচীনকালে এ ধরনের লোকেরাই নবীদের অনুসারী হতো বেশী করে। কারণ স্বভাবতই তারা সমাজের অভিজাত শ্রেণীর গোলামী থেকে মুক্তি দিতে পারে, এমন দাওয়াতের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়ে থাকে। যে দাওয়াত মানুষকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করে, সেই দাওয়াতের প্রতিই দরিদ্র মানুষের ঝোঁক বেশী হওয়া স্বাভাবিক। দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের রসূলের দাওয়াতে অধিকতর দীক্ষিত হওয়ার আরো একটা কারণ এই যে, অহংকার ও ভোগবাদী মনোভাব তাদের স্বভাব ও মেযাজকে বিকৃত করতে পারে না। স্বার্থপরতা তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। পৌত্তলিক কুসংস্কারের দরুন সৃষ্ট জনগণের উদাসীনতা ও দাসসুলভ মনোভাবের কারণে এক শ্রেণীর মানুষ যে সামাজিক পদমর্যাদা অবৈধভাবে অর্জন করে, আল্লাহর একতায় বিশ্বাসী হলে সেই পদমর্যাদা খোয়া যাওয়ার আশংকা থাকে, কিন্তু দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এই আশংকা থাকে না। পৌত্তলিক কু-সংস্কারের সবচেয়ে মারাত্মক রূপটি হলো, এককভাবে কেবল শরীকবিহীন আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করার পরিবর্তে ধ্বংসশীল ও নশ্বর সত্ত্বাগুলোর দাসত্ব ও আনুগত্য করা। সুতরাং তাওহীদের আন্দোলন আসলে দুনিয়ার সর্বত্র মানবতার যথার্থ স্বাধীনতা ও মুক্তির আন্দোলন ছাড়া আর কিছু নয়। এ জন্যে ফ্যাসিবাদী ও একনায়ক শক্তিবর্গ চিরদিনই তাওহীদের আন্দোলনকে প্রতিরোধ করে থাকে। মানুষকে তা থেকে জোরপূর্বক নিবৃত্ত করে থাকে। তা না পারলে আন্দোলনকে বিকৃত ও বিপথগামী করার চেষ্টা করে এবং তাওহীদের আহবায়কদের

বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে ঘৃণা ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে জঘন্যতম মিথ্যা অপবাদ রটানোর চেষ্টা করে। নেতৃস্থানীয় কাফেররা নূহ (আ.)-কে বললো,

'আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আপাতদৃষ্টিতে যাদেরকে আমাদের মধ্যকার সবচেয়ে নিম্নস্তরের লোক মনে হয়, তারা ছাড়া আর কেউ তোমার অনুসারী হচ্ছে না।'

অর্থাৎ যাদের বিচার বিবেচনা করার ক্ষমতা নেই, তারাই ঈমান আনে। এটাও একটা চিরাচরিত অপবাদ, যা ইসলাম বিরোধী সমাজপতিরা ঈমানদার লোকদের বিরুদ্ধে আরোপ করে থাকে। তারা অপবাদ দিয়ে থাকে যে, ইসলামের দাওয়াত যারা গ্রহণ করে, তাদের বিবেক বুদ্ধি নেই এবং তারা যুক্তি ও বিচার বিবেচনার ধার ধারে না। তারা তাদেরকে অন্ধ অনুসারী বলে গালাগাল করে থাকে এবং অমন নির্বোধসুলভ অন্ধ অনুকরণ তাদের মতো উচ্চ শ্রেণীর ও নেতৃস্থানীয় লোকদের পক্ষে শোভনীয় নয় বলে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করে থাকে। ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ ও ঈমান আনয়ন যখন নিম্ন শ্রেণীর লোকদের কাজ, তখন সে কাজটা তাদের মতো সমাজের ওপরতালার লোকদের পক্ষে বেমানান ও অশোভন।

'আর আমরা তোমাদের মধ্যে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু দেখি না।'

এ কথা দ্বারা দাওয়াতকারীকে তার অনুসারী কথিত নিম্নস্তরের লোকদের সাথে একাকার করে ফেলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য দেখি না, যা তোমাদেরকে আমাদের চেয়ে সৎ বা ন্যায়পরায়ণ প্রমাণ করে। তোমাদের রীতি নীতি যদি ভালো ও সঠিক হতো, তাহলে আমরাই তা আগে গ্রহণ করতাম, তোমরা আমাদের আগে তা গ্রহণ করতে না। আসলে ইসলাম বিরোধীরা এভাবেই তাদের ভ্রান্ত মানদন্ডে সব কিছুর বিচার বিবেচনা ও মূল্যায়ন করে থাকে। তারা মনে করে, যার যতো অর্থ আছে, সে-ই ততো মহৎ, যে যতো উচ্চপদস্থ সে ততো বুদ্ধিমান এবং যে যতো ক্ষমতাশালী সে ততো জ্ঞানী। তাওহীদী আকীদা যখন সমাজ থেকে বিলুপ্ত হয় বা তার প্রভাব যখন দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে যায়, তখনই এ ধরনের মূল্যবোধ ও ধ্যান ধারণা সমাজে বিস্তার লাভ করে। তখন মানব জাতি জাহেলিয়াতের যুগে ও পৌত্তলিক সংস্কৃতির দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এ পর্যায়ে মানব সমাজ যদিও বাহ্যত একটা পরিশীলিত ও মার্জিত বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার পোশাকে আবির্ভূত হয়, কিন্তু এটাকে মানব জাতির অধপতন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।(১) কেননা এ সংস্কৃতি সেই মূল্যবোধকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে, যার বলে মানুষ 'মানুষ' হয়েছে, পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা হবার যোগ্য হয়েছে এবং আকাশ থেকে আল্লাহর বার্তা লাভ করেছে। এ সংস্কৃতি মানুষকে পাশবিক মূল্যবোধের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

'বরং তোমাদেরকে আমরা মিথ্যুক মনে করি।'

এ হচ্ছে কাফেরদের পক্ষ থেকে প্রত্যেক রসূল ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে আরোপিত সর্বশেষ অপবাদ। তবে এ অপবাদটাও তারা তাদের নিজস্ব 'অভিজাত' পদ্ধতিতে আরোপ করেছে। ইতিপূর্বে যেমন ঈমানদারদের নিম্নস্তরের লোক বলার সময় 'আপাতদৃষ্টিতে' কথাটা প্রয়োগ করেছে, তেমনি এখন তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলার সময়ও 'মনে করি' শব্দটা যোগ করলো। কেননা কথা বলার সময় দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের সাথে বলা ওইসব দুর্বল নিম্নস্তরের লোকদেরই কাজ, চিন্তাশীল অভিজাত শ্রেণী তো আর সেই পর্যায়ে নামতে পারেন না।

(১) আজকাল পাশ্চাত্যে মানুষকে মূল্যায়ন করা হয় সে কতো টাকা আয় করে এবং ব্যাংকে তার কতো টাকা সঞ্চিত আছে, তার নিরিখে। এটা আসলে পৌত্তলিক জাহেলী সংস্কৃতি, যা পাশ্চাত্য থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি প্রাচ্যের মুসলিম নামধারীরাও এই সংস্কৃতির গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলেছে।

হযরত নূহের আমল থেকেই এই শ্রেণীর মানুষের এ আচরণ চলে আসছে। তাদের সম্পদের প্রাচুর্য থাকে, কিন্তু মন মগয থাকে শূন্য। গালভরা বুলি আওড়াতে তারা হয় ওস্তাদ। কিন্তু মাথা থাকে বিবেকশূন্য।

ওদিকে নূহ (আ.) এ সব অপবাদ, অহংকার ও উপেক্ষাকে নবীসুলভ ঔদার্য, মহানুভবতা, আত্মবিশ্বাস, সত্যনিষ্ঠা, আল্লাহনির্ভরতা ও আদর্শ সচেতনতা নিয়ে মোকাবেলা করেছেন। তাদের মতো তিনি তিরস্কারের ভাষাও প্রয়োগ করেননি, অপবাদও দেননি, গালভরা বুলিও আওড়াননি এবং নিজের ব্যক্তিসত্ত্বা বা নবীসত্ত্বা নিয়ে তিনি অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম অভিনয়ও করেননি।

'নূহ বললো, হে আমার জাতি, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, ...' (আয়াত ২৮-৩১)

'হে আমার জাতি' এ তিনটি শব্দ দিয়ে তিনি পরম স্নেহ ও মমতামাখা ভাষায় তাদেরকে ডেকেছেন এবং তাদেরকে নিজের মানুষ ও নিজেকে তাদের মানুষ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারপর বলছেন, তোমরা তো এই বলে আপত্তি তুলছো যে, 'তোমাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদেরই মতো একজন মানুষ।' আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ সে কথা সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি আমার প্রতিপালকের সাথে আমার একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকে, যার সম্পর্কে আমি নিশ্চিত, তাহলে তোমাদের মত কী? এই সংযোগ এমন একটা বৈশিষ্ট্য, যা তোমাদেরকে দেয়া হয়নি। শুধু আমাকে রসূল হিসাবে নিয়োগ করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশেষ করুণা হিসাবে দান করেছেন, অথবা আমি রসূল হিসাবে দায়িত্ব পালনের যোগ্য যাতে হতে পারি, সে জন্যে আমাকে কিছু বিশেষ গুণবৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এটাও নিসন্দেহে তাঁর একটা বিরাট অনুগ্রহ। মানুষ হিসাবে তোমাদের মতো একজন হওয়া সত্তেও তিনি যদি আমাকে এই সব গুণবৈশিষ্ট্যে ভূষিত করে থাকেন এবং তা দেখার ও বুঝার ক্ষমতা তোমাদের নেই বলে তোমরা যদি সে সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে থাকো, তাহলে এ ক্ষেত্রে তোমাদের অভিমত কী? আর এরূপ ক্ষেত্রে আমিই বা কেমন করে তোমাদের ওপর জবরদস্তি করতে পারি যে, তোমাদের বিশ্বাস করতেই হবে? 'আমি কি এটা তোমাদের ওপর বলপ্রয়োগে চাপিয়ে দিতে পারি, যদি তোমরা তা মানতে অনিচ্ছুক হয়ে থাকো?' (আয়াত ২৮)

এভাবে অত্যন্ত বিনম্র ভাষায় নূহ (আ.) তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, তাদের অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে এবং তাদের বিবেককে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন, যাতে তারা অদৃশ্য সত্যগুলোকে উপলব্ধি করতে পারে এবং রেসালাতের বৈশিষ্ট্যগুলোকে অনুধাবন করতে পারে, যার সম্পর্কে তারা উদাসীন ছিলো। এভাবেই তিনি তাদেরকে বুঝাচ্ছিলেন যে, নবুওত ও রেসালাত বাহ্যিক জাঁকজমকের ওপর নির্ভরশীল নয়, যা তাদের মানদন্ডে শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি। সেই সাথে তিনি তাদেরকে এই মহান তত্ত্ব বুঝাচ্ছিলেন যে, যে আকীদা বিশ্বাস তিনি প্রচার করেন, তা স্বাধীনভাবে ও স্বেচ্ছায় গ্রহণ করার বিষয়, চিন্তা ধারণা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গ্রহণ করার বিষয়, জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগে চাপিয়ে দেয়ার বিষয় নয়।

'হে আমার জাতি, আমি তোমাদের কাছে এ কাজের বিনিময়ে সম্পদ চাই না। আমার প্রতিদান কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আর যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে আমি তাড়িয়ে দিতে চাই না। তারা তো তাদের প্রভুর সাথেই মিলিত হবে। তবে তোমাদেরকে আমি দেখতে পাচ্ছি একটা অজ্ঞ জাতি।' (আয়াত ২৯)

হযরত নূহ (আ.) বলছেন যে, হে আমার জাতি, যাদেরকে তোমরা নিম্নস্তরের মানুষ মনে করে থাকো, তাদেরকে আমি দাওয়াত দিয়েছিলাম, সেই দাওয়াত তারা গ্রহণ করেছে। মানুষ

ঈমান আনুক– এছাড়া আর কিছু আমি তাদের কাছে প্রত্যাশা করি না। আমি দাওয়াতের বিনিময়ে অর্থ সম্পদ চাই না। তা যদি চাইতাম, তাহলে বিত্তশালীদেরকে আমি ভালোবাসতাম, দরিদ্রদেরকে ভালোবাসতাম না। অথচ ধনী ও দরিদ্র আমার কাছে সমান। যে ব্যক্তি মানুষের অর্থ-সম্পদের লোভ করে না, তার কাছে ধনী ও দরিদ্র সমান হয়ে থাকে।

'আমার প্রতিদান শুধু আল্লাহর কাছে প্রাপ্য।'

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে আমি প্রতিদান কামনা করি না।

'আর যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে আমি তাড়িয়ে দিতে চাই না।'

হযরত নূহের এই জবাব থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, দাম্ভিক সমাজপতিরা হযরত নূহের দরিদ্র ঈমানদার সহচরদেরকে তাঁর কাছ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার আব্দার করেছিলো, যাতে তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনা যায় কিনা বিবেচনা করে দেখতো। তারা ওই সব নিম্নস্তরের মানুষের সাথে এক সাথে বসা ও এক পথে চলার ব্যাপারে উন্নাসিকতা দেখাতো। হযরত নূহ (আ.) সাফ কথা বলে দিলেন, ওদেরকে তাড়িয়ে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওরা ঈমান এনেছে। এখন ওদের ভাগ্য আল্লাহর হাতে। আমার হাতে নয়।

'তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা একটা জাহেল জনগোষ্ঠী।'

অর্থাৎ আল্লাহর মানদন্ডে কোন মূল্যবোধের ভিত্তিতে মূল্যায়ন হয়ে থাকে, সে সম্পর্কে তোমরা অজ্ঞ। আর ধনী হোক গরীব হোক, সকল মানুষের পরিণাম ও ভাগ্য যে আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ, সেটা তোমরা জানো না।

'হে আমার জাতি, ওদেরকে যদি তাড়িয়ে দেই, তাহলে আল্লাহর শাস্তি থেকে আমাকে কে বাঁচাবে? তোমরা কি স্মরণ করবে না? (আয়াত ৩০)

অর্থাৎ আল্লাহর নির্ধারিত মানদন্ড ও মূল্যবোধকে যদি আমি বিকৃত করি, যে জড়বাদী মূল্যবোধগুলোকে অনুসরণ করার জন্যে নয়, বরং সংশোধন করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা আমাকে পাঠিয়েছেন, সেই মূল্যবোধগুলোকেই যদি আমি আল্লাহর মোমেন বান্দাদের ওপর প্রয়োগ করি এবং আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত এই মোমেন বান্দাদের ওপর যদি আমি যুলুম করি, তাহলে আমাকে আল্লাহর আযাব থেকে কে রক্ষা করবে? বস্তুত আল্লাহ ধনী ও গরীব সকলেরই প্রভু। দুর্বলের ও সবলের খোদা। তিনি মানুষকে মূল্যায়ন করেন তোমাদের মূল্যবোধের আলোকে নয়, অন্য মূল্যবোধের আলোকে। তিনি সবাইকে একই দৃষ্টিতে দেখেন এবং একই মানদন্ডে মাপেন। সেটা হচ্ছে ঈমানের মানদন্ড। তাই এই মোমেনদেরকে দেখে তোমরা যতোই নাক সিটকাও, তারা আল্লাহর তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

'তোমরা কি স্মরণ করবে না?'

অর্থাৎ একটা বিকারগ্রস্ত সামাজিক পরিবেশ তোমাদেরকে তোমাদের আসল নির্ভুল স্বাভাবিক মানদন্ডকে ভুলিয়ে দিয়েছে। সেটাকে কি তোমরা স্মরণ করবে না?

পরবর্তী ৩১ নং আয়াতে হযরত নূহ (আ.) নিজের আসল ব্যক্তিত্ব ও রসূলসুলভ বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। পার্থিব ও জড়বাদী মূল্যবোধগুলোকে খন্ডন করে প্রকৃত ও নৈতিক মূল্যবোধগুলোকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যাতে রসূলকে যারা অনুসরণ করতে চায়, তারা যেন একনিষ্ঠভাবেই তাঁর কাছে আসে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তাঁকে যথাযথভাবে অনুসরণ করে।

'আমি তোমাদেরকে বলছি না যে, আমার কাছে আল্লাহর সমস্ত অর্থভান্ডার রয়েছে।'

কাজেই আমি এ দাবীও করি না যে, আমি সম্পদশালী কিংবা অন্যদেরকে সম্পদশালী করার ক্ষমতা রাখি।

'আমি অদৃশ্য তথ্যও জানি না।'

কাজেই কোনো অতিমানবিক ক্ষমতা বা আল্লাহর সাথে রসূলসুলভ সম্পর্কের উর্ধের কোনো সম্পর্ক আমি দাবী করি না।

'আমি নিজেকে ফেরেশতা বলেও দাবী করি না।'

অর্থাৎ তোমাদের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা ও তোমাদের চোখে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করার উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের ধ্যান ধারণা অনুযায়ী মানবীয় গুণের চেয়ে উচ্চতর গুণের অধিকারী বলে নিজেকে দাবী করি না।

'তোমাদের চোখে যারা নানা দোষে দুষ্ট, তাদের সম্পর্কে আমি বলি না যে, আল্লাহ তায়ালা কখনো তাদের কল্যাণ করবেন না।' অর্থাৎ তোমাদের দাম্ভিকসুলভ মানসিকতাকে পরিতৃপ্ত করার জন্যে বা তোমাদের বস্তুবাদী মূল্যায়নকে সমর্থন করার জন্যে এ রকম কথা আমি বলতে প্রস্তুত নই।

'তাদের মনের অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন।'

অর্থাৎ আমাদের কাছে তাদের বাহ্যিক অবস্থাই বিবেচ্য। তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখলে তাদেরকে শ্রদ্ধা করতেই ইচ্ছা হয় এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের কল্যাণ করবেন- এই আশাই জন্মে।

'তাহলে আমি অবশ্যই যালেম হয়ে যাবো।'

অর্থাৎ উল্লেখিত কথাগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটাও যদি আমি বলি, তাহলে যে সত্যকে প্রচার করার জন্যে আমি এসেছি, তার প্রতি আমার অবিচার করা হবে। এতে আমার নিজের ওপরও যুলুম করা হবে এবং নিজেকে আল্লাহর গযবের শিকার করা হবে। আর এতে জনগণের ওপর যুলুম করা হবে এবং জনগণকে আল্লাহ তায়ালা যে মর্যাদা দিয়েছেন, তার চেয়ে নিম্নতর মর্যাদা দেয়া হবে।

এভাবে নূহ (আ.) নিজের ব্যক্তিসত্ত্বা ও নবীসত্ত্বার ওপর থেকে সব রকমের কৃত্রিম ও ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করেন, যা তাঁর জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা রসূল ও রেসালাতের মধ্যে অনুসন্ধান করতো। তিনি তাদের কাছে সকল ভ্রান্ত ধারণামুক্ত হয়ে একমাত্র সেই মহাসত্য নিয়ে উপস্থিত হন, যা কোনো বস্তুবাদী স্বার্থের জোড়াতালির অপেক্ষা রাখে না। এভাবে তিনি তাদেরকে নির্ভেজাল সত্য ও তার শক্তির কাছে ফিরিয়ে দেন, যাতে তারা প্রকৃত সত্যের মুখোমুখি হতে পারে এবং নিজেদের জন্যে একটা হেদায়াতের পথ খুঁজে পায়। রেসালাতের নিরেট সত্যের বিনিময়ে কাউকে খুশী করার চেষ্টা এবং কোনো ধরনের বিকৃতিকে তিনি আদৌ প্রশ্রয় দেন না। এভাবে তিনি পরবর্তীকালের ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলন পরিচালনাকারীদের জন্যে একটা নমুনা এবং ক্ষমতাশালীদের সামনে আসল ও নির্ভেজাল সত্যের শিক্ষা উপস্থাপনের একটা পদ্ধতি শিক্ষা দিচ্ছেন। এ পদ্ধতি আপোষহীন এবং তা কাউকে খুশী করার মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেয় না। এখানে মানুষের প্রতি ভালোবাসার শিক্ষা আছে, কিন্তু মাথা নোয়ানোর শিক্ষা নেই। আদর্শের ব্যাপারে নমনীয়তা নেই।

এ পর্যায়ে এসে নূহ (আ.)-এর জাতির সমাজপতিরা যুক্তির লড়াই-এ জয়লাভের আশা ছেড়ে দেয়। অভিজাত শ্রেণীর চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী তারা অপরাধমূলক আত্মশ্লাঘাবোধে উজ্জীবিত

হয়ে অধীর হয়ে ওঠে। যুক্তির যুদ্ধে হেরে যাবে, এটা তাদের কাছে অসহনীয় লাগে। যৌক্তিক ও স্বাভাবিক প্রমাণের বিশ্বাস করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। তাই সহসাই তারা যুক্তি ছেড়ে হুমকির পথ ধরে।

'তারা বললো, হে নূহ, আমাদের সাথে তুমি অনেক তর্ক করেছো। এখন তুমি যে জিনিসের ভয় দেখাও, তাই নিয়ে এসো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।' (আয়াত ৩২)

আমরা দেখতে পাচ্ছি, অক্ষমতা কিভাবে আস্ফালনে রূপান্তরিত হয় এবং দুর্বলতা কিভাবে সবলতার পোশাকে আবৃত হয়। সত্যের বিজয়ের ভীতি থেকে কখনো কখনো চ্যালেঞ্জ ও বেপরোয়াভাবের জন্ম হয়।

'সুতরাং তুমি যার ভয় দেখাও, সত্যবাদী হয়ে থাকলে তা নিয়ে এসো।'

অর্থাৎ তুমি যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভয় দেখাও, তা নামাও দেখি। কেননা আমরা তোমাকে বিশ্বাসও করি না এবং তোমার হুমকিরও পরোয়া করি না।

কিন্তু এতো প্রত্যাখ্যান ও চ্যালেঞ্জ হযরত নূহ (আ.)-এর নবীসুলভ গুণাবলীকেও করছে না এবং তাঁকে সত্যের দাওয়াত থেকে নিরুৎসাহিত করছে না। তিনি তাঁর জাতিকে তাদের ভুলে যাওয়া সত্য স্মরণ করিয়ে দেন এবং তিনি যে রসূল ছাড়া আর কিছু নন ও তাঁর কাজ সত্যকে পৌঁছে দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়, সে কথা মনে করিয়ে দেন। আযাব নামিয়ে আনাটা তো তাঁর কাজ নয়, আল্লাহর কাজ।

তিনিই সব কিছু নির্ধারণ করেন এবং আযাবকে ত্বরান্বিত বা বিলম্বিত করার যৌক্তিকতা স্থির করেন। আল্লাহ তায়ালা যে নীতি স্থির করেন, সেটাই কার্যকর হয়। তিনি তাকে ঠেকাতেও পারেন না, বদলাতেও পারেন না। তিনি একজন রসূল। তাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সত্যকে প্রকাশ ও প্রচার করে যাওয়া তাঁর কর্তব্য। জাতি তাকে যতোই প্রত্যাখ্যান করুক বা চ্যালেঞ্জ করুক, তাতে তিনি সত্য প্রচার ও দাওয়াত থেকে বিরত থাকতে পারেন না।

'নূহ বললো, আযাব নিয়ে আসা একমাত্র আল্লাহরই কাজ এবং তাঁর ইচ্ছাধীন। তোমরা তাকে প্রতিহত করতে পারো না। আমার উপদেশ তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না .... ' (আয়াত ৩৩ ও ৩৪)

অর্থাৎ আল্লাহর নীতি যখন এটাই দাবী করে যে, তোমাদের বিভ্রান্তির দ্বারা তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন এ নীতি তোমাদের মধ্যে কার্যকর হবেই, তা আমি যতোই উপদেশ দেই না কেন। আমার উপদেশ দ্বারা তোমাদের উপকৃত হওয়ার পথ যে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং রুদ্ধ করেছেন তা নয়, বরং তোমাদের নিজেদের কর্মকান্ডই আল্লাহর নীতি কার্যকরী হওয়ার পথ সুগম করেছে এবং তোমরা বিপথগামী হয়েছ। এ বিপথগামিতার যে ফল আল্লাহ তায়ালা স্থির করে রেখেছেন, তা ঠেকানোর কোনো ক্ষতা তোমাদের নেই। তোমরা সব সময় আল্লাহর মুঠোর মধ্যে রয়েছো এবং তিনিই তোমাদের সর্ব বিষয়ের পরিকল্পক ও পরিণাম নির্ধারক। তাঁর কাছে ফিরে যাওয়া, তাঁর কাছে হিসাব নিকাশ ও কর্মফল প্রাপ্তি থেকে তোমাদের নিস্তার নেই।

'তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে।'

নূহ (আ.)-এর ঘটনার এ পর্যায়ে সহসা এ ঘটনার ওপর কোরায়শদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা ও তার জবাব দেয়া হয়েছে। মোহাম্মদ (স.)-এর সাথে তাদের আচরণের ইতিহাসের নূহের কাহিনীর সাথে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। আর কোরায়শরা একথাও বলতো যে, এ কাহিনী মোহাম্মদেরই (স.) মনগড়া। এ প্রতিক্রিয়ার জবাবেই নূহের কেসসার মাঝখানে ৩৫ নং আয়াতটা নাযিল হয়েছে,

'তবে কি তারা বলে যে, এ কাহিনী মোহাম্মদের বানানো? বলো, এটা যদি আমার মনগড়া হয়ে থাকে, তবে আমার অপরাধের জন্যে আমিই দায়ী। আর তোমাদের অপরাধের দায় থেকে আমি মুক্ত।' (আয়াত ৩৫)

অর্থাৎ হে মোহাম্মদ, তুমি বলো, এটা যদি আমি বানিয়ে থাকি, তাহলে এর দায়দায়িত্ব আমার ওপর বর্তাবে। আর আমি যখন এ কাজটাকে অপরাধ বলেই মনে করি, তখন এ কাজ আমার দ্বারা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। আর তোমরা আমার ওপর বানোয়াট কাহিনী রচনা করার মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে এবং শেরেক ও রসূলের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে যে অপরাধ করেছ, সে ব্যাপারে আমি দায়মুক্ত।

মধ্যবর্তী এ ভিন্ন প্রসংগের আয়াতটি কোরআনের চলমান কাহিনীর সাথে পুরোপুরি সংস্রবহীন নয়। কেননা এটা সমগ্র কাহিনীর সঠিক শিক্ষার একটা অংশ।

মহাপ্লাবন ও ঈমানদারদের উদ্ধার পর্ব

৩৬ নং আয়াত থেকে পুনরায় শুরু হচ্ছে হযরত নূহের কাহিনী। এখানে কাহিনীর দ্বিতীয় দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। নূহ (আ.) কর্তৃক আল্লাহর নির্দেশ লাভের দৃশ্যটা লক্ষ্য করুন,

'নূহের কাছে নির্দেশ এলো যে, তোমার জাতির মধ্য থেকে ইতিমধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না.........। (আয়াত নং ৩৬ ও ৩৭)

কেননা সতর্কীকরণ, দাওয়াত দান ও যুক্তিতর্ক প্রদর্শনের পালা শেষ হয়ে গেছে। যাদের মনে ঈমান আনার যোগ্যতা ছিলো, তারা ইতিমধ্যে ঈমান এনেছে। যারা অবশিষ্ট রয়েছে, তাদের আর সে যোগ্যতা নেই। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা নূহকে ওহী পাঠান। কেননা তিনিই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান রাখেন। কোথায় সম্ভাবনা আছে, আর কোথায় সম্ভাবনা নেই, তা তিনিই ভালো জানেন। কাজেই নিষ্ফল দাওয়াত চালিয়ে যাওয়ার কোনো অবকাশ নেই। আর তারা যতোই কুফরী, চ্যালেঞ্জ, ব্যংগ বিদ্রূপ ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করুক, তাতে হে নূহ, তোমার কিছু আসে যায় না।

'অতএব তারা যা যা করে, তাতে তুমি বিব্রত হয়ো না।'

অর্থাৎ তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না। তুমি তাদের কাজকে গুরুত্ব দিও না। তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর তাদেরও কিছু করণীয় নেই। কেননা তাদের মধ্যে আর কোনো কল্যাণ নেই। কাজেই তাদের ব্যাপারটা বাদ দাও। তাদের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণের সময় সমুপস্থিত।

'আর তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার ওহীর তত্ত্বাবধানে নৌকা বানাও'......... অর্থাৎ আমার নির্দেশ ও তদারকীতে নৌকা বানাও।

'আর যালেমদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো না। কেননা তারা অবশ্য অবশ্যই পানিতে ডুববে।'

অর্থাৎ তাদের ভাগ্য চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে। কাজেই তাদের সম্পর্কে আমাকে আর কিছু বলো না। তাদেরকে হেদায়াত করার দোয়াও করো না। তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়াও করো না। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, তিনি যখনি তাদের সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়লেন, তখন তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেন। তবে হতাশা যে এই ওহীর পরই এসেছিলো, সেটা বোধগম্য। চূড়ান্ত ফয়সালার সময় যখন উপস্থিত হয়, তখন দোয়া নিরর্থক হয়ে যায়।

ঘটনার তৃতীয় দৃশ্য হলো, হযরত নূহের নৌকা বানানোর দৃশ্য। এ সময় তিনি তাঁর জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদেরকে দাওয়াত দেয়া ও তাদের সাথে তর্ক করা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছিলেন।

'নূহ নৌকা বানাচ্ছে। যখনই তাঁর জাতির নেতৃস্থানীয় লোকদের একাংশ তার কাছ দিয়ে যায়, তাকে বিদ্রূপ করে। .... ' (আয়াত ৩৮ ও ৩৯)

এভাবে দৃশ্যটাকে বর্তমান কালের ক্রিয়া দিয়ে প্রকাশ করায় তা অত্যন্ত জীবন্ত ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ দ্বারা আমরা দৃশ্যটাকে আমাদের কল্পনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দেখতে পাই। তিনি নৌকার নির্মাণ কাজ চালাচ্ছেন। আর তার দাম্ভিক ও হঠকারী জাতির লোকেরা দলে দলে তার কাছ দিয়ে যাচ্ছে এবং ব্যংগ বিদ্রূপ ও উপহাস করছে। উপহাস করছে সেই ব্যক্তিকে, যিনি নিজেকে রসূল বলে পরিচয় দিয়ে সবাইকে দাওয়াত দিতেন, দীর্ঘস্থায়ী বিতর্কেও জড়িয়ে পড়তেন। সেই ব্যক্তিই এখন একজন সুতার মিস্ত্রী সেজে নৌকা বানাতে আরম্ভ করেছেন। তারা উপহাস করছে এ জন্যে যে, তারা বাহ্যিক দৃশ্য ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। এর আড়ালে তাঁর কাছে যে ওহী ও নির্দেশ আসে, তা তাদের অজানা। তারা চিরকাল শুধু বাহ্যিক অবস্থাটাই দেখতে ও জানতে পারে এবং আল্লাহর গোপন পরিকল্পনা ও কৌশল সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। কিন্তু হযরত নূহের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ী ও তথ্যাভিজ্ঞ।

তিনি তাদেরকে পূর্ণ নিশ্চয়তা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে জানাচ্ছেন যে, তিনি অচিরেই বিদ্রূপের বদলায় বিদ্রূপ করবেন।

'তোমরা যদি আমাকে বিদ্রূপ কর, তবে তোমাদেরই মতো আমিও তোমাদেরকে বিদ্রূপ করবো।'

বিদ্রূপ করবো এ জন্যে যে, তোমাদের এ বিদ্রূপের পরিণাম কী এবং এর আড়ালে আল্লাহর কী কৌশল রয়েছে, তা তোমরা জানো না।

'তোমরা অচিরেই জানবে, কার ওপর অবমাননাকর ও দীর্ঘস্থায়ী আযাব নাযিল হবে।'

আমাদের ওপর, না তোমাদের ওপর নাযিল হবে, তা যখন সকল গোপন জিনিস প্রকাশিত হবে, তখন জানবে। এরপর শুরু হচ্ছে প্রতীক্ষিত আযাবের আগমনের বর্ণনা।

'অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পড়লো এবং উনুন হতে পানি উথলে উঠতে লাগলো, ... (আয়াত ৪০ ও ৪১)

'উনুন থেকে পানি উথলে ওঠার ব্যাখ্যা নিয়ে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। এসব মতের কোনো কোনটা অনেকটা অলীক কল্পনার মতো মনে হয়। সে সব মতের পেছনে এবং হযরত নূহের গোটা বন্যার কাহিনীর পেছনে ইসরাঈলী মনগড়া বর্ণনার অনেকখানি হাত রয়েছে। অবশ্য আমরা বিনা প্রমাণে এ অজানা ও অদৃশ্য ঘটনা সম্পর্কে কোরআনে যা পাওয়া যায়, তার বাইরে কিছুই বলতে পারি না।

খুব বেশী বললে এতোটুকুই বলতে পারি যে, উনুন থেকে বিশেষত প্রজ্জ্বলিত উনুন থেকে পানি উথলে ওঠা এভাবে হতে পারে যে, তার ভেতর থেকে কোনো ঝর্ণা ফুটে বেরিয়েছিলো। অথবা আগ্নেয়গিরি থেকে কোনো ফোয়ারা ফুটে বেরিয়েছিলো। এই পানি উথলে ওঠা নূহ (আ.)-এর জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো প্রতীক হতে পারে অথবা নিছক আল্লাহর আযাব এসে যাওয়ার সমসাময়িক একটা ঘটনা হতে পারে। একই সাথে মাটির ভেতর থেকে পানি উথলে ওঠা এবং আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে আল্লাহর আযাব বাস্তবায়নের সূচনা হয়ে থাকতে পারে।

এটা যখন ঘটলো, তখন আমি বললাম, 'ওই নৌকায় প্রত্যেক প্রাণীর একজোড়া করে তোলো। ....' যেন প্রত্যেকটা স্তরে হযরত নূহকে এক এক করে যথা সময়ে আদেশ দেয়া হচ্ছিলো। প্রথমে তাকে নৌকা গড়ার আদেশ দেয়া হলো এবং তা তিনি গড়লেন। আয়াতে অবশ্য

এই নৌকা গড়ার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়নি এবং সে উদ্দেশ্য হযরত নূহকে জানানো হয়েছে কিনা তাও বলা হয়নি।

'অবশেষে যখন আমার আযাব এসে পড়লো এবং উনুন থেকে পানি উথলে উঠলো, তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্দেশ দেয়া হলো,

'আমি বললাম, প্রত্যেক প্রাণীর একজোড়া করে নৌকায় তোলো। আর যার যার সম্পর্কে পূর্বাহ্নের কথা কার্যকর হয়েছে এবং যারা ঈমান এনেছে, তাদের ছাড়া আর সবাইকে ধ্বংস করে দিলেন।'

'প্রত্যেক প্রাণীর একজোড়া' সম্পর্কেও মতভেদ ঘটেছে এবং এ বিষয়েও ইসরাঈলী জনশ্রুতির জোরদার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আমরা আয়াতকে নিয়ে যথেচ্ছা কল্পনার ঘোড়া দাবড়ানোর পক্ষপাতী নই। আমার মতে এখানে 'প্রত্যেক প্রাণী' বলতে হযরত নূহের পক্ষে যে যে প্রাণীকে ধরে আনা ও সাথে রাখা সম্ভব ছিলো সেই সেই প্রাণীকেই বুঝানো হয়েছে। এর বাইরে গড়পড়তায় সকল প্রাণীর কথা বলা যুক্তি-নির্ভর ও স্বাভাবিক নয়।

'যাদের ওপর পূর্বাহ্নের কথা কার্যকর হয়েছে, তারা ছাড়া আর সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।' অর্থাৎ আল্লাহর চিরাচরিত নিয়মে যারা আযাবের যোগ্য ছিলো, তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

'আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ছাড়া।'

'আল্লাহ তায়ালা বললেন, তোমরা এই নৌকায় আরোহণ করো, ...' এরপরই আল্লাহর আযাব এলো এবং যারা যারা নৌকায় একত্রিত হলো, তারা বেঁচে গেলো।

'........... আল্লাহর নামে এ নৌকা চলবে এবং থাকবে......................'

এ দ্বারা বুঝা গেলো নৌকার গতি ও স্থিতি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল ছিলো। নৌকাটি আল্লাহর তত্ত্বাবধানে ছিলো। বন্যার ভয়াবহ তান্ডবের মুখে মানুষ কিভাবে নৌকাকে নিয়ন্ত্রণ করবে?

এরপর বন্যার ভয়াবহ দৃশ্যের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে,

'পাহাড়ের মতো প্রকান্ড প্রকান্ড ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে নৌকা চলতে লাগলো .... '(আয়াত ৪২ ও ৪৩)

এখানে দুটো ভীতি একত্রিত হয়েছে। একটা নীরব নিথর প্রকৃতিতে, অন্যটা মানবীয় মনে।

বেঈমানীর কারণে নূহের ছেলের করুণ পরিণতি

এহেন ভয়ংকর মুহূর্তে নূহ (আ.) দেখতে পান, তার এক ছেলে তাঁর সাথে নেই এবং তাঁর কাছ থেকে দূরে রয়েছে। এমতাবস্থায় তাঁর মধ্যে পিতৃস্নেহ জেগে ওঠে এবং বিদ্রোহী ছেলেকে ডাকতে থাকেন,

'হে আমার ছেলে, আমাদের সাথে নৌকায় আরোহণ করো। কাফেরদের দলভুক্ত হয়ো না।'

কিন্তু অবাধ্য ছেলে স্নেহশীল পিতার মর্যাদা কিভাবে দেবে এবং দর্পিত তারুণ্য আযাবের ভয়াবহতাকে কিভাবে উপলব্ধি করবে?

'সে বললো, আমি অচিরেই এমন এক পাহাড়ে আরোহণ করবো, যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে?'....

এরপর দুর্যোগের ভয়াবহতাকে অনুধাবনকারী পিতা ছেলের উদ্দেশ্যে সর্তকবাণী উচ্চারণ করেন,

'তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা নিজে যাকে অনুগ্রহ করেন, সে ছাড়া আর কেউ আজ আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই পাবে না।' ....

অর্থাৎ পাহাড় পর্বত যাই বলো না কেন, আজ আল্লাহর দয়া ছাড়া কোন কিছুই কাউকে রক্ষা করবে না।

মুহূর্তের মধ্যে দৃশ্য পাল্টে যায়। মহা প্লাবন সব কিছুকে গ্রাস করে ফেলে।

পিতা পুত্রের মাঝে তরংগ আড়াল হয়ে পড়লো এবং সে ডুবে গেলো।'

হাজার হাজার বছর পর আজও আমরা এ ঘটনার বিবরণ রুদ্ধশ্বাসে পড়তে গিয়ে এমন আতংকিত হয়ে যাই, যেন দৃশ্যটা এখনই স্বচক্ষে দেখছি। নৌকা পাহাড় সমান ঢেউয়ের ওপর দিয়ে চলছে, স্নেহকাতর নূহ (আ.) ছেলেকে একের পর এক ডেকেই চলেছেন। আর তাঁর দর্পিত পুত্র তাঁর ডাক উপেক্ষা করে চলেছে। সহসা এক ভয়ংকর তরংগ এসে এক মুহূর্তেই সব কিছুর মীমাংসা করে দেয়। যেন কোনো ডাকও আসেনি, কেউ তাতে সাড়াও দেয়নি!

এই দুর্যোগ পিতা ও পুত্রের মাঝে যতোটা মানব মনকে ভারাক্রান্ত করেছিলো, ঠিক ততোটাই প্লাবিত করেছিলো পৃথিবীকে। অন্য কথায়, মানবীয় মনে ও নিস্তব্ধ প্রকৃতিতে তা একই ধরনের ভীতির স্বাক্ষর রেখেছিলো। এটা কোরআনের এক উল্লেখযোগ্য শৈল্পিক সৌন্দর্য।

এরপর দুর্যোগ থেমে গেলো। নীরবতা নেমে এলো পৃথিবীতে। সব কিছুর ফয়সালা হয়ে গেলো এবং স্থিতিশীলতা বিরাজ করতে লাগলো।

'বলা হলো, হে পৃথিবী, তোমার পানিকে শুষে নাও এবং হে আকাশ, বৃষ্টি থামাও। .... (আয়াত ৪৪)

অর্থাৎ পৃথিবী তার পেটের ভেতরে পানিকে শুষে নিলো এবং তার পিঠে আর কোনো পানি রইলো না।

'অতপর নৌকাটা জুদী পাহাড়ের ওপর থামলো।'

অর্থাৎ স্থায়ীভাবে থামলো।

'আর বলা হলো, যালেমদের ওপর অভিসম্পাত হোক!'

এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটি দ্বারা তখনকার পরিস্থিতির গভীরতম দৃশ্য অংকন করা হয়েছে। 'বলা হলো' এরূপ পরোক্ষ ভাষায় বলায় কে বললো তার উল্লেখ করা হলো না।

অর্থাৎ তারা বিশ্বের প্রাণীকূলের জীবন থেকে, আল্লাহর দয়া ও করুণা থেকে এবং মানব জাতির স্মৃতি থেকে দূর হয়ে ধুয়ে মুছে যাক, আর কখনো তাদেরকে স্মরণ করা হবে না।

দুর্যোগ থেমে যাওয়া, ভীতি দূর হয়ে যাওয়া ও নৌকা জুদী পর্বতে থামার পর নূহের অন্তরে পুনরায় পিতৃস্নেহ জেগে উঠলো।

'নূহ তার প্রভুকে ডেকে বললো, হে আমার প্রভু, আমার ছেলে তো আমারই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। আর তোমার ওয়াদা সত্য। তুমি বিজ্ঞতম নিষ্পত্তিকারী।' (আয়াত ৪৫)

অর্থাৎ আমার পরিবারকে তুমি রক্ষা করবে বলে ওয়াদা করেছিলে। তোমার ওয়াদা তো ভংগ হবার কথা নয়। আমার ছেলে তো আমার পরিবারভুক্ত। আর তুমি বিজ্ঞতম নিষ্পত্তিকারী। কাজেই তোমার কোন ফয়সালা তো অযৌক্তিক হতে পারে না।

তিনি নিজের পরিবারের মুক্তি চেয়েই একথা বলেছিলেন। তাঁর ওয়াদায় ও ফয়সালায় কী যুক্তি, তা জানতে চেয়েছিলেন।

অতপর তাঁর কাছে যে জবাব এলো, তাতে তাঁর ভুলে যাওয়া একটা বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো। আল্লাহর চোখে, আল্লাহর দ্বীনে ও তাঁর মানদন্ডে পরিবার রক্ত সম্পর্কীয় জনসমষ্টির নাম

নয়, বরং আদর্শ ও আকীদা সংক্রান্ত জনসমষ্টির নাম। হযরত নূহের এই ছেলে মোমেন ছিলো না। কাজেই সে তার মতো একজন নবীর পরিবারের সদস্য হতে পারে না। এ জবাব দেয়া হয়েছে অত্যন্ত দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ভাষায় এবং হুমকি ও ভর্ৎসনার সুরে।

'আল্লাহ বলেন, হে নূহ, সে তো তোমার পরিবারের লোক নয়। সে অসৎ কর্মশীল। ....' (আয়াত ৪৬)

এটা ইসলামের অন্যতম প্রধান মূলনীতি। আকীদা বিশ্বাসের ঐক্য দু'জন মানুষের মধ্যে এমন বন্ধন ও এমন ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি করে, যা রক্ত সম্পর্ক বা অন্য কোনো আত্মীয়তা করতে পারে না।

'সে তোমার পরিবারের লোক নয়। সে অসৎ কর্মশীল।'

কাজেই সে ঔরসজাত সন্তান হলেও সে তোমার কেউ নয় এবং তুমিও তার কেউ নও। কেননা প্রথম ও আসল যোগসূত্র ও বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। এরপর আর কোন আত্মীয়তার বন্ধন থাকতে পারে না। আর যেহেতু নূহ আল্লাহর কাছে এমন একটা ওয়াদা পালনের জন্যে দোয়া করেছিলেন, যা পালিত হয়নি বলে তাঁর মনে হচ্ছিলো। তাই এর জবাবে কিছুটা হুমকি ও তিরস্কারের সুর ধ্বনিত হয়েছে,

'অতএব, তুমি যা জানো না, তা আমার কাছে চেও না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যেন অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেও না।'

অর্থাৎ তুমি আত্মীয়তার বন্ধন বা আল্লাহর ওয়াদার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাও, এ আশংকায় তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি। আসলে আল্লাহর ওয়াদা তার যথার্থ ব্যাখ্যা অনুসারে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং তোমার পরিবারের যথার্থ সদস্য যারা, তারা সত্যই মুক্তি পেয়েছে।

এ পর্যায়ে একজন যথার্থ মোমেন বান্দা হিসাবে হযরত নূহ (আ.) ভয় পেয়ে যায় যে, তিনি তাঁর প্রতিপালকের ব্যাপারে কোনো পদস্খলন করে বসলেন কিনা। তাই তার কাছে ক্ষমা ও আশ্রয় চান।

সে বললো, হে আমার প্রতিপালক, আমি যা জানি না, তা তোমার কাছে চাওয়া থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাই। .... (আয়াত ৪৭)

তৎক্ষণাৎ নূহ (আ.) আল্লাহর রহমত পেয়ে ধন্য হন, তাঁর মন শান্ত হয়ে যায়। এবং তিনি ও তাঁর সৎ বংশধররা কল্যাণ লাভ করেন। আর অন্যরা পায় মর্মন্তুদ আযাব।

'বলা হলো, হে নূহ! তুমি ও তোমার সঙ্গীদের একাংশ আমার পক্ষ থেকে শান্তি ও বরকত সহকারে মাটিতে নেমে পড়। অন্যদেরকে আমি সুখ ভোগ করাবো। অতপর আমার পক্ষ তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবও ভোগ করবে।' (আয়াত ৪৮)

নূহের প্লাবন সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের জনশ্রুতি

'কাহিনীর এ শেষ আয়াতটিতে নূহ (আ.) ও তাঁর ঈমানদার বংশধরের জন্যে মুক্তি ও সুসংবাদ এবং তাদের মধ্যে যারা দুনিয়ালোলুপ তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে। সূরার শুরুতেও ছিলো সুসংবাদ ও হুশিয়ারী। আর কাহিনীর মধ্য দিয়ে সেটাই বাস্তব রূপ লাভ করলো।

এ জন্যেই সবার শেষে এভাবে মন্তব্য করা হয়েছে,

'এ হচ্ছে অদৃশ্য জগতের ঘটনাবলী, যা আমি তোমার কাছে ওহীযোগে পাঠিয়েছি। তুমি ও তোমার জাতি ইতিপূর্বে এগুলো জানতে না। সুতরাং ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই শেষ ফল সংযমীদের জন্যে।' (আয়াত ৪৯)

এ মন্তব্য থেকে জানা যায় যে, এ সূরায় যে সব কেসসা কাহিনী রয়েছে, তার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ,

* ওহীর প্রকৃত স্বরূপ, যা মোশরেকরা অস্বীকার করে থাকে। এ সব কেসসা-কাহিনী অজানা ও অদৃশ্য জগত থেকে আগত। রসূল (স.) ও তাঁর জাতি এগুলো জানতো না এবং এগুলোর তেমন পরিচিতিও ছিলো না। এগুলো শুধু সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর কাছ থেকে ওহী যোগেই এসেছে।

* হযরত নূহ, যিনি হযরত আদমের পর মানব জাতির দ্বিতীয় আদিমতম পূর্ব পুরুষ, তাঁর আমল থেকেই ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাস একই ছিলো এবং আজও একই রয়েছে।

* নবীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের আপত্তি ও অভিযোগসমূহের স্বরূপ উদঘাটন, যা তারা বারবার উল্লেখ করে থাকে। তাদের কাছে আগত নিদর্শনাবলী, অকাট্য যুক্তি প্রমাণাদি ও শিক্ষাসমূহ একটি প্রজন্মের কাছে ভ্রান্ত প্রমাণিত হলেও অন্য প্রজন্মের কাছে তার গ্রহণযোগ্য হওয়ায় কোনো বাধা থাকে না।

* সুসংবাদ ও সতর্কবাণীসমূহের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ, যেমন নবীরা সুসংবাদ ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করে থাকেন। এটা একটা ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ।

* ইতিহাস ও প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম, যা কখনো লংঘিত হয় না এবং যার ব্যাপারে কোনো পক্ষপাতিত্ব বা স্বজনপ্রীতি হয় না। 'সংযমীদের জন্যেই শেষ পরিণতি ও শেষ সাফল্য। তারাই মুক্তি পায় ও স্থলাভিষিক্ত হয়।

* এক ব্যক্তির সাথে আরেক ব্যক্তির এবং এক প্রজন্মের সাথে আরেক প্রজন্মের প্রকৃত যোগসূত্র হলো আকীদা বিশ্বাস। এ আকীদা-বিশ্বাসই সকল মোমেনকে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে।

হযরত নূহের আমলের এই প্লাবন সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন জাগে, এ প্লাবন কি দুনিয়াজোড়া ছিলো, না শুধু হযরত নূহের অধ্যুষিত এলাকার মধ্যে সীমিত ছিলো? হযরত নূহ কোন দেশে বাস করতেন? সেই দেশের সীমা প্রাচীন আমলেই বা কী ছিলো, আধুনিক যুগেই বা কী? এ সব প্রশ্নের আনুমানিক জবাব ছাড়া সঠিক জবাব দেয়া সম্ভব নয়। ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে এর যে জবাব পাওয়া যায়, তার কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। এ সব বর্ণনা কোরআনের কেসসা কাহিনীর প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ণয়েও কোনো সাহায্য করে না।

তবে কোরআনের আয়াতের ভাষা থেকে বাহ্যত মনে হয়, সে যুগে হযরত নূহের জাতিই ছিলো সারা বিশ্বের সমগ্র মানব গোষ্ঠী, আর তারা পৃথিবীর যে এলাকায় বাস করতো সেটাই ছিলো তৎকালীন একমাত্র মনুষ্য অধ্যুষিত ভূখন্ড। প্লাবন ওই সমগ্র এলাকাটা জুড়েই সংঘটিত হয়েছিলো এবং নৌকার আরোহীরা ছাড়া এ এলাকার সমগ্র সৃষ্টিই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।

এ ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে সময়ে সংঘটিত হয়েছিলো, সেটা এতো প্রাচীন যুগ, যার সম্পর্কে ইতিহাস কিছুই জানে না। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের এ ঘটনা সম্পর্কে আমাদের জানার একমাত্র নির্ভরযোগ্য সূত্র হলো ওহী। এ সূত্র থেকে আমরা এর চেয়ে বেশী কিছু জানতে পারি না। 'ইতিহাস' সেদিন কোথায় ছিলো? ইতিহাস একটা সাম্প্রতিক জিনিস, যা মানবেতিহাসের খুব সামান্য সংখ্যক ঘটনাই সংরক্ষণ করে। আর যেটুকু সংরক্ষণ করে, তাতেও ভুল নির্ভুল, সত্য মিথ্যা উভয় রকমের তথ্যের সংমিশ্রণ রয়েছে। ওহীর মাধ্যমে আমরা যেটুকু জানতে পারি তা সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনোই অবকাশ নেই। এ নিয়ে প্রশ্ন তোলার অর্থই হলো প্রকৃত ঘটনার বিকৃতি ও অধপতন। যার মন মগযে ইসলামের মূলমন্ত্র যথাযথভাবে বদ্ধমূল হয়েছে, সে এ ধরনের বিকৃতি ও অধপতনের শিকার হতে পারে না।

বেশ কিছু সংখ্যক জাতির পৌরাণিক ইতিহাসে ও জনশ্রুতিতে এমন একটা প্লাবনের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা অতি প্রাচীনকালে সংঘটিত হয়েছিলো এবং তার কারণ ছিলো ওই সময়কার মানব প্রজন্মের পাপ ও আল্লাহদ্রোহিতা। বনী ইসরাঈলের 'আদিম পুস্তক' নামক পুস্তকে যে সব প্রাচীন উপাখ্যান সন্নিবেশিত হয়েছে, তাতেও নূহ (আ.)-এর প্লাবনের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এ সব কাহিনী ও উপাখ্যানকে কোরআনে বর্ণিত প্লাবন কাহিনীর পাশাপাশি রাখা চলে না। এ সব অনির্ভরযোগ্য ও অজানা সূত্রে বর্ণিত কেসসা কাহিনীকে কোরআনের সত্য কাহিনীর সাথে মিলিয়ে একাকার করা বাঞ্ছনীয় নয়। যদিও বিভিন্ন জাতির জনশ্রুতিতে এ সব কেসসা কাহিনীর উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, ওই সব জাতি যে এলাকায় বসবাস করতো, সেই সব এলাকায় ওই প্লাবন সংঘটিত হয়েছিলো। আর না হোক, এটুকু প্রমাণিত হয় যে, ওই প্লাবন থেকে যারা বেঁচে গিয়েছিলো, তাদের বংশধররা যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তখন তাদের মুখে মুখে ওই প্লাবনের কাহিনী বিস্তার লাভ করেছে।

ইহুদীদের ধর্মীয় পুস্তকাদির সমন্বয়ে 'আমিদ পুস্তক' এবং খৃষ্টানদের বাইবেলসমূহের সমন্বয়ে 'আধুনিক পুস্তক' নামে যে 'পবিত্র পুস্তক' রয়েছে, তা হুবহু আল্লাহর কাছ থেকে নাযিল হওয়া পুস্তক নয়। ইহুদীদের গণ গ্রেফতারীর সময় ব্যাবিলনবাসীর হাতে তাওরাতের মূল গ্রন্থ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিলো। এর প্রায় পাঁচশো বছর পর হযরত ঈসার (আ.) জন্মের পূর্বে হযরত ওযায়ের (আ.) ওই গ্রন্থকে পুনর্লিপিবদ্ধ করেন এবং তাতে তাওরাতের অবশিষ্টাংশ সন্নিবেশিত করেন এই গ্রন্থ নিছক সংকলন ছাড়া আর কিছু নয়। ইনজীল বা বাইবেলের অবস্থাও তদ্রূপ। হযরত ঈসার তিরোধানের প্রায় একশো বছর পর তাঁর শিষ্যরা নিজেদের স্মৃতি থেকে এগুলোকে সংকলন করেন। তারপর তাতে আরো বহু কল্পকাহিনী সংযোজিত হয়। তাই ওই পুস্তকগুলোর সব কটির কাছ থেকে কোনো একটা বিষয়েও নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত কোনো তথ্য পাওয়ার আশা করা যায় না।

এবার এ ঘটনার বিবরণ থেকে আমরা এর শিক্ষা আলোচনা করতে চাই। এর শিক্ষা একটা নয়, অনেক। হযরত নূহের কাহিনী থেকে হূদের কাহিনীতে প্রবেশ করার আগে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করবো।

নূহ (আ.)-এর এ জাতি জাহেলিয়াত, কুফরী, বাতিলপ্রীতি এবং এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের আহ্বান সম্বলিত ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতায় কতোখানি কট্টর, হঠকারী ও একগুঁয়ে ছিলো, তা তো আমরা দেখতেই পেলাম। নূহের (আ.) এ জাতি হযরত আদম (আ.)-এর বংশধর। ইতিপূর্বে আমরা সূরা আরাফ ও সূরা বাকারা থেকে জানতে পেরেছি যে, আদম (আ.) বেহেশত থেকে পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন শুধু এখানে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্যে। এই দায়িত্বটা পালন করার জন্যেই আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং এর জন্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা দান করেছিলেন। আর এ যোগ্যতা ও দক্ষতা লাভ করার আগে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তাঁর পদস্খলন থেকে তাওবা করা ও তাওবা করার পদ্ধতি ও ভাষা শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেই সাথে তিনি আদম (আ.) ও তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে এ মর্মে অংগীকারও নিয়েছিলেন যে, ভবিষ্যতে আল্লাহর কাছ থেকে যে নির্দেশ ও বিধান আসবে, তার অনুসরণ করবে এবং তাঁর বংশধরদের চিরশত্রু শয়তানের অনুসরণ করবে না।

সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আদম (আ.) যখন পৃথিবীতে নামেন, তখন তিনি একজন পরিপূর্ণ মুসলমান এবং আল্লাহর হেদায়াতের অনুসারী ছিলেন। এ ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ নেই যে, পৃথিবীতে মানুষ সর্বপ্রথম যে আকীদা ও আদর্শের সন্ধান পেয়েছিলো, সেটা ইসলাম ছাড়া আর কিছু ছিলো না। সে সময়ে ইসলাম ছাড়া আর কোনো আকীদা ও ধর্মের অস্তিত্ব ছিলো না। হযরত নূহের এ জাতির উদ্ভব আদম (আ.)-এর বংশধরের কতো প্রজন্ম পরে

ঘটেছিলো, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। এ জাতি যখন জাহেলিয়াতে লিপ্ত হয়েছিলো, সে কথা এ সূরাতেও বর্ণনা করা হয়েছে, তখন এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এ জাহেলিয়াত তার সমস্ত খারাপ উপসর্গগুলো যথা পৌত্তলিকতা, পৌত্তলিকতা থেকে উদ্ভূত অপসংস্কৃতি, তার ঐতিহ্য ও মতাদর্শসহ মানব জাতির ওপর চড়াও হয়েছে। মানব জাতি ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে এ জাহেলিয়াতকে গ্রহণ করেছে শয়তানের কুপ্ররোচনার প্রভাবে এবং মানব মনে সৃষ্ট জন্মগত ফাঁক ফোকর দিয়ে। এ সমস্ত ফাঁক ফোকর দিয়ে আল্লাহর দুশমন ও মানুষের দুশমন শয়তানের অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে। আর সেটা ঘটে তখনই, যখন মানুষ আল্লাহর নির্দেশ পালনে শৈথিল্য দেখায় এবং ছোট বড় সব কাজে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো আদেশ পালন করতে লেগে যায়। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে কিছুটা নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, এর দ্বারা আসলে তার পরীক্ষা নেয়া হয়। এ স্বাধীনতাটুকু দ্বারা সে আল্লাহর বিধানের অনুসরণও করতে পারে, যার ফলে তার আজন্ম শত্রু শয়তানের ওয়াস ওয়াসা তার ওপর কার্যকর হয় না, আবার এ দ্বারা সে আল্লাহর বিধান থেকে বিপথগামী হয়ে অন্যের বিধানেরও অনুসারী হতে পারে। এ ধরনের বিপথগামিতা প্রথমে অতি ক্ষুদ্র আকারেও ঘটতে পারে, অতপর শয়তান সেই সুযোগ গ্রহণ করে তাকে সেই চরম জাহেলিয়াতের পথে টেনে নিয়ে যেতে পারে, যেখানে আদম (আ.)-এর বংশধররা বহু যুগ পরে এবং বহু প্রজন্মের পরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। অথচ হযরত আদম (আ.) নিজেও একজন মুসলিম নবী ছিলেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় নিজের বংশধরকেও তিনি ইসলামের পথে পরিচালিত করেছেন।

বস্তুত পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে আকীদা ও আদর্শের উদ্ভব ঘটেছে, তা ছিলো এক আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর একক প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত ইসলাম। আর এ সত্য আমাদেরকে তথাকথিত 'তুলনামূলক ধর্মতাত্ত্বিক' প্রগতিশীলদের উদ্ভাবিত এ তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করতে উদ্বুদ্ধ করে যে, মানব জাতির সূচনাকালেই তাওহীদের উদ্ভব ঘটেনি, বরং শুরুতে পৌত্তলিকতা, একাধিক খোদার পূজা, প্রকৃতি পূজা, আত্মাপূজা, সূর্য পূজা ও নক্ষত্র পূজা ইত্যাদি প্রচলিত ছিলো। পরে আকীদা বিশ্বাসের পর্যায়ক্রমিক বিবর্তন ঘটতে ঘটতে সর্বশেষে তাওহীদ তথা এক আল্লাহর এবাদাতের ধারণা জন্ম লাভ করেছে। তাদের এ তত্ত্ব সকল ঐশী ধর্মমত, ওহী ও রেসালাতের ভিত্তিমূল ধ্বংস করে দেয়। এ তত্ত্ব এটাই প্রমাণ করে যে, ধর্ম মানুষের তৈরী এবং যুগ যুগ ধরে মানুষের চিন্তায় যে বিবর্তন ঘটেছে, সেই বিবর্তনেরই সর্বশেষ স্তরের ফসল হলো তাওহীদবাদী ধর্ম ইসলাম।

ইসলামের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনকারী লেখকদের কারো কারো পদস্খলন ঘটেছে। ধর্মের ইতিহাস নিয়ে গবেষণাকারীরা যে সব মতবাদ উদ্ভাবন করেছে, তারা অবচেতনভাবে তারই অনুসরণ করে। তারা যদিও যথেষ্ট দরদ ও আবেগের সাথে ইসলামের পক্ষ সমর্থন করে, কিন্তু কার্যত ইসলামের সেই মৌলিক আকীদা বিশ্বাসকে ধ্বংস করে দেয়, যা কোরআনে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। কোরআন স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে, হযরত আদম (আ.) ইসলামের আকীদা নিয়েই পৃথিবীতে এসেছিলেন। আর আদম (আ.)-এর বংশধরদের মধ্যে যাদেরকে শয়তান ইসলাম থেকে পৌত্তলিক জাহেলিয়াতের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো, হযরত নূহ (আ.) সেই ইসলামই পুনরায় তাদের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এ ইসলাম ছিলো শতকরা একশো ভাগ তাওহীদভিত্তিক। হযরত নূহের পর এ ধারা অব্যাহত থাকে। লোকেরা ইসলাম ছেড়ে জাহেলিয়াতের অনুসারী হতো। আর নবীরা সবাই তাওহীদভিত্তিক ইসলাম নিয়ে আসতেন। আল্লাহর কাছ থেকে আগত এ আকীদায় কখনো কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, পরিবর্তন ঘটেছে শুধু ওই আকীদার সাথে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধানে। জাহেলী আকীদা বিশ্বাসে যে পরিবর্তন সূচিত হতে

দেখা যায়, তার অর্থ এ নয় যে, জনগণ মূল আকীদায় পরিবর্তন হতে দেখে ইসলামের দিকে ঝুঁকেছে। বরং এর অর্থ এই যে, তাওহীদী আকীদা প্রত্যেক নবীর হাতে বাস্তবায়িত হবার পর পরবর্তী বংশধরের মধ্যে তার কিছু প্রভাব রেখে যান। এমনকি পরবর্তী বংশধরগুলো বিপথগামী হয়ে গেলেও সেই প্রভাব পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারে না। ফলে জাহেলী আকীদার উৎকর্ষ সাধিত হতে হতে তা এক সময় আসল তাওহীদী আকীদার কাছাকাছি চলে যায়। কিন্তু আসল তাওহীদী আকীদা মানবেতিহাসে যাবতীয় পৌত্তলিক আকীদার চেয়েও প্রাচীন। এ আকীদা প্রথম দিন থেকেই পূর্ণাংগ আকীদা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা তার উৎস কোনো মানবীয় চিন্তাধারা ও বিবর্তনশীল আকীদা নয়। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে এবং প্রথম দিন থেকেই তা পূর্ণাংগ ও নির্ভুল হয়ে থাকে।

এ হলো কোরআনে ঘোষিত ইসলামী আকীদা এবং এর ওপরই সমগ্র ইসলামী চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে। সুতরাং কোনো মুসলিম গবেষক যখন ইসলামের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে, তখন তার পক্ষে কোরআনে বর্ণিত এই সুস্পষ্ট আকীদা থেকে সরে আসার এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের গবেষকরা যে সব মতবাদ উদ্ভাবন করেছেন তাকে গ্রহণ করার কোনোই অবকাশ থাকে না।

ইসলামের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে এক শ্রেণীর লেখকের কিরূপ পদস্খলন ও ভুলত্রুটি সংঘটিত হয়েছে, তার বিশদ তালিকা দেয়া এখানে সম্ভব নয় তবে এর একটামাত্র নমুনা তুলে ধরবো। অধ্যাপক আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ তাঁর লেখা গ্রন্থ 'আল্লাহ'-এর আকীদা সংক্রান্ত অধ্যায়ে লিখেছেন,

'মানুষ জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পে যেমন উন্নতি করেছে, তেমনি আকীদা বিশ্বাসেও উন্নতি করেছে।'

'তার প্রাথমিক সময়কার আকীদা বিশ্বাস তার প্রাথমিক জীবনের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিলো। তার জ্ঞান বিজ্ঞান এবং শিল্পও ছিলো তদ্রূপ। প্রাথমিক যুগের বিজ্ঞান ও শিল্প প্রাথমিক যুগের এবাদাত ও ধর্মের চেয়ে উন্নত মানের ছিলো না। আর এর কোনো একটাতেও বাস্তবতার উপাদান অন্যটাতে বাস্তবতার উপাদানের চেয়ে বেশী নয়।

'জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পের জন্যে মানুষ যেমন চেষ্টা সাধনা করে, ধর্মের জন্যে তার তার চেয়েও কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী চেষ্টা সাধনা করা উচিত।'

'কেননা যে বিবিধ জিনিস কখনো বিজ্ঞানের এবং কখনো শিল্পের আলোচ্য বিষয় হয়ে থাকে, তার বাস্তবতার চেয়ে বিশ্ব প্রকৃতির বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা অনেক বেশী কষ্টসাধ্য ও সুদূর পরাহত।'

'সূর্যকে মানুষ স্বচক্ষেই দেখে এবং সমগ্র শরীর দিয়েই উপলব্ধি করে। তথাপি এই দেদীপ্যমান সূর্যের প্রকৃত পরিচয় মানুষের অজানা রয়ে গেছে। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত পন্ডিতেরা বলে এসেছেন, পৃথিবীর চারপাশে সূর্য ঘোরে আর সূর্যের গতিবিধি ও তার গ্রহণাদির ব্যাখ্যা দিয়ে এসেছেন স্বপ্নের তাবীর ও ধাঁধার ব্যাখ্যা দেয়ার মত। তবে কেউ সূর্যকে অস্বীকার করার কথা কল্পনাও করেনি। কেননা তার প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে মানুষের বিবেক বুদ্ধি অথৈ অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো এবং সম্ভবত এখনো আছে।'

'সুতরাং আদিম জাহেলিয়াতের যুগে বিভিন্ন ধর্মের মূলনীতির অনুসন্ধান প্রচলিত ধর্মভীরুতাকে বাতিল প্রমাণ করে না। কিংবা তা কোনো অসম্ভব জিনিসের অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়েছে, এ কথাও প্রমাণ করে না। এটা শুধু এ কথাই প্রমাণ করে যে, মহাসত্য এতো বড় ও বিশাল জিনিস যে, একটা নির্দিষ্ট যুগে বিশ্ববাসী তাকে পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। বরং মানব জাতি যুগ যুগ ধরে তাকে জানবার ও বুঝবার চেষ্টা করে এবং পর্যায়ক্রমে ও [illegible] ায় তাকে বোঝে।

অনুরূপভাবে, ক্ষুদ্র সত্যগুলোকেও তারা পর্যায়ক্রমে এবং অধিকতর জটিল ও অভিনব পন্থায় হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে। যে সত্যগুলোকে মানুষ বিবেক বুদ্ধি, দৃষ্টিশক্তি ও চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে, মহাসত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে তার চেয়েও বিস্ময়কর ও কঠিন পন্থায়।'

'বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক পর্যালোচনা সংক্রান্ত বিদ্যা এমন বহু অলীক কাহিনী ও বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব উদঘাটিত করেছে, যার ওপর আদিম যুগের মানুষ ঈমান এনেছিলো। প্রাচীন সভ্যতার অনুসারী জাতিগুলো বা আদিম উপজাতিগুলোর মধ্যে আজও এ সব বিভ্রান্তি বিদ্যমান। তুলনামূলক ধর্ম পর্যালোচনা থেকে এর বিপরীত কোনো জিনিস উদঘাটিত হবার কথা ছিলো না, আর প্রাচীন কালের ধর্মগুলোর এ সব বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত থাকারও কথা ছিলো না। মানবীয় বিবেক বুদ্ধি এ ছাড়া অন্য কোনো ফলাফল আশাও করতে পারতো না। আর এই ফলাফলে এমন কোনো নতুন জিনিস নেই, যা বিজ্ঞানীদের কাছে বিস্ময়কর মনে হয় অথবা ধর্মের মৌলতত্ত্বের ব্যাপারে তাদের নতুন করে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়। বস্তুত প্রাথমিক যুগের মানুষ প্রাকৃতিক সত্যকে পুরোপুরিভাবে এবং সব রকমের অলীক কল্পনা থেকে মুক্ত অবস্থায় উপলব্ধি করেছিলো, এ কথা প্রমাণ করার জন্যে যেসব জ্ঞানীজন প্রাচীন কালের ধর্মগুলো নিয়ে গবেষণা করার উদ্যোগ নেন, তারা একটা অসম্ভব কাজেরই উদ্যোগ নেন।'

অনুরূপভাবে অধ্যাপক আল আক্কাদ তাঁর ওই পুস্তকের 'ঐশী আকীদার স্তরসমূহ' শীর্ষক অধ্যায়ে লিখেছেন, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বিশেষজ্ঞগণ সাধারণভাবে তিনটি স্তরের সন্ধান পেয়েছেন। প্রাচীন জাতিগুলো খোদার ওপর ঈমান আনতে গিয়ে এ স্তরগুলো অতিক্রম করেছে,

প্রথম স্তরটা হলো একাধিক খোদায় বিশ্বাসের স্তর,

দ্বিতীয় স্তর কতিপয় খোদাকে অগ্রাধিকার দেয়ার স্তর,

তৃতীয় স্তর, একক খোদার স্তর বা তাওহীদ।

একাধিক খোদায় বিশ্বাসের স্তরে থাকাকালে প্রাচীন উপজাতিগুলো ডজন ডজন থেকে শুরু করে শত শত খোদায় বিশ্বাস করতো। কখনো কখনো প্রত্যেক বড় পরিবারের আলাদা খোদা থাকতো অথবা খোদার প্রতিনিধি হিসাবে একটা করে তাবীজ বা মাদুলী থাকতো। ওই মাদুলী তাদের প্রার্থনা ও কোরবানী গ্রহণ করতো।

দ্বিতীয় স্তরে এসে খোদার সংখ্যা অনেক থাকলেও তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ অগ্রাধিকার পেতো। এর কারণ কখনো এই হতো যে, ওই ইলাহ ছিলো কোনো বড় গোত্রের ইলাহ, তাই ওই গোত্রের প্রভাবাধীন সকল ছোট ছোট গোত্র ওই খোদারই উপাসনা করতো। এই সব ছোটো ছোটো গোত্র নিজ নিজ খাদ্য ও আত্মরক্ষার প্রশ্নে বড় গোত্রের ওপর নির্ভরশীল থাকতো। আবার কখনো কখনো এর কারণ ছিলো এই যে, এই বড় খোদা অন্যান্য খোদার তুলনায় মানুষের বৃহত্তর দাবী পূরণ করতো। যেমন একটা বিরাট অঞ্চলের মানুষ 'বৃষ্টির খোদা'র মুখাপেক্ষী থাকতো। অনুরূপ, 'বাতাসের রব' সমগ্র জনগোষ্ঠীর আশা ও ভয়ভীতির কেন্দ্রবিন্দু থাকতো। অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের ভারপ্রাপ্ত রবেরা থাকতো এই দুই রবের অধীন।

তৃতীয় স্তরে গোটা জাতি একটা অঞ্চলে সকল ব্যাপারে একই রবের উপাসনা করতো। বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক রবের অস্তিত্ব তখনো মান্য করা হতো। এ স্তরে একটা অঞ্চলের অধিবাসী তার চেয়ে ছোট বা দুর্বল অপর অঞ্চলের অধিবাসীদের ওপর নিজেদের রাজত্ব ও আধিপত্য চাপিয়ে দেয়ার সাথে সাথে তাদের খোদার উপাসনাও চাপিয়ে দিত। এরূপ ক্ষেত্রে দুর্বল ও অধীন জাতির রাজা যেমন শক্তিশালী জাতির অধীন হতো, তেমনি তাদের মাবুদও হতো বৃহত্তর জাতির মাবুদের অনুগত বা তাবেদার।

এটা আসলে অসম্পূর্ণ তাওহীদের স্তর। এ স্তরে পৌঁছতেও কোনো জাতিকে সভ্যতার অনেকগুলো স্তর পেরিয়ে আসতে হতো। ইত্যবসরে জ্ঞানেরও প্রসার ঘটতো। এ পর্যায়ে সমকালীন অসভ্য ও বর্বর জাতিগুলোর মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কার মেনে নেয়া বিবেকবান গোষ্ঠীগুলোর পক্ষে সম্ভব হতো না। তাই তারা আল্লাহকে পূর্ণতা ও পবিত্রতার প্রায় সর্বোত্তম প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করতো। তারা এবাদাতকে প্রকৃতির অপার রহস্য নিয়ে চিন্তা গবেষণার সাথে যুক্ত করতো এবং আল্লাহর ইচ্ছা ও সূক্ষ্ম জ্ঞানকে এবাদাতের অংশ গণ্য করতো। এ সব শক্তিশালী জাতির মাবুদকে কখনো কখনো 'সর্বশ্রেষ্ঠ মাবুদ' ও 'সঠিক মাবুদ' নামে আখ্যায়িত করা হতো। অন্যান্য জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোদাকে ফেরেশতার পর্যায়ে বা আকাশ থেকে বিতাড়িত মাবুদ হিসাবে চিহ্নিত করা হতো।'

গ্রন্থকার অধ্যাপক আল আক্কাদের নিজের মতামত এবং তাঁর উদ্ধৃত তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বিশেষজ্ঞদের মতামত– এই উভয়টা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মানব জাতি নিজেই নিজের আকীদা বিশ্বাস গড়ে তুলেছে। এ কারণে তাদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক, জ্ঞানগত, সৃষ্টিগত ও রাজনৈতিক স্তরভেদ পরিলক্ষিত হয়। আর বহুত্ব থেকে দ্বিত্ব ও একত্বের পর্যায়ে পৌঁছা একটা চিরন্তন ধারাবাহিক বিবর্তন।

লেখকের পুস্তকের ভূমিকার প্রথম বাক্যটা থেকে এ ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানে তিনি বলেছেন, 'এ পুস্তকের আলোচ্য বিষয় মাবুদ সংক্রান্ত আকীদা বিশ্বাস কিভাবে গড়ে উঠলো এবং মানব জাতির সর্ব প্রথম মাবুদের সন্ধান করা থেকে শুরু করে এক আল্লাহর পরিচয় লাভ ও তাওহীদের পরিচ্ছন্ন ধারণায় উপনীত হওয়া পর্যন্ত কিভাবে এই বিশ্বাস বিকাশ লাভ করলো।'

পক্ষান্তরে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, ইলাহ সংক্রান্ত আকীদার গঠন সম্পর্কে কোরআন যে দ্ব্যর্থহীন বর্ণনা দিয়েছে, তা আল আক্কাদ সাহেবের পুস্তক 'আল্লাহ'তে ব্যক্ত করা ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, যা তিনি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ববিদদের ধ্যান ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লিখেছেন। আল্লাহ তায়ালা যা বলেছেন তা এই যে, প্রথম মানব আদম (আ.) তাওহীদ বিশ্বাসের সাথে পুরোপুরিভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি যে তাওহীদকে জানতেন, তা যাবতীয় দ্বিত্ব, ত্রিত্ব ও বহুত্বের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন ছিলো। তিনি জানতেন, এই তাওহীদ বা একত্ববাদের দাবী হলো একমাত্র আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা। এ আকীদা তিনি তাঁর সন্তানদেরকে শিখিয়েছেন। সুতরাং মানবেতিহাসের আদিমতম ও প্রাচীনতম প্রজন্মগুলো ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্ম এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদের ও প্রভুকে চিনতোই না। তারপর কালের আবর্তনক্রমে আদমের বংশধরদের মধ্য থেকে কিছু কিছু প্রজন্ম তাওহীদ থেকে বিচ্যুত ও ভ্রষ্ট হয়ে গেলো। তারা একাধিক মাবুদের ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত হলো। অবশেষে নূহ (আ.) এসে পুনরায় তাওহীদ শিক্ষা দিলেন। যারা জাহেলিয়াত তথা শেরেককে আঁকড়ে ধরে রাখলো, তাদের সবাইকে আল্লাহ ডুবিয়ে মারলেন এবং এক আল্লাহর অনুগত মানুষ ছাড়া আর সবাই ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। এই বেঁচে যাওয়া তাওহীদপন্থীদের একাংশ আবার দীর্ঘকাল পর তাওহীদ থেকে বিপথগামী হলো। আবার অন্য রসূল আসলেন এবং আবার নতুন করে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। এভাবেই প্রত্যেক রসূল নিজ ভূমিকা পালন করেছেন।

'তোমার পূর্বে আমি যাকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি, তাকে বলেছি যে, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ বা খোদা নেই। অতএব আমার এবাদাত করো।' (আম্বিয়া)

নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কোরআনের বক্তব্য এবং আল-আক্কাদ সাহেবের তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ববিদদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লেখা পুস্তক 'আল্লাহ'র বক্তব্য সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী। আর ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত গবেষকদের মতামতও পরস্পর বিরোধী মতবাদ ছাড়া কিছু নয়। 'আল্লাহ' তো দূরের কথা, খোদ মানুষ সম্পর্কেও তাদের কারো কথাই শেষ কথা প্রমাণিত হয়নি।

আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর কেতাবে এরূপ অকাট্য ভাষায় কোন কথা বলেন, আর অন্য কেউ যখন তার সম্পূর্ণ বিরোধী কথা বলে, তখন আল্লাহর কথাই অগ্রগণ্য। বিশেষত যারা ইসলামকে যাবতীয় সন্দেহ সংশয় থেকে মুক্ত করে দেখাতে চান, তাদের জন্যে একথা আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের আকীদাগত ভিত্তি ও মূলনীতি হলো, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীযোগে এসেছে এবং তা কোনো মানুষের মনগড়া নয়। ইসলাম প্রথম দিন থেকেই তাওহীদের শিক্ষা নিয়ে এসেছে। ইতিহাসের কোন একটা যুগেও তা তাওহীদকে বাদ দিয়ে আসেনি। ইসলামের এই আকীদাগত ভিত্তিকে ধসিয়ে দিলে ইসলামের কোনো উপকার করা হয় না। অনুরূপভাবে, ইসলামের নিজের কথা বাদ দিয়ে তুলনামূলক ধর্মতাত্ত্বিকদের কথা প্রচার করলেও ইসলামের কোনো সেবা হয় না। কেননা ওই ধর্মতাত্ত্বিকদের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর দ্বীনের মূল ভিত্তিকে ধ্বংস করা। ইসলামের ভিত্তি হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ওহী, কোনো মানুষের মনগড়া প্রগতিবাদী চিন্তা নয়।

আশা করি, এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কোনো অনৈসলামী উৎস থেকে ইসলাম সংক্রান্ত তথ্য গ্রহণ করা কত বিপজ্জনক। অনুরূপভাবে এও জানা গেলো যে, যারা ইসলামের মূল উৎসকে উপেক্ষা করে শুধু পাশ্চাত্য চিন্তাধারার আলোকে গবেষণার কাজ করেন, তারা আন্তরিকভাবে ইসলামের দুশমনদের আরোপিত অপবাদ প্রক্ষালণ করতে চাইলেও তাতে তারা সফলকাম হতে পারেন না। বরং তাদের মন মগযকে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারাই আচ্ছন্ন করে রাখে এবং তারা ইসলামের সেবার মনোভাব নিয়ে হলেও যাই লেখেন তা ইসলামের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ যথার্থই বলেছেন, 'এ কোরআন সর্বোত্তম পথই প্রদর্শন করে।' (সূরা বনী ইসরাঈল)

ইসলামে বন্ধন ও সম্পর্কের ভিত্তি

হযরত নূহের ঘটনার শিক্ষা নিয়ে আরো কিছু জরুরী আলোচনা আমার বাকী রয়েছে। এবার সেই বাকী আলোচনার দিকে পুনরায় মনোনিবেশ করছি।

সর্বপ্রথম যে প্রসংগটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবী রাখে তাহলো, হযরত নূহের ছেলেকে তাঁর পরিবারের অংশ বলে স্বীকার না করা। এটা ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক।

'নূহকে ওহীযোগে বলা হলো, তোমার জাতির মধ্য থেকে যারা ইতিমধ্যে ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না। .....

নূহ বললো, হে আমার প্রভু, আমার ছেলে তো আমার পরিবারের অংশ। তোমার ওয়াদা তো সত্য। ....

আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে নূহ! সে তোমার পরিবারের সদস্য নয়। কেননা সে অসৎকর্মশীল ....।' (আয়াত ৩৬ থেকে ৪৭)

এ আয়াত কটি থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে পারস্পরিক সম্পর্ক ও বন্ধন অন্যান্য আদর্শের তুলনায় বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইসলামের স্বভাব প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যেমন গভীর তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধনও তেমনি গভীর।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বন্ধন রক্ত ও বংশ ঘটিত নয়। ভূমি ও স্বদেশ ভিত্তিক নয়। গোত্র ও জাতি ভিত্তিকও নয়। ভাষা ও বর্ণ ভিত্তিক নয়। শ্রেণী ও পেশাভিত্তিকও নয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই সমস্ত সম্পর্ক ও বন্ধন চিরস্থায়ী হয় না। কখনো থাকে, কখনো ছিন্ন হয়ে যায়। যেমন আল্লাহর বান্দা নূহ (আ.) বললেন, 'হে আমার প্রভু, আমার ছেলে তো আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।' আল্লাহ জবাবে বললেন, 'হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়।' এরপর ব্যাখ্যা করলেন, তাঁর ছেলে হয়েও সে কেন তাঁর পরিবারভুক্ত নয়! বললেন, 'সে অসৎকর্মশীল।' অর্থাৎ তুমি নবী ও সৎকর্মশীল, আর তোমার ছেলে অসৎকর্মশীল। তাই তোমাদের দু'জনের মধ্যে ঈমানের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। কাজেই 'তুমি যা জানো না তা আমার কাছে চেও না।' অর্থাৎ তুমি ভাবছো, সে তোমার পরিবারের লোক। কিন্তু এ ধারণা ভুল। সে তোমার ঔরসজাত সন্তান হলেও তোমার পরিবারভুক্ত নয়।'

এখান থেকেই পৃথক হয়ে যাচ্ছে, মানবীয় সম্পর্ক ও বন্ধনের প্রতি ইসলামের ও জাহেলিয়াতের দৃষ্টিভংগি। জাহেলিয়াত সম্পর্ক ও বন্ধনের সূত্র বানায় কখনো রক্ত ও বংশকে, কখনো দেশ ও ভূমিকে, কখনো জাতি ও গোত্রকে, কখনো ভাষা ও বর্ণকে, কখনো লিংগ ও গোষ্ঠীকে, কখনো পেশা ও শ্রেণীকে এবং কখনো যৌথ স্বার্থকে বা ইতিহাসকে। এগুলো সবই জাহেলী চিন্তাধারাপ্রসূত বন্ধন অথবা বিচ্ছেদের সূত্র। ইসলামী চিন্তাধারার সাথে এর পার্থক্য অত্যন্ত মৌলিক।

স্থায়ী ও টেকসই সংযোগ মাধ্যম নির্ণয়ে আল্লাহর যে বিধান কোরআনে ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা মুসলিম জাতিকে শেখানো হয়েছে এবং তদনুযায়ী প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে।

এর সুস্পষ্ট ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সূত্রের উদাহরণ এ সূরায় হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর ছেলের মধ্যকার সম্পর্কের উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। পিতা-পুত্রের সম্পর্কের এ নমুনাকে অন্য সকল সম্পর্কেরও পথ প্রদর্শক বানানো হয়েছে। এ দ্বারা সম্পর্ক ও বন্ধনের সূত্রটা কি হবে, তা দেখিয়ে দেয়া হয়েছে।

পিতা ও ছেলের এ সম্পর্কের উদাহরণ হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর পিতা ও তাঁর জাতির মধ্যেও দেখা যায়। যেমন, সূরা মরিয়মে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'কেতাবে ইবরাহীমকে স্মরণ করো। সে ছিলো একজন সত্যনিষ্ঠ নবী। সে যখন তার পিতাকে বললো, হে পিতা, যে শুনতেও পায় না, দেখতেও পায় না, আপনার কোনো উপকারও করে না, আপনি তার পূজা কেন করেন?..................... (আয়াত ৪১ থেকে ৫০ পর্যন্ত)

অনুরূপ সম্পর্ক ছিলো ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরদের মধ্যে, যার উদাহরণ আল্লাহ সূরা বাকারায় দিয়েছেন।

'স্মরণ করো, যখন ইবরাহীমকে তার প্রতিপালক কিছু কথা দ্বারা পরীক্ষা করলেন। ইবরাহীম সবগুলো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো. আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি তোমাকে বিশ্ব মানবের নেতা বানাবো। ইবরাহীম বললো, আমার বংশধরের মধ্য থেকেও? আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমার নিয়োগ যালেমরা পাবে না। .... (আল বাকারা, আয়াত ১২০-১২৬)

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যেও যে এই বন্ধন পুরোপুরি ঈমান ও সৎকর্মনির্ভর, তাঁর উদাহরণ হিসাবে হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর কাফের স্ত্রী, হযরত লূত (আ.) ও তাঁর কাফের স্ত্রী এবং ফেরাউন ও তার মোমেন স্ত্রীর উদাহরণ দেয়া হয়েছে। (সূরা আত তাহরীম, আয়াত ১০ ও ১১)

মোমেনদের সাথে তাদের স্বজাতি, স্বদেশবাসী, স্বার্থ ও সম্পদ ইত্যাদির সম্পর্কও অনুরূপ ঈমান ও সৎকর্ম নির্ভর। এ ব্যাপারেও কোরআনে বিস্তর উদাহরণ দেয়া হয়েছে। হযরত ইবরাহীমের সাথে তাঁর জাতির এবং আসহাবুল কাহফের সাথে তাদের দেশবাসীর সম্পর্কের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, সূরা মুমতাহেনার ৪ নং আয়াত এবং সূরা কাহফের ৯ থেকে ১৬ নং আয়াত লক্ষণীয়।

আগের নবীরা ও তাদের সাথী মোমেনদের জীবন থেকে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহর জন্যে উল্লেখিত উদাহরণসমূহ দিয়েছেন। এগুলোর মধ্য দিয়ে এ উম্মাহর জন্যে পথ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইসলামী সমাজ কী ধরনের সম্পর্ক বন্ধনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তা এর মধ্যে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এ সম্পর্ক বন্ধনের ওপর যাতে মোমেনরা দৃঢ় ও অবিচল অবস্থান নেয়, সে জন্যে কোরআনে বহু নির্দেশ এসেছে। তার কয়েকটা নমুনা নিম্নরূপ,

'আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস রাখে এমন কাউকে তুমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যদের সাথে ভালোবাসা রাখতে দেখবে না– যদিও তারা তাদের পিতামাতা, ছেলে মেয়ে, ভাইবোন আত্মীয়স্বজন হয়। ....' (আল মুজাদালা, আয়াত ২২)

'হে মোমেনরা, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না ....' (আল মুমতাহেনা, আয়াত-১)

'তোমাদের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় ও সন্তানরা তোমাদেরকে কোনোই উপকার করতে পারবে না .....' (আল মুমতাহেনা, আয়াত ৩, ৪)

'হে মোমেনরা! তোমাদের পিতামাতা ও ভাইবোনকে আপন হিসাবে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের ওপর কুফরীকে স্থান দেয়।' (তাওবা ২৩)

'হে মোমেনরা, ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না ...' (আল মায়েদা ৫১)

এভাবে ওই অটল মূলনীতিটা ইসলামী সমাজের সম্পর্ক বন্ধনে এবং তার সাংগঠনিক কাঠামোতে স্থায়ীভাবে বদ্ধমূল হয়েছে। আর এর ফলেই ইসলামী সমাজ আধুনিক ও প্রাচীন যাবতীয় জাহেলী সমাজ থেকে পৃথক হয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। বস্তুত একই সাথে সমাজ প্রতিষ্ঠা ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় উম্মতকে যে মূলনীতি দিয়েছেন, তা ছাড়া অন্য কোনো মূলনীতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

যারা ইসলামী গুণবৈশিষ্ট্যের দাবীদার, অথচ ইসলামী মূলনীতির পরিবর্তে ওইসব জাহেলী সম্পর্ক বন্ধনের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার চেষ্টা করে, তারা হয় ইসলাম কী জানে না, নচেত ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে। উভয় অবস্থায়ই ইসলাম তাদের দাবীকৃত গুণবৈশিষ্ট্য স্বীকার করে না, যা তারা বাস্তবায়িত করে না। বরঞ্চ তারা জাহেলী সমাজের উপাদানগুলোকে গ্রহণ করে না।

এ মূলনীতিটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এর সম্পর্কে আলোচনা আপাতত বন্ধ করছি। তবে এ মূলনীতির ভিত্তিতে ইসলামী সমাজ গড়ার পেছনে আল্লাহর কী কী মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, তার ওপর একটু আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করছি।

আকীদা বিশ্বাস মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। এটাই মানুষকে পশু থেকে পৃথক করে। কেননা এর সাথে সম্পর্ক রয়েছে মানুষের আত্মা নামক বাড়তি উপাদানের, যা পশুর নেই। এ বাড়তি উপাদানটাই মানুষকে 'মানুষ' বানিয়েছে। এমনকি কট্টরতম নাস্তিক ও বস্তুবাদী পন্ডিতরাও ইদানীং স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে, আকীদা বিশ্বাসই মানুষের সেই অন্যতম মৌলিক উপাদান, যা তাকে মৌলিকভাবে পশু থেকে পৃথক করে। আধুনিক ডারউইন তত্ত্বের অন্যতম বিশেষজ্ঞ জুলিয়ান হাক্সলে এই পন্ডিতদের অন্যতম।

এ জন্যেই সভ্যতার সর্বোচ্চ ধাপে উপনীত মানব সমাজটার সাংগঠনিক উপাদান আকীদা বিশ্বাসই হওয়া উচিত। কেননা এই আকীদা-বিশ্বাস তথা নীতি আদর্শই মানুষ ও পশুতে প্রভেদকারী গুণাবলীর অন্যতম। যে সমস্ত গুণবৈশিষ্ট্যে মানুষ পশুর সমান, সেগুলোকে মানুষের সমাজ গড়ার উপাদান করা হয়নি। যেমন একই ভূখন্ডের অধিবাসী হওয়া, একই ক্ষেতের শস্য খাওয়া, একই সীমানা ও একই স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া, একই রক্ত, একই বর্ণ, বংশ, গোত্র, জাতি, লিংগ, ভাষা ইত্যাদির অধিকারী হওয়াকে মানুষের সমাজ গড়ার উপাদান করা হয়নি। এগুলোতে মানুষ ও পশু সমভাবে জড়িত। একমাত্র বিবেক ও মনের ভূমিকা আছে এমন জিনিসের সাথেই মানুষ এককভাবে জড়িত। এতে পশুর সাথে তার কোনো অংশীদারী নেই।

আকীদা বিশ্বাস তথা নীতি আদর্শ আরো একটা উপাদানের সাথে জড়িত, যা মানুষকে পশু থেকে পৃথক করে। সেটি হলো, ইচ্ছা ও নির্বাচনের স্বাধীনতা। প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল প্রাপ্তবয়স্ক হলেই নিজের আকীদা বিশ্বাসকে স্বাধীনভাবে বেছে নিতে পারে। আর এভাবেই সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে সে স্বেচ্ছায় কোন সমাজে বসবাস করবে, কোন আকীদা বিশ্বাস, সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও নৈতিক ব্যবস্থাকে সে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের জীবনাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবে।

কিন্তু কোনো ব্যক্তি নিজের বর্ণ, বংশ, জাতীয়তা, লিংগ, জন্মস্থান ও মাতৃভাষা ইত্যাদিকে স্বেচ্ছায় বেছে নিতে পারে না। জাহেলী সমাজ গড়ার এ সব উপাদান এমন যে, মানুষের পৃথিবীতে আসার আগেই এগুলোর ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যায়। এ গুলোর ব্যাপারে তার কোনো পরামর্শ বা মতামত নেয়া হয় না। এগুলো তার ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়, চাই সে তা চাক বা না চাক। এ ধরনের জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া উপাদানগুলোর ওপর যদি তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় অথবা শুধু দুনিয়ার ভাগ্য ও পরিণতি নির্ভর করে, তাহলে তাকে স্বাধীন বলা চলে না। এভাবে তার মানবতা ও মনুষ্যত্বের একটা অন্যতম উপাদান কেড়ে নেয়া হয়। মানুষের সম্মান ও মর্যাদার একটা মূল স্তম্ভ ধসিয়ে দেয়া হয়, বরং সত্য বলতে কি, সমগ্র সৃষ্টিজগতের চেয়ে যে পৃথক ও সম্মানজনক উপাদান দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, তা থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হয়।

মানুষের আল্লাহ প্রদত্ত পৃথক বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা রক্ষার খাতিরেই ইসলাম আকীদা ও আদর্শকেই ইসলামী সমাজের ভিত্তি রূপে নির্ধারণ করে। এর ভিত্তিতে প্রত্যেক মানুষ নিজের স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারাই নিজের ভাগ্য ও পরিণাম গঠন করে নিতে পারে। যে সমস্ত উপাদানে তার কোনো হাত থাকে না এবং নিজ ইচ্ছায় তা বদলাতেও পারে না, তা তার সমগ্র জীবনের ভাগ্য নির্ধারণকারী হয় না।

যেহেতু ইসলামী সমাজ নিছক আকীদা বিশ্বাসের বন্ধনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং কোনো বাধ্যতামূলক উপাদানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না, সেহেতু ইসলামী সমাজ একটা স্বাধীন, উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক মানব সমাজ। এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী, বর্ণ, বংশ, ভাষা ও দেশ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে মানুষ আসে। কেউ তাদের জোর করেও আনে না, কেউ তাদের পথে বাধাও আরোপ করে না। উচ্চতর মানবীয় বৈশিষ্ট্যের বাইরের কোন জিনিস দ্বারা তাদের স্বাধীনতা সংকুচিতও হয় না। অতপর এ সমাজে সমস্ত মানবীয় শক্তি ও বৈশিষ্ট্য একীভূত হয় যাতে তা এক উন্মুক্ত মানবীয় সভ্যতা গড়ে তোলে। এ সভ্যতা সকল মানবীয় বৈশিষ্টকে কাজে লাগায় এবং বর্ণ, বংশ, ভূমি ইত্যাদির কারণে কোনো একজনেরও যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাকে অব্যবহৃত রাখে না।

'ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, শুধুমাত্র আকীদা ও আদর্শের ভিত্তিতে ইসলামী সমাজ গঠন, জাতীয়তা, ভূমি, বর্ণ, বংশ, ভাষা, ইত্যাদিকে এ ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা এবং মানুষ ও পশুর সম্মিলিত গুণবৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে মানুষের একক বৈশিষ্ট্যগুলোকে এ সমাজে অধিকতর গুরুত্ব ও মর্যাদা দেয়া হয়েছিলো। আর এর বাস্তব ও গৌরবোজ্জ্বল ফল এই দাঁড়িয়েছিলো যে, ইসলামী সমাজ সকল বর্ণ, বংশ ও ভাষার মানুষের জন্যে উন্মুক্ত সমাজে পরিণত হয়েছিলো। এ সব নিকৃষ্ট ও পাশবিক বাধাবিঘ্ন তার পথ আটকাতে পারেনি। ইসলামী সমাজ সকল শ্রেণীর মানুষের গুণবৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা ও ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এমন এক বিস্ময়কর, চমকপ্রদ বিশাল ও ভারসাম্যপূর্ণ সভ্যতা গড়ে তুলেছিলো, যা সেই যুগে বিপুল দূরত্ব ও যোগাযোগ ব্যবস্থার শ্লথগতি সত্তেও মানব জাতির শক্তির সার নির্যাসে পরিণত হয়েছিলো।'

'এ উৎকৃষ্টতম ইসলামী সমাজে আরব, পারসিক, সিরীয়, মিসরীয়, মরক্কান, তুর্কী, চৈনিক, ভারতীয়, রোমক, গ্রীক, ইন্দোনেশীয় ও আফ্রিকীসহ সকল জাতির মানুষ একত্রিত হয়েছিলো এবং ইসলামী সমাজ ও ইসলামী সভ্যতাকে ভারসাম্যপূর্ণ ও সহযোগিতাপূর্ণ করে গড়ে তোলার জন্যে তারা তাদের সবার বহুমুখী বৈশিষ্ট্যগুলোকে সমবেতভাবে কাজে লাগিয়েছিলো। এ সভ্যতা একদিনের জন্যেও আরবীয় ও জাতীয় ছিলো না, বরং চিরদিনই তা ছিলো ইসলামী ও আদর্শবাদী।'

'তারা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, পূর্ণ সাম্যের সাথে, ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এবং একমুখী হয়ে একত্রিত হয়েছিলো। তারপর তারা তাদের সর্বোচ্চ যোগ্যতা, দক্ষতা ও উৎকৃষ্টতম গুণবৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করেছিলো। তারা তাদের ব্যক্তিগত, জাতিগত ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে এই একীভূত, সমতা ভিত্তিক, আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককেন্দ্রিক ও বাধামুক্ত উদার মানবিক সমাজ গড়ে তুলেছিলো। এ ধরনের সমাজ মানবেতিহাসে আর কখনো কায়েম হতে দেখা যায়নি।'

'প্রাচীন যুগে সবচেয়ে খ্যাতিমান সমাজ ছিলো রোম সাম্রাজ্য শাসিত সমাজ। এ সমাজ যথার্থই বহু জাতিক, বহু ভাষাভাষী, বহু বর্ণ ও বহু মেযাজ ভিত্তিক সমাজ ছিলো। কিন্তু তা 'মানবীয় বন্ধন' ভিত্তিক ছিলো না এবং আকীদা ও বিশ্বাসের ন্যায় উচ্চতর মূল্যবোধের কোনো প্রতিনিধিত্ব তাতে ছিলো না। সে সমাজ ছিলো শ্রেণী ভিত্তিক এবং তার প্রধান দুটো শ্রেণী ছিলো দাস শ্রেণী ও অভিজাত শ্রেণী। সে সমাজের সর্বত্র ছিলো রোমক বংশীয়দের সর্বোচ্চ আধিপত্য এবং অন্য সকল জাতি ছিলো পরাধীন দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ। এ কারণে সে সমাজ কখনো ইসলামী সমাজের মতো উচ্চ মানের হয়নি এবং ইসলামী সমাজ থেকে যে সুফল পাওয়া গিয়েছিলো, ওই সমাজ থেকে তা পাওয়া যায়নি।'

'অনুরূপভাবে আধুনিক কালে অন্যান্য সমাজও গড়ে উঠেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সমাজ। তবে এটাও ছিলো রোমান সমাজের মতো এবং তারই উত্তরাধিকারী। এ সমাজ ছিলো আপাদমস্তক জাতীয়তাবাদী, শোষণমূলক। ইংরেজ জাতির জাতীয় আধিপত্য ও আভিজাত্য কেন্দ্রিক। এ ছাড়া ইউরোপীয় সব ক'টি সাম্রাজ্যই ছিলো এ ধরনের। স্পেনীয়, পুর্তগীজ, ফরাসী– সবই ছিলো ওই একই নিম্ন ও নিকৃষ্ট মানের। সবার শেষে কমিউনিজম অন্য এক ধরনের সমাজ গঠনের চেষ্টা করেছিলো, যা জাতীয়তা, আঞ্চলিকতা, ভাষা, বর্ণ ইত্যাদি সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তাকে সাধারণ মানবীয় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পারেনি। তারা যা কায়েম করেছিলো তা ছিলো শ্রেণী ভিত্তিক সমাজ। এ সমাজ ছিলো প্রকৃতপক্ষে

রোমান সাম্রাজ্যবাদী সমাজের অপর পিঠ। রোমক সমাজ ছিলো রাজকীয় 'অভিজাত' শ্রেণী ভিত্তিক, আর কমিউনিষ্ট সমাজ গড়ে উঠেছিলো প্রোলিতারিয়েত বা সর্বহারা শ্রেণী ভিত্তিক। যে আবেগ এখানে কার্যকর থাকে, তা হলো হিংসা এবং তা ছিলো অন্য সব কটি শ্রেণীর বিরুদ্ধে পরিচালিত। এ ধরনের উৎকট, হিংসুটে ও সংকীর্ণমনা সমাজ ব্যক্তি মানুষের নিকৃষ্টতম দোষগুলোকেই জাগিয়ে তুলতে সক্ষম ছিলো এবং করেছিলোও তাই। এ সমাজ শুরুতেই মানুষের কেবল পাশবিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রকটিত ও বিকশিত করেছিলো এবং মানসিক মৌলিক চাহিদা দেখিয়েছিলো তিনটি– খাদ্য, বাসস্থান ও যৌন লালসা, যা ইতর প্রাণীদেরও প্রাথমিক চাহিদা। তারা গোটা মানবেতিহাসকে খাদ্য অন্বেষণের ইতিহাস হিসাবে চিহ্নিত করে থাকে।'

'পক্ষান্তরে ইসলাম এনেছে এক অতুলনীয় ঐশী ব্যবস্থা। এটা মানব সমাজ গড়ার জন্যে মানুষের সর্বোত্তম গুণগুলোকে জাগ্রত করা, বিকশিত করা ও শানিত করার বিধান। আজও এ ব্যবস্থা অতুলনীয়। যারা একে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করে অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায় এবং অন্য কোনো ভিত্তির ওপর যথা জাতীয়তা, ভূমি ও শ্রেণী ইত্যাদির ওপর প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তারা যথার্থই মানব জাতির শত্রু। মানুষকে যে শ্রেষ্ঠতম গুণবৈশিষ্ট্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন, সেই গুণবৈশিষ্ট্য নিয়ে সে এই বিশ্ব প্রকৃতিতে অন্য সকল সৃষ্টির ওপর মাথা তুলে দাঁড়াক, তা তারা চায় না। তারা চায় না মানব সমাজ মানুষের সর্বোত্তম যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও গুণবৈশিষ্ট্য দ্বারা ভারসাম্যপূর্ণভাবে উপকৃত ও সমৃদ্ধ হোক।' (আমার লেখা 'মায়ালিমু ফিত্তরীক'– 'ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)

এখানে এ কথাও বলে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, ইসলামের শত্রুরা ইসলামের অজেয় ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত। এদের সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে, 'তারা তাদের ছেলেকে যেরূপ চেনে, রসূল (স.)-কেও সেরূপ চেনে।' তারা খুব ভালো করেই বুঝতে পারে যে, আদর্শভিত্তিক সম্পর্ক বন্ধনই ইসলামের ও ইসলামী সমাজের শক্তির উৎস। তাই তারা যখন ইসলামী সমাজকে ধ্বংস করা বা তার ওপর নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নিলো, তখন তারা মুসলমানদের এবাদাতের জন্যে এক আল্লাহর পরিবর্তে বহু সংখ্যক মূর্তি তৈরী করে দিলো। সে সব মূর্তির কোনোটার নাম 'দেশ-মাতৃকা', কোনোটার নাম 'জাতি', কোনোটার নাম 'ভাষা' ইত্যাদি। এ মূর্তিগুলো ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে কখনো 'জাতীয়তা', কখনো 'তুরানী জাতীয়তা', কখনো 'আরব জাতীয়তা' ইত্যাদি নামে খ্যাতি লাভ করে। ক্রমে এ মূর্তিগুলো গোটা মুসলিম জাতির অভ্যন্তরীণ ঐক্য বিনষ্ট করে দুর্বল করে দেয়, তাদের শরীয়ত ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয় এবং তারা এমন 'পবিত্র ভাবমূর্তি' ধারণ করে যে, ঐগুলোকে যারা অস্বীকার করে, তাদেরকেই ধর্মদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক নামে আখ্যায়িত করা হয়।

ইতিহাসে যে শিবিরটি ইসলামী সমাজের সুদৃঢ় ভিত্তিকে দুর্বল করার ব্যাপারে সবচেয়ে ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করেছে, তা হলো ইহুদী শিবির। তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত সমাজকে ধ্বংস করার কাজেও 'জাতীয়তা'র অস্ত্র প্রয়োগ করেছে এবং তাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক উপদলীয় গীর্জায় বিভক্ত করেছে। এভাবে তারা ইহুদী জাতির চারপাশে বিদ্যমান খৃষ্টীয় প্রাচীর ধ্বংস করেছে। এরপর পুনরায় ধ্বংস করেছে ওই অকৃতজ্ঞ জাতিটির চারপাশে বিদ্যমান ইসলামী রক্ষা প্রাচীর।

খৃষ্টানরাও মুসলিম জাতির সাথে অনুরূপ আচরণ করেছে। মুসলিম জাতির অভ্যন্তরে নানা রকমের জাতীয়তা ও আঞ্চলিকতার ধুয়া তুলে শত শত বছর ধরে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে

এসেছে। এটা ছিলো নিছক ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রাচীন ক্রুসেডজনিত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার হীন অপচেষ্টা। ইউরোপের খৃষ্টীয় সাম্রাজ্যবাদ প্রতিরোধে মুসলমানরা যাতে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে, সেটা ছিলো এর প্রধান লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্য অর্জনে তারা অনেকাংশে সফল হয়েছে। এই অপচেষ্টা তাদের আজও অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যতোদিন ওই অভিশপ্ত মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করার সুযোগ না দেন, ততোদিন তাদের এ চক্রান্ত অব্যাহত থাকবে। যেদিন ওই মূর্তিগুলো ধ্বংস হবে এবং মুসলিম জাতি তাদের 'মুসলিম' পরিচয় ছাড়া অন্য সব জাতিগত, ভাষাগত ও ভৌগোলিক খন্ডিত ও সংকীর্ণ পরিচয় থেকে মুক্তি পাবে, একমাত্র সেদিনই তাদের সমাজ অটুট ভিত্তির ওপর পুন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

মানব জাতি পৌত্তলিক জাহেলিয়াত থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হতে পারবে না যতক্ষণ একমাত্র আকীদা বিশ্বাসের ওপর তাদের সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত না হবে। কেননা এ ভিত্তি তাদের চিন্তাধারায় ও সমাজ গঠনে পূর্ণতা না পাওয়া পর্যন্ত আল্লাহর একক আনুগত্য বাস্তব রূপ লাভ করবে না।

মহা পবিত্র সত্ত্বা একজনই হওয়া চাই– একাধিক নয়। শ্লোগান একটাই হওয়া উচিত– একাধিক নয়। অনুরূপভাবে কেবলা একাধিক না হয়ে একটাই হওয়া উচিত এবং সকল মানুষের সেদিকেই মনোনিবেশ করা উচিত।

মনে রাখতে হবে, পৌত্তলিকতা শুধু পাথরের মূর্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পৌত্তলিকতা নানা উপায়ে প্রকাশ পেতে পারে এবং মূর্তিগুলোর রূপও একাধিক রকমের হতে পারে। নতুন নামে ও নতুন রূপে নতুন উপাস্য ও পৌরাণিক দেবদেবীর আবির্ভাবও ঘটতে পারে।

ইসলাম মানুষকে পাথরের মূর্তি ও পৌরাণিক দেবদেবীর কবল থেকে মুক্তি দেবে, আর ভৌগোলিক, বর্ণগত ও ভাষাগত জাতীয়তার মূর্তিপূজায় সম্মত হবে, এটা কখনো হতে পারে না। ইসলাম মানুষকে কোনো সৃষ্টির নয়, বরং মহান স্রষ্টা আল্লাহর একক এবাদাতের আহ্বান জানায়। মানুষ তার পরিবর্তে রকমারি সংকীর্ণ জাতীয়তার মূর্তি পূজা করবে এবং পরস্পরের সাথে লড়াই করবে, এটা কখনো ইসলামের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

এ জন্যে ইসলাম চিরদিন মানব জাতিকে দুটো উম্মতে বিভক্ত করেছে। একটা হলো নবী ও রসূলদের অনুসারী মুসলিম উম্মত। প্রত্যেক নবীর আমলে তাঁর অনুসারীরা এবং তার পরে সমগ্র মানব জাতির কাছে আগত শেষ নবীর আমলে ও তাঁর তিরোধানের পর তাঁর অনুসারীরা এই উম্মতের শামিল। অপরটা হলো অমুসলিম, তাগূত পূজারী ও মূর্তি পূজারী– তা যে আকারেই হোক এবং যে যুগেই হোক।

আল্লাহ মুসলমানদের কাছে তাদের সর্বকালের সমগ্র মুসলিম উম্মাহর পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমে বিভিন্ন নবীর নাম নিয়ে তাদের অনুসারীদের পরিচয় দেন এবং সবার শেষে এরূপ মন্তব্য করেন,

এরা সবাই হচ্ছে তোমাদের একই উম্মত। আর আমি তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং শুধু আমারই এবাদাত করো।' আরবদেরকে তিনি বলেননি যে, 'এ আরবরাই তোমাদের উম্মত– চাই জাহেলী আরব হোক বা মুসলিম আরব হোক। ইহুদীদেরকেও তিনি বলেননি যে, বনী ইসরাঈলরাই তোমাদের উম্মত, চাই তারা অমুসলমান হোক বা মুসলমান হোক। সালমান ফারসীকে বলেননি যে, পারস্যবাসী তোমার উম্মত। সোহায়েব রূমীকে বলেননি যে, রোমকরা তোমার উম্মত। বেলালকে বলেননি যে, হাবশীরা তোমার উম্মত। বরং আরব, পারসিক, রোমক ও হাবশী– সবাইকে বলেছেন, তোমাদের উম্মত হলো সেই মুসলমানরা, যারা হযরত মূসা, হারূন,

ইবরাহীম, লূত, নূহ, দাউদ, সোলায়মান, আইয়ূব, ইসমাঈল, ইদরীস, যুল কিফল, ইউনুস, যাকারিয়া, ইয়াহিয়া ও ঈসার আমলে ঈমান এনেছে, আর শেষ নবী মোহাম্মদ (স.)-এর আমলে যারা ঈমান এনেছে। (সূরা আম্বিয়ার ৪৮ থেকে ৯১ নং আয়াত দেখুন।)

আল্লাহর দৃষ্টিতে এই হলো মুসলিম উম্মাহ বা জাতির পরিচয়। যে ব্যক্তি ইসলামের এ জাতীয়তার পরিচয় মানে না, তার সে স্বাধীনতা আছে। কিন্তু তাকে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, সে মুসলমান নয়। আমরা যারা মুসলমান, তারা আল্লাহ যাদেরকে 'মুসলিম' বলেছেন, তাদেরকে ছাড়া আর কাউকে মুসলিম বলে মানতে পারি না। তিনিই একমাত্র সত্যবাদী সর্বোত্তম নিষ্পত্তিকারী।

মোমেনদের মর্যাদা

হযরত নূহের ঘটনা থেকে আমরা ইসলামের এই মৌলিক বিষয়টা সম্পর্কে যে শিক্ষা পাই, তার আলোচনা এখানেই শেষ করলাম। এবার হযরত নূহের ঘটনার সর্বশেষ দিকটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আল্লাহর মূল্যায়নে সেই ক্ষুদ্র মুসলিম দলটার গুরুত্ব ও মর্যাদা কেমন, সে বিষয়টার ওপর আলোকপাত করতে চাই।

নূহ (আ.)-এর অনুসারীদের সংখ্যা বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুসারে বারো জন মাত্র। সাড়ে নয়শো বছর ধরে দাওয়াত দিয়ে তিনি এই ক'জনকে ইসলামে দীক্ষিত করতে সক্ষম হন।

এত দীর্ঘকাল ধরে ও এতো দীর্ঘ পরিশ্রমের ফলে দীক্ষিত এই মুষ্টিমেয় সংখ্যক মানুষকে আল্লাহ তায়ালা এতোটা মর্যাদা দিলেন যে, তাদের স্বার্থে গোটা বিশ্ব পরিমন্ডলের প্রাকৃতিক নিয়মে পরিবর্তন আনলেন। জন অধ্যুষিত গোটা বিশ্বকে তিনি পানি দিয়ে নিমজ্জিত করলেন এবং এই মুষ্টিমেয় সংখ্যক মানুষকে গোটা পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানালেন। তাদের দিয়ে বিশ্ব সভ্যতার ও আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের নতুন করে সূচনা করলেন।

এটা সত্যই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার।

আজকের পৃথিবীর দিকে দিকে যে ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনগুলো নব্য জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করছে এবং যারা ক্রমাগত এই জাহেলী সভ্যতার পৈশাচিক ও নিষ্ঠুর যুলুম নির্যাতন ভোগ করে চলেছে, তাদেরকে হযরত নূহের ঘটনার এই দিকটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা গবেষণা করতে অনুরোধ করি।

বস্তুত আল্লাহর দৃষ্টিতে সারা পৃথিবীতে ইসলামের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বীজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, এর স্বার্থে ও প্রয়োজনে তিনি গোটা জাহেলী জনগোষ্ঠীকে, জাহেলী সভ্যতাকে, জাহেলী প্রতিষ্ঠানাদিকে, তার সকল শক্তি ও ক্ষমতাকে এবং সকল সঞ্চিত পুঁজিকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। তারপর ওই বীজটার অংকুরোদগম করা, তার লালন পালন করা, তার বিকাশ ঘটানো, তাকে নিরাপদ ও মুক্ত করা এবং তাকে গোটা পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করা ও নতুন করে আবাদ করার অধিকারও দিতে তিনি প্রস্তুত।

হযরত নূহ (আ.) আল্লাহর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে নৌকা তৈরী করছিলেন। যেমন আল্লাহ এই সূরায় বলেছেন, 'তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার নির্দেশে নৌকা বানাও। আর যালেমদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো না। ওরা অবশ্যই ডুবে মরবে।'

নূহ (আ.) তার জাতির অত্যাচার, হুমকি ধমকি ও অপবাদে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর আশ্রয় চাইলেন। এ সম্পর্কে সূরা কামারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তাদের পূর্বে নূহের জাতি আমার বান্দাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বলেছে, সে একটা পাগল। অতপর তাকে ধমকও দেয়া হয়েছে। তখন নূহ তার প্রতিপালককে ডাকলো যে, আমি অসহায়। আমাকে সাহায্য করো।'

নূহ যখন নিজেকে 'অসহায়' আখ্যায়িত করে আল্লাহর সাহায্য চাইলেন তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রাকৃতিক শক্তিকে উন্মুক্ত করে দিলেন যেন তার অসহায় বান্দার সাহায্য করে,

'আমি তৎক্ষণাত আকাশের দরযা খুলে দিলাম ও মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। আর মাটি থেকে পানি উঠালাম। অতপর নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে সমস্ত পানি একত্রিত হলো।'

আল্লাহর এই অপ্রতিরোধ্য শক্তিগুলো যখন এরূপ দুরন্ত প্রাকৃতিক অভিযানে নামলো, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর সমগ্র সত্ত্বা ও শক্তি নিয়ে তাঁর অসহায় বান্দার পক্ষে অবস্থান নিলেন,

'আমি নূহকে আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে। যা আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চলতো। এটা ছিলো প্রত্যাখ্যাতের (নূহের) পুরস্কার।'

এ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টা জাহেলী শক্তির হাতে নির্যাতিত ও জাহেলী শক্তির হাতে পর্যুদস্ত সর্বকালের ও সকল দেশের ইসলামী সংগঠনকে ভেবে দেখতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে প্রাকৃতিক শক্তিকে অনুকূল ও অনুগত করে দিতে পারেন। এটা ঝড় বা বন্যার আকারেই হতে হবে এমন কোন কথা নেই। ঝড় বা বন্যা আল্লাহর সেই সব প্রাকৃতিক শক্তিরই অন্যতম। 'তোমার প্রভুর শক্তি কতো ও কেমন, তা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।'

ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের একমাত্র কাজ হলো ময়দানে টিকে থাকা, আল্লাহর পথে অগ্রসর হতে থাকা, তার শক্তির উৎস যে আল্লাহ তায়ালা তাকে স্মরণ রাখা, তাঁর কাছে আশ্রয় চেয়ে ধরনা দিয়ে পড়ে থাকা। আল্লাহ তায়ালা যতক্ষণ তাঁর ফয়সালা নিয়ে না আসেন, ততোক্ষণ ধৈর্যধারণ করা। তাঁর অভিভাবক ও মনিবকে হারাতে পারে, এমন কোনো শক্তি যে আকাশ ও পৃথিবীতে নেই, তা মনে রাখা। ভরসা রাখা যে, তিনি একটা নির্দিষ্ট পরীক্ষা ও প্রস্তুতির মেয়াদের জন্যে ছাড়া তাঁর বন্ধুদেরকে কখনো তার শত্রুদের হাতে সঁপে দেবেন না এবং এই মেয়াদটা কেটে গেলে তাকে উদ্ধার করবেন এবং তাকে দিয়ে পৃথিবীতে যা করতে চান করবেন।

এ হচ্ছে হযরত নূহের এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিক্ষা।

ইসলামের পথে চলতে গিয়ে জাহেলী শক্তির নিপীড়নের শিকার হচ্ছে, এমন কারো একথা ভাবা উচিত নয় যে, আল্লাহ তাকে একদিকে জাহেলী বর্বরতার কাছে চিরতরে অসহায় ছেড়ে দিয়েছেন এবং অপরদিকে তাকে এক মাত্র আল্লাহর প্রভু বলে মেনে নিতেও বলছেন। তার নিজের ব্যক্তিগত শক্তিকে জাহেলী শক্তির সম পর্যায়ের ভেবে এ কথা মনে করা উচিত নয় যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে এ সব অপশক্তির কাছে অসহায় ছেড়ে দেবেন। তার এ কথা ভুলে যাওয়া চাই না যে, সে সেই বান্দা, যে অসহায় হলে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার অধিকারী।

পৃথিবীর শক্তিগুলো সমান নয়। জাহেলিয়াতের নিজস্ব শক্তি আছে এবং তার ওপর সে নির্ভরও করে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকে, সে স্বয়ং আল্লাহর শক্তির ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তায়ালা বহু প্রাকৃতিক শক্তিকে তার অনুগত করে দিতে পারেন, যা যেখানেই ইচ্ছা করেন এবং যেভাবে ইচ্ছা করেন। প্রকৃতির ক্ষুদ্রতম শক্তি দিয়েও তিনি জাহেলী শক্তিকে এমনভাবে খতম করে দিতে পারে, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।

আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে কখনো পরীক্ষা ও দুর্ভোগের মেয়াদ দীর্ঘও হতে পারে। নূহ তাঁর জাতির মধ্যে সাড়ে নয়শো বছর কাটিয়েছেন। এরপরই আল্লাহর বরাদ্দকৃত সাহায্য এসেছে। এত দীর্ঘকাল ধরে দাওয়াত দিয়ে মাত্র ১২ জন লোক পেয়েছেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র শক্তি আল্লাহর পাল্লায় এতো ভারী ছিলো যে, গোটা বিভ্রান্ত মানব জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার মতো প্রাকৃতিক শক্তি তাদের পক্ষে আসতে পেরেছিলো এবং তারা গোটা পৃথিবীকে নতুন করে আবাদ করার যোগ্য হয়েছিলেন।

অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশের যুগ শেষ হয়ে যায়নি। প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা ঘটে চলেছে আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতার আওতায়। তবে আল্লাহ তায়ালা অলৌকিক ঘটনাবলীর রূপ পাল্টে থাকেন সংশ্লিষ্ট যুগের বাস্তবতা ও দাবী অনুসারে। অনেক অলৌকিক ঘটনা অনেকের বিবেক বুদ্ধিকে প্রতিনিয়ত ধাক্কা দিচ্ছে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করছে না। কিন্তু যারা আল্লাহর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য অর্জন করেছে, তারা ওই সব ঘটনার পেছনে আল্লাহর হাত দেখতে পান এবং তার বিস্ময়কর প্রভাব টের পান।

যারা আল্লাহর পথে চলে, তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে পরিপূর্ণভাবে নিজ কর্তব্য পালন করে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করণীয় নেই। এরপর যাবতীয় ব্যাপার আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে শান্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া উচিত। আর যখন নিজেকে অসহায় মনে হয়, তখন একমাত্র নির্ভরযোগ্য সহায় আল্লাহর আশ্রয় চাইতে হবে, যেমন আশ্রয় চেয়েছিলেন তাঁর সুযোগ্য ও সৎ বান্দা নূহ (আ.)। তারপর আল্লাহর আসন্ন সাহায্যের অপেক্ষায় থাকতে হবে। এ অপেক্ষাও একটা এবাদাত এবং এর জন্যে সওয়াব পাওয়া যাবে।

পুনরায় আমার কাছে অনুভূত হচ্ছে যে, যারা কোরআনকে নিয়ে অক্লান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হয়, কোরআন কেবল তাদের কাছেই তার গুপ্ত রহস্য উদঘাটন করে। একমাত্র এই সংগ্রামী ব্যক্তিরাই নিজেদেরকে এমন পরিবেশে উপস্থিত বলে অনুভব করে, যে পরিবেশে কোরআন নাযিল হয়েছিলো। এ কারণেই তারা এর প্রকৃত মজা পায় এবং একে উপলব্ধি করে। কেননা তাদের কাছে মনে হতে থাকে যেন কোরআন তাদেরকে সরাসরি সম্বোধন করছে, যেমন সম্বোধন করেছিলো প্রথম মুসলিম দলটিকে। সেই দলটি এর প্রকৃত মজা উপভোগ করেছিলো, এর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করেছিলো এবং এ নিয়ে আন্দোলন ও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো।

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ
إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ يَٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا
عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِىٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ وَيَٰقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟
إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا۟
مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا۟ يَٰهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِىٓ ءَالِهَتِنَا عَن
قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا
بِسُوٓءٍ ۗ قَالَ إِنِّىٓ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا۟ أَنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِن
دُونِهِۦ ۖ فَكِيدُونِى جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٥﴾ إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى

রুকু ৫

৫০. আমি আ'দ জাতির কাছে তাদেরই (এক) ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম; সে তাদের বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এবাদাত করো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই; (আসলে আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে) তোমরা তো মিথ্যা রচনাকারী ছাড়া আর কিছুই নও। ৫১. হে (আমার) জাতি, (আল্লাহর দিকে ডেকে) তার ওপর আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছি না; আমার (যাবতীয়) পাওনা তো আল্লাহ তায়ালার কাছেই, যিনি আমাকে পয়দা করেছেন; তোমরা কি বুঝতে পারো না? ৫২. হে (আমার) জাতি, তোমরা তোমাদের মালিকের কাছে গুনাহখাতা মাফ চাও, অতপর তোমরা তাঁর দিকেই ফিরে আসো, তিনি তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘমালা পাঠাবেন এবং তোমাদের (আরো) শক্তি যুগিয়ে তোমাদের (বর্তমান) শক্তি আরো বাড়িয়ে দেবেন, অতএব তোমরা অপরাধী হয়ে (তাঁর এবাদাত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। ৫৩. তারা বললো, হে হূদ, তুমি তো আমাদের কাছে (ধরা-ছোঁয়ার মতো) কোনো স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে আসোনি, শুধু তোমার (মুখের) কথায় আমরা (কিন্তু) আমাদের দেবতাদের ছেড়ে দেয়ার (লোক) নই, আমরা তোমার ওপর (বিশ্বাস করে) মোমেনও হয়ে যাবো না! ৫৪. আমরা তো বরং বলি, (আসলে) আমাদের কোনো দেবতা অশুভ কিছু দ্বারা তোমাকে আবিষ্ট করে ফেলেছে; (এ উদ্ভট কথা শুনে) সে বললো, আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও (আমার এ কথায়) সাক্ষী হও, তোমরা যে (-ভাবে আল্লাহর সাথে) শেরেক করো, আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, ৫৫. (যাও,) তোমরা সবাই মিলে আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে আমার বিরুদ্ধে যতো রকম ষড়যন্ত্র (করতে চাও) করো, অতপর আমাকে কোনো রকম (প্রস্তুতির) অবকাশও দিয়ো না। ৫৬. আমি অবশ্যই

وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ
رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾
وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ۚ وَنَجَّيْنَاهُمْ
مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ عَادٌ ۖ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ
وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦٠﴾ وَإِلَىٰ
ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ

আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করি, (যিনি) আমার মালিক, তোমাদেরও মালিক; বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই যার নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতের মুঠোয় নয়; অবশ্যই আমার মালিক সঠিক পথের ওপর রয়েছেন। ৫৭. (এ সত্ত্বেও) যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে (জেনে রেখো), আমি যে (পয়গাম) তোমাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে প্রেরিত হয়েছিলাম, তা আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি; (সে অবস্থায় অচিরেই) আমার মালিক অন্য কোনো জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, তোমরা তাঁর কোনোই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না; অবশ্যই আমার মালিক প্রত্যেকটি বস্তুরই ওপর একক রক্ষক (ও অভিভাবক)। ৫৮. অতপর যখন আমার (আযাব সম্পর্কিত) হুকুম এলো, তখন আমি হূদকে এবং তার সাথে যতো ঈমানদার ছিলো, তাদের আমার রহমত দ্বারা (আযাব থেকে) বাঁচিয়ে দিয়েছি, (এভাবেই) আমি তাদের এক কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করেছি। ৫৯. এ হচ্ছে আদ জাতি (ও তাদের কাহিনী), তারা তাদের মালিকের আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিলো, তারা তাঁর রসূলদের নাফরমানী করেছিলো, (সর্বোপরি) তারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশই মেনে নিয়েছিলো। ৬০. পরিশেষে এ দুনিয়ায় (আল্লাহর) অভিশাপ তাদের পিছু নিলো, কেয়ামতের দিনও (এ অভিশাপ তাদের পিছু নেবে); ভালো করে শুনে রেখো, আদ (জাতি) তাদের মালিককে অস্বীকার করেছিলো; এও জেনে রেখো, ধ্বংসই ছিলো হূদের জাতি আ'দের (একমাত্র) পরিণতি।

রুকু ৬

৬১. সামুদ (জাতির) কাছে (নবী) ছিলো তাদেরই (এক) ভাই সালেহ। সে (তাদের) বললো, হে (আমার) জাতি, তোমরা সবাই (একান্তভাবে) আল্লাহর এবাদাত করো, তিনি

أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ
رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾ قَالُوا يَٰصَٰلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَآ
أَتَنْهَىٰنَآ أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ
مُرِيبٍ ﴿٦٢﴾ قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَىٰنِي مِنْهُ
رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۖ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ
تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾ وَيَٰقَوْمِ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِيٓ أَرْضِ اللَّهِ
وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا
فِي دَارِكُمْ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا

ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই, তিনি তোমাদের (এ) যমীন থেকেই পয়দা করেছেন এবং তাতেই তিনি তোমাদের বসবাস করিয়েছেন, অতপর (কৃতজ্ঞতাস্বরূপ) তোমরা তাঁর কাছে গুনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতপর (তাওবা করে) তাঁর দিকেই ফিরে এসো, অবশ্যই আমার মালিক (প্রত্যেকের) একান্ত নিকটবর্তী এবং (প্রত্যেক ব্যক্তির) ডাকের তিনি জবাব দেন। ৬২. তারা বললো, হে সালেহ, এর আগে তুমি এমন (একজন মানুষ) ছিলে, (যার) ব্যাপারে আমাদের মধ্যে (বড়ো) আশা করা হতো, (আর এখন) কি তুমি আমাদের সে সব মাবুদের এবাদাত থেকে বিরত রাখতে চাও যাদের এবাদাত আমাদের পিতা-মাতারা (যুগ যুগ থেকে) করে আসছে, (আসলে) তুমি যে (দ্বীনের) দিকে আমাদের ডাকছো, সে ব্যাপারে আমরা সন্দেহে নিমজ্জিত আছি, (এ ব্যাপারে) আমরা খুব দ্বিধাগ্রস্তও বটে! ৬৩. সে বললো, হে আমার জাতি, তোমরা কি এ বিষয়টি নিয়ে একটুও চিন্তা করে দেখোনি যে, যদি আমি আমার মালিকের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট দলীলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর অনুগ্রহ দিয়ে (ধন্য করে) থাকেন, (তা সত্ত্বেও) যদি আমি কোনো গুনাহ করি তাহলে কে এমন আছে, যে আল্লাহর মোকাবেলায় আমাকে সাহায্য করবে? (আসলে অন্যায় আবদার করে) তোমরা আমার ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই তো বাড়াচ্ছো না? ৬৪. হে আমার সম্প্রদায়, এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার (পাঠানো) উটনী, (তোমরা যে নিদর্শন চাচ্ছিলে) এটা হচ্ছে তোমাদের জন্যে (সে) নিদর্শন। অতপর (আল্লাহর) এ (নিদর্শন)-কে ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর যমীনে চরে খাক, তাকে কোনো রকম কষ্ট দেয়ার নিয়তে ছুঁয়ো না, (তেমনটি করলে) অতিসত্ত্বর (বড়ো ধরনের) আযাব তোমাদের পাকড়াও করবে। ৬৫. অতপর তারা সেটিকে বধ করে ফেললো, সে তারপর (তাদের) বললো (চলে যাও), তোমরা তোমাদের নিজ নিজ ঘরে তিন দিন জীবন উপভোগ করে নাও; (আযাবের ব্যাপারে আল্লাহর) এ ওয়াদা কখনো মিথ্যা হবার নয়। ৬৬. এর পর (ওয়াদামতো যখন আমার (আযাবের) নির্দেশ এলো (এবং

نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿٦٦﴾ وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٦٧﴾ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَآ اِنَّ ثَمُوْدَاۡ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ﴿٦٨﴾

তা তাদের ভীষণভাবে পাকড়াও করলো), তখন আমি সালেহকে এবং তার সাথে আরো যারা ঈমান এনেছিলো তাদের সবাইকে আমার রহমত দিয়ে সে দিনের অপমান (-কর আযাব) থেকে বাঁচিয়ে দিলাম; অবশ্যই (হে নবী,) তোমার মালিক শক্তিমান ও পরাক্রমশালী। ৬৭. অতপর যারা (আল্লাহর দ্বীনের সাথে) যুলুম করেছে, এক মহানাদ (তাদের ওপর মরণ) আঘাত করলো, ফলে তারা তাদের ঘরসমূহে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো, ৬৮. (অবস্থা দেখে মনে হলো) যেন তারা কোনোদিন সেখানে বসবাসই করেনি। শুনে রাখো, সামুদ জাতি তাদের মালিককে অস্বীকার করেছিলো; আরো জেনে রেখো, (নির্মম) এক ধ্বংসই ছিলো সামুদ জাতির জন্যে (নিদৃষ্ট পরিণাম)!

তাফসীর

আয়াত ৫০-৬৮

'আর আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছি। সে বললো, হে আমার জাতি, একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করো। তিনি ছাড়া সর্বময় ক্ষমতার মালিক তোমাদের জন্যে আর কেউ নেই.........শোনো, নিশ্চয়ই সামুদ জাতি কুফরী করেছে তাদের রবের সাথে। জেনে রাখো, (সত্য সঠিক পথ থেকে) বহু যোজন ব্যাপী দূরত্ব রয়েছে সামুদ জাতির জন্যে। (আয়াত ৫০-৬৮)

হুদ (আ.)-এর বিস্তারিত ঘটনা

নূহ (আ.)-এর জাতির বিবরণ ইতিহাসে এসে গেছে। ওদের অধিকাংশই ছিলো সত্য ও সত্যের বাহক নূহ (আ.)-কে অস্বীকারকারী, বরং তারা তো দাবী করে বলেছিলো যে, নূহ (আ.) মিথ্যাবাদী, যার ফলে সর্বগ্রাসী প্লাবন তাদেরকে ডুবিয়ে মেরেছিলো এবং মুছে দিয়েছিলো ইতিপূর্বেকার যাবতীয় ইতিহাস। এ অভিশপ্ত জাতি যেমন পার্থিব জীবন ও জীবনের সকল আনন্দ থেকে দূরে চলে গিয়েছিলো, তেমনি একইভাবে তারা মহান আল্লাহর দয়া রহমত থেকেও (পরবর্তী সর্বকালের জন্যে) তারা দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো। যারা এ ধ্বংস থেকে রেহাই পেয়েছিলো, তারাই পৃথিবীতে নতুন জাতি গড়ে তুলেছিলো এবং আল্লাহর বিধি বিধান এবং তাঁর ওয়াদা পূরণ করার জন্যে তাঁর খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলো। 'সুতরাং শুভ পরিণতি তো আল্লাহভীরু (মুত্তাকী)দের জন্যেই নির্ধারিত রয়েছে।

আর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা নূহ (আ.)-এর কাছে ওয়াদা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'হে নূহ, আমি জানাচ্ছি যে, আমার পক্ষ থেকে সেই শান্তি এবং অভাবনীয় রহমত ও বরকতসহ (তোমার জাহাজ থেকে) নেমে যাও, যা আমি তোমার জন্যে এবং তোমার সাথী সকল উম্মতের জন্যে বরাদ্দ করেছি। এসব উম্মতকে খুব শীঘ্রই আমি দুনিয়ার বহু নেয়ামত দান করবো, কিন্তু তারপর পুনরায় (ওদের না ফরমানীর কারণে) আমার পক্ষ থেকে এসে পড়বে ওদের ওপর বেদনা দায়ক শাস্তি।'

এরপর সময়ের আবর্তনের সাথে সাথে ইতিহাসের পট পরিবর্তন হলো এবং সত্যে পরিণত হল আল্লাহর (আযাব দেয়ার) ওয়াদা। আর আদ জাতি ছিলো নূহ (আ.)-এরই বংশোদ্ভূত, যারা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শহর নগর বন্দরে ছড়িয়ে পড়েছিলো। ওদের পর আগমন ঘটলো সামুদ জাতির, তাদের ওপরও আল্লাহর ওয়াদা সত্যে পরিণত হলো। অর্থাৎ তারা অধিকারী হলো প্রভূত নেয়ামতের। কিন্তু সময়ান্তরে তাদের ওপরও এসে পড়লো সর্বগ্রাসী কঠিন আযাব। এরশাদ হচ্ছে,

'আর বহু জনপদ ছড়িয়ে পড়বে, শীঘ্রই আমি তাদেরকে দেবো অনেক নেয়ামত, তারপর আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে স্পর্শ করবে বেদনাদায়ক আযাব।'

পুনরায় জাহেলিয়াত বা হঠকারিতা ও যুক্তি বুদ্ধিহীন কাজের প্রসার ঘটলো, যেমন ইতিপূর্বে বারবার ঘটেছে। আদম (আ.)-এর পর তাঁর বংশধরদের মধ্যে যারা মুসলমান (আল্লাহর ব্যবস্থার অনুসারী) ছিলো, তাদের মধ্যে কতো মতাবলম্বী জাতির যে অভ্যুদয় ঘটেছে, তার খবর আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ রাখে না। সুতরাং অবশ্যই এটা সত্য যে আদম (আ.)-এর বংশের লোকেরা তাঁর খেলাফতের আমল শেষ হয়ে যাওয়ার পরও বহু কাল ধরে তাদের বাপ দাদার ধর্ম 'দ্বীন' ইসলামের ওপর টিকে থেকেছে। অবশেষে তাদেরকে এ মহান জীবন ব্যবস্থা থেকে সরিয়ে নিয়ে ওই জাহেলিয়াতের মধ্যে ফেলে দিয়েছে, যার সম্মুখীন হয়েছিলেন নূহ (আ.)। তারপর নূহ (আ.) এলেন এবং জাহেলিয়াত থেকে মুক্তি পাওয়া যাদের নসীবে ছিলো, তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে সত্যের ঝান্ডা তলে সমবেত হলো। ধ্বংস হয়ে গেলো তারা, যারা তাঁর সাথে যোগ দিলো না এবং ওই কাফেরদের কোনো ঘর আর পৃথিবীর বুকে অবশিষ্ট থাকলো না। এরপর তাই ঘটলো যেমন নূহ (আ.) দোয়া করেছিলেন। অবশ্য এটাও সত্য যে নূহ (আ.)-এর পরে বহু কাল ধরে তাঁর বংশের লোকেরা ইসলামের ওপর টিকে ছিলো, শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে শয়তান তাদেরকেও পুনরায় বিপথগামী করে ফেলে এবং তারা আবার জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। এভাবে পরবর্তীতে আদ ও সামুদ জাতির পত্তন ঘটে ওই জাহেলিয়াতের পরিবেশে।

এরপর আসে আদ জাতি, এ কাবীলা বাস করতো আরব উপদ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত দীর্ঘ বালির পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে নির্মিত মযবুত কেল্লাসমূহে, আর সামুদ জাতি আরবের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত তবুক ও মদীনার মধ্যবর্তী নির্জন মাদায়েন এলাকায়। এ দুই জাতির প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ আমলে যেমন ছিলো অর্থ সম্পদে চূড়ান্তভাবে সমৃদ্ধ, তেমনি এদের শক্তি সাহসও বৃদ্ধি পেয়েছিলো অভাবনীয় রূপে। বরং বলা যায় পার্থিব জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সামগ্রীতে তারা ছিলো ভরপুর। কিন্তু হলে কি হবে, তাদের অহংকার ও না-শোকরীর কারণে তাদের প্রত্যেকের ওপর আল্লাহর শাস্তির ঘোষণাগুলো সত্যে পরিণত হলো। শক্তি ও সম্পদের নেশায় তারা নিজেদের মালিককে ভুলে গিয়ে মূর্তিপূজা এবং কুপ্রবৃত্তির পূজার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলো। আল্লাহপ্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করে তারা বান্দাদের বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করেছিলো এবং রসূলদেরকে অত্যন্ত নিকৃষ্টভাবে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিলো। সূরার শুরুতে বর্ণিত নূহ (আ.)-এর কাহিনীর মতো তাদের ঘটনাগুলোও এখানে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

এরশাদ হচ্ছে, 'আর আদ জাতির কাছে তাদেরই এক ভাই হূদ প্রেরিত হয়েছিলো। সে এসে বললো, হে আমার জাতি, একমাত্র আল্লাহরই গোলামী করো। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্যে কোনো মনিব মালিক শাসনকর্তা এবং আইনদাতা নেই। .... তাহলে আকাশ ঝরাবে তোমাদের ওপর প্রচুরভাবে তাঁর রহমতের বারিধারা এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শক্তির সাথে আরও অনেক শক্তি বাড়িয়ে দেবেন। আর খবরদার, অপরাধজনক কাজ করা অবস্থায় তোমরা তাঁর থেকে ফিরে যেয়ো না।'

হূদ (আ.) ছিলেন আদ জাতিরই একজন। এজন্যে তাঁকে ওদের ভাই বলে জানানো হয়েছে। তিনি ওদেরকে একতাবদ্ধ রাখার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন, যেহেতু একই কাবীলার মধ্যে প্রত্যেকেই ছিলো তারা পরস্পর আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। এখানকার আলোচনায় তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার কথা প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, তিনি জানতেন যে, কোনো জাতির মান মর্যাদা ও আয় উন্নতি তাদের একতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে, নির্ভর করে তাদের পারস্পরিক বন্ধন, সদুপদেশ ও ভ্রাতৃত্ববোধের ওপর। এ ভ্রাতৃত্ব বোধ যতো মযবুত হবে, ততো তারা তাদেরই ভাই নবী হূদ (আ.)-এর দরদ, সহানুভূতি ও কল্যাণকামিতার কথা অনুভব করতে পারবে। এ অনুভূতি যতো তীব্র হবে, ততোই তারা তাদের থেকে ভিন্ন মতের দিকে আহ্বানকারীর কথার মর্যাদা বুঝতে সক্ষম হবে, আর তখনই তারা বুঝবে, কেন প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের ওপর গড়ে ওঠা একতার মধ্যে তাদের ভাই নবী হূদ (আ.) বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করলেন। তখনই তারা বুঝবে কেন এহেন সচ্চরিত্রের অধিকারী নবী নতুন এ (তাওহীদ) বিশ্বাসীদের মধ্যে একতা গড়তে চাইলেন। তিনি তাদেরকে এ শিক্ষা দিতে চাইলেন যে, একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করার কারণেই মানুষের মধ্যে সত্যিকার একতা গড়ে উঠতে পারে। তিনি সবার রব এবং সবাই তাঁর বান্দা। এ বিশ্বাসের বন্ধন ছাড়া দ্বিতীয় এমন কোনো বন্ধন নেই, যা বিভিন্ন মন মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের মধ্যে অটুট সম্পর্কের সেতু গড়ে তুলতে পারে। এ কারণেই ইসলামী সমাজের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক দরদ মহব্বতের সম্পর্ক অন্য যে কোনো সমাজের লোকদের তুলনায় বেশী। এ একতার মাধ্যমেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে দ্বীন ইসলামের আসল প্রকৃতি এবং সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে ইসলামী আন্দোলনের পদক্ষেপগুলো। অতপর এ সম্প্রীতি বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে ইসলামের দাওয়াতী কাজের সূচনা হয়। রসূল ও তাঁর জাতি তো ছিলেন একই জনপদ উদ্ভূত, তাঁরা তো পরস্পর রক্ত সম্পর্ক আত্মীয়তা ও একই এলাকার মানুষ হিসাবে পরস্পর অত্যন্ত নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। তারপর আকীদার পার্থক্যের কারণে তারা একই জাতির মানুষ হওয়া সত্তেও বিভিন্ন মতাবলম্বী জনপদে বিভক্ত হয়ে যান। এক দল হয়ে যায় মুসলিম অর্থাৎ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী এবং অন্য দলটি থেকে যায় মোশরেক, আল্লাহর ক্ষমতায় অপর কাউকে অংশীদার মান্যকারী। আকীদা বিশ্বাসের এ পার্থক্য তাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এ বিচ্ছিন্নতার কারণেই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে সাহায্য দান করার ও কাফেরদেরকে ধ্বংস করার প্রতিশ্রুতি পালন করে থাকেন। তবে এ ওয়াদা আল্লাহ তায়ালা ততোক্ষণ পর্যন্ত পূরণ করেন না, যতোক্ষণ না তাদের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা স্থির ও পরিপূর্ণ হয়ে যায়, স্পষ্ট না হয়ে যায় তাদের পরস্পর মারমুখী অবস্থানসমূহ। নবী ও তাঁর সংগী মোমেনরা তাদের জাতির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করেন। তাদের পূর্বেকার সম্পর্ক সম্বন্ধ কেটে দেয়ার ঘোষণা না দেন, নৈকট্যের বন্ধনকে। মোমেনগণ অস্বীকার না করেন তাদের সাবেক নেতাদের মুরব্বিয়ানা ও কর্তৃত্বকে এবং পুরোপুরি সোপর্দ না করেন অভিভাকত্বের অধিকারকে তাদের রব একমাত্র আল্লাহর হাতে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ সিদ্ধান্তকে তখনই কার্যকরী করেন, যখন মুসলমানরা তাদের পরিচালনার ভার নিরংকুশভাবে সোর্পদ করেন তাদের হাতে, যারা তাদেরকে আল্লাহর দিকে এবং তাঁর বান্দার জন্যে প্রেরিত জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের দিকে আহ্বান জানায়। একমাত্র এ সময়েই এ দলের প্রতি আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর ভিন্নধর্মী ব্যবহারকে বাস্তবায়িত করেন, এর পূর্বে মোমেনদের জন্যে তাঁর প্রতিশ্রুত ওয়াদা আল্লাহ তায়ালা পূরণ করেন না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে পাঠালেন।' হূদকে পাঠিয়ে তিনি বললেন, ওদের কাছে আমি হূদকে যেমন করে পাঠিয়েছিলাম আমি পাঠিয়েছিলাম নূহকে তার জাতির কাছে, যা ইতিপূর্বেকার কাহিনীতে বলা হয়েছে।

'সে বললো, হে আমার জাতি ....'।

আল্লাহর নবী হূদ তার জাতিকে এ আবেগ মহব্বতের সাথে ডাক দিলেন, ডাক দিলেন পূর্বেকার সেই সম্পর্কের দোহাই দিয়ে, যা তাদেরকে পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিলো, যেন তাদের চেতনা উজ্জীবিত হয় এবং পরিতৃপ্ত মনে তারা এগিয়ে আসতে পারে সেই কথার দিকে, যা তিনি বলছেন। তাদের মন যেন বলে ওঠে, 'নেতা তাদের আপন জনগণের সাথে কখনও মিথ্যা কথা বলতে পারেন না এবং সকল ভালো কাজে যে মহান ব্যক্তি উৎসাহ দিচ্ছেন, তিনি তাঁর জাতিকে কখনও ধোকা দিতে পারেন না বা ভুল পথে চালিত করতে পারেন না।' দেখুন, কতো হৃদয়স্পর্শী তাঁর আদরের ভাষা। এরশাদ হচ্ছে,

'সে বললো, হে আমার জাতি, নিরংকুশভাবে আল্লাহর দাসত্ব করো, তিনি ছাড়া সর্বময় ক্ষমতার মালিক তোমাদের জন্যে আর কেউ নেই।'

এ একই কথা নিয়ে সকল রসূল (দুনিয়াতে) এসেছেন এবং প্রতি যামানাতেই জনগণ তাদেরকে অস্বীকার করেছে, মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত করেছে, যার বিবরণ ইতিপূর্বে এসে গেছে। তারা ওই মোমেন ব্যক্তিদের বিশ্বাস ও বাস্তব জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেনি, যারা নূহ (আ.)-এর সাথে জাহাজ থেকে নেমে পৃথিবীর বুকে পুনরায় বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং বিশ্বব্যাপী নতুন এক জাতির পত্তন ঘটিয়েছিলেন। নবীর আনীত ও ওইসব মোমেনের প্রদর্শিত জীবন পথ থেকে পরবর্তীকালের লোকেরা এভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কাজের সূচনা করেছিলো যে, তারা ওই অল্প কিছু সংখ্যক মোমেন লোকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন শুরু করে দেয়, যারা নূহ (আ.)-এর সাথে হাজাজে আরোহী ছিলো! তারপর তাদের এ শ্রদ্ধাবোধ যুগের পর যুগ ধরে এবং বংশানুক্রমিকভাবে বাড়তে থাকে, এরপর তাদের আত্মাগুলো ওদের বিবেচনায় উপকারী গাছ ও পাথরের রূপ নিতে থাকে, তার পরবর্তীকালে এসব বস্তু তাদের মাবুদ (পূজ্য বস্তু) হিসাবে গৃহীত হয়। তারা এসব বস্তুকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং সমাজের কাছে এ সকল বস্তুর শক্তি ক্ষমতার কথা পেশ করে, তাদের সামনে মাথা নত করতে থাকে ও তাদের কাছে নিজেদের প্রয়োজন ব্যক্ত করে সাহায্য চাওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করার খেদমত আনজাম দেয় গীর্জার পুরোহিত ও ধর্মীয় নেতারা। এরা ওই একই পদ্ধতিতে পৌত্তলিকতা পূজার দিকে মানুষকে এগিয়ে দেয়, যা প্রাক্তন জাহেলিয়াতের আমলে বর্তমান ছিলো। এভাবে দেখা যায় যে, সঠিক ও মূল একত্ববাদ থেকে যখন মানুষ সরে গেছে, তখন একই ধরনের জাহেলিয়াতের মধ্যে তারা ঘেরাও হয়ে গেছে, একই পদ্ধতিতে জীবন পথে তারা চলেছে এবং একইভাবে সৃষ্ট বস্তু বা কোনো মানুষের পূজা করতে শুরু করেছে, যাদের হাতে প্রকৃতপক্ষে কোনোই শক্তি ক্ষমতা নেই। সত্যিকারে চিন্তা করলে দেখা যাবে, আল্লাহর আনুগত্য বাদ দিয়ে এসব জিনিসের পূজা উপাসনার প্রতি কোনো জাগ্রত বিবেকের কোনো সাড়া নেই। আল্লাহ থেকে মুখ ফেরানো এমন একটি পদক্ষেপ, যার থেকে কালক্রমে সীমাহীন বিবেক বুদ্ধি বহির্ভূত কাজ হতে থাকে, যা গুনে শেষ করা যাবে না এবং ওই ভ্রান্তিসমূহের ব্যাপকতা কতো, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নিরূপণ করতে পারে না।

অবস্থা যাই হোক না কেন, হূদ (আ.)-এর জাতি ছিলো মোশরেক। তারা একমাত্র আল্লাহর সামনেই দাসত্ব প্রকাশ করতো এবং তাঁর দেয়া জীবন ব্যবস্থা মেনে চলতো, তা নয়, বরং আরো বহু বস্তুকে তারা উপাস্য বানিয়ে নিয়ে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতো। এজন্যেই হূদ (আ.) তাদের কাছে একই তাওহীদের আহ্বান নিয়ে হাযির হলেন, যা নিয়ে অন্যান্য যামানায় এবং অন্যান্য দেশে বহু নবী এসেছেন। তারা এসে যে সব কথা বলে দাওয়াত দিয়েছেন, তা উদ্ধৃত করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'হে আমার জাতি, একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। .... তোমরা মনগড়া ব্যবস্থা মতো চলছো।'

আল্লাহ ছাড়া অন্য যে সব বস্তুর পূজা উপাসনা তোমরা করছো এবং কোনো চিন্তা ভাবনা না করে (আল্লাহর হুকুমের বিরোধী) অন্যান্য যাদের হুকুম তোমরা মানছো, আর আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার ভাগী মনে করে অন্য যাদেরকে তোমরা সাহায্যের জন্যে ডাকছো, এগুলো সবই হচ্ছে মনগড়া ....

নবী হুদ (আ.) খুব ব্যস্ত হয়ে তাঁর জাতির কাছে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পেশ করছেন এবং স্পষ্ট করে ও অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি তাঁর জাতিকে সঠিক পথ গ্রহণ করার জন্যে উৎসাহ দিচ্ছেন। তিনি তাদেরকে পরিষ্কার করে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, নিজ জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন ছাড়া তাঁর আর কোনো উদ্দেশ্য বা গরজ নেই। আর এ উপদেশ দান ও পথ প্রদর্শনের জন্যে তিনি তাদের কাছে কোনো প্রতিদান বা মজুরীও চান না। এ গুরু দায়িত্ব পালনের জন্যে তিনি মহান আল্লাহর কাছেই পুরস্কার চান, যিনি তাঁকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাঁর একমাত্র অভিভাবক। তাঁর কথা উদ্ধৃত করতে গিয়ে আল কোরআন বলছে,

'হে আমার জাতি, আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। প্রতিদান আমি চাই তাঁর কাছে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। এর থেকে কি তোমরা কিছুই বুঝছো না?'

'আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না' কথাটা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, হূদ (আ.)-এর জাতি তাঁকে দোষ দিতে গিয়ে এবং কটাক্ষপাত করতে গিয়ে বলতো যে, এসব দাওয়াত বা শুভেচ্ছা প্রদর্শনের মাধ্যমে তিনি অবশ্যই কিছু স্বার্থ বাগাতে চান বা কোনো না কোনো সময়ে মজুরী চেয়ে বসবেন। সেই কারণেই তিনি বলছেন, না, আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরী আশা করি না। এরপর তাদের বিবেককে আকর্ষণ করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, 'তোমরা কি বুঝছো না? তোমাদের বুঝশক্তিকে কি কাজে লাগাচ্ছ না?' এর দ্বারা ওদের ব্যবহারে বিস্ময়ও প্রকাশ করা হচ্ছে। যেহেতু তারা মনে করে যে, আল্লাহর রসূল হলে কি হবে, সে মানুষের কাছেই তো চায় তার প্রয়োজন মেটাবার মতো বস্তুসম্ভার। কিন্তু তাদের বুঝা দরকার যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর মালিক। তিনিই সেই মহান সত্ত্বা, যিনি সকল অভাবী লোকের অভাব মোচন করেন!

তারপর আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদেরকে তাওবাও এস্তেগফার করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করছেন এবং সূরাটির শুরুতে শেষ নবী (স.)-এর জবানীতে বারবার এ প্রসংগটির উল্লেখ করে জানাচ্ছেন যে নবীরা একমাত্র আল্লাহর কাছেই তাঁদের কাজের বিনিময় আশা করেন। হুদ (আ.) তাদের কাছে সেভাবে ওয়াদা করেছিলেন যেভাবে মোহাম্মদ (স.) তাদের কাছে ওয়াদা করেছেন এবং তিনি সতর্কও করেছিলেন সেভাবে যেভাবে মোহাম্মদ (স.) তাঁর উম্মতকে আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'হে আমার জাতি, তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও তারপর তোমরা তাওবা করো তাঁর কাছে (সর্বান্তকরণে এবং চূড়ান্তভাবে তাঁর দিকে ফিরে যাও), (তাহলেই) আকাশ তোমাদের ওপর প্রচুরভাবে বর্ষণ করবে তাঁর রহমতের বারিধারা এবং তোমাদের শক্তির সাথে মহান আল্লাহ আরো শক্তি বাড়িয়ে দেবেন। অতপর তোমরা আর অপরাধী হিসাবে ফিরে যাবে না।

অর্থাৎ তোমরা যে সব অপরাধজনক কাজে লিপ্ত রয়েছ, তার জন্যে তোমাদের রবের কাছে সময় থাকতেই মাফ চেয়ে নাও এবং পরিপূর্ণভাবেই তাঁর কাছে ফিরে যাও। অতপর তোমাদের

আচরণ দ্বারা নতুন এক অধ্যায় রচনা করো, যা তোমাদের নিয়তের স্বচ্ছতা প্রকাশ করবে এবং এমন সব কাজ তোমাদের দ্বারা সংঘটিত হবে, যা জানাবে তোমাদের ইচ্ছা-এরাদার আন্তরিকতা .... তাহলেই .... আকাশ (আল্লাহর হুকুমে) প্রচুরভাবে বর্ষণ করবে। ওদের ফল ও ফসলের জন্যে এবং গবাদিপশুর প্রয়োজনে ওই শুষ্ক মরু অঞ্চলের মধ্যে ওরা পানির জন্যে বড়ই আকাংখী ছিলো, প্রচুর বৃষ্টি হলে তারা জমি সেচ এবং পশুদের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে প্রচুর পরিমাণে পানি মওজুদ করে রাখতো।

আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছে ওয়াদা করছেন যে, তারা তাওবা করলে তিনি নিজ মেহেরবানীতে তাদের শক্তি আরো বহুলাংশে বাড়িয়ে দেবেন। তাই বলছেন,

'তিনি বাড়িয়ে দেবেন তোমাদের শক্তির সাথে আরো অনেক শক্তি ....' অর্থাৎ, তাঁর যে শক্তির পরিচয় তোমরা পেয়েছ, এ হচ্ছে সেই শক্তির প্রতিশ্রুতি,

'আর খবরদার, অপরাধী থাকা অবস্থায় তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।'

অর্থাৎ মুখ ফেরানোর দ্বারা এবং নবীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে খবরদার তোমরা এসব অপরাধ করো না।

এ ওয়াদার মধ্যে আমরা যেসব জিনিস দেখতে পাচ্ছি তা হচ্ছে, প্রচুর বৃষ্টির আশ্বাস এবং শক্তি বৃদ্ধির শুভ সংবাদ। এ সমস্ত নেয়ামত দানের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালার নিয়ম কার্যকর হয়, যা সৃষ্টির বুকে বিরাজমান স্থায়ী সকল নিয়ম ও বিধি বিধানের সাথে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যশীল। তাঁর এ দানের মধ্য দিয়ে বিশ্ব প্রকৃতির প্রতি তাঁর কৃপা ঝরে পড়ে, সেখানে সেই প্রকৃতির নিয়মের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবার সম্পর্ক কি?

শক্তি বৃদ্ধি জিনিসটা সহজেই বুঝা যায়, বরং এর বহিপ্রকাশ দেখাও যায়। অপরদিকে হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা এবং পৃথিবীতে ভালো কাজ, এ দুটি জিনিস তাওবাকারীদের কাজের মধ্যে শক্তি বাড়িয়ে দেয়। তাওবা করার কারণে যখন তারা ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করে এবং সীমিতভাবে পবিত্র খাদ্য খাবার গ্রহণ করে, তখন তাদের শরীর সুস্থ থাকার কারণে শক্তিও বৃদ্ধি পায়, বিবেক উদ্বেগমুক্ত থাকে এবং আরাম পায়, অংগ প্রত্যংগগুলো ধীরস্থিরভাবে, শান্তভাবে ও বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহর দিকে সর্বদা এগিয়ে যায়। শক্তি বৃদ্ধি পায় সেই সমাজে, যে সমাজে সে আল্লাহর বিধানমতো জীবন যাপন করায় এবং নেতৃত্ব দেয়ায় কল্যাণকর কিছু গড়ে তুলতে পারে, যার কারণে সবার ওপর তার মযবুত প্রভাব গড়ে ওঠে, তার নেতৃত্বে মানুষ আযাদীর স্বাদ পায় এবং তারা নিজেদেরকে সম্মানিত বোধ করে। তখন তারা আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য কারো মনগড়া আইন কানুনের কাছে মাথা নত করে না, বরং যালেম শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে 'সকল মানুষ সমান', এ নীতির ভিত্তিতে হক কথা বলার সাহস পায়। একইভাবে অন্তরের এই পরিচ্ছন্নতা এবং ভালো কাজ মানুষের শক্তিকে এমনভাবে বাড়িয়ে দেয় যে, তারা পৃথিবীতে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের যোগ্য হয়ে ওঠে। তখন তারা দুনিয়ার ঝোঁকপ্রবণ মানুষের দলে ভিড়ে গিয়ে নানা প্রকার সামাজিক প্রথার মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে না, আগর বাতি ও ধূপ জালিয়ে, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বা তবলা বাজিয়ে, নর্তন কুর্দন করে গানের লহরী ছুটিয়ে পার্থিব কোনো মনিবের মনোরঞ্জন করার কাজে নিয়োজিত হয় না এবং শংখ বা বাঁশী বাজিয়ে মানুষের প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহর কাছে আত্মনিবেদনের স্বাদ মেটায় না।

আর অবশ্যই সর্বদা এটা মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবীর এসব মনিব এবং যারা নিজেদেরকে ক্ষমতাবান বলে দাবী করে তারা সবাই মুখাপেক্ষী, অর্থাৎ কেউ এমন নেই যে বলতে পারে যে,

আমি কারো ওপর নির্ভরশীল নই। প্রত্যেকেই কারো না কারো পরিচালনার অপেক্ষা রাখে এবং তাকে অবশ্যই একথা মানতে হয় যে, তার ওপর কারো নিয়ন্ত্রণ আছে। যে সকল সামাজিক বা ধর্মীয় নেতা ও পূজারীদেরকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর শক্তি ক্ষমতা বিদ্যা বুদ্ধি, জ্ঞান ও দয়া অথবা শাস্তি দানের ক্ষমতার কিছু অংশের অধিকারী মনে করা হয়, তারাও যে নিজ নিজ ক্ষমতার পুরোপুরি মালিক এবং সে ক্ষমতার ওপর কথা বলার আর কেউ নেই, একথা কেউ মনে করে না বা বলেও না। সাধারণভাবে মানুষের ধারণা, এসব নেতা ও পূজারীরা মূল মালিকের শক্তি ক্ষমতার কিছু অংশ পেয়েছে এবং এসব ধারণা কল্পনা গড়ে তোলার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে বশীভূত করে তাদের আনুগত্য আদায় করা! সুতরাং বুঝা গেলো পালনকর্তা বা আইনদাতা সাজতে গেলে প্রয়োজন এমন কিছু শক্তি ক্ষমতার, যার দ্বারা মানুষকে বশীভূত করা যায়! আর ক্ষমতা বড় কষ্ট করেই লাভ করতে হয়। এর জন্যে ধর্মীয় নেতা ও পূজারীদের ক্লান্ত হয়ে যেতে হয় ওইসব লোক থেকে আনুগত্য আদায় করার জন্যে, যারা একমাত্র আল্লাহর কাছে নতি স্বীকার করেছে এবং এ পৃথিবীকে আবাদ করার জন্যে চেষ্টা করেছে, একে গড়ার জন্যে আত্মনিয়োগ করেছে এবং খেলাফতের দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে পৃথিবীর উন্নতি করতে চেয়েছে। কিন্তু যারা ওইসব মেকী রবকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, তাদের কাছে মাথা নত করেছে এবং তাদের কাছেই নিজেদের প্রয়োজন পূরণের আবেদন জানিয়েছে, তাদেরকে দেখা যায় তারা ডুগ ডুগি-তবলা হারমোনিয়াম এবং আরো অন্যান্য নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নাচ-গান ও আমোদ প্রমোদে মত্ত হয়ে রয়েছে।

যারা তাদের মনের মধ্যে এবং সমাজের নানা কাজে আল্লাহর বিধান মতে বিচার ফয়সালা করে না, সাধারণভাবে দেখা যায় তাদের শক্তি বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু বুঝতে হবে এ শক্তি তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে দেয়া হয় এবং ওই সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী চূড়ান্ত ফয়সালা নেমে আসে, ভেংগে যায় সেই সব অপশক্তি যা কোনো দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে নেই। হাঁ, পার্থিব জীবনের সুখ সমৃদ্ধির জন্যে তারা যে চেষ্টা সাধনা করে, যে শৃংখলা মেনে চলে, তার অবশ্যই একটা গুরুত্ব আছে এবং সাময়িক হলেও তার কিছু ফল তারা পায়, কিন্তু এটা খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় না। কেননা তাদের আবেগময় ও সামাজিকতাপূর্ণ জীবনের চাকচিক্যের প্রতিক্রিয়া একটা নির্দিষ্ট সময়েই শুরু হয়ে যায়।

এখন দেখুন 'বৃষ্টিবর্ষণ', 'প্রচুরভাবে'-এর দ্বারা আসলে কি বুঝাতে চাওয়া হয়েছে! মানুষের কাছে বাহ্যিকভাবে এটাই মনে হয় যে, বৃষ্টি হওয়ার একটা বিশেষ নিয়ম আছে এবং সেই নিয়মেই বৃষ্টি হয়, তাহলে বিশেষ কারো ভাল ব্যবহারে প্রচুরভাবে বৃষ্টিবর্ষণ করানোর তাৎপর্য কি? এর জওয়াব হচ্ছে, আল্লাহর স্থায়ী নিয়ম অনুযায়ী বৃষ্টি হওয়ার অর্থ তো এ নয় যে, বিশেষ কোনো সময়ে এবং বিশেষ কোনো এলাকায় বৃষ্টি হওয়া উপকারী হবে না এবং অপর কোনো সময়ে এবং অন্য কোনো এলাকায় এটা অপকারী হবে না। আর এসব স্থায়ী নিয়মের অর্থ এটাও নয় যে, বৃষ্টি দ্বারা কোনো জাতিকে জীবন দান করা এবং অপর কোনো জাতিকে ধ্বংস করা আল্লাহর পক্ষে সম্ভব নয়। অথবা এর দ্বারা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী কাউকে সুসংবাদ দান এবং কারো জন্যে দুঃসংবাদের বার্তা বয়ে আনাও সম্ভব নয়। প্রকৃতির মধ্যে যে সব নিয়ম-পদ্ধতি নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে, সে সব তো তাঁরই সৃষ্টি এবং তাঁর নিয়মকে সর্বাবস্থায় চালু রাখার জন্যে তিনিই প্রকৃতির বুকে বিরাজমান সব কিছুর উদ্দেশ্য বা কারণও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এসব কিছু সত্তেও সকল জিনিসের পেছনে আল্লাহর সেই স্বাধীন ইচ্ছাই কাজ করে যাচ্ছে, যা ওই কারণগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং বাহ্যিক জিনিসগুলোকেও পরিচালনা করছে। একমাত্র সীমা অতিক্রমকারী ধূর্ত

ব্যক্তিদেরকে তিনি সাময়িকভাবে কিছুটা ঢিল দিয়েছেন, যাতে করে আল্লাহর ফয়সালা তিনি যেভাবে চান এবং যেখানে চান, সেভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে। তাঁর সেই অপার ক্ষমতার দ্বারা এ ফায়সালা গৃহীত হয়, যার দ্বারা তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু পরিচালনা করছেন।(১) তাঁর এ ক্ষমতাকে কেউ সীমিত করতে পারে না। মানষের কাছে তাঁর প্রদত্ত এ ওয়াদা অধিকাংশ স্থানে বেশ বুঝা যায়।

দাওয়াত অবজ্ঞাকারী জাতির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ

এটাই ছিলো হূদ (আ.)-এর দাওয়াত। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, তাঁর দাওয়াত দানের সাথে তিনি অলৌকিক কোনো মোজেযা দেখাননি। সম্ভবত এসময়ে নূহ (আ.)-এর অন্তর্ধান ও বিগত সেই মহা প্লাবনের যামানা খুব বেশী দিন পূর্বে অতিক্রান্ত হয়নি। এজন্যেই হয়ত হূদ (আ.)-কে কোনো মোজেযা দেয়া হয়নি। নূহ (আ.)-এর ঘটনাবলী তখনকার লোকের স্মৃতিতে তখনও পুরোপুরি তাজা ছিলো এবং সাধারণভাবে লোকের মুখে মুখে এর চর্চাও ছিলো। তাদের সম্পর্কে এ তথ্য অন্য সূরাতেও আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তাদের না-ফরমানী করা ও তাদের ওপর গযব নাযিল হওয়ার কারণ এটাই বুঝা যায় যে, তারা আল্লাহর নবী হূদ (আ.) সম্পর্কে মারাত্মক কু-ধারণা পোষণ করছিলো। যদিও তাকে, ওরা ভালো করেই জানতো, জানতো তার সততা ও সচ্চরিত্রতা সম্পর্কে। ...... এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা বললো, ওহে হূদ, তুমি তো (তোমার নবুওতের প্রমাণ হিসাবে) কোনো নিদর্শন নিয়ে আসোনি। শুধু তোমার মুখের কথায় আমাদের দেব দেবীদেরকে আমরা পরিত্যাগ করতে পারি না। আর প্রকৃতপক্ষে তোমার প্রতি আমরা পুরোপুরি আস্থাশীলও নই। বরং আমরা তো বলবো, আমাদের দেব দেবীরা তোমাকে অবশ্যই অভিশাপ দিয়েছে (যার ফলে তোমার এ ভীমরতি হয়েছে) ....।'

দেখুন, সত্যবিমুখতা তাদের অন্তরের মধ্যে কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিলো যে, তারা হূদ (আ.) সম্পর্কে একথা বলতে দ্বিধাবোধ করেনি যে, তিনি পাগলের প্রলাপ বকছেন, আর এর কারণ আবিষ্কার করতে গিয়ে তারা বলছে যে, তাকে তাদের মনগড়া কোনো এক মাবুদ (দেবতা) অভিশাপ দিয়েছে, যার ফলে তার এই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। তাই তারা বলছে,

'ওহে হূদ, আমাদের কাছে কোনো স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসো না।'

প্রকৃতপক্ষে তাওহীদ বা আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালাই যে সকল সৃষ্টির একচ্ছত্র মালিক, মনিব ও বাদশাহ একথা এতোই স্পষ্ট যে, একথা বুঝানোর জন্যে কোনো প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু উৎসাহদান ও উপদেশদানের। প্রয়োজন মানুষের বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তিপূর্ণ কথা বলার ও আসমানী বাণীর গুরুত্ব উপলব্ধি করানোর। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তোমার কথা মতো আমরা আমাদের মাবুদদের ছেড়ে দিতে পারি না।' অর্থাৎ কোনো দলীল প্রমাণ ছাড়া তুমি যা বলবে, সেই কথা মতো আমরা আমাদের মাবুদদেরকে ছেড়ে দেবো, এটা সম্ভব নয়।

'আর আমরা তোমার প্রতি আস্থাশীলও নই।'

অর্থাৎ তোমার কথায় বিশ্বাস করে এবং সংগে সংগে তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে তুমি যা করতে বলছো, তাই করবো এমনটাও কখনো হবে না। তোমার এ আহ্বানকে তো আমরা নিছক

(১) এ কাহিনীর শেষের দিকে এ বিষয়ের ওপর আরো বিস্তারিত বিবরণ আসছে।

এক পাগলের প্রলাপ বলে মনে করি। আরো মনে করি, আমাদের কোনো এক দেবতার অভিশাপে তোমার মাথা গোলমাল হয়ে গেছে।

এমতাবস্থায়, হূদ (আ.)-এর জন্যে দৃঢ়সংকল্প থাকা এবং একমাত্র আল্লাহর দিকে রুজু করা ও তাঁর সাহায্যের ওপর ভরসা করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই ছিলো না। অথবা হয়তো তিনি তাদেরকে কিছু ধমকাতে পারতেন এবং মিথ্যা সাব্যস্তকারীদেরকে শেষ বারের মতো সতর্ক করেও দিতে পারতেন। অথবা তার ও তার জাতির মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো, তাও ছিন্ন করে ফেলতে পারতেন এবং তাকে মিথ্যাবাদী বলে দাবী করার কারণে তাদের ব্যাপারে মাথা ঘামানো বন্ধ করে দিতে পারতেন। তাই তাঁর কথাগুলো উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

'আর সে বললো, আমি একমাত্র আল্লাহকেই সাক্ষী মানছি, তোমরাও সাক্ষী থাকো, তাঁর ক্ষমতায় অন্য কেউ শরীক আছে বলে তোমরা যে মনে করো, এসব মারাত্মক অপরাধ থেকে আমি সম্পূর্ণ দায়িত্বমুক্ত।'

অর্থাৎ এর জন্যে কঠিন শাস্তি নেমে এলে আমি তোমাদেরকে কোনোই সাহায্য করতে পারব না। অতএব, যতো খুশী তোমরা সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে চাও করো, আর আমাকে কিছুমাত্র ছাড় দিয়ো না। আমি অবশ্যই আমার রবের ওপর ভরসা করছি, যিনি তোমাদেরও রব .... নিশ্চয়ই আমার রব সকল কিছুর হেফাযতকারী। ....

হূদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে এটা ছিলো তাঁর জাতির প্রতি চরম সতর্কবাণী অর্থাৎ 'এখন তোমাদের ব্যাপার তোমরাই বুঝবে। তোমাদের কোনো ব্যাপারে আমি আর কোনোভাবে দায়ী থাকলাম না।' তিনি ছিলেন তাদেরই লোক, ছিলেন তাদেরই এক ভাই। যেহেতু তারা আল্লাহর পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথ ধরেছিলো, এজন্যেই তাঁর ভয় হচ্ছিল, যে কোনো সময় তাদের ওপর এক ভীষণ আযাব এসে পড়বে। আর এজন্যেই তাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে সব রকমের চেষ্টা করে অবশেষে তিনি স্পষ্ট করে তাঁর দায়িত্ব মুক্তির কথা জানিয়ে দিলেন। মানুষে মানুষে অন্যান্য যতো সম্পর্কই থাকুক না কেন, অন্তরের গভীরে বিরাজমান আকীদার সম্পর্কই আসল সম্পর্ক। এ সম্পর্ক কেটে গেলে অন্য কোনো বন্ধন তাদেরকে এক জাতি বানিয়ে রাখতে পারে না, পারে না এক জাতি হিসাবে তাদেরকে ধরে রাখতে।

এজন্যে, আল্লাহকে সাক্ষী রেখেই হূদ (আ.) তার বিপথগামী জাতি থেকে দায়িত্বমুক্ত হওয়ার ঘোষণা দিয়ে দিলেন, ঘোষণা দিলেন তাদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার এবং সম্পূর্ণভাবে তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার কথা। তাদের মুখের ওপর একথাগুলো চূড়ান্তভাবে বলে দিয়ে তাদেরকেই এ বিষয়ে সাক্ষী রাখলেন যে, 'তিনি তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা সময়মতো জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের থেকে পুরোপুরিভাবে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন এ ব্যাপারে যেন তাদের মনে বিন্দুমাত্র কোনো সন্দেহ না থাকে যে, 'তাদেরকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়ে তিনি দূরে সরে যেতে পারেন' কিনা এবং তারা যেন বুঝে নেয় যে, বিপদ এলে তিনি আর তাদের সাথে কিছুতেই থাকবেন না!

এটাই ছিলো ঈমানের দাবী এবং ঈমানকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দানের উপযুক্ত ব্যবহার। ঈমানের সাথে বিশ্বস্ততা ও ঈমানের ওপর পরিতৃপ্ত থাকার এটাই ছিলো সঠিক পদক্ষেপ।

আর ওই ব্যক্তির কথা চিন্তা করতে গিয়ে মানুষ হয়রান হয়ে যায় যে, কেমন করে কোনো নির্বোধ অথচ শক্তিশালী ও যুলুমবাজ জাতির মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে সে সত্য কথা বলছে, কিছুতেই সে বুঝে উঠতে পারে না যে, এসব মেকী ও মিথ্যা দেব দেবীরা মানুষকে কিভাবে প্রভাবিত করে এবং তাকে চরম অপমানজনক অবস্থায় ফেলে দেয়। আর এভাবে শয়তানী প্ররোচনায় পড়ে

আল্লাহর দিকে দাওয়াত দানের কাজটিকে তারা কেমন করে তুচ্ছ জ্ঞান করে। আশ্চর্য লাগে ওই সব লোকের কথা মনে করে, যারা মিথ্যা ওই দেব দেবীদের সামনে এমন ভক্তি ভরে নতজানু হয়ে পড়ে যে, তাদের আকীদা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে যায় এবং তখন তাদের বিবেক তাদেরকে বারবার আঘাত করতে থাকে ও তাদের নানাভাবে তিরস্কার করে। কিন্তু এরপরও তাদের মধ্যে এমন প্রবল লোভ জেগে ওঠে যে, তাদের যোগ্যতাকে তারা আর কাজে লাগাতে পারে না এবং তাদের পরবর্তীদের জন্যে এমন কোনো ভালো জিনিস তারা ছেড়ে যেতে পারে না, যার কারণে তাদের ওপর গযব আসা বন্ধ হতে পারে।

এমতাবস্থায়, অবশ্যই মানুষ ওই ব্যক্তির ঝুঁকিপূর্ণ তৎপরতা ও কর্মকান্ডের ওপর বিস্মিত না হয়ে পারে না যে, এমন হঠকারী যালেম গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু তার এ বিস্ময় তখনই কেটে যায়, যখন এহেন মোজাহেদের উৎসাহ উদ্দীপনা ও সাহসের মূল উৎস তারা দেখতে পায়।

এমন মোজাহেদদের মনোবল ও সাহসের মূল উৎস হচ্ছে ঈমান, আল্লাহর ওপর ভরসা এবং তাঁর সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততা। অটল এ ঈমানদার ব্যক্তি কখনো মনকে দোদুল্যমান করে না। এরপর যখন সরাসরি আল্লাহর ওয়াদার কথা সে জানতে পারে, তখন মনে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহও থাকে না, যেহেতু মহান আল্লাহর আশ্বাসবাণী তার হাতকে শক্তিশালী করে ও দু'বাহুর মাঝে অবস্থিত তার মনে এনে দেয় অপরিমিত সাহস। তখন তার অন্তর তাকে ডাক দিয়ে বলে ওঠে, এ সাহায্যের আশ্বাসবাণী এটা কোনো ভবিষ্যতের ওয়াদা নয়; বরং রব্বুল আলামীনের সাহায্য প্রতি মুহূর্তে সে এমনভাবে প্রত্যক্ষ করতে থাকে যে, তার দিল নিশ্চিন্ততায় ভরে যায় এবং অন্তরে নেমে আসে পরম প্রশান্তি। এরশাদ হচ্ছে,

'সে বলে উঠলো, অবশ্যই আমি আল্লাহকে সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করছি, আর তোমরাও সাক্ষী থাকো যে, আমার কোনো সম্পর্ক নেই তাদের সাথে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর ক্ষমতায় অংশীদার মনে করছো। অতএব, তোমরা আমার বিরুদ্ধে সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করো, আর আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো সুযোগ দিয়ো না। .... অবশ্যই আমার রব সব কিছু করতে সক্ষম। (আয়াত ৫৪-৫৭)

আল্লাহর সাথে যে সব তোমরা শরীক বানাচ্ছ, সে সবের সাথে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালাকে সাক্ষী রেখেই আমার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা দিচ্ছি। আর তোমরাও সাক্ষী থাকো যে, তোমরাও আমার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলে। আর অবশ্যই তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কাছে একটি দলীল হিসাবে একথা হাযির হয়ে থাকবে যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক মানার কারণে তোমাদের সাথে আমি সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছিলাম। এরপর তোমরা এবং যাদেরকে তোমরা তোমাদের মনিব ও কর্ম নির্বাহক বলে মনে করে পূজা করো, তারা সবাই মিলে আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করে দেখো পারো নাকি। তারপর নির্দ্বিধায় আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো, আর আমাকে বাঁচার কোনো সুযোগ দিয়ো না। তোমাদের কারো কোনো পরওয়াই আমি করি না, কাউকে কোনো ভয়ও আমি করি না।

'অবশ্যই আমি (একমাত্র) আল্লাহর ওপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রব, তোমাদেরও রব।'

অর্থাৎ যেভাবেই তোমরা আমাকে অস্বীকার করো না কেন এবং আমাকে মিথ্যাবাদী বানাও না কেন, এ সত্য অবশ্যই কায়েম হবে যে, আমার ও তোমাদের বাদশাহ মনিব মালিক ও আইনদাতা একমাত্র আল্লাহ। এক আল্লাহ তায়ালাই আমার রব, তোমাদেরও রব, তিনি নির্বিচারে সবারই রব, একথা বারবার বলে দেয়ার অপেক্ষা রাখে না, তাঁর সাথে কারো কোনো প্রকার অংশীদারিত্ব নেই।

'পৃথিবীর বুকে এমন কোনো প্রাণী নেই, যাকে তিনি নিয়ন্ত্রণ না করছেন।'

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শক্তি ক্ষমতার এক বোধগম্য রূপ ফুটে উঠেছে এ আয়াতাংশে। এতে জানানো হচ্ছে যে, সকল কিছুর ওপর তাঁর ক্ষমতা বিরাজমান রয়েছে এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোনো কিছুই নেই। মানুষ, পশু পাখী, কীট পতংগ সব কিছুর ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ এমন ভাবে রয়েছে যে, তা স্পষ্ট দেখা যায় এবং অনুভবও করা যায়। বিশ্বের সব কিছুর ওপর তাঁর এ নিয়ন্ত্রণ পরিপূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে প্রাণী ও নিষ্প্রাণ সব কিছুর মধ্যে, এমনকি হঠকারী যালেম, কঠোরপ্রাণ লোক, শারীরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী ও দুর্বল লোকদের মধ্যে, তাদের ইচ্ছা এরাদা ও চেতনার মধ্যে রাখা হয়েছে চমৎকার এক ভারসাম্য, যা সর্বশক্তিমান মালিকের ইচ্ছায় তাদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পরিচালিত করে এবং এ নিয়মের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আমার রব সরল সঠিক ও দৃঢ় পথে রয়েছেন' (সেই পথেই তিনি সবাইকে চালাচ্ছেন, যে পথে নেই কোনো ভাংগন বা বিচ্ছিন্নতা)।'

অর্থাৎ একথা দ্বারা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শক্তি, দৃঢ়তা ও সংকল্প প্রকাশ করা হয়েছে।

এ সকল চূড়ান্ত শক্তিদৃপ্ত বাক্য দ্বারা আমরা গভীরভাবে তাঁর বড়ত্ব ও সব কিছুর ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার কথা জানতে পাই। আল্লাহর নবী হূদ (আ.) তাঁর এ চূড়ান্ত শক্তি ক্ষমতার কথা গভীরভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর রবের পক্ষ থেকেই তাঁর অন্তরের অভ্যন্তরে এ চেতনা জাগিয়ে দেয়া হয়েছিলো। সুস্পষ্টভাবে তিনি বুঝেছিলেন যে, তাঁর রব এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতের রব সেই মহান সত্ত্বা যাঁর হাতে রয়েছে সব ক্ষমতা এবং যে কোনো সময়ে তিনি তা প্রয়োগ করতে পারেন, তাঁকে বাধা দেয়ার কেউ নেই। তাই ঘোষণা দেয়া হয়েছে,

'যেখানে যতো জীব জন্তু সব কিছুর ওপর রয়েছে তাঁর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ।'

আর তার জাতির মধ্যে ওই কঠিন হৃদয় ব্যক্তিবর্গ ছিলো এমন হিংস্র পশু, যাদেরকে তার রব কঠিনভাবে পাকড়াও করেছিলেন এবং তাদেরকে ভীষণ আযাবের মধ্যে আবদ্ধ করে নিয়েছিলেন। সুতরাং এসব পশুর ভয়ে তিনি কেমন করে ভীত হবেন এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তিনি কেন অস্থির হবেন, যখন তিনি জানেন যে, মহান আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো শক্তির দাপট কোনো কিছুই করতে পারে না এবং তাঁর পথ ও পদ্ধতি থেকে সরে গিয়ে অন্য কোনো পদ্ধতি টিকে থাকতে পারে না?

অবশ্যই আল্লাহর পথে আহ্বানকারী তার অন্তরের মধ্যে এ চিরন্তন সত্যকে গভীরভাবে অনুভব করে, পরিশেষে সেই যে সাফল্যমন্ডিত হবে এ ব্যাপারে তার কোনো সংশয় থাকে না এবং এ কারণেই সত্যের এ কন্টকাকীর্ণ পথে চলতে গিয়ে তার মধ্যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বও পয়দা হয় না।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর এ শক্তি ক্ষমতার দৃপ্ত বাতি মোমেন হৃদয়কে সর্বদা সমুজ্জ্বল করে রাখে।

আদ জাতির পরিণতি

হূদ (আ.) যখন তাঁর জাতিকে সতর্ক করছিলেন এবং না-ফরমানীর দরুন কঠিন আযাবের মধ্যে তারা ঘেরাও হয়ে যাবে বলে ভয় দেখাচ্ছিলেন, তখন তাঁর অন্তরের মধ্যে আল্লাহর ক্ষমতা ও পাপীদেরকে চূড়ান্তভাবে পাকড়াও করার শক্তির কথা সদা সর্বদা জাগরূক হয়েছিলো। এরশাদ হচ্ছে,

'এরপরও যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে চলে যাও আমার তৃপ্তি হচ্ছে সত্যের যে বার্তা নিয়ে আমি এসেছি, তা অবশ্যই তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি।'

অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমি, আমার কর্তব্য পালন করেছি এবং তোমাদের বিষয়গুলো থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছি, যাতে করে তোমরা সরাসরি আল্লাহর শক্তির মুখোমুখি দাঁড়াতে পার।

আল্লাহর ঘোষণা আসছে, যা হূদ (আ.)-এর যবানীতে প্রকাশ করা হয়েছে,

'আর আমার রব তোমাদের স্থানে অন্য এক জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন।' অর্থাৎ এমন এক জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, যারা নবীর দাওয়াত গ্রহণের যোগ্য হবে এবং তোমাদের বিদ্রোহ, অন্যায় অত্যাচার অবিচার ও সত্যবিমুখতার কারণে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে তাদেরকে ক্ষমতাসীন করা হবে।

'এবং তোমরা তাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না।'

অর্থাৎ তোমাদের এমন কোনো শক্তি নেই যার দ্বারা তোমরা পৃথিবীর কোনো স্থানে কোনো শূন্যতা সৃষ্টি করতে পার বা কোনো ত্রুটি ঘটিয়ে দিতে পারে।

'নিশ্চয়ই আমার রব সব কিছুর হেফাযতকারী।'

অর্থাৎ তিনিই তাঁর দ্বীন, তাঁর প্রিয়পাত্রদের এবং তাঁর নিয়মাবলীকে কষ্ট ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করেন। আর তিনি তোমার ওপর তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর পাকড়াও থেকে কোনোভাবেই রেহাই পাবে না এবং তাঁর হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে কিছুতেই তাঁকে অক্ষমও করে দিতে পারবে না।

এটাই সদা সর্বদা চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্তকর কথা এবং এখানেই সকল ঝগড়া শেষ হয়ে যায়। একথা দ্বারা হুঁশিয়ারী দান ও ভীতি প্রদর্শনের কাজ সঠিকভাবে আদায় হয়ে যাচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যখন আমার ফায়সালা এসে গেলো আমি হূদ এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিলো, তাদেরকে সরাসরি আমার মেহেরবানী দ্বারা বাঁচিয়ে নিলাম। রেহাই দিলাম তাদেরকে আমার সেই আযাব থেকে যা সামগ্রিকভাবে সেই কওমকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে দিলাম। তারা সেই কঠিন আযাব থেকে রেহাই পেয়ে গেলো, যা মিথ্যাবাদী ও সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে পূর্ণাংগভাবে গ্রাস করে ফেললো।' এ আযাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এটা ছিলো এমন এক ঘনীভূত আযাব, যা ওই আল্লাহদ্রোহীদের জন্যে পুরোপুরি উপযোগী ছিলো, উপযোগী ছিলো শক্তহৃদয় ও অহংকারী ওই ব্যক্তিদের জন্যে।

আর এখন চূড়ান্ত যে কথাটা পেশ করা হচ্ছে তা হচ্ছে, হূদ (আ.)-এর জাতি আদ কওম পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হয়ে গেলো। এর দ্বারা ইংগিত দেয়া হচ্ছে যে, তারা আল্লাহর রহমত থেকে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো এবং সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেলো, যে অপরাধ তারা করেছিলো তারই শাস্তি স্বরূপ তারা এসর্বগ্রাসী আযাবে পতিত হলো, তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ ও বিতাড়ন নেমে এলো। কঠিন এ আযাব সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষা ও ভংগিতে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যাতে ওই আযাবের ভয়াবহতা ও যে কারণে আযাব নাযিল হয়েছে তা ছবির মতো ভেসে ওঠে। দেখুন আল্লাহর বর্ণনাভংগি,

আর ওই আদ জাতি তাদের রবের শক্তির নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করলো, রসূলদের সাথে না-ফরমানী করলো এবং অনুসরণ করল সত্যবিদ্বেষী শক্তিদর্পী সকল না-ফরমানদের, আর তারা এ দুনিয়াতে ও কেয়ামত দিবসে লানতের পথকে অনুসরণ করলো। জেনে নাও, অবশ্যই আদ জাতি তাদের রবকেই অস্বীকার করেছিলো, দেখো, এজন্যেই হূদ-এর জাতি আদ দূর হয়ে গেলো করুণাময়। আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি থেকে।

'এ হচ্ছে সে আদ জাতি' ....এভাবে আল্লাহ থেকে তাদের দূরত্ব এসে গেলো। এ প্রসংগের সূচনা থেকেই তাদের বিষয়টা আলোচিত হয়েছে, যার মধ্যে সবার দৃষ্টিতে তাদের ধ্বংসের অবস্থাটা ফুটে উঠেছে ....কিন্তু আসলে তারা নিশেষ হয়ে গেছে এবং মানুষের মানস-পট থেকে তারা বহু বহু দূরে সরে গেছে, মুছে গেছে তারা মানুষের স্মৃতি থেকে।

'হাঁ, আদ জাতির এ করুণ পরিণতি হয়েছিলো এজন্যে যে, তারা তাদের রবের নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করেছিলো এবং অমান্য করেছিলো তাঁর রসূলদেরকে। যতো রসূলকেই বিভিন্ন যামানায় অস্বীকার করেছে, সবার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে তারা একজন রসূলকে অমান্য করেছিলো, যেহেতু সকল রসূল একই দাওয়াত ও মানবমন্ডলীর নিকট একই মিশন নিয়ে এসেছিলেন। একবার ভেবে দেখুন, তারা সবাই কি একই বার্তা ও একই উদ্দেশ্য নিয়ে আসেননি? সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো একজন রসূলের কাছে নতি স্বীকার না করবে, সে যেন দুনিয়ায় যতো রসূল এসেছেন সবাইকেই অস্বীকার ও অমান্য করলো। আর এ আয়াতে উল্লেখিত বর্ণনাধারার মধ্যে বহু বচনের ব্যবহার এবং রসূলরা বলে কথা বলার এ যে পদ্ধতি এটা কখনও আমরা ভুলে যাবো না। বহুবচনের শব্দ চয়নের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাদের অপরাধের তীব্রতা প্রকাশ করেছেন এবং বর্ণনাধারায় লোকদের সমগ্র রসূলমন্ডলীকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। এতে বুঝা যায়, ওই সত্যবিমুখ লোকেরা হূদ (আ.)-কে অমান্য করার মাধ্যমে রসূলকেই অমান্য করেছিলো। তাহলে দেখুন, কী সাংঘাতিক ছিলো তাদের এসব ক্রটি এবং কতো ভীষণ ছিলো তাদের অপরাধ!!

'আর তারা যতো সব হঠকারী যেদী সত্যবিদ্বেষীদেরকেই অনুসরণ করেছে।'

অর্থাৎ যাদের ওপর রাজা বাদশাহ ও ক্ষমতাসীনরা প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে, সর্বকালে তাদের এ একই ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তারা হয় সত্য বিদ্বেষী, সত্যের কাছে তারা মাথা নত করে না। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কেন তারা ওইসব যালেম শাসক থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে চেষ্টা করেনি এবং কেনই বা নিজ থেকে নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা করেনি। আল্লাহ তায়ালা চান, তারা যেন নিজেদেরকে অবনতির নিম্নতম স্তরে নামিয়ে দিয়ে তাদের মানবতাকে ধ্বংস না করে।

এমনি করে একথা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, হূদ (আ.) ও তাঁর নিজ কওম আদ জাতির মধ্যে বিরোধের আসল কারণ ছিলো কোনো বান্দার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করার দাওয়াত দান এবং তাঁরই দেয়া জীবন ব্যবস্থা কায়েমের জন্যে চেষ্টা চালানো। প্রকারান্তরে ওই জাতির নেতাদের শাসন কর্তৃত্ব ও আনুগত্য সংক্রান্ত ব্যাপারেই এ বিরোধ সৃষ্টি হয়.... এ সমস্যার সূচনা তখন হয়, যখন হূদ (আ.) ও তাঁর সংগী সাথীরা একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং তাঁরই নির্দেশ মতো জীবন যাপন করতে শুরু করেছিলেন। এ কথাটাই নীচের আয়াতটিতে ফুটে উঠেছে,

'আর ওই আদ জাতি তাদের রবের নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করেছিলো এবং হঠকারী ও শক্তিদর্পী সকল বিদ্বেষী শাসকের অনুসরণ করেছিলো।'

এটাই ছিলো তাদের আসল অপরাধ অর্থাৎ একদিকে রসূলদের নির্দেশ অমান্য করা এবং অপরদিকে যারা জোর করে আনুগত্য করতে বাধ্য করে, তাদের অনুসরণ করা! এখানে এসেই জাহেলিয়াত ও ইসলামের পথ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, ভাগ হয়ে যায় কুফর ও ঈমানের পথ..... সকল রেসালাতের আমলে এবং প্রত্যেক রসূলের হাতে হক ও বাতিলের পথ এমনি করে আলাদা আলাদা হয়ে যায়।

আর এমনি করে একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তাওহীদের দাওয়াত প্রথম যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানায়, তা হচ্ছে গায়রুল্লাহর দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ মানুষের ওপর প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব করার অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ, যিনি সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কারো সামনে মানুষ মাথা নত করবে না, বিনা শর্তে ও নিরংকুশভাবে আর কারো আনুগত্য সে করবে না। কোনো যুলুমবাজ শাসকের দাপটের কাছে কিছুতেই সে নতি স্বীকার করবে না। কেননা চাপে পড়ে অন্যায় অপশক্তির কাছে মাথা নত করার অর্থ হচ্ছে নিজ স্বাধীনতাকে বিসর্জন দেয়া। আর অবশ্যই এটা অতি সত্য কথা যে, যে কোনো অহংকারী ও অন্যায়কারী শক্তির আনুগত্য করার অর্থ হচ্ছে শেরেক ও কুফরীতে লিপ্ত হয়ে যাওয়া। এ অপরাধের কারণে অবাধ্য ব্যক্তিবর্গ দুনিয়াতে ধ্বংসের সম্মুখীন হয় এবং আখেরাতে চূড়ান্ত আযাবের মধ্যে পতিত হওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। অবশ্যই মানুষকে আল্লাহ তায়ালা স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। তারা কখনো কোনো সৃষ্টজীবের কাছে নতি স্বীকার করবে না এবং কোনো মানব রচিত জীবন বিধানও তারা মেনে নেবেন না। তার এ স্বাধীন সত্ত্বার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে কিছুতেই কোনো অত্যাচারী শাসকের কাছে, কোনো কর্মকর্তা বা কোনো নেতার হাতে তারা নিজেদেরকে সোপর্দ করবে না। এটা হচ্ছে তাদের মর্যাদার উপযুক্ত ব্যবহার। এ মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে তারা যদি তৎপর না হয়, তাহলে আল্লাহর কাছে তাদের জন্যে কোনো সম্মান বা কোনো নাজাত নেই। যে কোনো দলকে ও তাদের আত্মমর্যাদা ও মানবতা অটুট রাখার জন্যে এ ভাবেই বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের মযবুত ভূমিকা ছাড়া মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার আর কোনোই উপায় নেই। যারা কোনো বান্দার বন্দেগীতে নিজেদেরকে সোপর্দ করবে এবং মানুষের শাসন ক্ষমতাকে মেনে নেবে, তাদের জন্যে এ পরাজয়ের গ্লানি বহন করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। আর যারা দুর্বল ও এ অসহায় মানুষের গোলামী করে, মেনে নেয় তাদের শাসন কর্তৃত্বকে, তারা সবাই যে বিশেষ কোনো ওযর ওজুহাতের কারণে বা উপায়হীন হয়ে তাদের বশ্যতা স্বীকার করে তা নয়, আর এই শ্রেণীর মানুষের সংখ্যায়ই বেশী। আর যারা অনন্যোপায় হয়ে অত্যাচারী শাসক বর্গের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়, তাদের সংখ্যা আসলে খুব বেশী নয়। যদি তারা স্বাধীন হতে চাইতো, তাহলে অবশ্যই তার জন্যে কিছু দুঃখ কষ্ট বরণ করতে ও কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়ে যেতো। তাদের মিথ্যা দেব দেবতাদের পূজা অর্চনা করার জন্যে যে বিবেক বিরোধী কাজ করা লাগে, এর জন্যে যে পয়সা কড়ি খরচ করতে হয় এবং যতোটুকু ত্যাগ স্বীকার করার প্রয়োজন হয়, যদি তারা যালেম শাসকদের রক্ত চক্ষুর সামনে সত্য পথে প্রকৃতপক্ষে মযবুতীর সাথে টিকে থাকতে চাইতো, তাহলে ওই ধরনের জান মাল ও সম্মানের কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে রাযী হয়ে যেতো।

কিন্তু আদ জাতি অহংকারী ও যালেম শাসকদের দাপটে পড়ে তাদের অনুসরণ করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে, চিরতরে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং আজ তারা দুনিয়াতে এক অভিশপ্ত জাতি হিসাবে পরিচিত, আর আখেরাতে তাদের জন্যে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে নিকৃষ্টতম আযাব। এরশাদ হচ্ছে,

'আর (এ কারণেই) দুনিয়ায় তাদেরকে সর্বদা তাদের প্রতি অভিসম্পাত অব্যাহত রাখা হয়েছে এবং আখেরাতেও তাদের জন্যে সব দিক থেকে লা'নতই লা'নত নির্ধারিত রয়েছে।

তারপর তাদের অবস্থাটা স্পষ্ট করে দুনিয়াবাসীর কাছে তুলে ধরে তাদের পরিণতি জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং ঘোষণা করা হয়েছে যে, পরবর্তীকালে অনুরূপ অপরাধে যারা লিপ্ত হবে, তাদেরকেও ওই একই আযাবে পড়তে হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'শোনো, আদ জাতি তাদের রবকে অস্বীকার করেছে।'

ওপরে বর্ণিত আয়াতাংশের মাধ্যমে বলা হচ্ছে যে, আদ জাতি তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহর করুণার দৃষ্টি থেকে বিতাড়িত হলো এবং সত্য থেকে তারা এতো দূরে ছিটকে পড়লো যেখান থেকে ফিরে আসা আর সম্ভব নয়। তাই বলা হচ্ছে,

'শোনো, দূরত্ব ও বহু দূরত্ব রয়েছে আদ জাতির জন্যে।'

এভাবে জোর দিয়ে, স্পষ্ট করে এবং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আদ জাতির ব্যবহার ও তাদের পরিণতির কথা এখানে তুলে ধরা হয়েছে, যেন তাদের অপরাধের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহর তরফ থেকে যে লানত বর্ষিত হয়েছে, তার ফলে তাদের পরিচয় দুনিয়া থেকে মুছে গেছে।

...... শোনো, বহু বহু দূরে সরে গেছে আদ জাতির মানুষেরা স্মৃতিপট থেকে। দূরত্ব– বহু দূরত্ব ওই অভিশপ্ত জাতির জন্যে, যারা ছিলো হূদ (আ.)-এর জাতি।'

দ্বীনের বিরোধিতার কারণ

এ সূরার মধ্যে হূদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্কিত আদ জাতির যে ইতিহাস আলোচিত হয়েছে, সেখান থেকে সালেহ (আ.)-এর কাহিনীর দিকে যাওয়ার পূর্বে এ প্রসংগে আরো কিছু বুঝার জন্যে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা প্রয়োজন বোধ করছি। এ অপেক্ষা করার প্রয়োজন আমরা এজন্যে অনুভব করছি যে, আমরা বুঝতে চাই, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার যে দায়িত্ব নিয়ে হূদ (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন, সে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁকে কোন কোন বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো এবং কি কি কারণে এসেছিলো সে সব বাধা। এ কারণসমূহ জানতে পারলে সত্যের পরিচয় জানা ও তা প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি বুঝা সহজ হবে এবং সে সব কারণ জেনে এগুলো আমাদের কাছে বিশেষ পরিচয়বহ চিহ্ন হয়ে থাকবে এবং তখনই এগুলোর মোকাবেলায় মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.) কি কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন তা সহজে বুঝতে পারবো। আরো বুঝতে পারবো যুগে যুগে সকল নবীর বিরোধিতার মূল কারণসমূহ এবং তখনই আমরা আল্লাহর দ্বীনকে কায়েমের পথে সঠিক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবো। বরং কোরআনে করীমে ইসলামী দাওয়াত দান করার এ পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা ধীরে ধীরে আরো অনেক কিছু জানতে পারবো। এ পদ্ধতি অতীতের লোকেরা আল কোরআন থেকে বুঝেছে, ভবিষ্যতের মানুষেরাও জানবে এবং দুনিয়া বিলীন হওয়া পর্যন্ত চিরদিন মানুষ এ পদ্ধতি জানতে থাকবে। কোরআনে উল্লেখিত ইসলামী দাওয়াত দানের এ পদ্ধতি অতীতের মুসলিম জামায়াতের মধ্যে শুধু সীমাবদ্ধ ছিলো, তা নয়, বরং এ পদ্ধতি জাহেলী যুগের চেহারাকে পরিবর্তন করেছিলো এবং সত্যের আগমনে খানখান হয়ে ভেংগে পড়েছিলো জাহেলিয়াতের এমারত। এভাবে ভবিষ্যতেও মুসলিম জাতিকে চিরদিন জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যেতে হবে।

আর অবশ্যই আমরা ইংগিত করেছি, আল কোরআনের সেই বর্ণনা পদ্ধতির দিকে যা হৃদয়ের ওপর অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আঘাত করে এবং শীঘ্রই আমরা প্রয়োজন মতো এ বিষয়ে আবারও আলোচনা করবো। কিন্তু ইতিমধ্যেই আলোচ্য আয়াতগুলোর তাফসীর করতে গিয়ে বহু প্রাসংগিক আলোচনা এসে গেছে। তবে আরো সুন্দরভাবে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করার প্রয়োজন।

আমরা যখন একটু খেয়াল করে এ দাওয়াতদানের বিষয়টার দিকে তাকাই, তখন দেখতে পাই সকল যামানায় সকল নবী রসূল এই একই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন এবং প্রত্যেক রসূলের যবানীতে এ একই কথা উচ্চারিত হয়েছে, আর তা হচ্ছে নিশর্ত ও নিরংকুশ আনুগত্য করতে হবে একমাত্র আল্লাহর আর দাসত্ব হবে একমাত্র আল্লাহর জন্যে। আল কোরআন প্রত্যেক রসূলের এ

একই মিশনের কথা ঘোষণা করতে গিয়ে বলছে, 'সে বললো, হে আমার জাতি, এবাদাত করো আল্লাহর (নিশর্ত ও নিরংকুশ আনুগত্য করো একমাত্র আল্লাহর), নেই তোমাদের জন্যে কোনো ইলাহ (সার্মভৌম ক্ষমতার মালিক) তিনি ছাড়া' ....আর অবশ্যই আমরা বরাবর এবাদাতের ব্যাখ্যায় বলে এসেছি যে, দাসত্ব বা নিশর্ত ও নিরংকুশ আনুগত্য করতে হবে একমাত্র আল্লাহর। কারণ 'একমাত্র আল্লাহর সামনেই মাথা নত করতে হবে এবং তাঁর দেয়া জীবন বিধান মেনে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর হুকুম মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতিটি ব্যাপারে একমাত্র তাঁর বিধানকে গ্রহণ করে চলতে হবে। আল কোরআনের ভাষার আভিধানিক অর্থেও এ কথাটাই বুঝা যায়। আবদ শব্দের (আভিধানিক) অর্থ হচ্ছে, নিয়ম মেনে চলা, নত হওয়া এবং নিজেকে ছোট জ্ঞান করে বিনয় প্রকাশ করা। আর গোলামী করার পদ্ধতি হচ্ছে হীনতা দীনতা ও বিনয় নম্রতার পদ্ধতি। কাউকে কেউ গোলাম বানিয়েছে- কথাটার অর্থ বুঝায় কেউ কাউকে তার কাজে লাগিয়ে নত হতে বাধ্য করেছে এবং তার জীবনকে অপমানের জীবনে পরিণত করেছে। আর যখন একজন আরব (নবী)কে আল কোরআন দ্বারা প্রথম সম্বোধন করা হয়েছিলো, তখন তিনি অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলেন আল্লাহ তায়ালা এ কেতাবের দ্বারা কী করতে চান। শুধুমাত্র দাসত্বের প্রতীক হিসাবে কিছু আনুষ্ঠানিক কাজ করা হোক? তিনি বুঝেছিলেন- তাঁর কাছে মহান আল্লাহর দাবী এতোটুকুই নয়, বরং যদিও মক্কায় আনুষ্ঠানিক কিছু কাজের নমুনা পেশ করা হয়েছিলো, তবু সে সবের মধ্য দিয়েও তিনি বুঝেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা চান যে, জীবনের সকল কাজ ও ব্যবহারে তিনি একমাত্র আল্লাহর বিধান মেনে নিন এবং তাঁর গলা থেকে গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য সবার) দাসত্বের শেকল খুলে ফেলে দিন। রসূল (স.) এবাদাতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নিজেই বলেছেন বলে হাদীসে জানা যায়, আর তা হচ্ছে অনুসরণ করা, নির্দেশ পালন করা ও মেনে চলা- শুধু কয়েকটা আনুষ্ঠানিক কাজ করা নয়। তিনি আদী ইবনে হাতেমকে সম্বোধন করে ইহুদী ও নাসারাদের পীর পুরোহিত ও ধর্মযাজকদেরকে প্রতিপালক, মনিব, মালিক ও আইনদাতা (রব) মানা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে বলছিলেন, 'অবশ্যই ওই ব্যক্তিরা তাদের জন্যে বহু হারাম জিনিসকে হালাল করে নিয়েছিলো এবং হারাম করে দিয়েছিলো বহু হালাল বস্তুকে, আর (সাধারণ মানুষরা এমন অন্ধভাবে তাদের কথা মেনে চলতো যে,) তারাও ওদের কথা নিশর্তভাবে মেনে নিতো এবং তাদের পুরোপুরি আনুগত্য করতো। এভাবেই তারা ওইসব ধর্ম যাজক ও পীর পুরোহিতদের এবাদাত (বা পূজা) করতো। তারা 'এবাদাত' শব্দটির অর্থ করতে গিয়ে আনুগত্যবোধক কিছু প্রতীকী কাজকে বুঝাতো, অর্থাৎ নির্দিষ্ট কিছু পূজা অনুষ্ঠানকেই তারা এবাদাতের নাম দিয়েছিলো এমন নিষ্ঠার সাথে এবং অবশ্যকরণীয় মনে করে এসব অনুষ্ঠানাদি পালন করা হতো যেন এগুলো আল্লাহরই হুকুম এবং এগুলো পালন করলে স্বয়ং আল্লাহরই হুকুম পালন করা হবে। এবাদাতের বাহ্যিক এ রূপ-চেহারাতে এবাদাতের উদ্দেশ্য বা মূল অর্থ ও ভাব প্রকাশ পায় বরং আনুগত্য বোধ জন্ম হয় স্বাভাবিকভাবে। এটা জোর জবরদস্তি দ্বারা পয়দা হয় না। তারপর যখন দ্বীনের মূল উদ্দেশ্য এবং তাদের এসব এবাদাত মানুষের কাছে অর্থহীন বলে মনে হতে লাগলো, তখন তাদের অন্তর সাক্ষ্য দেয়া শুরু করলো যে, এসব গায়রুল্লাহর এবাদাতের কারণে মানুষ আল্লাহর আনুগত্য থেকে বহু দূরে সরে পড়েছে। অর্থহীন জাহেলী ভাবধারার দিকে এগিয়ে গেছে এবং ঝুঁকে পড়েছে মূর্তিপূজার দিকে! আর যখনই মানুষ এ কুসংস্কার ও অন্ধত্বের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে, তখনই তারা শেরেক ও জাহেলিয়াত থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে মুসলমান হওয়ার গৌরব অর্জন

করেছে। ইসলামের এ গৌরবজনক ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে, যা কোনো দিনই মুছে ফেলা যাবে না বা মুছে ফেলতে চাওয়াও কোনোক্রমেই মানব সমাজের জন্যে কল্যাণকর নয়। আর মুসলমান সমাজে জান মাল ও সম্ভ্রমকে যে ভাবে রক্ষা করা উচিত এবং যেভাবে মুসলমানদের পক্ষে অন্যান্য মুসলমানদের হক আদায় করা উচিত, সেভাবেই শেরেকমুক্ত সমাজে আদায় করা হয়েছে।

আর এ হচ্ছে মুসলিম সমাজ এবং বাতিল সমাজের অবস্থার চিত্র। একদিকে দুঃখ দৈন্য ও স্বার্থপরতা এবং নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার এক করুণ অবস্থা, বরং এবাদাত শব্দের অর্থ আনুগত্যের নানা প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ইতিহাস। এ শব্দটির ব্যবহারের মাধ্যমে কেউ মুসলমান বলে পরিচিত হচ্ছে, আর কেউ ইসলামের গন্ডি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর সেই অর্থটি হচ্ছে, আল্লাহর কাছে পূর্ণাংগ আত্মসমর্পণ এবং গায়রুল্লাহর অন্ধ আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। আভিধানিক অর্থে শব্দগুলো দ্বারা এ অর্থই বুঝা যায় এবং রসূল (স.) এক হাদীস থেকেও এ অর্থের প্রতিই সমর্থন পাওয়া যায়। এ হাদীসটি হচ্ছে এক মযবুত দলীল যা নীচের আয়াতের ব্যাখ্যা,

'ওরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ধর্ম যাজক ও দরবেশদেরকে প্রতিপালক ও আইনদাতা বানিয়ে নিয়েছে।' আয়াতটির তাফসীরে রসূল (স.)-এর কথা এসে যাওয়ার পর অন্য কোনো ব্যক্তির কোনো কথার কোনো মূল্যই থাকে না।(১)

এই সত্যটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে আমরা এ তাফসীরের বহু স্থানে এবং এ পবিত্র দ্বীনের প্রকৃতি এবং এ দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে অন্যান্য যে সব কেতাব লেখার তাওফীক আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন, সে সব গ্রন্থের মধ্যেও বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন আমরা সেই আন্দোলন সম্পর্কে সূরা হূদের মধ্যেও যথেষ্ট আলোচনা দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি একই আন্দোলনের ধারা সূরা হূদের বিবরণে এবং হূদ (আ.) ও তাঁর জাতির মধ্যে এ বিষয়ে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়েছিলো– তার মধ্যেও। দেখতে পাই একই আন্দোলন নবী মোহাম্মদ (স.)-এর আনীত ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মধ্যেও তাঁর সময়ে তিনি জাহেলী সমাজে বসবাস করতেন, তার মধ্যে। আন্দোলনের এ কথাটিকেই তিনি তাঁর শানিত ভাষায় তুলে ধরতে গিয়ে যে ডাক দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করতে গিয়ে আল কোরআন বলছে, 'হে আমার জাতি, একমাত্র আল্লাহর এবাদাত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্যে ইলাহ (সর্বময় ক্ষমতার মালিক) বলতে আর কেউ নেই।'

অর্থাৎ তিনি ছাড়া কেউ কোনোদিন ইলাহ ছিলো না। আর কেউ কোনো দিন হবেও না। তাই বলা হচ্ছে, হে আমার জাতি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মানুষ বা বস্তুর সামনে মাথা নত করো না এবং তাদের জন্যে এমন কোনো আনুষ্ঠানিক কাজ করো না, যার দ্বারা তাদের অন্ধ দাসত্ব করা বুঝায়! জীবনের সমস্ত বিষয়ে যে পথ ও পদ্ধতি তোমরা গ্রহণ করবে, তার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার কাছেই যেন তোমাদের নতি স্বীকার করা ফুটে উঠে এবং একথাও যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তোমরা তোমাদের গর্দান থেকে মানুষের গোলামী করার রশি খুলে ফেলেছো এবং জীবনের কোনো ব্যাপারেই আল্লাহদ্রোহী কোনো শক্তি বা কোনো ব্যক্তির কোনো কথা বা কোনো আইন মানতে

(১) এ বিষয়ের ওপর বলিষ্ঠ আলোচনা এসেছে আল্লামা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রচিত 'কোরআনের চারটি বুনিয়াদী মূলনীতি (আল মুসতালাহাতুল আরবায়াতু ফিল কোরআনে) বইতে– আলইলাহ আর রব আদ দ্বীন আল এবাদাত।

রাযী নও। আর যে কারণে হূদ (আ.)-এর জাতির ওপর ধ্বংস ও অভিশাপ নেমে এলো তার কারণ শুধু এটাই ছিলো না যে, তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পূজা উপাসনা করতো বরং এসব আনুষ্ঠানিক পূজা অন্যান্য সেই সব শেরেকের অংশ বিশেষ ছিলো, যেগুলো থেকে তাদেরকে মুক্ত করে এক আল্লাহর বান্দা বানানোর জন্যে হূদ (আ.) তাদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি চেয়েছিলেন তাঁর জাতিকে একমাত্র আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বানাতে, আল্লাহর কাছে নতি স্বীকার করাতে এবং একমাত্র আল্লাহর হুকুম মতো জীবন যাপন করাতে। যে সব পাপের কারণে তাদের ওপর শাস্তি অবধারিত হয়ে গিয়েছিলো তা ছিলো, আল্লাহর আয়াতগুলো অস্বীকার করা রসূলকে অমান্য করা এবং আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে অহংকারী, আত্মগর্বী ও স্বৈরাচারী শাসকদের আনুগত্য করা, এরশাদ হচ্ছে,

'ওই আদ জাতি তাদের রবের আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছিলো, তাদের রসূলদের না-ফরমানী করেছিলো এবং অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারী শাসকদের নির্দ্বিধা আনুগত্য করার কাজে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলো।' তাদের সম্পর্কে জানাতে গিয়ে সকলের থেকে সত্যবাদী সত্ত্বা আল্লাহ তায়ালা এ কথা বলেছেন।

আর তাদের রবের আয়াতগুলোকে অগ্রাহ্য করার কাজটা রসূলের না-ফরমানী এবং শক্তিদর্পী শাসকদের আনুগত্য করার মাধ্যমেই ফুটে উঠেছিলো। আসলে বিভিন্ন কাজ নয়, এ একটি মাত্র কাজ ছিলো, যার কারণে তাদের ওপর আল্লাহর গযব নেমে এসেছিলো..... আর দুনিয়ার যে কোনো দেশে, যে কোনো সময়ে রসূলের আনীত জীবনের জন্যে আল্লাহর দেয়া আইন কানুনকে অস্বীকার করা হয়েছে, মানুষের দেয়া জীবন পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান মানতে অস্বীকার করা হয়েছে, অথবা আল্লাহর আইন কানুনকে বাদ দিয়ে মানব নির্মিত আইনের কাছে মাথা নত করা হয়েছে, এভাবে বাস্তবে যখন আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার ও রসূলকে অমান্য করে প্রকারান্তরে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে শেরেকের দিকে ঝুঁকে পড়া হয়েছে, তখনই নেমে এসেছে আল্লাহর আযাব। অবশ্য ইতিপূর্বে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলামই হচ্ছে সব কিছুর মূলে সেই আসল জীবন ব্যবস্থা ও নিয়ম কানুন, যার ওপর, পৃথিবীর বুকে মানুষের জীবন শুরু হয়েছিলো। এ ব্যবস্থার অধীনেই বা আল্লাহর এ নিয়ম অনুযায়ীই আদম (আ.) পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছিলেন এবং পৃথিবীতে আল্লাহর খেলাফাতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এ ইসলাম (আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা) নিয়েই নূহ (আ.) জাহাজ থেকে নেমেছিলেন এবং পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা হিসাবে কাজ করছিলেন। প্রতি যামানাতেই দেখা যায়, ইসলাম এসেছে এবং মানুষ এ সুমহান জীবন ব্যবস্থা থেকে বের হয়ে গিয়ে জাহেলিয়াতের দিকে এগিয়ে গেছে। আবারও কোনো নবী এসে পুনরায় তাদেরকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছেন এবং তাদেরকে সঠিক জীবন ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন। এভাবে আমাদের যামানা পর্যন্ত বারবার এ আহবান জানানোর সিলসিলা চলে এসেছে।

আর বাস্তব সত্য হচ্ছে, যদি আনুষ্ঠানিক কাজ করলেই এবাদাত করার হক আদায় হয়ে যেতো, তাহলে নবী রসূলদের যে দীর্ঘ সিলসিলা দুনিয়ায় এসেছে, তারা সবাই অতোটুকু কাজ করার জন্যেই মানুষকে দাওয়াত দিতেন এবং যেহেতু ওই কাজগুলো করাতে কারোও কোনো স্বার্থ বিঘ্নিত হতো না– এজন্যে এ দাওয়াত গ্রহণ করাতে কারো কোনো আপত্তিও থাকতো না। আর কয়েকটি আনুষ্ঠানিক কাজ করার দাওয়াত দিলে যদি তাদের দায়িত্ব পালন করা হয়ে যেতো ত হলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হাজারো প্রকারের বিরোধিতা ও অত্যাচার সয়ে এবং বছরের পর বছর

ধরে লোকদেরকে দাওয়াত দেয়ার প্রয়োজন থাকতো না এবং প্রত্যেক যামানাতে ইসলাম গ্রহণকারী মানুষ এত কষ্ট ও বিরোধিতার সম্মুখীন হতো না। ইসলামের প্রথম ও প্রকৃত কাজ হচ্ছে মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা যেহেতু মানুষ হিসাবে সবাই সমান, কারো ওপর কারো প্রাধান্য নেই এবং কেউ কারো ওপর কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব চালাতে অধিকারী নয়। সবাই আল্লাহর বান্দা বিধায় কোনো বান্দা কোনো বান্দার ওপর প্রভুত্ব করার অধিকার রাখে না। তাই মানুষকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে তাদেরকে আসল মালিকের গোলামে পরিণত করে তাদের মধ্যে খেলাফতের দায়িত্ববোধ পয়দা করাই ছিলো নবীদের কাজ, আর একাজ করতে গিয়েই আত্মকেন্দ্রিক মানুষের বিরোধিতা ও অত্যাচার সকল নবী রসূল ও তাদের অনুসারীদেরকে সইতে হয়েছে। একাজ করতে গিয়ে নবীরা জানিয়েছেন যেহেতু আল্লাহ তায়ালা বিশ্ব সাম্রাজ্যের মালিক এজন্যে তাঁরই আইন চলবে বিশ্বের সবখানে এবং আল্লাহর খলীফা হিসাবে মোমেনরা এসব আইন চালু করবে, যাতে করে মানব সাধারণ জীবনের সকল ব্যাপারে এসব আইন ও বিধান মতো জীবন যাপন করে ধন্য হয়, নিজেরা শান্তি পায় এবং অপরকেও শান্তি দেয়।

এ প্রসংগে চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সারা জগতের সর্বময় ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা। তিনিই সবার প্রতিপালক ও নিয়ামক, তিনিই সৃষ্টিকর্তা, প্রভু ও মনিব এবং তিনিই সবার বাদশাহ, আইন প্রণেতা ও আইনদাতা। যাঁর কথাই আইন, যাঁর কথা এসে যাওয়ার পর সে বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করার বা মত খাটানোর বা তা বাদ দিয়ে অন্য কোনো মতে চলার অধিকার কারো নেই। সারা বিশ্বের সকল মানুষের জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগকে পরিচালনার জন্যে তিনিই সর্বাংগীন সুন্দর জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন। অতএব একমাত্র তাঁর কাছেই নির্দ্বিধায় আনুগত্য পেশ করতে হবে। তাঁর সব হুকুম মানতে হবে। এসব হুকুম মানতে গিয়ে তাদের সবাইকেই কিছু না কিছু কষ্ট সহ্য করতে হবে, যেহেতু সবার হুকুম উপেক্ষা করে একমাত্র আল্লাহর হুকুম মতো চলতে গেলে প্রভুত্বের দাবীদার ও স্বার্থান্বেষী মানুষ তাদেরকে সহজে ছেড়ে দেবে না। আল্লাহ তায়ালা যে মানুষকে একমাত্র তাঁর হুকুম মতো চালাতে চান এতে তাঁর নিজস্ব কোনো স্বার্থ নেই। সবাই আল্লাহকে মালিক, মনিব ও আইনদাতা মেনে চললে সমাজে একটা নিয়ম শৃঙ্খলা বিরাজ করবে এবং আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহি করার ভয়ে কেউ কারো হক নষ্ট করবে না এবং কাউকে কষ্ট দেবে না। এর ফলে সামগ্রিকভাবে জন সাধারণ শান্তি পাবে। এ সব কথাই আলোচ্য সূরার শেষের দিকে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে।

এবারে আমরা সেই সত্য ঘটনাটার দিকে সবার মুখ ফেরাতে চাই, যা হূদ (আ.) তাঁর জাতির সামনে তুলে ধরেছিলেন। এরশাদ হচ্ছে,

'হে আমার জাতি, তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তারপর তাঁর কাছে তাওবা করো, (তাহলে) তিনি আকাশ থেকে তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির সাথে আরো শক্তি বাড়িয়ে দেবেন, আর খবরদার! ফিরে যেয়ো না তোমরা অপরাধী থাকা অবস্থায় বা অপরাধকারী হিসাবে।'

এটাই হচ্ছে সে নিগূঢ় সত্য কথা, যা সূরাটির প্রথম দিকে বর্ণিত হয়েছে এবং রসূল (স.)-এর মূল লক্ষ্য হিসাবে তাঁর জাতির কাছে এ কেতাবের মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে। তারপর, এ কেতাবের প্রতিটি কথাকে যুক্তি বুদ্ধি দ্বারা সজ্জিত করে এমনভাবে বিস্তারিত বলা হয়েছে মানুষ যেন কথাগুলো সহজে হৃদয়ংগম করতে পারে। তাই আবারও বলা হচ্ছে, 'তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং এরপর সবাই তাঁর কাছে তাওবা করো (ফিরে যাও), তাহলে তিনি

তোমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নানা প্রকার সুখ সম্পদের জিনিস দিতে থাকবেন এবং প্রত্যেক সম্মানী ব্যক্তিকে তার উপযুক্ত সম্মান দেবেন। এসব কথা জানানোর পরও যদি তোমরা ফিরে যাও (নবীর আহ্বানকে উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে চলে যাও), তাহলে আমি তোমাদের জন্যে ভয় করছি এক বিরাট দিনের আযাবের।'

আসলে মানুষের জীবনে যে সব দুর্ঘটনা ঘটে যায়, তা ঈমান আনার পর তখনই মাফ হয়ে যায়, যখন তারা অনুতপ্ত হৃদয় নিয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। এটাই হচ্ছে বাস্তব জীবনের সাথে ঈমানের সুমধুর সম্পর্ক, আর এটাই গোটা সৃষ্টির মধ্যে নিহিত সেই নিগূঢ় সত্য এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত সেই আইনের কথা, যা দ্বীন ইসলামের মূল প্রাণ বলে আমরা জানতে পেরেছি।

এটাই ঘর ও বাইরে ও জীবনের সবখানে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আসল সত্য, বিশেষ করে তাদের কাছে এ সত্যটা আরো বেশী প্রকটভাবে অনুভূত হয়, যারা জীবনের বাহ্যিক জিনিসগুলো জানে ও দেখে, আর যারা তাদের আত্মা ও হৃদয়কে পরিষ্কার করেনি এবং তাদের অন্তর মধ্যস্থিত ব্যাধির আরোগ্য এখনো লাভ করেনি, তাদের জন্যে এ তাওবা এস্তেগফারের প্রশ্নটা আরো বেশী জরুরী। অন্তত এ আয়াতের সংস্পর্শে এসে যদি তারা তাদের ভুলটা সঠিকভাবে বুঝতে পারে (তাহলেই তাদের পেছনের গুনাহ মাফ হওয়া আশা করা যায়)।

যে সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ মহান দ্বীনের আগমন তার বাস্তবায়ন একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েমের মাধ্যমেই সম্ভব। আর বিশ্বের বুকে যতো সৃষ্টি আছে তার প্রত্যেকটার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অস্তিত্বের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে এবং এসবের মধ্যেই চালু রয়েছে তাঁর স্থায়ী নিয়ম কানুন, যার ব্যতিক্রম কোনো দিন হয়নি। আর চিরস্থায়ী এ নিয়মের মধ্যে কেউ কোনো দিন পরিবর্তন আনতে পারবে না। আর কোরআনুল করীমের বর্ণনার মধ্যে বেশীর ভাগ স্থানে দুনিয়ার বুকে (মানুষের জীবনের সর্বত্র) সেই বিধানই চালু করার আহ্বান জানানো হয়েছে, যার অধীনে আবহমান কাল ধরে চলে এসেছে বিশ্ব প্রকৃতি। সত্যের দাবী হচ্ছে সর্বাবস্থায় যেন আল্লাহর কাছে মানুষ নতি স্বীকার করে– এটা হবে তার মানবতার প্রতীক, তার জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ সত্যের দাবী হচ্ছে ভাল কাজের উত্তম প্রতিদান দেয়া এবং মন্দ কাজের জন্যে শাস্তি বিধান করা। এ কথাগুলোই নীচের আয়াতগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে,

'ওহে মানুষেরা, পুনরুত্থান সম্পর্কে যদি তোমরা কোনো সন্দেহের মধ্যে থেকে থাকো, তাহলে চিন্তা করে দেখো (তোমাদের আমি কিভাবে মাটি দিয়ে), সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে .... আর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কবরবাসীদেরকে যিন্দা করে তুলবেন (৫-৭)।

ওপরের আয়াতগুলোতে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে একথার দিকে যে, আল্লাহ তায়ালাই চির সত্য (অর্থাৎ তিনি আছেন চিরদিন এবং থাকবেন চির দিন। অন্যান্য যা কিছু আছে সবই ক্ষণস্থায়ী। সবাই জীবনের সফর শেষে একটি নির্দিষ্ট সময় পরেই বিদায় নেবে ও বিলীন হয়ে যাবে বিশ্বের বুকে। দেখুন পরবর্তী আয়াতগুলোর মধ্যে কতো চমৎকারভাবে এ বিষয়টার ওপর প্রদত্ত বিবরণী–

'এসব কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করে জ্ঞানী গুণী ও বিদগ্ধ লোকেরা যেন জানতে পারে যে, যা কিছু (চিরস্থায়ী) সত্য তার আগমন হয়েছে তোমার রবের কাছ থেকে, অতপর এ সত্যকে বুঝতে গিয়ে ওদের অন্তর বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেছে। এতদসত্তেও ঈমানদার তাদেরকে সত্য সঠিক পথেই পরিচালনা করবেন .... সুতরাং সাবধান, ওরা যেন তোমাকে (তোমার) দায়িত্ব পালনের কাজ থেকে সরিয়ে নিতে না পারে। তুমি (মানুষকে) তোমার রবের দিকে ডাকতে থাকো। অবশ্যই তুমি সরল সঠিক ও মযবুত পথের ওপরে আছ। (হজ্জ, ৫৪-৬৭)

এভাবে এ আয়াতগুলোতে যে নির্দেশ ও উদাহরণ দেখছি, তাতে সুস্পষ্টভাবে আমরা যে সব কথা জানতে পারি তা হচ্ছে, গোটা সৃষ্টির মধ্যে পারস্পরিক যে বন্ধন রয়েছে, তার মূলে রয়েছে একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই ইচ্ছা এবং তাঁর হুকুম। আর এ মহা বিশ্বে বিরাজ করছে যে সব সৃষ্টি এবং তারা যত কাজ কর্ম করছে সবই চলছে আল্লাহরই নিয়মের অধীনে এবং তাঁরই ইচ্ছাক্রমে। আর সৃষ্টির মধ্যে বাহ্যিক ও দৃশ্যমান যে সব বস্তু রয়েছে, সেগুলোর দিকে খেয়াল করে তাকালে বুঝা যায় যে, সব কিছুই এক আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এই যে কেতাব নাযিল হয়েছে এর অবতরণও সেই একই নিয়মের অধীনে এবং একই উদ্দেশ্যের কারণে হয়েছে। আর দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারে মানুষকে যে সব নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার মধ্যেও আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক টের পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং সব কিছুর মধ্যে দেখা যায় যে, সব কিছু একই উৎস থেকে শক্তি পাচ্ছে এবং সব কিছু আল্লাহর পূর্ব নির্ধারিত একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়ে চলেছে এবং তিনিই সারা বিশ্বের মালিক, যা কিছু ভালো বা মন্দ সবই তাঁর হাতে নিবদ্ধ। এ পৃথিবী যেহেতু একটি পরীক্ষা-গৃহ, এজন্যে এখানে তাঁরই ইচ্ছা মতে কেউ ভালো আছে এবং কেউ আছে দুরবস্থার মধ্যে। এখানে কেউ দায়িত্ব পালন করবে, কেউ করবে না, কেউ ভালো করবে এবং কেউ মন্দ করবে– তবেই তো প্রশ্ন আসবে তাওবা এস্তেগফারের। আর ভুল করে বা দোষ করে কোনো মানুষ এস্তেগফার করলে এবং তাওবা করলে, তাদের জন্যেই আকাশ বর্ষণ করবে প্রচুর বারিধারা। আর সব কিছু আসবে একই সত্যের উৎস থেকে এবং এই উৎসই হচ্ছে বিশ্ব পরওয়ারদেগার আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা। তিনি আমাদের মধ্যে সদা সর্বদা হাযির আছেন তাঁর ফয়সালা নিয়ে এবং তাঁর পূর্বপরিকল্পিত ব্যবস্থা নিয়ে, তাঁর তদ্বীর ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে। তিনি হাযির আছেন তার হিসাব গ্রহণ ও পুরস্কার বিতরণের মধ্যে যাঁর কাছে ভালো ও মন্দ একই প্রকারের ও তার স্থান তাঁর কাছে সমান সমান ....।

আর এ সম্পর্কের কারণেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বাস্তব কাজ ছাড়া ঈমানের কোনো মূল্য নেই, যা মানুষের জীবনে প্রয়োজন হয়। বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাস অনুযায়ী কাজই মানুষকে কিছু দিতে পারে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে কাজ থেকে বিশ্বাস বিচ্ছিন্ন নয়, আবার কাজের পেছনে যদি ঈমান না থাকে, তাহলে সে কাজও লাগাম ছাড়া ও অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে এবং তা মানুষের জীবনে কাংখিত ফল দিতে পারবে না। অতএব এ দুটিই আমাদের জীবনে সমভাবে প্রভাবশীল। এ প্রভাব আসে কখনও আল্লাহর নির্ধারিত গায়েবী নিয়মে, যার সম্পর্ক মানুষের দৃষ্টির বাইরের উপায় উপকরণের সাথে, যেখানে মানুষের জ্ঞান ও চেষ্টা কোনো কাজে লাগে না অথবা এ প্রভাব আসে বাস্তব সেই সব দৃশ্যমান কাজের ফল হিসাবে, যা মানুষ দেখতে পারে এবং নিজের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে পারে। এগুলো হচ্ছে সেই সব লক্ষণ, যা একজন মানুষের জীবনে তার ঈমান থাকার কারণে প্রকাশিত হয়। আর প্রকৃতপক্ষে যদি কারো অন্তরের মধ্যে ঈমান না থাকে, তাও তার কাজে ও কর্মে, আচার আচরণে, কথা বার্তায় প্রকাশ পায়। এ বহিপ্রকাশ দেখা যায়, ছোঁয়া যায় ও অনুভব করা যায়।

আর ইতিপূর্বে আমরা ঈমানের এ প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছি যে, আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জীবন বিধান সমাজ- জীবনে চালু করার অর্থই হচ্ছে প্রত্যেকে তার কাজের উচিত প্রতিদান পাবে, জান মাল ও ইযযতের নিরাপত্তা, সামাজিক মর্যাদা ও স্থিতিশীলতা পাবে। এছাড়াও তারা সহজ সরল ও নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করার সুযোগ সুবিধা, মানসিক শান্তি ও বাক-স্বাধীনতা ও অন্তরের মধ্যে নিশ্চিন্ততা পাবে। আরো পাবে আখেরাতে পুরস্কার পাওয়ার পূর্বে পৃথিবীর এ জীবনে শান্তি সুখে বসবাস করা এবং উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার নিশ্চয়তা।

ঈমান আনার দাবী করে ও নিজেদেরকে মুসলমান বলে স্বীকার করে যখন এক সময় আমরা বলেছি যে, নিশর্ত ও নিরংকুশ আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর, তখন সমাজ জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে অবশ্যই আমরা একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করবো এবং আল্লাহর খলীফা হিসাবে তাঁর আনুগত্য যেন সমাজে চালু হয় তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবো। এটাই আমাদের মর্যাদার জন্যে উপযোগী কাজ। এ কাজ না করে আমরা যদি ডুগি তবলা হারমোনিয়াম, গীটার ও নানা প্রকর বাদ্যযন্ত্র নিয়ে অন্যান্য জাতির মতো ব্যস্ত হয়ে থাকি ও নিজেদের অপমান করে বানরদের মতো নাচতে থাকি, যেভাবে মিথ্যা দেব দেবীদের মূর্তিসমূহকে ঘিরে পৃথিবীর বহু জ্ঞান পাপীরা নাচানাচি করছে এবং তাদের মধ্যে সর্ব শক্তিমান আল্লাহর কিছু গুণ তালাশ করে ফিরছে, আমরাও যদি এসবের জন্যে ওই জ্ঞানান্ধদের মতোই অর্থ সম্পদ ব্যয় করি, তাহলে তাদের ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য থাকলো কোথায়! দেখুন আজকের সভ্যতাগর্বী সমাজে কিভাবে এসব অপচয় হচ্ছে। আমরাও যদি অন্যদের মতো বড় বড় অট্টালিকা, দালান কোঠা ইত্যাদি নির্মাণ করার কাজেই লেগে থাকি এবং মানুষের দাসত্ব উৎখাত করে মানুষের জীবনে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে স্বাধীনতা ও সাম্য কায়েম করার ব্যবস্থা না করি, তাহলে আল্লাহর খলীফা হিসাবে কি আমাদের দায়িত্ব পালন করা হবে।.... ঈমানী যিন্দেগী কায়েম করলে অবশ্যই এ ফলগুলো আসতে হবে। অর্থাৎ মানুষের জীবনে স্বাধীনতা, শান্তি সমৃদ্ধি এবং জান মাল ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা কায়েম হবে।

অহংকারী জাতির সামনে হুদ (আ.)-এর ভাষণ

আলোচ্য সূরার শেষের দিকে রসূলদের ঘটনাবলী আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ের ওপর আরো কিছু বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবো ইনশাআল্লাহ।

এবারে আমরা জানতে চাই, হূদ (আ.)-এর সেই শেষ ভাষণটি সম্পর্কে, যা তিনি তাঁর জাতিকে সম্বোধন করে দান করেছিলেন। আমরা এখন মুখোমুখি হচ্ছি সেই ভীষণ ও চূড়ান্ত দৃশ্যের সামনে যার ঘোষণা ওই অভিশপ্ত জাতিকে সরাসরি ও স্পষ্টভাবে শোনানো হয়েছিলো। আযাব আসার আগেই তাদেরকে সাবধান করা হয়েছিলো, কিন্তু তারা তা কানে তোলেনি; বরং নবীর নিদারুণভাবে উপেক্ষা করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছিলো। তারপর আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব কায়েমের জন্যে তাঁর আগমন সম্পর্কে তিনি সবাইকে চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন। এরশাদ হচ্ছে,

'সে বললো, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি, আর তোমরাও সাক্ষী থাকো– অবশ্যই তোমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করছো, আমি তাদের থেকে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কমুক্ত। ..... নিশ্চয়ই আমার রব সব কিছুর হেফাযতকারী।'

এ সব আয়াত দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, আল্লাহর পথে দাওয়াত দানকারীদেরকে সকল দেশে ও সকল যামানায় দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করতে হয়েছে, ধৈর্য ধরতে হয়েছে এবং সেই চমৎকার দৃশ্যের সামনে বহু কাল অপেক্ষা করতে হয়েছে যা আল্লাহর ক্ষমতার প্রমাণ পেশ করেছে .... দেখুন, এক দিকে একজন মাত্র মানুষ তাঁর সাথে কতিপয় সাধারণ মানুষ যোগ দিয়েছে ও ঈমানের কথা প্রকাশ করেছে– তারা মুখোমুখি হচ্ছেন তাদের দেশের চরম অহংকারী বিত্তবান এবং যামানার সর্বাধিক শক্তিশালী ও বস্তুগত দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা বড় জাতির সাথে, যেমন অন্য আর একটি সূরায় তাদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আদ জাতি রসূলদের প্রত্যাখ্যান করলো (এবং অস্বীকার করলো ও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো)। স্মরণ করে দেখো ওই সময়ের কথা, যখন তাদেরকে তাদের ভাই হূদ বললো, তোমরা কি ভয় করছো না? আমি অবশ্যই তোমাদের বিশ্বস্ত রসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি। সুতরাং

আল্লাহকে ভয় করো ও আমার আনুগত্য করো .... এসব কথা তো পূর্ববর্তী লোকদের মতোই এক অভ্যাস ছাড়া আর কিছু নয়। আর আমাদেরকে (কখনো) আযাব দেয়া হবে না।' (শোয়ারা ১২৩-১৩৮)

দেখুন, এ অহংকারী যালেমদের দিকে– আল্লাহর রহমতকে উপেক্ষা করে তারা তাদের শক্তি সাহস প্রদর্শন করেছে-এরা অহংকারের কারণে আল্লাহর নেয়ামত দেখতে সক্ষম হয়নি। এরা বহু কল কারখানা গড়ে তুলে বহু অর্থের মালিক হয়ে যায়, যার কারণে তারা মনে করেছিলো সব দিক থেকে তারা সাহায্য পাবে এবং চিরদিন তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এহেন বলদর্পী হঠকারী জাতিকে হূদ (আ.) সম্বোধন করলেন। চমৎকার এ মোকাবেলা। একদিকে ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে আল্লাহর নবী মুষ্টিমেয় কয়েকজন মোমেন সাথীকে নিয়ে আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসার সাথে তাঁর সাহায্যকামী হয়ে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে– অপরদিকে দাঁড়িয়ে সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চরম অহংকারের সাথে শক্তিদর্পী তাঁর জাতি চূড়ান্ত মোকাবেলার জন্যে। ওরা কোনো সময় না দিয়ে মহা পরাক্রমের সাথে এই মুষ্টিমেয় সত্যের নিশান বর্দারকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে প্রস্তুত। এজন্যে তারা সাধ্যমতো সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে! পরিণতির কোনো পরওয়াই তাদের নেই।

দেখুন, কী চমৎকার দৃশ্য। আল্লাহর নবী হূদ (আ.) নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়িয়ে– যেহেতু তিনি তাঁর এর নিকট থেকে প্রাপ্ত সত্যের বিজয়বার্তা পেয়ে পরম ও চরম আনন্দের মুহূর্তের অপেক্ষায় দন্ডায়মান। তিনি জানছেন ও দেখছেন যে, বিজয় অনিবার্য। তবু তিনি শেষ বারের মতো নিজ জাতিকে সম্বোধন করে পরম মহব্বতের সাথে, সত্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে নিষেধ করছেন– উপদেশ দিচ্ছেন যেন এখনো ফিরে যায়..... এরপরও তাঁর সামনে ওদের ঘৃণা ও অহংকার প্রকাশিত হয়েছে, এরপরও তারা সাহস দেখাচ্ছে এবং শক্তি প্রদর্শন করে সত্যাশ্রয়ী এ দলটিকে ধ্বংস করার জন্যে প্রত্যয় ঘোষণা করছে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করছে। তাদের অবাধ্যতার জন্যে যে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে, তা উপেক্ষা করতেও তারা দ্বিধাবোধ করছে না।

এভাবে হূদ (আ.) অতি সুন্দরভাবে সত্যের পথে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছেন। কেননা তাঁর অন্তরের মধ্যে তিনি তাঁর রবের সত্যতা সদা সর্বদা অনুভব করেন। এ কারণেই তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে ওইসব শক্তিদর্পী অহংকারী ব্যক্তি, যারা সম্পদ সচ্ছলতার মধ্যে ডুবে রয়েছে, অবশ্যই তারা মানুষ নয়– পশু। পশুর যেমন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না এবং পরবর্তী অবস্থার কোনো আন্দাজ করতে পারে না– একইভাবে এরাও ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছুই চিন্তা করতে পারে না, যার জন্যে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। আর তিনি নিশ্চিত যে এসব পশু আল্লাহর হাতে ধরা পড়বেই। সে দিন এ জানোয়াররেরা কী নিয়ে হাযির হবে? আর তার রব তো হচ্ছে সেই মহান সত্ত্বা, যিনি তাদেরকে পৃথিবীতে তাঁর খলীফা হওয়ার মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং তাদের তিনি কি না দিয়েছেন! তাদেরকে সন্তান সন্তুতি, মান সম্ভ্রম, ধন সম্পদ, কল কারখানা গড়ে তোলা ও খনিজ দ্রব্য ব্যবহারের নানা কলা কৌশল ও শক্তি সামর্থ সবই দিয়েছেন। এসব দিয়ে তাদেরকে তিনি পরীক্ষা করতে চেয়েছেন যে, তারা এসব নেয়ামতের সদ্ব্যবহার করে কিনা। তারা তো নিজ ক্ষমতায় এসব জিনিসের মালিক হয়ে যায়নি যে, যা ইচ্ছা তাই করবে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন যেমন মেহেরবানী করে এসব নেয়ামত দিয়েছেন, তেমনি যে কোনো মুহূর্তে তিনি এগুলো তুলে নিয়ে অন্য কাউকে তাদের স্থানে বসানোর ক্ষমতা পুরোপুরিই রাখেন এবং তা করলে তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি কেউ করতে পারবে না বা তাঁর ফায়সালাকে কেউ পরিবর্তনও করতে পারবে না। তাহলে

বলো, যা তারা করছে তার দ্বারা তারা কি অর্জন করতে চাইছে? অথচ তাদের রব তো সেই মহান সত্ত্বা, যিনি তাদেরকে (প্রয়োজনীয়) সব কিছু দেন এবং যার কাছ থেকে এবং যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন সে নেয়ামত তুলে নেন।

এভাবে আজও যারা আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছে, তাদেরও কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর মর্যাদা যেন তারা অন্তরের গভীরে যথাযথভাবে অনুভব করে। তাহলেই আশপাশের ওই সব জাহেলিয়াতের পূজারী, অহংকারী, মূর্খ নাদানদের সামনে এসব সত্যাশ্রয়ী মানুষ সত্যের পতাকা হাতে নিয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারবে। দাঁড়াতে পারবে তাদের সামনে, যারা বস্তুগত শক্তিতে বলীয়ান, যারা শিল্প কারখানা গড়ে তুল অগাধ সম্পদ সম্পত্তির মালিক হয়ে বসেছে। বস্তুগত জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। সাংগঠনিক শক্তি ক্ষমতা অর্জন করেছে। দুনিয়ায় বড় হওয়ার মতো জ্ঞান ও যোগ্যতা অভিজ্ঞতা হাসিল করেছে। উপরন্তু ব্যাপকভাবে দেশ দুনিয়ার খবর রাখার কারণে তারা চরম আত্মম্ভরী হয়ে উঠেছে ..... এসব জ্ঞানদর্পী ও শক্তি সামর্থবান লোকদের সামনে দায়ী ইলাল্লাহ যারা, তাদেরকে ঈমান,আমল ও আখলাখ এর হাতিয়ার নিয়ে আল্লাহ তায়ালার ওপর তাওয়াক্কুলের এমন নযীর স্থাপন করতে হবে যেন বিপক্ষীয়রা চিন্তা করতে বাধ্য হয়। তাদের অন্তরে এ দৃঢ় বিশ্বাস অবশ্যই থাকতে হবে যে, এসব নর পশুকে যে কোনো সময়ে আল্লাহ তায়ালা পাকড়াও করবেন। মানুষ, সে যেই হোক না কেন, ঈমান না থাকলে অন্যান্য পশুর মতো পশু ছাড়া সে আর কিছুই নয় যেহেতু তারা পেট ও ইন্দ্রিয়লিপ্সা চরিতার্থ করা ছাড়া আর কিছুই বুঝে না।

আর একদিন এমন আসবে, যখন দায়ী ইলাল্লাহর এ দলটি তাদের জাতি থেকে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলবে। তখন একটি জাতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে- এক ভাগ একমাত্র আল্লাহর দ্বীনকে চালু করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য সবাইকে, সবার শক্তি ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে, মানুষের পরিচালিত সকল নিয়ম নীতি ও আইন কানুনকে অস্বীকার করবে। অপর দলটি আল্লাহ ছাড়া আরো অনেককে নিজেদের প্রভু মালিক ও আইনদাতা মানবে, আর আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে।

এ দুটি দল যখন চূড়ান্তভাবে আলাদা হয়ে, পরস্পর সংঘর্ষশীল হয়ে উঠবে, সে দিনই আসবে এ ছোট্ট দলটির প্রতি আল্লাহ তায়ালার সরাসরি রহমত ও সাহায্য। আর সে দিনই আল্লাহর তরফ থেকে নেমে আসবে এদলের দুশমনদের ওপর গযব এবং ধ্বংস। এ ধ্বংস আসবে অকল্পনীয়ভাবে। দ্বীনের দিকে দাওয়াত দানের সূচনালগ্ন থেকে পরবর্তীকালের কোনো সময়েই ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা কখনই এমন চূড়ান্ত ফয়সালা ঘোষণা করেননি, যতোক্ষণ না দ্বীনের দুশমনরা আকীদার মূল কথার ভিত্তিতে সম্পর্কচ্ছেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আল্লাহর পথের পথিকরা একমাত্র আল্লাহকে প্রভু, পালনকর্তা ও শাসনকর্তা রূপে গ্রহণ করেছে, যার কারণে তারা আল্লাহর দল বলে পরিচিত হয়েছে এবং কখনও আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিশ্বাস করেনি, ভরসাও করেনি। অপর দিকে এমন চূড়ান্ত মুহূর্তে বিরোধীদের সাথে কোনো সাহায্যকারী থাকেনি।

হযরত সালেহ (আ.)-এর মিশন ও তার জাতির পরিণতি

হূদ ও (তাঁর কওম) আদ জাতির এ ইতিহাস আমাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর জন্যে যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি। এর ফলে সূরাটির মধ্যে এ প্রসংগকে কেন্দ্র করেই আল্লাহর নবী সালেহ ও তাঁর জাতির ইতিহাস ও তাদের পরিণতি প্রদর্শিত হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর (পাঠিয়েছি) সামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে। সে বললো, হে আমার জাতি, একমাত্র আল্লাহর গোলামী করো। তোমাদের জন্যে তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি

তোমাদেরকে (পৃথিবীর)মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে সেখানে একটা বিশেষ বয়স দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, আর তাওবা করো তাঁর কাছে। নিশ্চয়ই আমার রব আছে খুব কাছে। তিনি অবশ্যই তাওবা কবুলকারী।'

এই যে কথাগুলো, এগুলোর কোনো পরিবর্তন নেই। এগুলো কোনো দিন পরিবর্তন হবে না, এরশাদ হচ্ছে,

'হে আমার জাতি, নিশর্ত ও নিরংকুশভাবে আল্লাহর আনুগত্য করো। তিনি ছাড়া কোনো সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নেই।'

আর এটিই সেই ব্যবস্থা, যার কোনো পরিবর্তন হবার নয়।

'অতএব, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতপর প্রত্যাবর্তন করো তাঁর দিকে।'

তারপর আল্লাহর সার্বভৌমত্বের এটাই সেই তাৎপর্য, যা রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর নিজের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'নিশ্চয়ই আমার রব (আমার) খুব কাছে (এবং) তিনি দোয়া কবুলকারী।'

সালেহ (আ.) তাঁর কওমকে সতর্ক করতে গিয়ে বলছেন যে, তাদের জন্ম ও বৃদ্ধি এ মাটি থেকে– একথাগুলো বলে তিনি তাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন। তারা নিজেদের শ্রেণীর মধ্যে থেকেই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের প্রত্যেকে এ পৃথিবীর উৎপন্ন দ্রব্যাদি থেকে খাদ্য পাচ্ছে অথবা পৃথিবীর যে কোনো পদার্থের সাহায্যে তারা সংগ্রহ করছে তাদের প্রয়োজনীয় সর্ব প্রকার বস্তু। অবশ্যই এসব কিছু ব্যবহার করার জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন। মানুষের মধ্যে সবাইকে খেলাফতের দায়িত্ব দেয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো ব্যক্তিকে বিশেষভাবে দায়িত্ববোধ সম্পন্ন বানিয়েছেন এবং তাদেরকে তাদের সম-শ্রেণীর ওপর পরিচালক বানিয়েছেন। এ দায়িত্বশীলরা তাদের জ্ঞান ও বুঝ মতো তাদের দায়িত্ব পালন করার পর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, তাদের স্থানে এসেছে পরববর্তীরা। তারা দেখে নিয়েছে তাদের পূর্ববর্তী দায়িত্বশীলদের ইতিহাস।

এরপরও তারা মহান আল্লাহর সাথে আরো অনেককে শরীকদার খাড়া করে নিয়েছে......

'সুতরাং তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তারপর তাঁর কাছেই তাওবা করো। অতপর তাদের তাওবা করার দরুন সে তাওবা কবুল হয়েছে, যার কারণে তারা পরবর্তীতে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে। তাই আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন,

'নিশ্চয়ই আমার রব খুব কাছে– তাওবা কবুলকারী' (যখনই কোনো বান্দা তাওবা করে, তার তাওবা তখনই তিনি কবুল করে নেন।)

খেয়াল করুন, 'রব্বী' শব্দটির মধ্যে আমার রব 'করীব'– নিকটে' এবং 'মুজীব' শব্দের মধ্যে কবুলকারী– এ অর্থগুলো পাশাপাশি ও একত্রিত হয়ে এমন একটি সত্যের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্যে প্রযোজ্য হতে পারে না। যেহেতু একমাত্র তিনিই সর্বাধিক প্রিয় বন্ধু, যিনি সদা সর্বদা কাছে থাকেন এবং যখনই তাঁকে ডাকা হয় তিনি সে ডাক শোনেন ও সাথে সাথে সাড়া দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পরম বন্ধু একমাত্র তাঁরই জন্যে একথাটা খাপ খায়। বাক্যটি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে গোটা পরিবেশে আন্তরিকতা নৈকট্য ও মহব্বতের এক মধুর হাওয়া যেন বইতে থাকে। এ মধুর পরশ নবী (স.)-এর অন্তর থেকে বেরিয়ে এসে সেই সব হৃদয়ের গভীরে প্রবিষ্ট হয়, যে হৃদয়গুলো আল্লাহর মধুর ছোঁয়া পাওয়ার জন্যে উৎকর্ণ ও উদগ্রীব।

কিন্তু আফসোস, যে সমাজের বুকে একথাগুলো ধ্বনিত হচ্ছিলো, তার অধিকাংশ সদস্য ছিলো ঘৃণা বিদ্বেষ, ফেতনা ফাসাদ, হিংসা ও আত্মকেন্দ্রিকতার দোষে দুষ্ট। নানা প্রকার পাপাচারে তাদের

মন ছিলো এমনই কলুষিত যে, এ মধুর বচন কদাচিত তাদের অন্তরে সাড়া জাগাতো। এ মিষ্টি মধুর বাক্যের ছোঁয়া তাদের আঁধার দুয়ারে খুব কমই আঘাত হানতো। এ মর্যাদাপূর্ণ কথার সৌন্দর্য তাদের হৃদয়পটে খুব কমই প্রতিভাত হতো। এ আদর মহব্বতের কথার মিষ্টতা তাদের হৃদয়ে খুব কমই স্নেহের পরশ বুলাতো। তাদের হৃদয় বাতায়ন পথে এ মহব্বতের ধ্বনি খুব কমই প্রবেশ করতো ....এমনই কঠিন পরিবেশের মধ্য থেকে হঠাৎ করে কিছু মুগ্ধ হৃদয় এ মধুর বচন শুনে বিগলিত হয়ে গিয়েছিলো, মুগ্ধ হয়েছিলো তারা তাদেরই পরম প্রিয় ও দরদী এ ভাইয়ের প্রিয় মুখের এসব মধুমাখা বাণীতে, তারা ভাবতে শুরু করেছিলো, কে এ মানুষটি যে বয়ে এনেছে পরম করুণাময় বিশ্ব পালকের পক্ষ থেকে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের জন্যে মুক্তির এ পয়গাম। তারা দেখতে পেলো এ বাণী, বেরিয়ে আসছে নির্মল নিষ্কলুষ ও মধুমাখা সেই মুখটি থেকে, যাঁর চরিত্রগুণে মুগ্ধ তার দেশবাসী। দেখুন এসব কথারই সাক্ষ্য বহন করছে আল্লাহ তায়ালা নিম্নলিখিত বাণী,

'ওরা বললো, হে সালেহ, তুমি তো ছিলে ইতিপূর্বে আমাদের সবার কাছে এক অতি প্রিয় ও কাংখিত ব্যক্তিত্ব হিসাবে। এখন সেই তুমিই কি আমাদেরকে মানা করছো সেই দেব দেবীর সামনে মাথা নত করতে, যাদের পূজা করে এসেছে আমাদের বাপ দাদারা? এখন, যে সব বিষয়ে তুমি আমাদেরকে ডাকছো, সেগুলো সম্পর্কে আমরা তো বড়ই সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেলাম।'

ওপরের কথাগুলো থেকে তো তাদের এই মানসিকতাই ঝড়ে পড়ছে, তুমি আমাদের কাছে এতই প্রিয়, এমনই প্রিয় ব্যক্তিত্ব, এতো বেশী বিশ্বস্ত এবং এতো বেশী আশা ভরসার পাত্র যে, জ্ঞান বুদ্ধি, সততা সত্যবাদিতা, সুন্দর ব্যবহার ও গোছালো কথা বলার মতো মানুষ আমরা দ্বিতীয় কাউকে দেখি না। সর্ব বিষয়ে তোমার সঠিক ব্যবস্থা দানের যোগ্যতা সর্বাধিক। কিন্তু একি হলো, এমনই এক অভিনব ডাক তুমি আমাদের দিলে যে, আমাদের সমস্ত আশা ভরসা ভেংগে চুরমার হয়ে গেলো! উদ্ধৃতি আসছে,

'তুমি কি আমাদেরকে তাদের পূজা অর্চনা করতে নিষেধ করছো-, যাদেরকে আমাদের বাপ দাদারা পূজা করতো?'

আসলে কথাগুলো ছিলো নবী সালেহ (আ.)-এর হৃদয়াবেগের প্রতি এক মারাত্মক আঘাত! ভাবখানা ছিলো এই, হে আমাদের প্রিয়তম ভাই, তোমার সব কিছুই আমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত এ কথাটা ছাড়া যা তুমি এখন বলছো! এমন কথা তুমি বলবে এটা আমরা কস্মিনকালেও ভাবতে পারিনি! হায় আফসোস, হায় তোমাকে নিয়ে আমাদের সারা যিন্দেগীর আশা ভরসা! এখন একি হলো, তুমি যে বিষয়ে ডাকছো, সে ব্যাপারে আমরা তো বড়ই সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেলাম। এমন কঠিন সন্দেহ এসে গেলো যে, তোমার সকল সততা ও যোগ্যতা, তোমার এ কথার কারণে সব লন্ডভন্ড হয়ে গেলো! দেখুন উদ্ধৃতি,

'তুমি যা গ্রহণ করার জন্যে আমাদেরকে ডাকছো, সে বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কেই তো আমরা সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেলাম।'

আর এভাবে সালেহ (আ.)-এর জাতি তাঁর দাওয়াতের ওপর বিস্ময় প্রকাশ করেছিলো। অথচ এর মধ্যে এমন অদ্ভুত কিছু ছিলো না, যার কারণে তারা আশ্চর্য হতে পারতো। বরং আসল ব্যাপার হচ্ছে, যা গ্রহণ করা তাদের কর্তব্য ছিলো, সেটাই তারা অস্বীকার করছিলো। তারা যেন হয়রান হয়ে যাচ্ছিলো একথায় যে, তাদেরই ভাই (জ্ঞাতি ভাই একান্ত আপন জন) তাদেরকে একমাত্র আল্লাহর এবাদাত (হুকুম পালন ও নিশর্ত আনুগত্য)করার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছে। কেন ছিলো তাদের এ বিস্ময়?

কিন্তু কেন ছিলো তাদের এ বিস্ময়? হূদ (আ.)-এর কাজ যুক্তি বিরোধী ছিলো বা তাঁর কথার পেছনে কোনো দলীল প্রমাণ ছিলো না বা কোনো সুস্থ চিন্তা ভাবনা ছিলো না বলেই যে তারা বিস্ময় প্রকাশ করছিলো তা নয়; বরং একটি মাত্র কারণেই তারা সালেহ (আ.)-এর দাওয়াতকে আশ্চর্যজনক মনে করছিলো, আর তা ছিলো এই যে, এ লোকটা আমাদেরই একজন জ্ঞাতি ভাই হয়ে কি করে বাপ-দাদাদের আমল থেকে চলে আসা নিয়ম প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলছে! বাপ দাদারা এসব দেব দেবীর পূজা করে এসেছে, তারা কি সবাই ভুল করেছে? তাদের মাথায় কি কোনো বুদ্ধি ছিলো না? তারা কি সবাই বিবেকহীন ছিলো?

এভাবে তারা মানুষকে সুস্পষ্ট সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্যে উসকানি দিয়ে চলেছিলো এবং মানুষের আকীদা বিশ্বাসকে বাপ দাদার কাজের দোহাই দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো। আর এভাবে সালেহ (আ.)-এর দেশবাসীর সামনে একবার, দুইবার, তিনবার সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিলো যে, প্রকৃত অর্থেই মানুষকে মানুষের দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করাই ছিলো সালেহ (আ.)-এর তাওহীদের দিকে দাওয়াতের লক্ষ্য। আল্লাহর হুকুমে তিনি এ প্রচেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছিলেন যে, মানুষ চিন্তা করুক এবং বিনা যুক্তিতে অন্ধভাবে কারো অনুসরণ না করুক। ভাবের আবেগে এবং বাপ দাদার দোহাই দিয়ে মানুষ যেন কুসংস্কারের মধ্যে হাবুডুবু না খায়। এমন কোনো কাজ যেন তারা না করে, যা বিবেক-বুদ্ধিতে ধরে না।

এ প্রসংগে আমরা সালেহ (আ.)-এর প্রতি আরোপিত কথাকে স্মরণ করতে পারি, যা আল্লাহ তায়ালা নিজেই উদ্ধৃত করেছেন,

'অবশ্যই তুমি আমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে বড়ই আশা ভরসার পাত্র ছিলে।'

এই সাথে আমরা স্মরণ করতে পারি কোরায়শদের কথাও, যা তারা রসূল (স.)-এর বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী সম্পর্কে বলতো। কিন্তু যখন এ আমানতদার ব্যক্তিই তাদেরকে একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার কথা বললেন, ডাক দিলেন তাদেরকে একমাত্র আল্লাহর আইন মেনে চলার জন্যে, তখনই তাদের কাছে তা সেভাবে খারাপ লাগলো, যেমন সালেহ (আ.)-এর জাতির কাছে খারাপ লেগেছিলো। আর তখনই তারা বলে উঠেছিলো, এ একজন মহা জাদুকর। আবার কখনো বলেছিলো, এগুলো তার মনগড়া কথা। এ সময় তারা তাঁর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে নিজেদেরই সাক্ষ্যদান করার কথা ভুলে গেলো!

ইসলামী দাওয়াতের প্রকৃতি চিরদিন একই থেকেছে, এর বর্ণনাভংগিও চিরদিন একই প্রকারের, যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানবমন্ডলীর কাছে বিভিন্ন ভাষায় ও ভংগিতে নাযিল হয়েছে। তাই দেখা যায়, সালেহ (আ.) সেই একই কথা বলেছেন, যা তার দাদা নূহ (আ.) বলেছিলেন।

'সে বললো, হে আমার জাতি! তোমরা চিন্তা করে দেখেছো কি, যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে আসা সুস্পষ্ট কোনো দলীলের ওপরে থেকে থাকি এবং তিনি আমাকে তাঁর মেহেরবানী দান করে থাকেন, আর সে অবস্থায় যদি আমি তাঁর নাফরমানী করি, তাহলে আমার ওপর তাঁর যে আযাব আসা অবশ্যম্ভাবী হয়ে যাবে, তার থেকে বাঁচার জন্যে কে আমাকে সাহায্য করবে? অতপর সে অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়া তো আমার আর কোনো উপায়ই থাকবে না।'

অর্থাৎ হে আমার জাতি, আমি যদি আমার অন্তরের মধ্যে আমার রব সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট দলীল প্রমাণের ওপর দাঁড়িয়ে থাকি, তাহলে তোমরা কি বলতে চাও, তখনও কি এ পথের সত্যতা সম্পর্কে তোমাদের মনে বিশ্বাস জাগবে না? আমি কিভাবে এ পথের নিশ্চয়তা সম্পর্কে সন্দেহ

করব, যখন তিনি নিজের তরফ থেকে আমার প্রতি রহমত করেছেন, রেসালাত দান করার জন্যে আমাকে তিনি নিজে বাছাই করে নিয়েছেন এবং এ কাজের যোগ্য বানানোর জন্যে তিনি আমাকে কিছু বৈশিষ্ট্যও দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আমি যদি তাঁর নাফরমানী করি এবং তোমাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর ব্যাপারে কোনো ঢিলেমি করি, তাহলে তাঁর আক্রোশ থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে? তোমাদের মন রক্ষার জন্যে এবং আমার ব্যাপারে তোমাদের আশা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে যদি সজ্ঞানে এসব ত্রুটি করি, তাহলে তাঁর আযাব থেকে বাঁচার আমার কোনো উপায়ই থাকবে না। আমার সম্পর্কে তোমাদের এ আশা আমার সত্যিকার কোনো উপকারে আসবে কি এবং আল্লাহর আক্রোশ থেকে বাঁচার ব্যাপারে কোনো সহায়ক হবে কি? না, মোটেই না।

'যদি আমি তাঁর না-ফরমানী করি আল্লাহর শাস্তি থেকে তাহলে কে আমাকে সাহায্য করবে? এতে আমার ক্ষতি ছাড়া আর তো কোনো সুবিধা হবে না।'

এতে তো শুধু আমার ক্ষতির ওপর ক্ষতিই বাড়বে। একদিকে রয়েছে আল্লাহর গযব, অপরদিকে রেসালাতের দায়িত্ব থাকার কারণে আমার মান সম্মান, তারপর রয়েছে দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখেরাতের আযাব। এ সব কিছু মিলে ক্ষতির ওপর শুধু ক্ষতিই বাড়বে লোকসান ছাড়া অন্য কোনো প্রকার উপকারের সম্ভাবনাই আমার নেই। আমার দায়িত্ব পালন না করলে সকল দিক থেকে আমার বোঝা এবং কঠোরতা বাড়বে।

সামুদজাতির অবাধ্যতা ও ধ্বংস

পরবর্তীতে সালেহ (আ.)-এর কথা উদ্ধৃত করতে গিয়ে আল কোরআন বলছে,

'হে আমার জাতি, এই যে দেখছো একটি উটনী, এটা তোমাদের জ্ঞান চোখকে খুলে দেয়ার জন্যে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহর যমীনে চরে খেয়ে বেড়ানোর জন্যে একে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও। আর খবরদার! একে কোনো কষ্ট দিয়ো না। তাহলে কিন্তু অবিলম্বে তোমাদের ওপর আযাব এসে যাবে।'

ওই জাতির সামনে নবুওতের এক নিদর্শন পেশ করার সাথে সাথে সালেহ (আ.) এ প্রসংগে ..... যে উটনীর দিকে ইশারা করেছেন, তার কোনো বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে বলা হয়নি। বরং আল্লাহর সাথে এর সম্পর্কিত হওয়ার কথাটাই শুধু বলা হয়েছে, 'এটা আল্লাহর উটনী।' আর বিশেষভাবে তাদের জন্যে এ উটনীর প্রয়োজনের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে; 'তোমাদের জন্যে নিদর্শন।' এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, উটনীটি বিশেষ কিছু গুণের অধিকারী। যার কারণে অন্যান্য যে কোনো উটনী থেকে এটা আলাদা ধরনের। এর দ্বারা যেন ওদের বুঝোনা হচ্ছে, উটনীটি তাদের জন্যে আল্লাহর তরফ থেকে আসা এক বিশেষ নিদর্শন।

এতোটুকু বলার পর আমরা আর অধিক এ বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না, যেমন ইসরাঈলীদের বিভিন্ন রেওয়ায়াতে এ উটনী সম্পর্কে অজস্র বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং মোফাসসেররা ইহুদীদের ওইসব আয়াতের ওপর ভিত্তি করে সালেহ (আ.)-এর উটনী সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বহু আলোচনা করেছেন, যার কথা ইতিমধ্যে অনেক তাফসীরে কিছু এসেছে এবং আগামীতেও আসবে। এরশাদ হচ্ছে,

'এ হচ্ছে তোমাদের জন্যে আল্লাহর তরফ থেকে আগত একটি উটনী, যা এক বিশেষ নিদর্শন হিসাবে এসেছে। অতএব, একে আল্লাহর যমীনে চরে খেয়ে বেড়ানোর জন্যে ছেড়ে দাও। আর খবরদার! একে আঘাত করে কোনো কষ্ট দিও না।'

জেনে রাখো, একে কষ্ট দিলে খুব শীঘ্রই তোমাদেরকে পাকড়াও করে নেবে এক দারুণ শাস্তি। এখানে 'ফা' অক্ষরটা দ্বারা খুব জলদিই আযাব নেমে আসার কথা বুঝানো হচ্ছে এবং 'কারীব' শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এ আযাব আসা তোমরা অনেক দূরের কথা ভাবছো তাই না? না তা নয়। এরশাদ হচ্ছে,

'অতপর পাকড়াও করবে তোমাদেরকে নিকটস্থ আযাব।'

অর্থাৎ পাকড়াও করবে তোমাদেরকে অত্যন্ত শক্তভাবে।এটা শুধু স্পর্শ করা বা আযাব এসে যাওয়াই নয়। এতবড় ধমকিকেও কোনো পরওয়া না করে ওই নাফরমান জাতির জঘন্য খাসলাতের লোকেরা যা করলো, তা জানাতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

'অতপর তারা এ উটনীটিকে মেরে ফেললো.... তখন সে বললো, ফুর্তির সাথে খেয়ে দেয়ে নাও, তোমাদের বাড়ীতে বসে তিন দিন ধরে। (জেনে রাখো) এটা (আল্লাহর) একটা ওয়াদা, যাকে কেউ মিথ্যা বানাতে পারবে না।'

অর্থাৎ নিজ নিজ বাড়ীতে থেকে আমোদ ফুর্তির সাথে তিন দিন যতো খুশী খেয়ে দেয়ে নাও, মওজ করে নাও জীবনের মতো। এটা এমন একটা ওয়াদা, যাকে কেউ মিথ্যা বানাতে পারবে না।

একথা দ্বারা বুঝায় উটনীটির ঠ্যাং তারা এমনভাবে কেটে দিয়েছিলো যে, শেষ পর্যন্ত সেটা মারা যায়। তারা তরবারি দ্বারা উটনীটির পেছনের পা কেটে দিয়েছিলো, ফলে রক্তপাত হতে হতে সেটা মারা গিয়েছিলো। এ ঘটনা তাদের অন্তরের বক্রতা ও কলুষতার পরিচয় বহন করে। এ প্রসংগে উটনীটির আগমন এবং তার নিহত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়টাতে আর যে সব ঘটনা ঘটেছিলো, তার কোনো বিবরণ দেয়া হয়নি। কারণ এ ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় যে, দাওয়াত দেয়ায় তাদের অন্তরে কোনো সাড়া জাগেনি, তাদের হঠকারিতার মধ্যে কোনো পরিবর্তনও আসেনি। তারপর দেখা যায়, আযাব শীঘ্র আসার খবর দানের ঘটনা। অবশ্য বর্ণনাভংগিতে বুঝা যায়, উটনীটি আসার অব্যবহিত পরেই তাকে হত্যা করা হয়েছিলো এবং অবিলম্বে ঘটনাটি ঘটার জন্যে 'ফা' অব্যয়টা যথেষ্ট বলে মনে হয়। বলা হচ্ছে। ফা আকারুহা ফাক্বালা;........

'অতপর ওরা তার ঠ্যাং কেটে দিলে (হত্যা করলো)। তখন সে বললো, আমোদ-ফুর্তি করো তোমাদের গৃহে তিন দিন। এটা এমন এক ওয়াদা, যা মিথ্যা কেউ বানাতে পারবে না।'

অর্থাৎ তোমাদের জীবনের শেষ দিন সমাগত প্রায়। অতপর এ স্বল্প সময়ে তোমাদের মনের মতো খেয়ে দেয়ে ও আমোদ-ফুর্তি করে নাও।

'এটা এমন এক ওয়াদা, যাকে কেউ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারবে না।'

অর্থাৎ এটা সত্য ওয়াদা, যার ব্যতিক্রম হবার নয়।

এরপর পরবর্তী 'ফা ক্বালা'-র মধ্যে 'ফা' দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, সাথে সাথেই তাদেরকে আযাবের ধমকি দেয়া হয়েছিলো এবং তিন দিন পার হওয়ার সাথে সাথেই তাদের ওপর আযাব এসে গিয়েছিলো। এরপর অবিলম্বে আযাব যে এসে গেলো, তাও 'ফা-লাম্মা'-র 'ফা' দ্বারা বুঝা গেছে। এরশাদ হচ্ছে,

তারপর যখন আমার (শক্তির) হুকুম এসে গেলো, আমি নাজাত দিলাম সালেহকে এবং তাদেরকে, যারা তার সাথে ছিলো আমার নিজ মেহেরবানী দ্বারা, আর বাঁচিয়ে নিলাম তাদেরকে সেদিনের লাঞ্ছনা থেকে। নিশ্চয়ই তোমার মালিক শক্তিমান মহাক্ষমতাধর। আর যুলুম যারা করেছিলো, তাদেরকে পাকড়াও করলো এক মহা চিৎকারধ্বনি (বিকট শব্দ), ফলে দেখা গেলো পরের দিন তারা নিজ নিজ ঘরে সবাই মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো।

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বলছেন, তারপর যখন এ আযাব নাযিল হওয়ার দিন ঘনিয়ে এলো, উপস্থিত হলো যখন ধমকি ও ধ্বংসের দিন, তখন আমি সালেহ এবং তার সংগী মোমেনদেরকে আমার মেহেরবানী বলে নাজাত দিলাম। নাজাত দিলাম বিশেষভাবে এবং সরাসরি মৃত্যু থেকে এবং সেদিনের লাঞ্ছনা থেকে। অবশ্যই সামুদ জাতির মৃত্যু ছিলো বড়ই অপমানজনক। তাদের অবস্থা ছিলো এই যে, তারা প্রচন্ড শব্দের আযাবের তোড়ে পড়ে তাদের নিজ নিজ বাড়ীতে মুখ থুবড়ে পড়ে অপমানজনকভাবে মৃত্যুবরণ করলো। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই তোমার রব, তিনিই শক্তিমান, তিনিই মহাক্ষমতার অধিকারী।'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এমনই শক্তিমান যে, তিনি অহংকারী বিদ্রোহীদেরকে, অবশেষে পাকড়াও করেন এবং কেউ তাঁর থেকে রেহাই পায় না। আর যার পরিচালনার দায়িত্ব এবং অভিভাবকত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করেন তাকে কেউ লাঞ্ছিত করতে পারে না।

তারপর এ আযাবের দৃশ্যে এভাবে বিস্ময় প্রকাশ করা হচ্ছে যে, হায়রে শক্তিদর্পী অর্বাচীনের দল, কি নিদারুণ তাদের পরিণতি! যারা তাদের শক্তি ক্ষমতায় আবহমান কাল ধরে টিকে থাকার নেশায় ছিলো বিভোর। কতো শীঘ্র তারা খতম হয়ে গেলো। একটুও বিলম্বিত করতে পারল না তারা তাদের এ অশুভ পরিণতিকে। তাদের এ করুণ পরিণতি ছিলো এতোই মর্মান্তিক।

'যেন কোনো দিন সেখানে কেউ ছিলোই না।'

অর্থাৎ ওই ভীষণ অহংকারী জাতি এমন নিস্ত নাবুদ হয়ে গেলো যে, তাদের ধ্বংসস্তূপ দেখে পরবর্তীকালে মনে হয়েছে যেন কেউ কোনো দিন সে এলাকায় বাসই করেনি এবং ওই এলাকার শস্য শ্যামল ভূমি থেকে কেউ কোনো দিন কোনো নেয়ামতের আস্বাদন পায়নি। এ দৃশ্য বড়ই করুণ, বড়ই হৃদয় বিদারক, বড়ই প্রভাবপূর্ণ, যা মনের ওপর মর্মান্তিকভাবে দাগ কেটে যায়। হৃদয়াবেগে সৃষ্টি হয় এক ভীষণ উত্তেজনা। সৃষ্টির ইতিহাসে আজও এ অহংকারী জাতির (এলাকার) ধ্বংসাবশেষ এমনভাবে জাগরূক হয়ে রয়েছে যেন জীবন মৃত্যুর এ এক জীবন্ত দৃশ্য। রাতে ছিলো সবাই জীবন্ত সকালেই এক মৃতপুরী। যেন চোখের পলকে লন্ডভন্ড হয়ে গেছে সব। জীবন যেন সবটুকুই দ্রুতগতিশীল ক্যামেরার একটি ফিতা, ওই জাতির দৃশ্য এমনভাবে অতিক্রম করে চলে গেছে যেন মনে হয় কোনো দিন ধরাপৃষ্ঠে ওই জাতির কোনো অস্তিত্ব ছিলো না।

পরিশেষে সূরাটির সমাপ্তিতে যে কথাগুলো সবার কাছে বোধগম্য হিসাবে আসছে, তা হচ্ছে, মানুষের মারাত্মক অপরাধগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। বাস্তব অবস্থা ও সে অবস্থার আলোকে উপদেশবাণী প্রতি পাতায় পাতায় ভর্তি হয়ে রয়েছে। বলা হচ্ছে,

শোনো, নিশ্চয়ই সামুদ জাতি তাদের মালিক পরওয়ারদেগারকে, তাঁর ক্ষমতাকে, তাঁর প্রভুত্বকে অস্বীকার করেছিলো এবং তারা পরিণত হয়েছিলো চরম এক অকৃতজ্ঞ জাতিতে। শোনো দূর হয়ে গেছে সামুদ জাতি আল্লাহর রহমত থেকে, 'চির দূরত্ব' হচ্ছে ভাগ্যলিপি এহেন হতভাগা জাতির জন্যে।

ঘটনার সারসংক্ষেপ ও শিক্ষা

আলোচ্য সূরাতে অভিশপ্ত ওই জাতির ধ্বংসের যে ঘটনা ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে রয়েছে, তার আলোকে আমরা পুনরায় নিজেদেরকে যেন দেখতে পাচ্ছি রেসালাতের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্যে একটি কঠিন ঘটনার সামনে। এ ঘটনা প্রসংগে যে দাওয়াত সেখানে পেশ করা হয়েছে তা

হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সেই দাওয়াত, যা মানুষের অজ্ঞানের অন্ধত্ব দূর করে। দেখতে পাই এ দাওয়াতের মধ্যে ইসলামের মূল শিক্ষা ও তাৎপর্য। দেখতে পাই একমাত্র লা-শরীক আল্লাহর বন্দেগীর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। দেখতে পাই একমাত্র আল্লাহর নিঃশর্ত আনুগত্যের ঝলক এবং ওই ঐতিহাসিক ঘটনার আলোকে আমরা আজ আবারো দেখতে পাচ্ছি ইসলামকে ধ্বংস করার জন্যে জাহেলিয়াতের সংঘবদ্ধ তৎপরতা। আমরা দেখতে পাচ্ছি তাওহীদের পেছনে শেরেকের নানা প্রকার ষড়যন্ত্র, দেখতে পাচ্ছি আদ জাতির মতো সামুদ জাতির লোকদেরকে। তারাও তো ছিলো সেই সকল মুসলমান জাতির বংশধর, যারা নূহ (আ.)-এর সাথে জাহাজে চড়ে মহা প্রলয়ংকরী সেই তুফান থেকে নাজাত পেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের বংশধররাই তো আবার ভুল পথে চলেছে এবং ফিরে গেছে জাহেলিয়াতের দিকে এবং সবশেষে তাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল সালেহ (আ.) এসেছেন তাদেরকে পুনরায় ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে ফিরিয়ে নিতে।

এরপর আমরা সালেহ (আ.) ও তাঁর জাতির ইতিহাসে দেখতে পাই, ইসলামী দাওয়াত পেশ করা হলে ওই জাতির হতভাগা লোকেরা সালেহ (আ.)-এর কাছে মোজেযা বা অলৌকিক ক্ষমতা দেখানোর দাবী করতে থাকে। কিন্তু তাঁকে সত্যবাদী জেনে এবং তাঁর ওপর ঈমান আনার পর তারা এ দাবী করছিলো তা নয়, বরং তাঁকে অস্বীকার করে এবং উটনীকে হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে যখন তারা নানা প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো, সেই সময়েই তারা এসব মোজেযা দেখানোর দাবী করছিলো।

একইভাবে আরবের মোশরেকরাও রসূল (স.)-এর কাছে মোজেযা দেখানোর দাবী করে যাচ্ছিলো, যেমন করে পূর্ববর্তী লোকেরা ঈমান আনবে বলে ওইসব দাবী করেছিলো। হাঁ, তাদের দাবী পূরণ করা হয়েছিলো এবং যে মোজেযা তারা দেখতে চেয়েছিলো, তা তাদের দেখানো হয়েছিলো। কিন্তু তাদের জন্যে এ মোজেযা প্রদর্শন কোনো কাজেই লাগেনি। প্রকৃতপক্ষে যে ঈমান আনতে চায় সে আল্লাহর ক্ষমতার অজস্র নমুনা তার (সুস্থ বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা) আশপাশে দেখতে পায় এবং তার ঈমান আনতে কষ্ট হয় না। কিন্তু যে দূরে সরে যাওয়ার বাহানা তালাশ করে ও বারবার মোজেযা দেখানোর দাবী করে– অন্তরে তার ঈমান আনার কোনো আগ্রহ বা প্রস্তুতি না থাকায় কোনো মোজেযাই তাকে ঈমান আনার দিকে এগিয়ে দেয় না। সত্য গ্রহণের জন্যে তার অন্তরের দুয়ার বন্ধ হয়ে থাকে। চোখেও সত্যের আলো ধরা পড়ে না।

সালেহ (আ.)-এর ঘটনার যে বিবরণ আল কোরআন দিয়েছে, তার মধ্যে আমরা আবারও একবার আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অস্তিত্বের ঝলক দেখতে পাই এবং তা যে কোনো পাক সাফ দিলওয়ালা মোমেনের হৃদয়কে বিগলিত করে। দেখুন আল্লাহর বাণী,

'সে বললো, হে আমার জাতি! যদি প্রকৃতপক্ষেই আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সুস্পষ্ট দলীলের ওপর থাকি, আর তিনি আমার প্রতি যে রহমত নাযিল করেছেন তা আমি বুঝতে পারি। আর তারপরও যদি আমি তাঁর না-ফরমানী করি, সে অবস্থায় আমাকে কে আল্লাহর (আযাব) থেকে বাঁচাবে? এ অবস্থায় তোমরা আমার ক্ষতি ছাড়া কোনো উপকারই করতে পারবে না।' আর অবশ্যই এভাবে ওদের কাছেও সত্যের আলো পেশ করা হয়েছিলো, যেভাবে তাঁর সামনে পেশ করা হয়েছিলো। তাই তাঁর কথার উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে, 'নিশ্চয়ই আমার রব অতি কাছে, তিনি ডাকে সাড়া দানকারী (দোয়া কবুল করনেওয়ালা)।

অবশ্যই এটা সত্য কথা যে, আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে মানবমন্ডলীর মধ্য থেকে পছন্দ করে নবী বানিয়েছেন, তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অন্তরে যেভাবে সত্যের আলো প্রভাব বিস্তার করেছে, সেভাবে অন্য কারো মনে কখনও সত্য উদ্ভাসিত হয়নি, হতে পারে না। তাঁরা যেভাবে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা, শক্তি ক্ষমতা ও মাহাত্মের কথা অনুভব করতে পেরেছেন, সেভাবে আর কেউ অনুভব করতে পারে না। তাদেরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের মন মগযকে সত্য গ্রহণের জন্যে সেভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে, যার কারণে তারা সত্যকে সমস্ত হৃদয় প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছেন এবং তার জন্যে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়ে গেছেন। এমন চমৎকারভাবে আর কেউই গ্রহণ করতে পারে না।(১)

এরপর জাহেলিয়াতের সামনে দাঁড়িয়ে সেই কাহিনীটির দিকে তাকাচ্ছি, যা সত্য পথের সুস্পষ্ট আলো দেখানো সত্তেও মানুষ গোমরাহীর অতল তলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভেবে দেখুন একবার, সালেহ (আ.) ছিলেন কেমন ব্যক্তিত্ব, যার সম্পর্কে তাঁর জাতি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তিনি ছিলেন এমন ভাল মানুষ, যে তার জাতির সবার কাছে ছিলেন আশা ভরসার পাত্র। তার এ গ্রহণযোগ্যতা ছিলো তার সৎ, সত্যনিষ্ঠ ও নেককার হওয়ার কারণে এবং তার সুস্থ বুদ্ধি ও সচ্চরিত্রতার কারণে। এমতাবস্থায়, যেই না তিনি তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন অমনি তারা বেঁকে তার দাওয়াত গ্রহণ করার অর্থ ছিলো আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করা এবং বহু আপনজন থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশংকা। কিন্তু কেন? এর কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, তিনি তাঁর জাতিকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন এবং নিষেধ করছিলেন আল্লাহ ছাড়া অন্য (দেব-দেবী)-দের পূজা অর্চনা করতে ও তাদের কাছে সাহায্য চাইতে!

মানুষ যখন সহীহ আকীদা থেকে দূরে সরে যায়, তখন ভুল পথে চলতে চলতে অধঃপতনের কতো নীচু স্তরে নেমে যায়, তার কল্পনাও করা যায় না। অর্থাৎ তখন ভ্রান্তির সকল সীমা সে পার হয়ে যায়। সত্য থেকে এতো দূরে চলে যায় যে, তখন তার প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত সত্য চেতনা ও যুক্তি বুদ্ধি সব কিছুই যেন তার কাছে চরম আশ্চর্যজনক বোধ হতে থাকে এবং মনে হয় এসব কল্পনাতীত বিষয়। আর এ কারণে সে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে গোমরাহীর দিকে ধাবিত হতে পারে, যদিও সে ভুল পথ তার চেতনা ও বিবেক বিরোধী মনে হোক না কেন!

অবশ্যই সালেহ (আ.) তাদেরকে ডাকছিলেন। তাঁর কথা আল কোরআন উদ্ধৃত করছে,

'হে আমার জাতি, একমাত্র আল্লাহর গোলামী করো। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই.... তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, এরপর তোমাদেরকে তিনি একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত দুনিয়ায় বাঁচিয়ে রেখেছেন .....' অতএব তিনি (নবী সালেহ) তাদেরকে সেই মহান সত্ত্বার দিকে ডাকছেন যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। এ এমন একটি স্বাভাবিক যুক্তি, যা রদ করার সাধ্য কারো নেই... অথচ ওই নির্বোধ দল ভাবতো যে, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা তো হচ্ছে এই যে, তারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষমতা রাখে না বা নিজেদের জন্যে সেই সব জীবন ধারণ সামগ্রী (রেযেক) সংগ্রহ করার যোগ্যতাও তাদের নেই, যা তারা প্রতিনিয়ত ভোগ করে চলেছে।

(১) দেখুন খাসায়েসে সুত্তাসবীরুল ইসলামী ওয়া মুকাওয়ামাতিহী গ্রন্থের (২য় খন্ড) হাকীকাতুল উলূহিয়্যাত অধ্যায়।

আর প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তায়ালাই প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তাদের জীবনকে গড়ে তোলার যোগ্যতা দিয়েছেন, একথা তারা অস্বীকার করতো না। কিন্তু 'সকল শক্তি ক্ষমতার মালিক (ইলাহ সর্বশক্তিমান)' একথা মুখে স্বীকার করলেও বাস্তবে তারা তাঁকে ইলাহ মানছিলো না ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অনুসরণ করছিলো না। একথাও তারা মানছিলো না যে, পৃথিবীতে তাদেরকে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলীফা বানানো হয়েছে, যার কারণে তাদের জন্যে একমাত্র আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা মেনে চলা প্রয়োজন এবং জীবনের জন্যে প্রদত্ত ব্যবস্থা আরও কেউ দিতে পারে- একথা মানা দ্বারা শেরেক থেকে বেঁচে থাকা দরকার। আর নির্দ্বিধায় একমাত্র তাঁর হুকুম মানা তাদের জন্যে জরুরী। আর এ কথাগুলোই তো সালেহ (আ.) জানাতে গিয়ে তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন, 'হে আমার জাতি, একমাত্র আল্লাহর গোলামী করো এবং তোমাদের জন্যে তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।'

এ দাওয়াতের মধ্যে আসল বিষয়টা হচ্ছে ...রবূবিয়্যাত বা প্রতিপালক, মনিব এবং আইনদাতা হওয়ার বিষয়টা। এখানে ইলাহ হওয়ার বিষয়টাই মুখ্য নয়, যেহেতু ইলাহ (সর্বময় মালিক) তারা আল্লাহকেই মানতো; কিন্তু তারা তাঁকে একমাত্র আইনদাতা মানতো না বা শাসন-কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর এবং একমাত্র তাঁরই যাবতীয় হুকুম মানতে হবে।এ কথাটাই তারা মানতে চাইতো না।............এটাই হচ্ছে সেই জরুরী ও স্থায়ী বিষয়টি, যাকে কেন্দ্র করে জাহেলিয়াতের সাথে ইসলামের লড়াই বরাবর চলে এসেছে এবং এখনও চলছে ও ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে। এ সংঘর্ষ দুনিয়া বিলীন না হওয়া পর্যন্ত চলতেই থাকবে।

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرٰهِيمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ۖ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ
أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ
مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوْا لَا تَخَفْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٠﴾ وَامْرَأَتُهٗ قَائِمَةٌ
فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِإِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ إِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ﴿٧١﴾ قَالَتْ
يٰوَيْلَتٰىٓ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَّهٰذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾
قَالُوْٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ
ۚ إِنَّهٗ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿٧٣﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرٰهِيمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى
يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ إِبْرٰهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴿٧٥﴾

রুকু ৭

৬৯. (একদিন) আমার পাঠানো ফেরেশতারা (বিশেষ একটি) সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে এলো, তারা (তার কাছে এসে) বললো, (তোমার ওপর) শান্তি (বর্ষিত হোক); সেও (জবাবে) বললো, (তোমাদের ওপরও) শান্তি (বর্ষিত হোক), অতপর সে (তাড়াহুড়ো করে এদের মেহমানদারীর জন্যে) একটি ভুনা গো-বৎস নিয়ে এলো। ৭০. (কিন্তু) সে যখন দেখলো, তারা তার (খাবারের) দিকে হাত বাড়াচ্ছে না, তখন তাদের (এ বিষয়টি) তার (কাছে) খারাপ লাগলো এবং তাদের সম্পর্কে তার মনে একটা (প্রচ্ছন্ন) ভয়ের সৃষ্টি হলো; তারা (ইবরাহীমকে) বললো, (আমাদের ব্যাপারে) তুমি কোনো রকম ভয় করো না, আমরা প্রেরিত হয়েছি লূতের জাতির প্রতি; ৭১. তার স্ত্রী- (সেখানে) দাঁড়িয়ে ছিলো, (এদের কথাবার্তা শুনে) সে হাসলো, অতপর আমি তাকে (তার ছেলে) ইসহাক ও তার পরবর্তী (পৌত্র) ইয়াকুবের (জন্মের) সুসংবাদ দিলাম। ৭২. সে (এটা শুনে) বললো, কি আশ্চর্য! আমি সন্তান জন্ম দেবো, আমি তো (এখন) বৃদ্ধা (হয়ে গেছি,) আর এই (যে) আমার স্বামী, (সেও তো) বৃদ্ধ হয়ে গেছে; (এমন কিছু হলে) এটা (আসলেই হবে) একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার। ৭৩. তারা বললো, তুমি কি আল্লাহর কোনো কাজে বিস্ময়বোধ করছো, (নবীর) পরিবার-পরিজন (হিসেবে) তোমাদের ওপর আল্লাহর (বিশেষ) রহমত ও তাঁর অনুগ্রহ রয়েছে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা প্রচুর প্রশংসা ও বিপুল সম্মানের মালিক। ৭৪. অতপর যখন ইবরাহীমের (মন থেকে) ভীতি দূরীভূত হয়ে গেলো এবং (ইতিমধ্যে) তার কাছে (সন্তানের ব্যাপারেও) সুসংবাদ পৌঁছে গেলো, তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের (কাছে আযাব না পাঠানোর) ব্যাপারে আমার সাথে যুক্তি তর্ক করলো; ৭৫. (আসলে স্বভাবের দিক থেকে) ইবরাহীম ছিলো (ভীষণ) সহনশীল, কোমল হৃদয় ও আল্লাহর প্রতি নিবেদিত।

يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُ أَعۡرِضۡ عَنۡ هَٰذَآۖ إِنَّهُۥ قَدۡ جَآءَ أَمۡرُ رَبِّكَۖ وَإِنَّهُمۡ ءَاتِيهِمۡ عَذَابٌ غَيۡرُ مَرۡدُودٖ ﴿٧٦﴾ وَلَمَّا جَآءَتۡ رُسُلُنَا لُوطٗا سِيٓءَ بِهِمۡ وَضَاقَ بِهِمۡ ذَرۡعٗا وَقَالَ هَٰذَا يَوۡمٌ عَصِيبٞ ﴿٧٧﴾ وَجَآءَهُۥ قَوۡمُهُۥ يُهۡرَعُونَ إِلَيۡهِ وَمِن قَبۡلُ كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ هَٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطۡهَرُ لَكُمۡۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخۡزُونِ فِي ضَيۡفِيٓۖ أَلَيۡسَ مِنكُمۡ رَجُلٞ رَّشِيدٞ ﴿٧٨﴾ قَالُواْ لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنۡ حَقّٖ وَإِنَّكَ لَتَعۡلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٩﴾ قَالَ لَوۡ أَنَّ لِي بِكُمۡ قُوَّةً أَوۡ ءَاوِيٓ إِلَىٰ رُكۡنٖ شَدِيدٖ ﴿٨٠﴾ قَالُواْ يَٰلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيۡكَۖ فَأَسۡرِ بِأَهۡلِكَ بِقِطۡعٖ مِّنَ ٱلَّيۡلِ وَلَا يَلۡتَفِتۡ مِنكُمۡ أَحَدٌ

৭৬. (আমি তাকে বললাম,) হে ইবরাহীম, এ (যুক্তিতর্ক) থেকে তুমি বিরত হও, (এদের ব্যাপারে) তোমার মালিকের সিদ্ধান্ত এসে গেছে, (এখন) এদের ওপর এমন এক ভয়ানক শাস্তি আসবে, যেটা (কারো পক্ষেই) রোধ করা সম্ভব হবে না। ৭৭. যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা লূতের কাছে এলো, সে (এদের অকস্মাৎ আগমনে কিছুটা) বিষণ্ন হলো, তাদের কারণে তার মনও (কিছুটা) খারাপ হয়ে গেলো এবং সে (নিজে নিজে) বললো, আজকের দিন (দেখছি) সত্যিই বড়ো (কঠিন) বিপদের (দিন)। ৭৮. (এই অপরিচিত লোকদের দেখে) তার জাতির লোকেরা তার কাছে দৌড়ে আসতে লাগলো; আর তারা তো আগে থেকেই কুকর্মে লিপ্ত ছিলো; (তাদের কুমতলব বুঝতে পেরে) সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়, এরা হচ্ছে আমার (জাতির) মেয়ে, (বিয়ে ও দৈহিক সম্পর্কের জন্যে) এরাই হচ্ছে তোমাদের জন্যে বেশী পবিত্র, সুতরাং (তোমরা) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার (এ) মেহমানদের মধ্যে আমাকে তোমরা অপমানিত করো না; তোমাদের মধ্যে (এ কথাগুলো শোনার মতো) একজন ভালো মানুষও কি (অবশিষ্ট) নেই? ৭৯. তারা বললো, তুমি ভালো করেই (একথাটা) জানো, তোমার (জাতির) মেয়েদের আমাদের কোনোই প্রয়োজন নেই, তুমি জানো, আমরা সত্যিকার অর্থে কি চাই! ৮০. সে (এদের অশালীন কথাবার্তা শুনে) বললো, (কতো ভালো হতো) যদি আজ তোমাদের ওপর আমার কোনো ক্ষমতা চলতো, কিংবা যদি (তোমাদের মোকাবেলায়) আমি কোনো একটি শক্তিশালী স্তম্ভের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতাম! ৮১. (অবস্থা দেখে) তারা বললো, হে লূত (তুমি ভেবো না), আমরা তো হচ্ছি তোমার মালিকের (পাঠানো) ফেরেশতা, (আমাদের কথা দূরে থাক) এরা তো তোমার কাছেও পৌঁছতে পারবে না, তুমি (বরং এক কাজ করো,) রাতের কোনো এক প্রহরে তোমার পরিবার-পরিজনসহ (ঘর থেকে) বেরিয়ে পড়ো, তবে তোমাদের কোনো ব্যক্তিই যেন (যাবার সময়) পেছনে ফিরে না তাকায়, কিন্তু

إِلَّا امْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ

الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا

حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ

بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾

তোমার স্ত্রী ব্যতীত; (কেননা) যা কিছু (আযাবের তান্ডব) তাদের (ওপর) ঘটবে, তা তার (ওপর)-ও ঘটবে; তাদের (ওপর আযাব আসার) ক্ষণ নির্ধারিত হয়েছে সকাল বেলা; সকাল হতে আর কতোই বা দেরী! ৮২. অতপর যখন (সত্যিই) আমার (আযাবের নির্ধারিত) হুকুম এলো, তখন আমি সেই জনপদগুলো উল্টিয়ে দিলাম এবং তার ওপর ক্রমাগত পাকা মাটির পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করলাম, ৮৩. যা (অপরাধী ব্যক্তিদের নাম-ধামসহ) তোমার মালিকের কাছে চিহ্নিত ছিলো, আর (গযবের) এ স্থান তো এ যালেমদের কাছ থেকে দূরেও নয়!

তাফসীর
আয়াত ৬৯-৮৩

নূহ (আ.)-এর যামানার পর যারা পৃথিবীকে আবাদ করেছিলো এ প্রসংগে তাদের বিষয় নিয়েও বেশ কিছু কথা এসেছে এবং দীর্ঘকাল পর এ ঐতিহাসিক ঘটনা জানার আর কোনো উপায় নেই বিধায় নূহ (আ.)-এর প্লাবনের পর যারা বেঁচে ছিলো, তাদের এবং পরবর্তীতে যে সব জাতি এসেছে, তাদের বহু ঘটনা আল কোরআন বর্ণনা করেছে। ওই সব জাতির মধ্যে আল্লাহর রহমতধন্য ছিলো অনেক দল। আবার আযাবেও পতিত হয়েছে বহু জনগোষ্ঠী। এসব কওমের মধ্যে ইবরাহীম (আ.)-এর জীবনের একটি বিশেষ অংশ আমরা জানতে পাই, যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর রহমত ও বরকতের অনেক নিদর্শন দেখতে পাই। এসব ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে আমাদের সামনে আসে লূত (আ.) ও তাঁর অভিশপ্ত জাতির ঘটনা। এরা মানবেতিহাসে এক জঘন্য অপরাধের সূচনা করে, যার কারণে তাদের ওপর আল্লাহর গযব এসে পড়ে এবং তারা পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে যায়। এখানে দেখা যায়, লূত (আ.)-এর কাহিনী বলতে গিয়ে ইবরাহীম (আ.)-এর কেসসার এক ঝলক এসে গেছে। একদিকে লূত (আ.)-এর জাতির ওপর নেমে আসে আল্লাহর গযব, অপরদিকে ইবরাহীম (আ.) হলেন আল্লাহর রহমতধন্য। এ নবীদ্বয়ের কেসসা দু'টির মাধ্যমে যেভাবে পর্যায়ক্রমে আল্লাহর রহমত ও আযাব এসেছিলো, একইভাবে নূহ (আ.)-এর প্লাবন পূর্ব ও প্লাবনোত্তর কালেও আল্লাহর ক্রোধ ও রহম পর্যায়ক্রমে ঝরে পড়ে।

নূহ (আ.)-কে বলা হলো,

'হে নূহ, নেমে এসো খুশীর সাথে ও আমার পক্ষ থেকে দেয়া নিরাপত্তার সাথে। তুমি ও তোমার সংগী জনগণ আমার তরফ থেকে রহমত ও বরকত গ্রহণ করো। হাঁ, আর জেনে রাখো,

এই যে তোমার সংগী সাথীর দল, এদেরকে আমি নানা প্রকার নেয়ামত দিয়ে ধন্য করবো। কিন্তু তারপর আবারো তাদেরকে বেদনাদায়ক আযাব স্পর্শ করবে।'

ইবরাহীম ও তার অবর্তমানে তাঁর পুত্রদ্বয় ইসহাক ও তার বংশধর ইসরাঈলের বহু নবী এবং ইসমাঈল ও তার বংশে আগত শেষ নবীর ওপর আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার অবারিত রহমত ও বরকত নাযিল হয়েছে। শেষনবী মোহাম্মদ (স.) ছিলেন ইসমাঈল (আ.)-এর বংশের একমাত্র কিন্তু সকল নবী রসূলের সর্বশেষ নবী। এরশাদ হচ্ছে,

'আর অবশ্যই আমার দুতেরা ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ বহন করে এসেছে।'

এ সুসংবাদ বর্ণনার মধ্যে শুধু ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর স্ত্রীর উপস্থিতির উল্লেখ দেখা যায়। সেখানে (বনী ইসরাঈল বংশে আগত) রসূলদের ও ফেরেশতাদের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাদের কথা এখানে বর্ণিত হয়নি। অতএব, তারা কারা ছিলেন, সে বিষয়ে অন্য তাফসীরকরা যে জল্পনা কল্পনা করেছেন, আমরা না জেনে ওই আন্দাজকারীদের দলে যোগ দিতে চাই না। এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা বললো, সালাম। সেও বললো, সালাম।'

ইবরাহীম (আ.) তার জন্মস্থান ইরাকের অন্তর্গত ক্যালিডোনিয়ার রাজ্য থেকে হিজরত করেন এবং জর্দান নদী পার হয়ে কোনোয়ানের বিয়াবানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। তিনি বেদুইনদের অভ্যাস অনুযায়ী মেহমানদারী করতে গিয়ে আযাবের ফেরেশতাদের খাবার পেশ করেন। তিনি তাদের সাধারণ মেহমানই ভেবেছিলেন। তাই বলা হচ্ছে,

'সে একটি রোষ্ট করা বাছুর নিয়ে মেহমানদের সামনে পেশ করলো।'

অর্থাৎ ইবরাহীম (আ.) মোটা-তাজা একটা বাছুর রোষ্ট করে, একটা বিরাট খাঞ্চার ওপর সাজিয়ে এনে মেহমানদের সামনে পরিবেশন করলেন।

কিন্তু ফেরেশতারা পৃথিবীবাসীদের কোনো খাদ্য গ্রহণ করেন না। (এ জন্যে তারা খাদ্য গ্রহণ করা থেকে হাত সরিয়ে নিলেন)। এরশাদ হচ্ছে,

'অতপর [ইবরাহীম (আ.)] যখন দেখলেন তাদের হাত খাদ্য স্পর্শ করছে না'

অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণ করার জন্যে হাত বাড়াচ্ছে না।

তখন তাদেরকে তিনি উপেক্ষা করতে চাইলেন এবং তাদেরকে এড়িয়ে সরে যেতে চাইলেন। যেহেতু তাদের ব্যাপারে তার মনের মধ্যে বেশ ভীতি সঞ্চার হয়েছিলো।

বেদুইনদের মধ্যে সাধারণভাবে মনে করা হতো, কোনো ব্যক্তিকে খাবার দিলে যদি সে অস্বীকার করতো, তাহলে সে ভালো মনে আসেনি বলে সন্দেহ করা হতো। মনে করা হতো, সে কোনো দুরভিসন্ধি নিয়ে এসেছে অথবা সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে বলে ধারণা আসতো। .... আর আমাদের কৃষি প্রধান অঞ্চলের লোকদেরকে খাবার দিলে তারা সাধারণত খাবারের খেয়ানাত করে বলে আমরা মনে করি, অর্থাৎ তার সাথে যারা খাবার খাবে তাদের থেকেই খেয়ানাতের আশংকা করা হয়। কিন্তু যদি ওরা কারও কাছ থেকে খাবার না চায়, তাহলে বুঝতে হবে ওরা তার কোনো ক্ষতি করতে চায় বলে খাচ্ছে না, অথবা মনে হচ্ছিলো, ওরা এ আশংকাতে খাচ্ছে না যে, ওই খাবার দাতা ওদের কোনো ক্ষতি করতে পারে বলে ওদের মধ্যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। তার মনের মধ্যে এমনই এক সন্দেহের ভাব পয়দা হওয়ার করণে ওই মেহমানরা নিজেরাই নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন, দেখুন ওদের কথাকে উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

'ওরা বললো, প্রেরিত হয়েছি লূতের জাতির প্রতি আমরা।'

লূত (আ.)-এর জাতির কাছে ফেরেশতাদের কোন উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে, তা ইবরাহীম (আ.) ভালো করেই বুঝছেন। কিন্তু এ মুহূর্তে এ প্রসংগকে এড়িয়ে গিয়েই তিনি কথা বললেন। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তার স্ত্রী পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো, অতপর সে হেসে উঠলো।'

অপবিত্র ও খবীছ ওই জাতির ধ্বংসের খবর আঁচ করতে পেরেই সম্ভবত খুশীর চোটে তার হাসি এসে গিয়েছিলো। এরশাদ হচ্ছে,

'তখন তাকে আমি ইসহাকের (জন্মগ্রহণ করার) সুসংবাদ দিলাম এবং জানালাম ইসহাকের পরে আসবে তার ছেলে ইয়াকুব (নবী)।'

তিনি ছিলেন বন্ধ্যা কোনো দিন সন্তান হয়নি, আর এ সময়ে তিনি বৃদ্ধাও হয়ে গিয়েছিলেন। এমনই অসম্ভব অবস্থার মধ্যে এলো ইসহাক (আ.)-এর জন্মের সুসংবাদ .... এতোটুকুই শুধু নয়, এ ছিলো এক দ্বিগুণ সুসংবাদ। সুখবরের ওপর সুখবর। শুধু পুত্রই নয়, পুত্রের ঘরেও আসবে আর এক পুত্র ইয়াকুব (নবী), পরম প্রেমময় প্রভুর কি মধুর আশ্বাসবাণী। একজন স্ত্রীলোক, বিশেষ করে বন্ধ্যা, এ খোশ খবরীতে খুশীর আতিশয্যে, যার গোটা অস্তিত্ব প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে, এ মহা সুসংবাদের আকস্মিকতায় তিনি প্রচন্ড বেগে দুলে উঠছেন এবং বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ছেন। তাঁর অবস্থা ব্যক্ত করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলছেন,

'সে বললো, হায় হায়, কী আশ্চর্য, আমি সন্তান জন্ম দেবো? আমি তো একজন বন্ধ্যা নারী। আর এই যে আমার স্বামী, তিনি তো একজন বৃদ্ধ মানুষ, এটা কি করে সম্ভব? এতো বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার। ....

সত্য সত্যই বিষয়টা ছিলো অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। সাধারণত একটা নির্দিষ্ট বয়সে মহিলাদের মাসিক ঋতু আসা বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা আর সন্তান ধারণ করতে পারে না। কিন্তু এতো হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। আল্লাহর কুদরতের কাছে এটা মোটেই কোনো বড় ব্যাপার নয়। সুতরাং এ সম্পর্কে জল্পনা কল্পনা করার কোনো প্রশ্নই আসে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'কি ব্যাপার, তুমি কি আল্লাহর ফয়সালার ওপর বিস্ময় প্রকাশ করছো? হে নবীর ঘরের বাসিন্দারা, তোমাদের ওপর বিশেষভাবে আল্লাহর রহমত ও বরকত রয়েছে। অবশ্যই তিনি প্রশংসার যোগ্য, তিনিই মহান।'

আল্লাহর কাজের ব্যাপারে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। কেন, একটা কাজ সাধারণভাবে একটা নিয়মের অধীনেই হচ্ছে বলে কি সে নিয়মের কোনো পরিবর্তন হতে পারে না- তার কোনো ব্যতিক্রম হতে পারে না? বিশেষ করে যখন আল্লাহ তায়ালা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে তা করতে চাইবেন। আর এখানে তো জানাই যাচ্ছে যে, নবীর ঘরের প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমতের বরকতও রহমতের দৃষ্টি আছেই, এমনকি যে কোনো মোমেনের জন্যেও এ রহমত আসতে পারে। এমনকি সাধারণ নিয়মের বাইরেও এ রহমত আসে, আসে আল্লাহর বিশেষ রহমত অনুযায়ী এবং সে নিয়ম কতো ব্যপক তার কোনো সীমা আমরা জানি না, আর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কোনো কিছু সংঘটিত হতেই হবে একথাও আমরা মনে করতে পারি না। যেহেতু সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে কতো প্রকার নিয়ম চালু রয়েছে আর কি কি নিয়ম প্রবর্তিত হওয়ার প্রয়োজন তা একমাত্র তিনিই জানেন, যিনি সব কিছুর নিয়ামক।

আর যারা আল্লাহর ইচ্ছাকে তাদের বুঝ মতো সীমাবদ্ধ করতে চায়, অর্থাৎ যারা মনে করে, তারা যা বুঝেছে তেমনই তো আল্লাহর ফায়সালা হওয়ার কথা, তারা আল্লাহর সাধারণ নিয়মই

জানে এবং মনে করে, সে নিয়মের তো ব্যতিক্রম হতে পারে না। আসলে তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার সেই তাৎপর্যটাই বুঝে না, যার বর্ণনা আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর পবিত্র কেতাবের মধ্যে দান করেছেন। তাঁর কথা তো কালামে পাকে সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত ফয়সালা হিসাবে এসে গেছে। এ ব্যাপারে মানুষের বুদ্ধি অনুযায়ী কোনো মত বা কোনো কথা থাকতে পারে না বা এ বিষয়ে তাদের বিস্মিত হওয়াও উচিত নয়।

এমনকি যে সব মানুষ আল্লাহর ফয়সালাকে সীমাবদ্ধ করতে চায় অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকতেই হবে বলে মনে করে নিয়েছে, তারাও আল্লাহর অসীম ক্ষমতার তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম হয়নি। আল্লাহ তায়ালা চির স্বাধীন এবং তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করার ব্যাপারে তাঁর স্বাধীনতা পুরোপুরিই রয়েছে। এ ক্ষমতাকে কেউ সীমাবদ্ধ করে দিতে পারে না বা তাঁর নিয়মের কোনো ক্রটিও কেউ ধরতে পারে না।

হাঁ, এটা ঠিক, আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা সৃষ্টিজগতকে এক বিশেষ নিয়মে চালাবেন বলে পূর্বেই স্থির করে রেখেছেন, এটা এক কথা, আর তাঁর ক্ষমতাকে কেউ সীমাবদ্ধ মনে করবে, সেটা আর এক কথা। তাঁর নিয়ম যা তিনি সৃষ্টির বহু পূর্বে স্থির করে রেখেছেন, সেই অনুযায়ীই সব কিছু চলছে- অবশ্যই ভবিষ্যতেও চলবে ঠিক এবং এভাবেই সব কিছু সদা সর্বদা চলতে থাকবে- তাও ঠিক। কোনো সময়ে এটা বন্ধ হবে না। কিন্তু পূর্বের নিয়মের মধ্যে যখন আল্লাহ তায়ালা নিজেই কোনো ব্যতিক্রম ঘটাতে চাইবেন, তখন এ নতুন নিয়মের সামনে পুরাতন নিয়মগুলো হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে যাবে। এটা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা বুঝাতে চান যে, তিনি সকল কিছুর মালিক, তিনি যেভাবে তাঁর সৃষ্টিকে চালাতে চাইবেন সেভাবেই তা চলবে। তার মধ্যে তিনি নিজেই পরিবর্তন আনতে সদা-সর্বদা সক্ষম, এতে বাধা দেয়ার বা কৈফিয়ত তলব করার এখতিয়ার কারও নেই। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে অন্য কেউ এ পরিবর্তন আনার অধিার রাখে না। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনার ব্যাপারে একমাত্র তিনিই স্বাধীন।

এ কারণেই দেখা যায়, ওদের শান্তির খবরে ইবরাহীম (আ.)-এর অন্তরে প্রশান্তি নেমে আসছে। আর ওই দারুণ সুসংবাদ শুনে তার অন্তরে পরিতৃপ্ত হয়ে গেলে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে শোনোনো হলো। কিন্তু এ মেহমানরা লূত ও তার জাতির কথা ভুলে গেলেন না। লূত (আ.) তো তারই ভাতিজা, যিনি তারই মতো তাঁর জাতির নাফরমানী ও দুর্ব্যবহারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তার ধারে কাছেই ওই ভাতিজা বাস করতেন। তিনি তো এ ফেরেশতাদের নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য কি, তা বুঝে গেলেন এবং তিনি নিশ্চিত হলেন যে, ওই হতভাগা জাতির ওপর এমন এক আযাব নেমে আসবে, যা তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে মূলোৎপাটিত করেই ছাড়বে। কিন্তু ইবরাহীম (আ.) বড়ই দয়ালু হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। গোটা জাতির মধ্যে সবাইকে ধ্বংস করে দেয়া হবে-এটা তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। মহান দয়াবান আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই মানসিক অবস্থাকে সামনে রেখেই এরশাদ করছেন,

'তারপর ইবরাহীম (আ.)-এর ভয় যখন দূর হয়ে গেলো, আর তার কাছে সন্তান সম্পর্কিত সুসংবাদ যখন এসে গেলো, তখন সে লূতের জাতির ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া (যুক্তি-তর্ক) করতে শুরু করে দিলো। অবশ্যই সে বড় সহনশীল এবং আল্লাহর দিকে রুজুকারী অনুতাপকারী।

এমন সহিষ্ণু তিনি, যিনি গযবের ঘটনাগুলো যখন দেখেন সবর করেন, ধীরস্থির ভাবে নিজ কর্তব্য স্থির করেন, উত্তেজিত হন না। আর কোনো ভুল করলে অনুতাপের সাথে ও অনুনয় বিনয় করে তিনি প্রার্থনা করেন, যার মধ্যে প্রতি মুহূর্তে তাকওয়া পরহেযগারী (আল্লাহভীতি) ঝরে পড়তে থাকে। এমন আল্লাহমুখী তাঁর মন যে, যে কোনো ব্যাপার বিষয় ও স্থান থেকে তিনি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আল্লাহর (হুকুমের) দিকে ফিরে আসেন। আর এ সব মহৎ গুনের কারণেই

লূত (আ.)-এর জাতিকে ধ্বংস করার প্রশ্নে তিনি ফেরেশতাদের সাথে ঝগড়া করতে শুরু করেন, যদিও কিভাবে ঝগড়া করছিলেন তা সঠিকভাবে আমরা জানি না। কারণ জানার একমাত্র নির্ভুল মাধ্যম হচ্ছে আল কোরআন, আর সে পাক কালামে এর কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে বলে আমরা জানি না। অতপর এর জওয়াবে আল কোরআন জানাচ্ছে যে, তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়েই গিয়েছিলো। কাজেই যতো যুক্তিতর্কই করা হোক না কেন তা তাদের পরিণতি বদলাতে পারে না। এরশাদ হচ্ছে,

'হে ইবরাহীম, এ ব্যাপারে তুমি থেমে যাও, এ সম্পর্কে তোমার রব-এর চূড়ান্ত ফয়সালা এসে গেছে। তাদের ওপর অবশ্যই আযাব আসবে, তা রদ হবার নয়।'

কওমে লূতের নৈতিক অধঃপতন

বর্ণনার এ পর্যায়ে এসে আল কোরআন নীরব হয়ে গেছে। নিসন্দেহে তিনিও চুপ হয়ে গেছেন বুঝা যাচ্ছে। তারপর ইবরাহীম ও তাঁর স্ত্রী সম্পর্কিত দৃশ্যের ওপর পর্দা ফেলে দেয়া হলো, যাতে লূত (আ.)-এর ঘটনাবলী এবং তার কার্যকারণগুলো প্রধান গুরুত্ব পায়। যতদূর জানা যায়, লূত জাতির এলাকা ছিলো জর্দানের অন্তর্গত আমুরিয়া ও সাদুম। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যখন আমার দূতরা লূত-এর কাছে এলো, তখন তিনি বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি বলে উঠলেন, হায় আজকের দিনটি বড়ই কঠিন!'

তিনি তো তার জাতিকে ভালো করেই জানতেন, তাদের নাফরমানীর কথাও তার অজানা ছিলো না। জানতেন তাদের অদ্ভুত চরিত্রের কথা-কী জঘন্য ছিলো তাদের মানসিকতা। মানব জাতির সাধারণ ও স্বাভাবিক চাহিদার বিপরীত নারীদের পরিত্যাগ করে তারা পুরুষদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলো। পৃথিবীতে মানব বসতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে স্বাভাবিক চাহিদা মানুষকে আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন, প্রকৃতির সে স্বাভাবিক নিয়মকে বাদ দিয়ে তারা এমন এক বাঁকা পথ ধরেছিলো, যা সৃষ্টির লক্ষ্যকে ব্যাহত করছিলো। মানব জাতির প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যেই মানব প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন এক আস্বাদ, যেন মানুষ সৃষ্টির বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ক্লান্তি বোধ না করে। এ নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমেই মানুষ পেতে পারে এক অতুলনীয় আনন্দ এবং এ আনন্দই তার জীবনকে অর্থবহ, মায়াময় ও মোহময় করে তোলে। জীবনের ঘানি টানতে গিয়ে সে অবসাদগ্রস্ত হয় না। সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মধ্যে এটাই হচ্ছে চিরন্তন সত্য। কিন্তু হায়, ওই অভিশপ্ত জাতি আল্লাহর এ উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিলো তাদের ব্যতিক্রমধর্মী ঘৃণ্য প্রক্রিয়া দ্বারা। এটা বিশ্ব পালক কিভাবে মেনে নিতে পারেন। এ জন্যে প্রয়োজন ছিলো ওই জঘন্য জাতির পুঁই পোনাকে সম্পূর্ণভাবে শেষ করে দেয়ার এবং পৃথিবীর বুকে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেন মানুষ সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যকে বানচাল করে দেয়ার দুঃসাহস আর কোনো দিন না করে। এটা শুধু শাস্তিই ছিলো না, বরং এটা ছিলো সঠিক পথের বাইরে চলে যাওয়া ভ্রান্ত মানবতাকে পুনরায় তার নিজ পথে তুলে দেয়া এবং দৃঢ়ভাবে সে পথের ওপর টিকিয়ে রাখা।

লূত (আ.)-এর কওমের বাঁকা পথে চলার যে খবর জানা যায় তা ছিলো এতোই কদর্য, পৃথিবীবাসী এমন জঘন্য ও সৃষ্টি ছাড়া পাপ আর কারো মধ্যে ইতিপূর্বে কখনও সংঘটিত হতে দেখেনি। তাদের এ মানসিক ব্যাধি যে কোনো শারীরিক ব্যাধির মতোই তীব্র ও সংক্রামক ছিলো। এ ব্যাধির কথা জানাজানি যতো বেশী হচ্ছিলো এবং যতো বেশী লোকের সাথে তাদের মেলামেশা হচ্ছিলো, ততো বেশী দ্রুততার সাথে মানুষের মন ও শরীর এ কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছিলো। এমনি করে নিজেদের পরিবেশকে যেমন তারা দূষিত করে ফেলেছিলো, তেমনি করে দূর দূরান্তরেও ছড়িয়ে পড়েছিলো এ মারাত্মক রোগ, যদিও এটা ছিলো মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি বিরুদ্ধ। প্রকৃতি বলতে তো আমরা বুঝি সেই প্রেরণা ও প্রবণতা, যা মানুষের জীবনকে আপনা

থেকেই এমন কাজ ও ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করে, যা তার জীবনকে বানায় সাবলীল, সচ্ছল ও সুন্দর, যা তাকে পারস্পরিক মেলামেশার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করে দীর্ঘ ও সুন্দর জীবন লাভের পথে এগিয়ে দেয়। অথচ এ বিরল ব্যাধি জীবনকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে ক্ষতি ও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দিলো। প্রকৃতির দাবী হচ্ছে সে মানুষকে এমন স্বাদ ও আনন্দ দেবে, যা তার জীবনকে করবে আরও মযবুত, আরও সুন্দর, আরও সমৃদ্ধ। জীবনকে বিগড়ানোর কাজ কখনও প্রকৃতিসংগত হতে পারে না। এ বিরল যৌন ব্যাধি বাস্তবে মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে এবং মানবতার অস্তিত্বকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দেয়। কারণ জীবনের বীজকে এ বদ-অভ্যাস এমন অনুপযুক্ত ও অনুর্বর জমিতে ফেলার ব্যবস্থা করে, যেখান থেকে কোনো উৎপাদন আশা করা যায় না। সৃষ্টিকর্তা সেই উপযুক্ত উর্বর জমিতে বীজ বপনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যা বীজ গ্রহণের সাথে সাথে উৎপাদনমুখী হয়ে উঠবে এবং সচকিত হয়ে উঠবে জীবনকে বাড়ানোর জন্যে। এ কারণেই শুধু নৈতিক দিক দিয়েই কওমে লূৎ এর অপরাধ ছিলো না, বরং এ ছিলো গোটা মানব জাতিকে ধ্বংসের এক মারাত্মক পদক্ষেপ এবং মানব প্রকৃতিকে ধ্বংসের নামান্তর। আর আল্লাহর সেই আইন বিরোধী, যা মানুষের জন্ম ও বৃদ্ধির পথে মানুষকে এগিয়ে দিয়েছে এবং মানুষের দেহ ও মনে এনে দিয়েছে পরম আনন্দের অনুভূতি। এ আনন্দ তাদের প্রবৃদ্ধির পথে কোনো বাধা বা প্রতিবন্ধকতা হিসাবে আসেনি।

আবার কখনো কখনো দেখা যায়, আমরা মৃত্যুর মধ্যেও কিছু স্বাদ অনুভব করি। হাঁ, দুনিয়ায় খ্যাতি ও সুনাম অর্জনের জন্যে অনেক সময় মানুষ মৃত্যুকে আলিংগন করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। সেখানে যে স্বাদ সে পায়, তা কোনো অনুভূতির স্বাদ নয়, তা হচ্ছে জীবন অর্থপূর্ণ ও মূল্যবান হওয়ার স্বাদ, এটাও জীবনের বিরোধী কোনো প্রবণতা তা নয়- প্রকৃতপক্ষে এটাও জীবনকে উন্নত বানানো ও অন্যভাবে জীবনকে অগ্রসর করার আর এক পন্থা। যদিও এ কারণে জীবন দানের নযীর খুবই বিরল, তবু এমন বিরল কাজ কেউ করলেও এ কাজ জীবন ধ্বংসের নামান্তর নয় বা জীবনের বীজকেও ধ্বংসের পথে এগিয়ে দেয় না।

লূত (আ.) তাঁর মেহমানদেরকে নিয়ে বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। অথচ তিনি তো জানতেন যে, তাঁর জাতির পাপের পেয়ালা কানায় কানায় ভর্তি হয়ে গেছে এবং তাদের জন্যে কী ভীষণ পরিণতি অপেক্ষা করছে। তবু তিনি তার মেহমানদের আসন্ন অপমানের কথা চিন্তা করে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। তার সেই কোমল অনুভূতিকে আল কোরআনের ভাষায় উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

'সে বলে উঠল, হায়! বড়ই কঠিন আজকের এ দিনটি।'

অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষেই আজ কঠিন দিনটি শুরু হয়ে গেলো।

লূত (আ.) দেখতে পেলেন বহু লোক একযোগে তাঁর বাড়ীর দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। অর্থাৎ তাদের দিকে খেয়াল করে দেখে বুঝলেন, তাদের শরীরে ভীষণ উত্তেজনা বিরাজ করছে।

'আর ইতিপূর্বে তারা বহু অন্যায় কাজ করেছে।'

এ ইতিহাস তাঁর জানা ছিলো। এমন পরিস্থিতিতে যে কোনো মানুষই বিব্রত করবে, কারও মেহমানের সাথে দুর্ব্যবহার করার জন্যে কাউকে এগিয়ে আসতে দেখলে অবশ্যই তার খারাপ লাগবে। তাই লূত (আ.) এ পরিস্থিতি সহ্য করতে পারছিলেন না। যার কারণে তাঁর পুরোপুরিই মনে হচ্ছিলো যে, ভীষণ কঠিন দিন আসন্ন এবং আজকেই সেই অবশ্যম্ভাবী কঠিন দিনটি এসে যাবে।

লূত (আ.) দেখতে পেলেন তার জাতির শরীরে উত্তেজনা পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে এবং তারা পাগলের মতো ছুটে আসছে তার বাড়ীর দিকে। তার মেহমানদের বেইযযত করার এবং তার মান

সম্মান নষ্ট করার উদ্দেশ্যেই তারা এগিয়ে আসছে। তখন তিনি তাদের প্রকৃতির মধ্যে সুপ্ত মানবতাবোধকে ও স্বাভাবিক মানব প্রকৃতি ও চাহিদা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন, আর তাদের মনের গতিকে ফেরানোর ব্যবস্থা করলেন তাদের বিপরীত লিংগের দিকে যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিই করেছেন পুরুষদের জন্যে। তার বাড়ীতেই তার মেয়েরা ছিলো, তারা সব দিক দিয়ে প্রস্তুত ছিলো, স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে ও কোমলতায় তারা ছিলো আকর্ষণীয়, যে কোনো আগ্রহী পুরুষ দল চাইলে সাথে সাথে তাদের সাথে তাদের বিয়ে দেয়া যেতো, আর তাদের উগ্র ও পাগলপারা যৌন উত্তেজনার উপশম ঘটানো সম্ভব হতো। তাই তার কথার উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'সে বললো, হে আমার জাতি, এই যে রয়েছে আমার মেয়েরা, এরা তোমাদের জন্যে অধিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো, আর আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে লাঞ্ছিত করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি প্রকৃত ভালো মানুষ নেই?'

'এরা আমার মেয়ে, এরা তোমাদের জন্যে পবিত্রতর'.........

এরা যে কোনো অর্থে অধিক পবিত্র, মনের দিক দিয়ে ও অনুভূতির দিক দিয়ে, সব দিক দিয়েই (যাদের জন্যে তারা লালায়িত ছিলো, তাদের তুলনায়) বেশী পবিত্র। তারা প্রকৃতির স্বাভাবিক ও পরিচ্ছন্ন আহ্বানে সাড়া দিতে এবং অতি চমৎকারভাবে চেতনার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। এ পরিচ্ছন্নতা হবে প্রকৃতিগত দিক দিয়ে, নৈতিক দিক দিয়ে এবং আল্লাহর ব্যবস্থা মানার দিক দিয়ে। তার অনুভূতির দিক দিয়েও তারা পবিত্রতর ও সুকোমল মনোভাবের অধিকারিণী এ জন্যে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা এ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন সম্পর্কের মাধ্যমেই পৃথিবীতে মানব জাতির বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছেন। এ জন্যে তিনি নির্দেশ দিতে গিয়ে বলছেন,

'অতএব আল্লাহকে ভয় করো।'

মানুষকে প্রকৃতির স্বাভাবিক গতির দিকে এগিয়ে দিতে গিয়ে রব্বুল আলামীন মানুষের বিবেককে আকর্ষণ করে এ কথাটা বলেছেন। আরও বলছেন,

'খবরদার, আমার মেহমানের ব্যাপারে আমাকে অপমানিত করো না।'

বেদুইনদের মধ্যে মেহমানদারীর যে রেওয়াজ চালু ছিলো, তাদের সেই মহানুভবতার কথাটা উল্লেখ করে তিনি তাদেরকে যে অনুরোধ করেছিলেন তা তুলে ধরতে গিয়ে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

'তোমাদের মধ্যে কি একজন ভালো মানুষও নেই?'

এখানে প্রশ্ন তোলা হয়েছে বিবেক বুদ্ধির ডাকে সাড়া দেয়া ও ইচ্ছাকৃতভাবে বিবেক বিরুদ্ধ কাজ করার পার্থক্যের মধ্য দিয়েই তাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, বিষয়টাকে মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক দাবী, ধর্মীয় অনুভূতি ও সাধারণ ভদ্রতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হোক। কিন্তু হলে কি হবে, এসব যুক্তিপূর্ণ কোনো কথাই ওই অভিশপ্ত ও ব্যাধিগ্রস্ত জনতার হৃদয়ে দাগ কাটতে পারলো না, আছর করলো না ওইসব মুর্দাদিল লোকদের অন্তরকে, যারা দ্বীন ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো এবং বিবেক যাদের একেবারেই পচে গিয়েছিলো, সাড়া জাগাল না ওইসব অসুস্থ হৃদয়ের মাঝে, ব্যাধিগ্রস্ত বুদ্ধির অধিকারী ও নির্বোধ লোকেরা এ সব যুক্তিপূর্ণ কথা গ্রহণ করলো না, বরং ওই মারাত্মক মানসিক রোগগ্রস্ত হতভাগার দল ভীষণভাবে উত্তেজিত অবস্থায় একযোগে এগিয়ে এলো লূত (আ.)-এর বাড়ীর দিকে। তাদের কথা উদ্ধৃত করা হচ্ছে নীচের আয়াতে,

'ওরা বললো, তুমি তো জানোই যে, তোমার মেয়েদের ব্যাপারে আমাদের কোনো নেই। আর অবশ্যই তুমি জানো যে, আমরা কী চাই।'

অর্থাৎ তুমি তো ইতিপূর্বে জেনেই নিয়েছো যে, তোমাদের মেয়েদের যদি আমরা চাইতামই, তাহলে তাদেরকে তো আমরা আগেই বিয়ে করে নিতাম। সুতরাং, (জেনে নাও) আমাদের চাহিদা

এটা নয়.........'আর তুমি অবশ্যই জানো, আমরা কি চাই।'একথা দ্বারা এক নিকৃষ্ট কাজের দিকে ঘৃণ্যভাবে ইংগিত করা হয়েছে।

লূত (আ.)-এর হাতে এ জাতির পতন ঘটে, কিন্তু এ জাতির লোকেরা লূত (আ.)-এর দুর্বলতা বুঝতো। কারণ তিনি ছিলেন একজন পরদেশী, সুদূর অন্য দেশ থেকে এসে এদেশে বসবাস করছিলেন। তার সহায়তা করার জন্যে তার বংশীয় কেউ সেখানে ছিলো না। আর এ কারণেই এমনই এক কঠিন দিনে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ শক্তিহীন বোধ করছিলেন। তাই তার ঠোঁট ফেটে বেদনাদায়ক এক দুঃখের কথা বেরিয়ে এলো।

'সে বললো, হায়, যদি তোমাদের মোকাবেলা করার মতো আমার কোনো শক্তি, অথবা আমি কোনো মযবুত এবং নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে পারতাম!'

এ কথাগুলো যখন তিনি বলছিলেন, তখন সেই যুবকরা সামনেই ছিলেন, যারা আসলে ছিলেন ফেরেশতা এবং মানুষের রূপ ধরে তার বাড়ীতে মেহমান হয়ে ছিলেন। তাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়েই তিনি কথাগুলো বলছিলেন। এরা ছিলেন কিশোর ছেলেদের মতো দেখতে, আর চেহারা ছিলো এদের বড়ই সুন্দর। কিন্তু তার দৃষ্টিতে এরা নাদুশ নুদুশ হওয়ার কারণে মনে হচ্ছিলো অত্যন্ত লাজুক ও দুর্বল। মোটেই এদেরকে শক্তিশালী মনে হচ্ছিলো না। এজন্যেই তিনি তাদের দিকে এগিয়ে গিয়েই শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলেন, আহা, এরা যদি একটু শক্তিশালী হতো, তাহলে ওদেরকে নিয়েই তিনি ওই যালেমদের মোকাবেলা করতে পারতেন অথবা শক্তিশালী কোনো আশ্রয় কেন্দ্র যদি তার জানা থাকতো, তাহলে এদেরকে নিয়ে সেখানে চলে গেলে আসন্ন এ ভীতিপ্রদ অবস্থা থেকে বাঁচতে পারতেন।

সাময়িকভাবে হলেও লূত (আ.)-এর অন্তর একথাটা একটু সরে গিয়েছিলো যে, অবশ্যই তাঁর শক্তিশালী আশ্রয় স্থান আছে, আর তা হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহর আশ্রয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বন্ধু ও প্রিয় পাত্রদেরকে কখনো অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেন না, যেমন রসূলুল্লাহ (স.) থেকে জানা যায়। তিনি আল্লাহর এ আয়াতটি উদ্ধৃত করছিলেন,

'আমার রহমত (অবশ্যই) ছিলো লূত এর ওপর। অবশ্যই তিনি শক্তিশালী আশ্রয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন।'

যখন প্রকৃতপক্ষেই সংকট ঘনিয়ে এলো এবং বিপদের ঘনঘটায় চতুর্দিকে তাকিয়ে লূত (আ.) চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগলেন, তখনই আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার শক্তি ও অভংগুর আশ্রয় কেন্দ্রের সন্ধান তাকে দিয়ে দিলেন।

'সেই ফেরেশতারা বলে উঠলো, হে লূত আমরা তো তোমার রবের দূত, ওরা কিছুতেই তোমার কাছে ঘেষঁতে পারবে না।'

তখনই তারা তাঁকে সেই খবরটা জানালো, যা নিয়ে তারা প্রেরিত হয়েছিলো। আর তা ছিলো, তাকে, তার স্ত্রী ব্যতীত পরিবারের অন্যান্য পবিত্র ব্যক্তিবর্গকে আসন্ন সেই গযব থেকে নাজাত দেয়ার বার্তা, যা সকাল হওয়ার পূর্বেই ওই যালেম জাতির ওপর এসে পড়বে। শুধু তার স্ত্রী বাচতে পারবে না। কারণ ওই ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের সাথে তার যোগ সাজশ ছিলো। বরং সে প্রকৃতপক্ষে ওদের সাথে সহযোগিতার কারণে হোক বা তাদের কাজে মৌনতা অবলম্বনের কারণে হোক, ওদেরই একজন বলে পরিগণিত হয়ে গিয়েছিলো। ওরা আল্লাহর বাণী শুনাতে গিয়ে বললো,

'রাতের কিছু অংশ বাকি থাকতেই তুমি এ এলাকা ছেড়ে রওয়ানা হয়ে যাবে। আর সাবধান, কেউ পেছন ফিরে তাকাবে না, তোমার স্ত্রী ছাড়া, তাকেও ওদের মতোই একইভাবে আযাব পাকড়াও করে নেবে।

নিশ্চয়ই তাদের প্রতিশ্রুত সময় (যে সময়ে আযাব আসবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে) হচ্ছে প্রভাত বেলা। প্রভাত কি আসন্ন নয়?'

আর রওয়ানা হওয়া এ শব্দ দ্বারা রাতের বেলায় সফরে রওয়ানা হওয়াকেই বুঝানো হয়েছে, কিন্তু রাত থাকতে, অর্থাৎ শেষ রাতে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পেছনের দিকে না দেখে, অর্থাৎ কেউ পেছনে পড়ে থাকবে না, বা কারো জন্যে অপেক্ষাও করবে না। কারণ, ধ্বংসের প্রতিশ্রুত সময়ই হচ্ছে ঠিক ভোর সকালের সময়টা। অতএব, যে ওই সময়ে শহরে থেকে যাবে, সে যেই হোক না কেন তাদের সাথে একইভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে যাদের জন্যে আযাব নাযিল হচ্ছে।

'সকাল কি খুব কাছে নয়?'

আযাব যখন এসে যাবে, তখন লূত (আ.)-কে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখা যাবে, সে প্রশ্নটা সামনে আসছে এবং তার জন্যেই ওয়াদাকৃত সময়ের কথাটা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বলা হচ্ছে এবং স্মরণ করাতে গিয়ে বলা হচ্ছে, সকাল কি কাছে নয়, অর্থাৎ রাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে যে মুহূর্তে প্রভাতের শুভ্র রেখা পূর্ব দিগন্তে ফুটে উঠবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই সেই প্রলয়ংকর আযাব এসে যাবে ওই এলাকার ওপর যে এলাকায় রয়েছে ওই যালেমদের বসতি এবং এটাও নির্ঘাত সত্য কথা যে, লূত (আ.)-এর বাড়ীও ছিলো সেই এলাকাতেই, যেহেতু ওরাও তারই জাতি ও জ্ঞাতি-(গোষ্ঠী)। আযাব সেই শক্তির কাছ থেকে আসবে, যে শক্তির সাহায্য তিনি কামনা করছিলেন।

আর শেষ যে দৃশ্যের কথা এ প্রসংগে জানা যায়, তা হচ্ছে লূত কওমের জন্যে সঠিকভাবে উপযোগী যে ভয়ানক ধ্বংসাত্মক আযাব, সেই কঠিন অবস্থার দৃশ্য।

'তারপর যখন আমার হুকুম এসে গেলো, তখন আমি ওই অঞ্চলকে সম্পূর্ণভাবে উল্টে দিলাম। তার উপরিভাগকে নীচে এবং নীচের অংশকে উপরে তুলে দিলাম এবং তাদের ওপর পাকা মাটির পাথর বর্ষণ করলাম, যা উপর্যুপরিভাবে পড়ে স্তূপ হয়ে গেলো। এগুলো চিহ্নিত ছিলো তোমার রবের কাছে (অর্থাৎ কার উপরে কোনটা পড়বে, তা নির্ধারিত)। আর যালেমদের থেকে এগুলো মোটেই দূরে ছিলো না।'

অর্থাৎ যখন আল্লাহর ফায়সালা কার্যকর হওয়ার সেই নির্দিষ্ট সময়টা এসে গেলো, তখন 'আমি পরিণত করলাম উপরের অংশকে নীচের অংশে' এটাই হচ্ছে তার সার্বিক ধ্বংসের চিত্র, যাতে বুঝা যায় যে, সব কিছু ওলট পালট হয়ে গিয়েছিলো, পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিলো সকল চিহ্ন এবং ওই জাতির নাম নিশানা মুছে গিয়েছিলো। আর ওই এলাকাকে ওলট পালট করে দিয়ে সেখানে আল্লাহ তায়ালা এই যে পরিবর্তন আনলেন এবং তাদের ওপরের অংশকে নীচের অংশে পরিণত করলেন- এটা এ জন্যে করা হয়েছিলো যে, ওই অভিশপ্ত জাতি আল্লাহর নিয়ম বদলে দিতে চেয়েছিলো এবং মানুষকে মানবতার স্তর থেকে চরম পশুর স্তরে নামিয়ে দেয়ার কাজে লেগে গিয়েছিলো, বরং পশু থেকেও তারা বহু বহু নীচে নেমে গিয়েছিলো। কারণ পশুও, পশুত্বের যে প্রকৃতি, তার মধ্যে তার আচরণকে সীমাবদ্ধ রাখে। কিন্তু ওই গযবপ্রাপ্ত জাতি পশুত্বের সকল সীমা ডিংগিয়ে গিয়েছিলো। এরই ফলে এরশাদ হচ্ছে,

'আমি মহান আল্লাহ তাদের ওপর পাকা মাটির পাথর বর্ষণ করলাম।' এ পাথর ছিলো মাটি-মিশ্রিত। ওই ধরনের পাথরই সম্ভবত তাদের জন্যে উপযুক্ত ছিলো এবং উপযোগী ছিলো তাদের অবস্থানের জন্যে।

'মানদুদ', পরতে পরতে সাজানো শিলাখন্ড, অর্থাৎ পাথরগুলো তাদের ওপর বর্ষিত হয়ে পরতে পরতে সাজানো হয়ে গিয়েছিলো।

এই যে পাথরগুলো............ 'এগুলো তোমার রব-এর কাছে চিহ্নিত ছিলো।' যেমন চিহ্নিত করা হয় গবাদি পশুকে। অর্থাৎ, প্রতিপালন করে এদের অধিকাংশকে মুক্তভাবে ছেড়ে দেয়া হয়।

এ পাথরগুলোকেও যেন একইভাবে প্রতিপালন করে মুক্তভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো, যাতে করে ওইসব পশুর মতো স্বাধীনভাবে এরা প্রতিপালিত হতে ও বাড়তে পারে। যাতে করে সময় মতো এদেরকে কাজে লাগানো যায়।......... এ এক আজব ছবি, যার ছায়া পড়ে অনুভূতির ওপর। আর এর ব্যাখ্যা সেইভাবে বুঝা যায় না, যেমন ব্যাপকভাবে বুঝা যায় ওই দৃশ্যের ছায়া থেকে, যা অন্তরের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। এরশাদ হচ্ছে,

'আর এগুলো (পাথরের বর্ষণ) যালেমদের থেকে মোটেই দূরে নয়।'

এ আযাব খুবই কাছে এবং এর জন্যে ফরমায়েশ দেয়া হয়েই গেছে এবং সময় প্রয়োজন হলেই এ আযাবকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং ওদেরকে তা পাকড়াও করবে। আর লূত (আ.)-এর জাতির ওপর বর্ষিত আযাবের যে ছবি এখানে আঁকা হয়েছে, তার তুলনা করা যায় কোনো আগ্নেয়গিরির সাথে। যখন এ সব আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা বেরোতে থাকে তখন পাশের ভূমির ওপরে পাথর ও গলিত খনিজ পদার্থ কাদার ঢেউ আকারে উপর্যুপরিভাবে পতিত হয়ে পুরু আস্তর পড়ে যায় ...... আর তোমার রবের কাছে যালেমদের জন্যে বহু বহু (এমন আযাব) জমা হয়ে রয়েছে!'

আমরা শুধু কথার কথা হিসাবে একথাগুলো বলছি- তা নয়। অবশ্য অন্যান্য আগ্নেয়গিরির মতোই এটাও ছিলো এক ভয়ানক আগ্নেয়গিরি, যা ওই সময়ে প্রচন্ড অগ্নি উদ্গীরণ করেছিলো, যার ফলে যা ঘটার তা ঘটেছিলো। আমি কিছুতেই এটা অস্বীকার করবো না যে, কার্যত অনুরূপ প্রচন্ড আগ্নেয়গিরিই ঘটেছিলো। তবে এটাও আমরা চূড়ান্তভাবে বলবো না যে, এটা আমাদের জানা কোনো সাধারণ আগ্নেয়গিরিই ছিলো।

অর্থাৎ পৃথিবীর জীবন্ত আগ্নেয়গিরিসমূহ থেকে যে সব অগ্ন্যুৎপাত এ পর্যন্ত ঘটেছে অবিকল সে ধরনের অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিলো- তা আমরা বলতে পারবো না।

এখানে প্রধান যে কথাটা আসে, তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা গযব নাযিল করতে চাইলে তা যে কোনো ভাবে করতে পারেন। কোনো এলাকা ধ্বংস করতে চাইলে আমাদের জানা মতে যে সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে পারে, তার যে কোনো একটাকে বেগবান করে দিয়ে যে ভাবে তিনি চান সেভাবে তার মধ্যে তীব্রতা দান করতে পারেন। সুতরাং তিনিই তাঁর গায়েবী জ্ঞানের অধিকারী, তিনিই জানেন যে কোন ধরনের আগ্নেয়গিরির আগুন দিলে ওই যালেম জাতি সমূলে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আর ওই নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আযাব নাযিল করা-এটা একমাত্র আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব যাঁর নিয়ন্ত্রণে সৃষ্টির সব কিছু পরিচালিত হচ্ছে, চলছে সকল জীবন্ত প্রাণী ও প্রাকৃতিক জগতের সব কিছু ....আর স্বাভাবিকভাবে এটাই হয়েছে যে, ওই আযাব এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে এবং নির্দিষ্ট পরিমাপ অনুসারে নাযিল হয়েছে, হয়েছে সেইভাবে যেভাবে লূত (আ.)-এর ওই নাফরমান জাতিকে ধ্বংস করার জন্যে ওই সময়ে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা চেয়েছিলেন।

এ পর্যায়ে একথাটা বলা প্রয়োজন যে, ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনাটাও এ পর্যায়ে তুলে ধরে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর শক্তি-ক্ষমতার নিদর্শন দেখাতে চেয়েছেন এবং সৃষ্টির সাথে তাঁর সম্পর্ক কতো ঘনিষ্ঠ, তাও এমনভাবে জানাতে চেয়েছেন যেন কোনো মানুষের কল্পনাতে শুধু নয়, বাহ্যিক সব কিছুর মধ্য দিয়েও আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার নিদর্শন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।(১)

এরপর মাদইয়ানবাসীর কাছে হযরত প্রেরিত নবী শোয়ায়বের সাথে তাদের দুর্ব্যবহার এবং তার পরিণতি জানাতে গিয়ে নাযিল হচ্ছে,

---

(১) তুলনামূলক আলোচনার জন্য দেখুন, 'খাসায়েসুত্তাসাব্বুরিল ইসলামী ওয়া মুকাওয়ামাতিহী।'

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ
غَيْرُهُۥ ۖ وَلَا تَنقُصُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۚ إِنِّىٓ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّىٓ أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَٰقَوْمِ أَوْفُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ
وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾
بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾
قَالُوا۟ يَٰشُعَيْبُ أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ
فِىٓ أَمْوَٰلِنَا مَا نَشَٰٓؤُا۟ ۖ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾ قَالَ يَٰقَوْمِ
أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَرَزَقَنِى مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَآ

রুকু ৮

৮৪. মাদইয়ান (বাসী)-এর কাছে (ছিলো) তাদেরই (এক) ভাই শোয়ায়ব; সে (তাদের) বলেছিলো, হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর এবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই; (আর সে মাবুদেরই নির্দেশ হচ্ছে,) তোমরা মাপ ও ওযন কখনো কম করো না, আমি তো তোমাদের (অর্থনৈতিকভাবে খুব) ভালো অবস্থায়ই দেখতে পাচ্ছি, (এ সত্ত্বেও এমনটি করলে) আমি কিন্তু তোমাদের জন্যে এক সর্বগ্রাসী দিনের আযাবের আশংকা করছি। ৮৫. হে আমার জাতি, তোমরা মাপ ও ওযনের কাজ ইনসাফের সাথে আঞ্জাম দেবে, লোকদের তাদের জিনিসপত্রে (কম দিয়ে তাদের) ক্ষতি করো না, আর যমীনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না। ৮৬. যদি তোমরা সঠিক অর্থে আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাকো, তাহলে (জেনে রেখো,) আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত যে সম্পদ তোমাদের কাছে অবশিষ্ট থাকবে, তাই তোমাদের জন্যে উত্তম (আমার কাজ শুধু তোমাদের বলা)- আমি তো তোমাদের ওপর পাহারাদার নই। ৮৭. তারা বললো, হে শোয়ায়ব, তোমার নামায কি তোমাকে এই আদেশ দেয় যে, আমরা আমাদের দেবতাদের এবাদাত ছেড়ে দেবো (বিশেষ করে এমন সব দেবতাদের)- যাদের এবাদাত আমাদের পিতৃপুরুষরা করতো, (তোমার নামায কি তোমাকে এ আদেশ দেয় যে,) আমরা আমাদের ধন-সম্পদ নিয়ে যা করতে চাই তা (আর) করতে পারবো না? (আমরা জানি) নিশ্চয়ই তুমি একজন ধৈর্যশীল নেককার মানুষ! ৮৮. সে বললো, হে আমার জাতি, তোমরা কি কখনো (একথা) ভেবে দেখেছো, যদি আমি আমার মালিকের পাঠানো একটি সুস্পষ্ট দলীলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, অতপর তিনি যদি আমাকে তাঁর কাছ থেকে উত্তম রেযেকের ব্যবস্থা করেন; (তাহলে কি আমি তোমাদের তাঁর পথে ডাকবো না?) আমি (কখনো) এটা এরাদা করি না, যে (কথা) থেকে

أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا

اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (৮৮) وَيَا قَوْمِ

لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ

أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ (৮৯) وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا

إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (৯০) قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ

وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا

بِعَزِيزٍ (৯১) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ

ظِهْرِيًّا ۖ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (৯২) وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ

আমি তোমাদের বারণ করি, নিজে (তার বিরুদ্ধে চলে) তোমাদের বিরোধিতা করবো;
(আসলে) আমি তো এর বাইরে আর কিছুই চাই না যে, যদ্দূর আমার পক্ষে সম্ভব আমি
তোমাদের সংশোধন করে যাবো; আমার পক্ষে যতোটুকু কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব তা তো
একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালার (সাহায্য) দ্বারাই (সম্ভব); আমি তো সম্পূর্ণত তাঁর ওপরই
নির্ভর করি এবং (সব ব্যাপারে) আমি তাঁরই দিকে ধাবিত হই। ৮৯. হে আমার জাতি,
আমার বিরুদ্ধে (তোমাদের) জেদ (এবং শত্রুতা) যেন তোমাদের জন্যে এমন এক
(আযাবজনিত) বিষয়ের কারণ না হয়ে দাঁড়ায় যে, তোমাদের ওপরও সে ধরনের কিছু
আপতিত হবে, যেমনটি নূহ কিংবা হূদ অথবা সালেহের জাতির ওপর আপতিত
হয়েছিলো; আর লূতের সম্প্রদায়ের (পাথর বর্ষণের সে) স্থানটি তো তোমাদের থেকে খুব
বেশী দূরেও নয়। ৯০. তোমরা তোমাদের মালিকের কাছে (নিজেদের গুনাহের জন্যে)
ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতপর (তাওবা করে) তাঁর দিকেই ফিরে এসো; অবশ্যই আমার
মালিক পরম দয়ালু ও স্নেহময়। ৯১. তারা বললো, হে শোয়ায়ব, তুমি যা (ভালো ভালো
কথাবার্তা) বলো তার অধিকাংশ কথাই আমাদের (ঠিকমতো) বুঝে আসে না (আসল কথা
হচ্ছে), আমরা তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, তুমি আমাদের মাঝে খুবই দুর্বল, (আমাদের
মাঝে) তোমার (আপন) গোত্রের লোকজন না থাকলে আমরা (অবশ্যই) তোমাকে পাথর
নিক্ষেপ (করে হত্যা) করতাম, (তা ছাড়া) তুমি তো আমাদের ওপর খুব শক্তিশালীও নও
(যে, অতপর আমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারবে)। ৯২. সে বললো, হে আমার
জাতি, তোমাদের কাছে আমার গোত্রীয় ভাই-বন্ধু কি আল্লাহ তায়ালার চাইতে বেশী
প্রভাবশালী (যে, তোমরা ওদের দোহাই দিচ্ছো)? আল্লাহ তায়ালাকে কি তোমরা
তোমাদের পেছনে ফেলে রাখলে? (জেনে রেখো,) তোমরা (এখন) যা কিছু করছো, আমার
মালিকের জ্ঞানের পরিধি দ্বারা তা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। ৯৩. হে আমার সম্প্রদায়,

إِنِّي عَامِلٌ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۙ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۖ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٩٤﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴿٩٥﴾

তোমরা তোমাদের জায়গায় যা কিছু করতে চাও করে যাও; আমিও (আমার জায়গায় যা করার) করে যাবো; অচিরেই তোমরা (একথা) জানতে পারবে, কার ওপর এমন আযাব আসবে যা তাকে অপমানিত করে ছাড়বে, আর কে মিথ্যাবাদী (তাও তখন জানা যাবে); অতএব তোমরা (সেদিনের) প্রতীক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করবো।
৯৪. পরিশেষে যখন আমার (আযাবের) সিদ্ধান্ত এলো, তখন আমি শোয়ায়বকে এবং তার সাথে যে কয়জন (মানুষ) ঈমান এনেছিলো তাদের সবাইকে আমার নিজস্ব রহমত দ্বারা (প্রলয়ংকরী আযাব থেকে) বাঁচিয়ে দিলাম, অতপর যারা (আল্লাহর সাথে) যুলুম করেছে, সেদিন তাদের ওপর মহানাদ আঘাত হানলো, ফলে মুহূর্তের মাঝেই তারা নিজেদের ঘরসমূহেই (এদিকে সেদিকে) উপুড় হয়ে পড়ে রইলো,
৯৫. (অবস্থা এমন হলো) যেন সে জনপদে কখনো তারা কোনো প্রাচুর্যই অর্জন করেনি, শুনে রাখো, এ ধ্বংসই ছিলো মাদইয়ান (বাসী)-এর চূড়ান্ত পরিণাম, (ঠিক) যেমন (ধ্বংসকর) পরিণাম হয়েছিলো (তার পূর্ববর্তী সম্প্রদায়) সামুদের!

তাফসীর
আয়াত ৮৪-৯৫

চিরন্তন এক তাওহীদী বিশ্বাসের আহ্বান নিয়ে একই ধারায় আল্লাহর সকল নবী রসূল যে দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন, সেই একই কাজ নিয়ে মাদইয়ানে প্রেরিত হয়েছিলেন শোয়ায়ব (আ.) তার জাতির মধ্যে..... আর তাওহীদী বিশ্বাসকে গ্রহণ করার দাওয়াতের সাথে সাথে এ পয়গাম্বর আরও একটি বিষয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। আর তা ছিলো মানুষের মধ্যে আমানত, ইনসাফ ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার দায়িত্ব। এ গুণগুলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সাথে অংগাংগিভাবে জড়িত। এ গুণগুলো কায়েম হতে পারে একমাত্র আল্লাহর প্রেরিত জীবন ব্যবস্থা কবুল করার মাধ্যমে এবং তাঁর আইন কানুন ও হুকুম আহকাম মেনে চলার মাধ্যমে। যদিও মাদইয়ানবাসী প্রচন্ড এক ভয় ভীতির কারণে এ আকীদা গ্রহণ করেছিলো, কিন্তু অর্থনৈতিক লেনদেন এবং আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের জন্যে নিয়মিত নামায পড়ার যে ব্যবস্থা তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো, তা পালন করতো না! এভাবে আদ জাতির সাথে হূদ (আ.)-এর এবং সামুদ জাতির সাথে সালেহ (আ.)-এর যে তিক্ত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো- সেই একই ধরনের কঠিন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো শোয়ায়ব (আ.)-এর সাথে তাঁর জাতির। হাঁ, এদের পরিসমাপ্তি এবং ওই সকল জাতির ঘটনাবলীর ধরনের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও সালেহ (আ.)-এর ঘটনার সমাপ্তির সাথে শোয়ায়ব (আ.)-এর জাতির শেষ পরিণতির মিল রয়েছে একটু বেশী, এমনকি এ উভয় জাতির ওপর যে আযাব নাযিল হয়েছিলো, তাও একই ধরনের।

অর্থনৈতিক দুর্নীতির পংকে নিমজ্জিত মাদইয়ানবাসী

'(স্মরণ করে দেখো), মাদইয়ানবাসীদের কাছে এলো তাদের ভাই শোয়ায়ব। সে বললো, হে আমার জাতি! এবাদাত করো আল্লাহর, তিনি ছাড়া তোমাদের জন্যে আর কোনো ইলাহ নেই ....।'

নতি স্বীকার করতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং সকল ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর ব্যবস্থাই মানতে হবে- এটাই তাওহীদ বিশ্বাসের প্রথম কথা এবং জীবনের প্রথম নীতি। আর শরীয়ত বা আল্লাহ প্রদত্ত আইন কানুনেরও প্রথম মূলনীতি এটাই। লেনদেনেরও প্রথম নীতিও এটাই। এ এমন এক মূলনীতি, যা বাদ দিলে অন্য জিনিসের ওপর কোনো বিশ্বাস, কোনো এবাদাত বন্দেগী (নির্বিচার ও নিরংকুশ আনুগত্য) কিছুই টিকে থাকতে পারে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'খবরদার, তোমরা মাপযন্ত্র এবং দাঁড়িপাল্লা দ্বারা জিনিসপত্র মাপার সময় কম দিয়ো না। আমি তোমাদেরকে তো বেশ স্বচ্ছলই দেখছি, আর তোমাদের জন্যে আমি সেই দিনের আযাবকে ভয় করি, যে দিন সব কিছুর বিচার হবে। আর হে আমার জাতি, পূর্ণভাবে মাপযন্ত্রে মেপে দাও এবং পাল্লা দিয়ে ওযন করে দেয়ার সময় সঠিকভাবে ওযন করো, আর মানুষকে তাদের পাওনা জিনিস থেকে কম দিয়ো না। এভাবে পৃথিবীতে অশান্তি ও বিশৃংখলা ছড়িয়ে দিওনা এবং উচ্ছৃংখল জাতিতে পরিণত হয়ে যেয়ো না। আল্লাহর কাছে যা আছে তাই তোমাদের জন্যে ভালো। যদি তোমরা মোমেন হও, তাহলে বুঝবে। 'আর আমি তোমাদের হেফাযতকারী হিসাবে নিয়োজিত হইনি।'॥এ এ আয়াতে আকীদা ও আনুগত্য সম্পর্কে বলার পর আমানত ও ইনসাফের ওপরই বিশেষভাবে আলোচনা এসেছে, অথবা জীবনের আইন কানুন ও লেনদেন সম্পর্কিত বিধান যে আকীদা ও আনুগত্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, সে বিষয়েই আলোকপাত করা হয়েছে।

মাদইয়ানবাসী এবং তাদের বাসস্থান হেজায থেকে সিরিয়াগামী রাস্তার ওপর অবস্থিত ছিলো। এ এলাকার লোকেরা সাধারণত মাপের কম দিতো এবং মানুষকে ঠকাতো। অর্থাৎ লেনদেনের সময় মূল্য পরিশোধ করতে গিয়ে কম দেয়া এদের নেশা ও পেশায় পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। এ এমন এক জঘন্য খাসলাত, যা অন্তরের পরিচ্ছন্নতা এবং বাস্তব লেনদেন উভয়টাকেই দলিত মথিত করে দেয়, যেমন করে নষ্ট করে মানুষের প্রতি সৌজন্যে বোধ এবং ভদ্রতা জ্ঞানকে। এ যালেম জাতি যেহেতু এমন সুবিধাজনক এলাকায় বাস করতো যে সেখান থেকে আরব উপদ্বীপের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে গমনকারী বাণিজ্য কাফেলাগুলোকে অতিক্রম করতেই হতো। অর্থাৎ সকল এলাকার বাণিজ্যযাত্রীদের এটাই ছিলো যাতায়াতের একমাত্র পথ। এ সুযোগে তাদের ওপর এ এলাকাবাসী প্রাধান্য বিস্তার করতো এবং জবরদস্তী করে তাদেরকে বাধ্য করতো ওদের শর্তেই লেনদেন করতে, যার বিশদ বর্ণনা এ সূরার মধ্যে এসেছে।

এরপর দেখানো হয়েছে, লেনদেনের সময় মানুষকে ঠকানো ও কষ্ট দেয়ার এ দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা হতে পারে একমাত্র আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার ওপর অবিচল বিশ্বাসের ওপর। তাঁর যাবতীয় হুকুম পালনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে বাস্তব আনুগত্য, আমানতের হক আদায়ের অনুভূতি, লেনদেনের পরিচ্ছন্নতা, ব্যবসায়ী সততা ও লোকদের সাথে ভদ্রতাপূর্ণ আচরণ। ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের সাথে লেনদেন কালে একমাত্র আল্লাহভীতিই তাদের গোপন চুক্তিকে ঠেকাতে পারে। এ পবিত্র ঈমানই মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী বানানোর গ্যারান্টি দেয়, নিশ্চয়তা বিধান করে পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করার। আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর প্রতি দৃঢ়

বিশ্বাস (মযবুত ঈমান)-ই মানুষকে দান করে আল্লাহভীতি এবং উদ্বুদ্ধ করে মানুষকে তাঁর সন্তুষ্টি হাসিলের দিকে-এভাবেই মানুষের মধ্যে স্থায়ী মানবতাবোধ পয়দা হয়। আর তাকওয়ার ভিত্তিতে যখন এ মানবতাবোধ পয়দা হয়, তখন তা অন্য কোনো যুক্তি বা অন্য কোনো বিবেচনা বা আবেগের কারণে নিভে যায় না।

মানবীয় যুক্তি, বিবেচনা বোধ বা ভাবের আবেগের কারণে তা নিভে যায় না।

অবশ্যই সুষ্ঠু লেনদেন ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতার পেছনে কোনো মযবুত ভিত্তি থাকতে হবে, যা নিও পরিবর্তনশীল কোনো মনমানসিকতার সাথে জড়িত নয়, আর তা হচ্ছে ইসলাম। আর পূর্ণাংগ এ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বুনিয়াদীভাবে মানব নির্মিত যে কোনো সামাজিক ও নৈতিক ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষের চিন্তা-প্রসূত ও মনগড়া ধারণা, অনুমানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ব্যবস্থায় তাদের বাহ্যিক সুযোগ সুবিধার দিকেই খেয়াল দেয়া হয় মাত্র!

আর যখন ইসলামের স্থায়ী ভিত্তির ওপর কোনো নীতি নৈতিকতা গড়ে ওঠে, তখন সেখানে (সাময়িক ও) উপস্থিত সুযোগ সুবিধা ও বস্তুগত স্বার্থ গৌণ হয়ে যায় এবং ইসলামী অনুভূতি ও আল্লাহর ভয়ের প্রভাবে গোটা পরিবেশের মধ্যে দেখা দেয় অভাবনীয় পরিবর্তন।

মানুষ কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করুক, পশু চরাক বা শিল্প কারখানার মধ্যে যেখানেই যখন কাজ করুক না কেন, আল্লাহর ভয় এবং তাঁর কাছে জওয়াবদিহি করার চিন্তা না থাকলে তাদের লেন দেন কোনো স্থায়ী নীতি নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পাদিত হওয়া সম্ভব নয়। সে সব স্থলে তাদের লেন দেনের নীতির মধ্যে অবশ্যই বারবার পরিবর্তন হতে থাকবে। আর এ পরিবর্তনের মধ্যে হারিয়ে যাবে তাদের নৈতিক চেতনা। আর এর ফলে তাদের পক্ষে কোনো নৈতিকতাপূর্ণ আদান প্রদানও সম্ভব থাকবে না। অপরদিকে, যখন জীবনের সকল বিষয়কে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করা হবে এবং সকল কাজের পেছনে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা, তাঁর কাছেই প্রতিদান পাওয়ার আকাংখা এবং তাঁর আযাব থেকে বাঁচার প্রেরণা কাজ করবে, তখন মানুষে মানুষে গড়ে উঠবে পারস্পরিক সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আর নীতি নৈতিকতা সম্পর্কিত মানুষের তৈরী বিভিন্ন মতবাদের যতোই প্রশংসা করা হোক না কেন, বাস্তব জীবনে ইসলামী নৈতিকতার মোকাবেলায় অর্থনৈতিক আদান প্রদান ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সে সব ব্যর্থ ও নিষ্ফল বলে প্রমাণিত হয়েছে।(১) এরশাদ হচ্ছে,

'আর কম করোনা মাপ-যন্ত্রে এবং দাঁড়িপাল্লার ওযনে।'

অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে উত্তম রেযেক দান করেছেন। সুতরাং সম্পদ বাড়ানোর জন্যে এবং হঠাৎ করে বড় লোক হওয়ার উদ্দেশ্যে এসব খারাপ ও ঘৃণিত পথ গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন তোমাদের নেই। জেনে রেখো, যদি তোমরা মাপে কম না দাও, তাতে তোমরা কিছুতেই গরীব হয়ে যাবে না বা তোমাদের কোনো ক্ষতিও হবে না .... বরং এ হীন পন্থায় তোমাদের যে লাভ হবে বলে তোমরা ধরে নিয়েছো, তা আসলে হবে তোমাদের জন্যে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির কারণ, যেহেতু এ ঘৃণ্য পন্থার মাধ্যমে লেন দেনের সময় মানুষকে ধোকা দেয়া হয় অথবা (বেচাকেনার সময়) দেয়া বা নেয়ার কাজ করতে গিয়ে (যদি এ ধোকাবাজি) ধরা পড়ে, তাহলে উভয় পক্ষের মধ্যে অবশ্যই রাগারাগি সৃষ্টি হয়, যার ফলে ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে স্বাভাবিক সম্পর্ক ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর শেষ পরিণতির দিকে ইংগিত দিতে গিয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয় আমি ভয় করছি যে, তোমাদের ওপর সেই মহা কঠিন দিনে চূড়ান্ত শাস্তি এসে যাবে, যে দিন থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না।'

(১) এ বিষয়ে আরো বিস্তারিতভাবে জানার জন্যে উস্তাদ আবুল আ'লা মওদূদী রচিত 'নাযরিয়াতুল ইসলামি আল খালক্বিয়্যাহ' নামক পুস্তক। আরো দেখুন এ লেখকের অন্য পুস্তক 'নাহওয়া মুজতামাউ ইসলামী'।

এ কঠিন শাস্তি হয়তো মৃত্যুর পর পরকালীন জীবনে আল্লাহর কাছ থেকে আসবে অথবা পার্থিব জীবনে এ ধোকাবাজি যখন ধরা পড়বে, তখন ব্যবসায়ের ওপর এসে পড়বে এক মারাত্মক প্রতিক্রিয়া, যার ফলে ব্যবসায় মার খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে। এতোটুকুতেই এ ক্ষতি সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয়, বরং এসব ধোকাবাজিকে কেন্দ্র করে ঝগড়া-ফাসাদ মারামারি কাটাকাটি ও যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, যাতে অগণিত জান মালের সমূহ ক্ষতির আশংকা দেখা দেবে। এ ক্ষতি গ্রাস করে ফেলবে দৈনন্দিন জীবনের সকল কর্মকান্ড, প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি যোগাযোগকে।

এসব উপদেশ দানের পর শোয়ায়ব (আ.) যখন দেখলেন তাঁর জাতির পক্ষ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া আসছে না, তখন তিনি অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী এক ভাষায় তাদেরকে ওই ঘৃণ্য পন্থার লেন দেন পরিত্যাগ করার আহ্বান জানাচ্ছেন। তাঁর কথার উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে আল কোরআন বলছে,

'হে আমার জাতি, মাপের পেয়ালা ও দাঁড়িপাল্লার ওযন ইনসাফের সাথে পূর্ণ করে দাও।'

এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, 'ঈফাউল কায়লা' (পূর্ণভাবে মাপ) শব্দদ্বয় 'ইনসাফের সাথে মাপ' কথাটার চেয়ে বেশী শক্তিশালী। কারণ একথাটা 'একটু বেশী দাও' কথাটার সাথে বেশী সম্পর্কযুক্ত।

আর আলোচনার ধারায় 'পূর্ণভাবে মাপ' কথার মধ্যে যে গভীর অনুভূতির দিকে ইংগিত করা হয়েছে তা অবশ্যই 'কম দিয়ো না' কথাটার চাইতে বেশী সুন্দর, বেশী ভদ্রতাপূর্ণ এবং দানশীলতার দিকে অধিক ইংগিত দানকারী। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'খবরদার, মানুষকে তাদের পণ্যদ্রব্য দেয়ার সময় কম দিয়ো না।'

আর এ হুকুম সকল ধরনের মাপের পাত্র ও যে কোনো পাল্লার ব্যাপারে সাধারণ নির্দেশ, মানুষের লেন দেন যোগ্য সকল শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের ব্যাপারেই একথাটা প্রযোজ্য– এটা মাপের কোনো পাত্র হতে পারে, ওযন করার যন্ত্র বা পাল্লা হতে পারে, কোনো দরপত্র ছাড়া অথবা নিলাম ডাকা হতে পারে, অথবা হতে পারে কোনো ট্যাকস নির্ধারণ ও বস্তুগত বা অর্থগত জরিপ করা। আসলে মানুষকে ঠকানোর এ কাজটা কোনো কাজ বা কোনো আচরণ বা কোনো গুণ দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে। কারণ 'শাইউন' (জিনিস) বলতে সর্বপ্রকার লাভজনক জিনিস বুঝালেও ধরা ছোঁয়া যায় না এমন জিনিসকেও বুঝায়।

আর মানুষকে তাদের পাওনা জিনিস থেকে কম দেয়া– এটার ক্ষতি অন্য যাই হোক না কেন, এটা অবশ্যই একটা যুলুম। এ যুলুম দ্বারা মানুষের কু-প্রবৃত্তিকে হাওয়া দেয়া হয়। এর দ্বারা মানুষকে কষ্ট দেয়ার মনোবৃত্তি ও সাহায্য করার পরিবর্তে ঘৃণা করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে ক্রেতা বা গ্রহীতার মনে জাগে ইনসাফ, কল্যাণ ও সদ্ব্যবহারপ্রাপ্তির ব্যাপারে হতাশা। আর এসব অনুভূতি মানুষের সুন্দর ও পারস্পরিক সৌহার্দ বিনিময়ের জীবনকে সংকীর্ণ করে ফেলে। সামাজিক জীবনে মানুষের মধ্যে যে হৃদ্যতা থাকা দরকার, সেটাকে নষ্ট করে দিয়ে সেখানে বৃদ্ধি পায় একে অপরকে কষ্ট দিয়ে স্বার্থ বাগানোর প্রতিযোগিতা, মন মানসিকতার সুন্দর বৃত্তিগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়ে জীবনের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর পৃথিবীর বুকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী হিসাবে ছড়িয়ে পড়ো না।'

'আসবুন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ মানুষকে কষ্ট দেয়া, অন্যায়ের প্রসার ঘটানো ও সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা। সুতরাং, আয়াতাংশের অর্থ দাঁড়াচ্ছে সমাজে তোমরা এমনভাবে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না যে, তোমরা এ কদর্য কাজটা পছন্দ করো বলে সাধারণভাবে মনে হতে পারে এবং তোমাদের সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, তোমরা এ অভ্যাসটা পছন্দ করো।

এরপর, আয়াতের শেষাংশে মানুষের মধ্যে বিরাজমান সুপ্ত মানবতাকে জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে এবং স্থায়ী শান্তি ও সম্প্রীতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে,

ওই অসুন্দর ও কুৎসিত মনোভাবকে দমন করো এবং কোনো পাত্রে বা পাল্লায় ওযন করার সময় কম দেয়ার মনোবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করো, যার যা পাওনা তা সঠিকভাবে বুঝিয়ে দাও। তাহলেই দেখতে পাবে (দুনিয়ার জীবনের লাভ লোকসানের যোগ বিয়োগের পর) আল্লাহর কাছে রক্ষিত অংশটা হয়ে ওঠে কতো ভালো! দেখুন আল্লাহর তরফ থেকে নিশ্চয়তার সাথে ঘোষণা দানের ভাষাটা,

(লাভ লোকসানের খতিয়ান করে দেখ তোমরা, হালাল পথে রোযগারের ফলে) যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে আল্লাহর কাছে তাই তোমাদের জন্যে হবে ভালো- (একথা তোমরা বুঝতে পারবে) যদি তোমরা (প্রকৃতপক্ষে) মোমেন হও।'

ওপরের কথাটা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন যে, মানুষের পাওনা সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেয়ার মাধ্যমে সৎ জীবন যাপন কর। এতে আল্লাহর কাছে যা বাকি থেকে যাবে, তাই হবে স্থায়ী এবং তাই হবে উত্তম................ এ বিষয়টা বলতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে প্রথমেই তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। অর্থাৎ চূড়ান্ত ও পূর্ণাংগভাবে নতি স্বীকার করতে হবে আল্লাহর কাছে ও জীবনের সকল ব্যাপারে আইন মানতে হবে একমাত্র তাঁর। অন্য কারো আইন মানা দ্বারা শক্তি-ক্ষমতায় আরো কেউ আল্লাহর সাথে ভাগীদার আছে এটা কিছুতেই একজন মোমেন মেনে নেবে না। এজন্যেই তাদেরকে স্মরণ করাতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা এখানে জানাচ্ছেন, যদি আল্লাহর নির্দেশ মেনে নিয়ে পাওনাদারের পাওনা ইনসাফের সাথে বুঝিয়ে দাও, তাহলে তার প্রতিদান দুনিয়ায় যা পাওয়ার তা তো পাবেই, আসল পুরস্কার অবশ্যই বাকি থাকবে আল্লাহর কাছে, যা তোমরা পাবে সেই মহা সংকটের দিনে, যে দিন তোমাদের বড় প্রয়োজন হবে এবং সেদিন এ সতর্কতাপূর্ণ জীবন যাপনের নেকী একত্রিত হয়ে তোমার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসবে। একথাগুলো তোমরা সহজেই বুঝবে যদি প্রকৃতপক্ষেই তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ওপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। অতএব, এখন তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো এ লেন দেনের স্বচ্ছতা ও সততা পোখতা ঈমানের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই আবারও খেয়াল করে দেখুন,

দুনিয়ায় বিনিময় পাওয়ার পর 'আল্লাহর কাছে যা কিছু পাওনা সংরক্ষিত রয়ে যাচ্ছে, তাই তোমাদের জন্যে উত্তম .... (বুঝতে কষ্ট হবে না) যদি (সত্যিকারে) তোমরা মোমেন হও।'

এরপর যাদেরকে একথাগুলো গ্রহণ করার জন্যে আহ্বান জানানো হচ্ছে, তাদের সাথে আল্লাহর এক মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠার ঘোষণা দেয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, যারা অন্যায় কাজ ও আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে চায় না, তার জন্যে চেষ্টাও করে না, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা মোটেই দায়ী নন। আল্লাহর নবীও তাদের জন্যে কেয়ামতের দিন কোনো দায়িত্ব নেবেন না। একই ভাবে, (যারা অন্যায় ও অসত্য থেকে বাঁচতে চায় না) তাদেরকে জোর করে ভুল পথে চলা থেকে তিনি বাঁচিয়ে নেবেন না, আর ভুল পথে তারা চলতে চাইলে তিনি তাদের জন্যে দায়ীও হবেন না, মোটই তার দায়িত্ব পৌঁছে দেয়া মাত্র এবং অবশ্যই তিনি সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। তাই তার কথাটাই উদ্ধৃত করতে গিয়ে পাক কোরআন বলছে,

'আর আমি তোমাদের ওপর হেফাযতকারী নই।'

আর এ বর্ণনাভংগির মাধ্যমে মানুষের চেতনার মধ্যে বিষয়টার গুরুত্ব যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাদেরকে নবীর অনুসরণের প্রয়োজন কতো অধিক তা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং রোয হাশরের দিনের শাস্তির ভয়াবহতা এমনভাবে তাদের কাছে পেশ করা হয়েছে যে, তাদের হৃদয়ংগম হচ্ছে যে, আল্লাহর কাছে পৌছার জন্যে কোনো মাধ্যম দরকার নেই এবং তাঁর আযাব থেকে কেউ তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে পারে না।

কিন্তু আলোচ্য অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, শোয়ায়ব (আ.)-এর জাতি অহংকার প্রদর্শন করলো, বিদ্রোহ করে তারা অন্যায় পথটাকেই আঁকড়ে ধরলো ও অশান্তির সৃষ্টি করলো এবং চরম ও নিকৃষ্ট বাড়াবাড়ির পথে এগিয়ে গেলো। এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা বললো, হে শোয়ায়ব তোমার নামায কি তোমাকে একথা বলতে হুকুম দিচ্ছে নাকি যেন আমরা সেই সকল দেব দেবীর এবাদাত করা পরিত্যাগ করি যাদেরকে আমাদের বাপ দাদারা পূজা করে এসেছেন অথবা (তুমি কি বলতে চাও নাকি যে, আমরা আমাদের সেই সব অভ্যাস, ছেড়ে দেই যা আমাদের ধন সম্পদের ব্যাপারে আমরা এ পর্যন্ত করে এসেছি? তুমি তো দেখা যায় বড়ই ধৈর্যশীল– খুব একজন ভালো মানুষ বলে মনে হচ্ছে!'

এভাবে কথা বলাতে বুঝা যাচ্ছে যে, এটা ছিলো সুস্পষ্ট এক বিদ্রূপ, বরং এটা বাস্তব সত্য, সকল যুগেই এভাবে দ্বীনের দায়ীদেরকে মস্কারা করা হয়েছে, যদিও জাহেল নাদানরা পরিশেষে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং এটাও ঠিক যে, বিরোধীদের এ দুশমনীর পেছনে কোনো যুক্তি বা সঠিক কোনো বুঝ ছিলো না। দেখুন খেয়াল করে তাদের কথা বলার ধরনটার দিকে।

'তোমার নামায কি আমাদেরকে সেই সব পূজা পার্বণ করতে নিষেধ করতে বলছে নাকি, যা আমাদের বাপ দাদার আমল থেকে আমরা করে আসছিলাম, অথবা আমাদের ধন সম্পদ যে ভাবে খুশী আমরা ব্যয় করবো, সে ব্যাপারেও কি তা মানা করছে?'

আসলে ওরা একথা বুঝে না, অথবা বুঝতে চায় না যে, নামায এক অপরিহার্য দাবী এবং এ এবাদাত আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের বাস্তব বিভিন্ন প্রমাণের অন্যতম। আর আল্লাহর একত্ব না মানলে অন্য কোনো বিশ্বাসই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না এবং তাদের বাপ দাদারা অন্য যে সব বস্তুর পূজা করছিলো ও এখনো করে চলেছে, সেগুলো তারা পরিত্যাগ করেছে বলে ততোক্ষণ পর্যন্ত মেনে নেয়া যায় না, যতোক্ষণ পর্যন্ত না তারা ব্যবসা বাণিজ্যে, ধন সম্পদ আদান প্রদানের ক্ষেত্রে শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং জীবনের সকল কাজ কর্মে অর্থাৎ জীবনের সব বিষয়ের জন্যেই আল্লাহর দেয়া বিধান মেনে না নেবে। এটাই একমাত্র সিদ্ধান্তকর কথা যে, জীবনের যাবতীয় বিধান থেকে নামায কখনও বিচ্ছিন্ন নয়, বা এটা স্বতন্ত্র কোনো জিনিস নয়, অর্থাৎ সারা যিন্দেগীর জন্যে প্রদত্ত আল্লাহর সমুদয় বিধানের সাথে নামাযের অংগাংগি সম্পর্ক।

মানবরচিত আইন মানা অবশ্যই শেরেকের অন্তর্ভুক্ত

মানুষের মন মানসিকতা ও চিন্তা চেতনার মধ্যে গভীর বিশ্বাস জন্মানোর উদ্দেশ্যে আমরা ওই রোগগ্রস্ত জাতির বাঁকা চিন্তার অসারতা প্রমাণ করার জন্যে দীর্ঘ আলোচনার আগে আসুন একবার ভেবে দেখি, ভেবে দেখি, হাজার হাজার বছর আগে মাদইয়ানবাসীর মধ্যে এহেন ব্যাধিগ্রস্ত যে মন মানসিকতা গড়ে উঠেছিলো, সে বিষয়ে। অবশ্য তারও আগে একবার ভেবে দেখি যে, আজকের যামানায় ঈমান ইসলামের দাবীদার হাজারো লাখো মানুষ শোয়ায়ব (আ.)-এর যুগের মানুষ এর চেয়ে জেহালাত ও হঠকারিতার দিক দিয়ে কোনো অংশে কম যাচ্ছে না। এরা অনেকে নামায পড়ছে সত্য, কিন্তু লেন দেনের ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ী আদান প্রদান ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মানা জরুরী মনে করে না। এসব বিষ বিবেচনায় শোয়ায়ব (আ.)-এর যুগের লোকদের থেকে এদেরকে ভালো মনে করার কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। শোয়ায়ব (আ.)-এর কওম

যে শেরেকের মধ্যে লিপ্ত ছিলো বলে আমরা জানতে পাই, হিসাব করতে গেলে আমরা দেখবো, সাধারণভাবে আজকের যুগের মুসলমানেরা একই ব্যাধিতে আক্রান্ত। এরাও নামায রোযা ও কতিপয় আনুষ্ঠানিক এবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মান্য করে। কিন্তু জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এরা স্বাধীন চিন্তা রাখে এবং সে সব ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জীবন যাপন করা জরুরী মনে করে না। একবার খেয়াল করে দেখুন, ব্যবসা বাণিজ্য, রাষ্ট্র পরিচালনা, ষ্টক এক্সচেঞ্জ ও শেয়ার বাজারের আদান প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে তারা ইহুদী, নাসারা না মুসলমান, তা কিছুই বুঝার উপায় নেই, যেহেতু সেখানে তাদের সবার ভূমিকা একই প্রকারের। এদের কাছে আকীদা বিশ্বাস ও বাস্তব কাজ কর্ম এবং লেন দেনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এরা মনে করে আকীদা বিশ্বাস এক জিনিস এবং বাস্তব জীবনের লেন দেন ও অন্যান্য বিষয় অন্য জিনিস। আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর দেয়া নির্দেশাবলী মানার পক্ষপাতী, কিন্তু তাদের মতে আইন-কানুন এবং জীবনে চলার পথে মানুষের অভিজ্ঞতাসঞ্চিত ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে (অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন থেকে এগুলো শ্রেয়.......) আর এটাই প্রকৃতপক্ষে শেরেক। শোয়ায়ব (আ.)-এর জাতির মতো এরাও একইভাবে চিন্তা করছে। আজকে আমরা যে জাহেলিয়াতের মধ্যে জীবন যাপন করছি, তা ওই পূর্বের জাহেলিয়াত থেকে কোনো অংশে ভালো বা যুক্তিসংগত নয়।

আজকের দুনিয়ায় শুধু ইহুদীরাই মনে করছে না যে, তাদের কাজ-কর্ম, লেন দেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ব্যাপারে তারা স্বাধীন, সেখানে ধর্মের কোনো হাত নেই, তারা যেভাবে বুঝবে সেভাবেই তারা চলবে এবং যেভাবে তারা ভালো মনে করবে, সেভাবেই তাদের আইন কানুন তারা নিজেরাই বানিয়ে নেবে। সেখানে ধর্মীয় আকীদা থেকে তারা নযর সরিয়ে নেবে।

যদিও আমরা একথা সবাই মনে করি যে, আজকের জগতে একমাত্র ইহুদীরাই তাদের ঈমান আকীদা ও সঠিক আমল থেকে পুরোপুরিভাবে সরে গিয়ে তাদের মনগড়া আইন কানুন অনুসারে চলছে। কিন্তু বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি, অন্যরাও একইভাবে আল্লাহর আইন থেকে সরে গেছে।

একবার একটা ইসরাঈলী জাহাজে অ-ইহুদী নাবিকদের জন্যে শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম কিছু খাদ্য পরিবেশন করা হলো এবং তাদেরকে খেতে বাধ্য করা হলো। এবিষয়ে আইনসভায় প্রশ্ন তোলা হলে বিরাট সংকট দেখা দিলো। কারণ জাহাজে শুধু হালাল খাদ্য পরিবেশন করারই বিধান রয়েছে। সে সময় কোথায় ছিলো সেসব মুসলমান, যারা দ্বীন ইসলামকে আঁকড়ে আছে বলে দাবী করে– তাদের তরফ থেকে তো সে সময় কোনো প্রতিবাদ উত্থিত হয়নি!

আজকে আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে, যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে, কিন্তু আকীদা বিশ্বাস ও বাস্তব চরিত্রের মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে– এ কথাটাকেই তারা অস্বীকার করে। বিশেষ করে বস্তুগত লেনদেন সম্পর্কিত ব্যবহারের ব্যাপারে তারা ইসলামের নিয়ম নীতিকে কার্যত অস্বীকার করে।

এসব মানুষ সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত। এরা স্বদেশ ও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে বড় বড় ডিগ্রি লাভ করেছে। তাদের প্রথম কথাই হচ্ছে, 'ব্যক্তিগত ব্যাপারসমূহে আমরা স্বাধীন– সেখানে ইসলামের হস্তক্ষেপ হবে কেন? সমুদ্র সৈকতে প্রকৃতিবাদীরা পোশাকের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে সূর্যস্নান করবে, সে ব্যাপারে ইসলাম কেন মাথা ঘামাবে? মহিলারা স্বাধীনভাবে সাজ গোছ করে রাস্তায় বেরুলে সেখানে তাদের ব্যাপারে ইসলাম কেন নাক গলাবে? যেমন খুশী তেমনি যৌনশক্তির ব্যবহার করতে গেলে সেখানে ইসলাম কেন আপত্তি তুলবে? মানসিক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া ও হৃদয়াবেগকে উপশম করার উদ্দেশ্যে দু'চার ঢোক সূরা পানে ইসলামের এতো আপত্তি কেন? আর আজকের প্রগতিবাদীরা একটু আমোদ ফুর্তির জন্যে যা কিছু করছে, তা নিয়ে ইসলাম কেন এতো মাতামাতি করবে?' এখন বলুন,

মাদইয়ানবাসীদের এই যে প্রশ্ন, 'তোমার নামায কি আমাদেরকে বাপ দাদার আমল থেকে চলে আসা পূজা পার্বণের রীতি নীতি সব ছেড়ে দিতে বলে নাকি?' তাদের সাথে এসব মুসলমানের পার্থক্য কোথায়?

দ্বিতীয়ত, ওরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছে, বরং অত্যন্ত কঠোরভাবে ও কড়া ভাষায় দ্বীন ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থাকার কথা তারা অস্বীকার করছে এবং লেন দেনের ক্ষেত্রে ঈমান আকীদার সম্পর্ক থাকার কথাও তারা মানছে না! এমনকি তারা বলে, নৈতিক চরিত্রের পেছনে ঈমান কোনো জরুরী ভূমিকা পালন করে না। সুতরাং, ধর্মের সাথে ধর্মীয় লেন দেনের সম্পর্ক কিসের। আবার ধর্ম ও দক্ষতার সাথে ধোকা দেয়া এবং চুরির মধ্যেই বা কিসের সম্পর্ক! যতোক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত কোনো শাসন ক্ষমতার শক্তি প্রয়োগ না করা হবে, অর্থাৎ সরকারী চাপ ও শাস্তির ভয় না থাকলে শুধু ধর্মীয় চেতনা দ্বারা কি চুরি চামারি, ধোকাবাজি ও লেন দেনের সততা টিকিয়ে রাখা যাবে? না, বরং ওরা অহংকার করে বলে যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক চেতনা ঢুকলে সব কিছুই লন্ড ভন্ড হয়ে যাবে। নাস্তিকরাও এমনি করে বলে, আর পাশ্চাত্য দেশের অনেকে (খৃষ্টানরাও) আনুষ্ঠানিক কিছু প্রার্থনা ছাড়া বাস্তব কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে ধর্মের হস্তক্ষেপকে অস্বীকার করে, বিশেষ করে নীতি নৈতিকতার আচরণে তারা ধর্মের ভূমিকাকে আদৌ মানতে চায় না। ওরা এ প্রশ্নকে প্রাচীন পন্থা বলে উড়িয়ে দিতে চায়!

সুতরাং আমরাও যেন সেই প্রাচীন যুগের মতো ইসলামকে আনুষ্ঠানিক কিছু এবাদাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না করে ফেলি। বাস্তবে কিন্তু আমাদের অধিকাংশ মানুষ জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্র থেকে ইসলামী বিধি বিধানকে ঝেঁটিয়ে বের করে দিয়ে প্রাচীন জাহেলিয়াত থেকেও আরো কঠিন অন্ধকারের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান, দক্ষতা অভিজ্ঞতা ও আমাদের অগ্রসরমান সভ্যতার দাবী হচ্ছে যে, আমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু আমরা নিজেরাই উদ্ভাবন করে নিতে পারি। যারা বিশ্বাস করে যে আল্লাহর প্রতি আকীদা বিশ্বাসই আমাদের সকল কাজ ও আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, তারা ঈমানকেই সকল কাজ কর্মের পরিচালিকাশক্তি মনে করে। বরং আল্লাহর হুকুম মতো জীবনের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও সামষ্টিক জীবনের (বস্তুগত) লেন দেনের ক্ষেত্রে এবং বাস্তব জীবনের সকল কাজ কর্মকে ঈমানের বাস্তব প্রমাণ হিসাবে তারা গ্রহণ করে। তাদেরকে আধুনিক তথাকথিত পন্ডিতরা সেকেলে, প্রাচীনপন্থী ও সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন বলে অভিহিত করে। তাদেরকে আখ্যা দেয় প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিবিরোধী বলে।

আর যখন কোনো ব্যক্তি তার অন্তরের মধ্যে আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্বের প্রতি বিশ্বাস আছে বলে দাবী করে, কিন্তু এরপর বাস্তব জীবনের লেন দেন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে আল্লাহর আইনকে অস্বীকার করে মানুষের তৈরী আইন মেনে নেয়, সে প্রকৃতপক্ষে তার অন্তরের বিশ্বাস ও মৌলিক স্বীকৃতিকে বাস্তব ব্যবহার দ্বারা বিকল করে দেয়। কারণ একই অন্তরে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি বিশ্বাস ও বাস্তব কাজে অন্যের আইনকে প্রশ্রয় মনে করা ও প্রাধান্য দেয়ার দুটো ভূমিকা একই সাথে বিরাজ করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এমন আচরণ দ্বারা সে আল্লাহর সাথে শেরেকই করে, অর্থাৎ অন্যকে আইন রচনাকারী মেনে নেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর শক্তি ক্ষমতায় তাকে অংশীদার বলে বিশ্বাস করার প্রমাণ দেয়। আসলে শেরেকের বিভিন্ন ধরন আছে। নানা কায়দার ও নানা বর্ণের শেরেকের মধ্যে এটাও এক ধরনের শেরেক, যার মধ্যে আমরা আজকের যামানায় কালাতিপাত করছি। এটাও ওই আসল শেরেকেরই শামিল, যা প্রত্যেক যামানায় ও প্রত্যেক দেশে মোশরেকরা বরাবর করে এসেছে।

দেখুন, কেমন করে মাদয়ানবাসী শোয়ায়ব (আ.)-এর সাথে ঠাট্টা মস্কারি করছিলো! আজকের দিনে যেভাবে মানুষেরা তাওহীদের হক দাওয়াতদানকারীদেরকে বিদ্রূপ করে থাকে, সেই একইভাবে ওরা বিদ্রূপ করতে গিয়ে বলছে,

'অবশ্য তুমি বড়ই সহনশীল, বড়ই ভালো মানুষ (তাই না)!'

তির্যকভাবে একথাটা উচ্চারণ করে প্রকৃতপক্ষে ওরা বলতে চেয়েছে এর বিপরীত কথাটা। অর্থাৎ বিপরীত অর্থেই ওরা কথাটা উচ্চারণ করেছে। ওদের কাছে তো ছিলো প্রকৃত সহিষ্ণুতা ও ভালো মানষীতা, কিন্তু কোনো প্রকার চিন্তা ভাবনা না করে ওরা যে বাপ দাদার অন্ধ অনুকরণে দেব দেবীর মূর্তিপূজা করতো এবং ওরা অবলীলাক্রমে তাদের বাস্তব জীবনের কাজ কর্ম থেকে এবাদাতকে আলাদা করে দেখতো! আর এভাবেই আজকের দিনের আধুনিক প্রগতিবাদীরা নিষ্ঠাবান লোকদেরকে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুসারীদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রাচীনপন্থী বলে দেয়!

জাতির প্রতি শোয়ায়েব (আ.)—এর কল্যাণ কামনা

শোয়ায়ব (আ.) তাঁর জাতির ওইসব উপহাস বিদ্রূপকে উপেক্ষা করে তাঁর ওপর অর্পিত সত্যের দিকে দাওয়াত দান করার দায়িত্ব বিনয়-নম্রতার সাথে কিন্তু অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে পালন করে গিয়েছেন। ওদের সত্য বিরোধিতা ও হঠকারিতাকে তিনি কিছুমাত্র পরওয়া করেননি। কারণ তাদের ক্রটি বিচ্যুতি ও মূর্খতা তিনি বুঝতেন। তাই অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ও সুমিষ্ট কথা দ্বারা তিনি তাঁর জাতির কাছে সত্যসঠিক কথাটা অত্যন্ত নরমভাবে পেশ করেছেন। বুঝিয়েছেন তাদেরকে তাঁর কথার যৌক্তিকতা এবং অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় তাদের বিবেকের কাছে তুলে ধরেছেন তাঁর রবের কাছ থেকে প্রাপ্ত যুক্তিপূর্ণ কথাগুলোকে। আর তিনি যা কিছু বলেছেন, সে বিষয়ে তিনি ছিলেন সন্দেহমুক্ত ও নিশ্চিত। কারণ তাঁকে তো সেই জ্ঞান দেয়া হয়েছে, যা ওদেরকে দেয়া হয়নি। তাই দেখা যায় তিনি তাদেরকে লেনদেনের ব্যাপারে এবং আমানতের হক আদায়ের জন্যে উপদেশ দিচ্ছেন এবং আহ্বান করছেন যেন তারা এমন কোনো কাজ না করে, যার ফলে তাদের পারস্পরিক আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। তিনি জানাচ্ছেন, এভাবে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করলে অবশ্যই তারা নিজেরাই উপকৃত হবে এবং অপরকেও উপকৃত করতে পারবে, কারণ তারা বেশ সম্পদশালী ছিলো। ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির জন্যে অবশ্যই পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন। একাকী নিজ খুশী মতো যা কিছু করলে তার দ্বারা সমাজের কোনো উপকার তো হয়ই না, নিজেরও ক্ষতি হয়। কারণ বাজারে মাল নিলে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা অপরিহার্য। সুতরাং শোয়ায়ব (আ.) নিজ জাতির সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যেই তাদের আচরণগুলোকে সংশোধন করে নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছিলেন। এতে তার নিজের, জাতির ও গোটা মানবমন্ডলীর কল্যাণ নিহিত ছিলো। ওদের মনে হচ্ছিলো তিনি বোধ হয় তাদের কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করছেন, মোটেই তা নয়। তাদের বুঝা দরকার ছিলো যে, তিনি তাদেরই ভাই, তাদেরকে এ দাওয়াত দেয়ায় তার ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ নেই। তার কথাগুলোকে উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

'সে বললো, হে আমার জাতি, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আমি আমার রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট কোনো দলীল প্রমাণ নিয়ে এসেছি কিনা এবং আমার রব আমাকে উত্তম রেযেক দিয়েছেন কিনা! তোমাদেরকে যে সব কাজ করতে আমি নিষেধ করছি, তার দ্বারা আমি তো তোমাদের কোনো ক্ষতি বা ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে বিরোধিতা করছি না। আমি সাধ্যানুযায়ী তোমাদের মধ্যে সংশোধনী আনতে চাই। আর আল্লাহ ছাড়া আমার নিজের কোনো যোগ্যতা নেই। তাঁর ওপরই আমি ভরসা করেছি এবং আমি বিশ্বাস করি যে, তাঁর কাছেই আমাকে ফিরে যেতে হবে।'

'হে আমার জাতি ....

এ সম্বোধনের ভাষার দিকে খেয়াল করলে বুঝা যায়, কতো আদর-মহব্বত ও কাছের মানুষ হিসাবে তাদেরকে শোয়ায়ব (আ.) সম্বোধন করছিলেন। তিনি বলছেন, 'তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আমি যদি আমার রবের পক্ষ থেকে আসা কোনো দলীল প্রমাণের ওপর থেকে থাকি?'

অর্থাৎ আমি আমার নিজের মনের মধ্যে এ সত্যকে গভীরভবে অনুভব করছি এবং পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করছি যে, তিনি (মহান আল্লাহ) আমার কাছে ওহী পাঠাচ্ছেন এবং তোমাদের কাছে আমি যা পৌঁছাচ্ছি, সে বিষয়ে তিনিই আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমার অন্তরের মধ্যে সুস্পষ্ট এ দলীল প্রমাণের ভিত্তিতেই আমি (তোমাদেরকে) পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে এ খবরগুলো পৌঁছাচ্ছি।

'আর তিনি আমাকে দিয়েছেন সুন্দর ও উত্তম রেযেক।'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন, তা দিয়েই তো তোমাদের মতো আমি মানুষের সাথে লেনদেন করি।

'আর তোমাদেরকে আমি যা মানা করছি, তার ব্যতিক্রম তো নিজে (কখনও) করতে চাই না।'

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে এক বিষয় মানা করছি, তারপর তোমাদের পেছনে (তোমাদের অজান্তে) যা তোমাদেরকে নিষেধ করছি, নিজের স্বার্থের কারণে, সেই জিনিসটাই আমি নিজে করবো, তা কখনো হতে পারে না।

'আমি তো যথাসাধ্য ইসলাহ (সংশোধনী) চাই।'

অর্থাৎ ইসলাহ চাই আমি গোটা জীবনের জন্যে এবং সেই সমাজের জন্যে, যার সুফল ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে এবং সমষ্টিগতভাবে সমাজের সবাই পেতে থাকবে। আর যদি কারো মনে একথা জেগে থাকে যে, ইসলামী আকীদার অনুসারী হলে ব্যক্তিগত স্বার্থের কিছু ক্ষতি হবে এবং জীবনের কিছু সুযোগ সুবিধা অবশ্যই নষ্ট হয়ে যাবে, তাহলে তাকে বুঝতে হবে যে, কোনো ভালো ও কল্যাণকর সুযোগ নষ্ট হবে না, বরং নষ্ট হবে তাদের কিছু কদর্য ইচ্ছা, হীন স্বার্থ ও গোটা মানব জাতির জন্যে প্রকৃতপক্ষে যা কিছু অকল্যাণকর, সেই সব সুযোগ সুবিধা। এর পরিবর্তে (আল্লাহর মেহেরবানীতে) খুলে যাবে এমন কিছু উপার্জন ও হালাল রুজি রোজগারের দরযা, যা সে চিন্তাও করতে পারে না এবং গড়ে উঠবে এমন এক কল্যাণ সমাজ, যার ফলে সমাজের ব্যক্তিবর্গ হবে পরস্পরের প্রতি দরদী ও সহানুভূতিশীল, যারা একে অপরের জন্যে দায়িত্ব বোধ করবে এবং একে অপরকে সাহায্য করবে। তাদের মধ্যে থাকবে না ঘৃণা বিদ্বেষ, কোনো ধোকাবাজি বা কোনো বিবাদ ঝগড়া।

এসব মধুর বাক্য দ্বারা আপন জাতিকে যথাসাধ্য সংশোধনের চেষ্টা করার পর শোয়ায়েব (আ.) অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জানাচ্ছেন যে,

(ইচ্ছা করলেই যে তোমাদেরকে আমি এ যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো বুঝাতে পারবো, তা আমি বিশ্বাস করি না, বরং) আমার নিজের কোনো তাওফীক (যোগ্যতা) নেই আল্লাহর মেহেরবানী ছাড়া।'

অর্থাৎ আমার এ সংশোধনী প্রচেষ্টায় তিনিই আমার একমাত্র সহায়। আর তিনিই জানেন আমার নিয়তকে। কাজেই তিনিই আমার চেষ্টাকে সাফল্যমন্ডিত করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি এবং আমার এ চেষ্টা সাধনার পুরস্কার অবশ্যই তিনি আমাকে দেবেন বলে আমার আস্থা রয়েছে।

'আমি তাঁর ওপরেই তাওয়াককুল করেছি।'

অর্থাৎ একমাত্র তাঁর ওপর ভরসা করেই আমি আমার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, আর কারো ওপর আমার কোনো ভরসা নেই।

'আর তাঁর কাছেই আমাকে ফিরে যেতে হবে বলে গভীরভাবে আমি তাঁর দিকেই রুজু করছি।

অর্থাৎ ফিরে আমি একমাত্র তাঁর কাছেই যাবো এবং যে বিপদের মধ্যে আমি রয়েছি তার থেকে বাঁচার জন্যে সমস্ত অন্তর প্রাণ দিয়ে আমি একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী হচ্ছি, যিনি আমার একমাত্র উদ্ধারকারী। আমার যাবতীয় নিয়ত, কাজ ও প্রচেষ্টার সাথে আমি তাঁর দিকেই রুজু করছি।

এরপর জানানো হচ্ছে যে, নবী শোয়ায়ব (আ.) তাঁর জাতিকে নিয়ে যাচ্ছেন উপদেশদানের অন্য আর এক দিগন্তে। এপর্যায়ে এসে তাদের বিরোধী ভূমিকাকে তিনি তুলনা করে দেখাচ্ছেন অতীতের অভিশপ্ত জাতিগুলোর সাথে, যেমন নূদ, হূদ, সালেহ ও লূত (আ.)-এর যামানায়। ওই জাতিসমূহও তাদের কল্যাণের পথ স্বাধীনভাবে খুঁজতে গিয়ে না-ফরমানী করেছিলো নিজ নিজ নবীর সাথে। তাদের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে তারা খুঁজেছিলো স্বাধীন পথ। একথাটাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে নীচের আয়াতটিতে।

'হে আমার জাতি, আমার বিরোধিতা যেন তোমাদেরকে এমন কোনো পদক্ষেপ নিতে উস্কানি না দেয়, যার ফলে তোমাদের ওপর সেই মহা মুসীবত এসে পড়বে, যা নাযিল হয়েছিলো নূহ, হূদ ও সালেহের জাতিদের ওপর। আর (একটু তাকিয়ে দেখো) লূতের জাতি তোমাদের থেকে খুব বেশী দূরে (বেশী দিন পূর্বে) নয়।'

অর্থাৎ আমার বিরোধিতার প্রবণতা এবং আমার কাজের সাথে দুশমনী করার মনোভাব যেন তোমাদের দ্বারা এতো দূর অন্যায় কাজ না করিয়ে ফেলে এবং এমনভাবে তোমাদেরকে বিগড়ে না দেয় যে, তোমরা ডাহা মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে বলবে এবং শুধু বিরোধিতার উদ্দেশ্যেই সম্পূর্ণ যুক্তিহীনভাবে বিরোধিতা করবে। একথাগুলো পূর্বাহ্নেই সতর্কতামূলক ভাবে তোমাদেরকে এ জন্যে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের নির্বুদ্ধিতা ও অসদাচরণ এতো দূর গড়িয়ে গেছে যে, যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহর সেই কঠিন আযাব নাযিল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদের ওপরে এসেছিলো। আর খোঁজ নিয়ে দেখো, তাদের মধ্যে লূত (আ.)-এর জাতি, তোমাদের অনতিকাল পূর্বে তোমাদের এলাকার খুব কাছেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য, (লূত (আ.)-এর এলাকা) মাদইয়ান, হেজায ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিলো।

যখন তারা আযাবের একেবারে মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিলো এমনই ক্রান্তিকালে মহা দয়াময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মাগফেরাত ও তাওবা করার শেষ সুযোগ দিচ্ছেন এবং শোয়ায়েব (আ.)–এর মাধ্যমে তাদেরকে নীচে বর্ণিত করুণা ও স্নেহভরা আশ্বাসবাণী দ্বারা আশ্বস্ত করতে গিয়ে বলছেন,

'হে আমার জাতি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও এবং তাওবা করে (সর্বান্তকরণে) ফিরে এসো তাঁর দিকে। নিশ্চয়ই তিনি বড়ই দয়ালু মনিব, পরম দরদী বন্ধু।'

মাদইয়ানবাসীর চরম বিনাশ

এমনি করে এগিয়ে চলেছে পরম করুণাময় রব্বুল আলামীনের উপদেশ ভরা এবং আশ্বাসবাণী সম্বলিত করুনাবাণী, যার মধ্যে ভীতি ও আশার সুর ধ্বনিত হচ্ছে, যাতে করে তাদের অন্তরের বন্ধ দুয়ার খুলে যায়, তাদের প্রাণে বিশ্ব সম্রাটের ভয় এবং জেগে ওঠে তাদের লৌহ কঠিন হৃদয় বিগলিত হয়।

কিন্তু হায়, ঐ অভিশপ্ত জাতির হৃদয়গুলো সম্পূর্ণভাবেই বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো। আর তারা তাদের জীবনের অবমূল্যায়ন করার কারণে, নিকৃষ্টতম পথটাকেই তারা গ্রহণ করেছিলো। আর নিকৃষ্ট চিন্তা চেতনার কারণে তাদের কাজ ও ব্যবহারগুলো ভুল পথে চালিত হয়ে গিয়েছিলো, যার কারণে তারা অত্যন্ত অহংকারের সাথে নবীকে বিদ্রূপ করেছে এবং তাঁকে মিথ্যাবাদী বানানোর চেষ্টা করেছে। বলা হচ্ছে,

'আর তারা বললো, হে শোয়ায়ব, তুমি যা বলছো, তার অধিকাংশই আমরা বুঝি না। আর আমরা তো তোমাকে আমাদের মধ্যে একজন দুর্বল লোক রূপে দেখতে পাচ্ছি। তবে এটাও ঠিক, তোমার মুষ্টিমেয় কতিপয় সংগী যদি না থাকতো, তাহলে তোমাকে আমরা পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতাম। অবশ্যই তুমি আমাদের বিরুদ্ধে একজন শক্তিশালী ব্যক্তি হিসাবে দাঁড়াতে পারো না।'

ওদের অবস্থা ছিলো এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সত্য সঠিক বিষয়গুলো গ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের অন্তর একেবারেই সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। কখনো তারা বুঝলেও সত্যকে বাস্তবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলো না।

'ওরা বললো, হে শোয়ায়ব, তুমি যা কিছু বলছো, তার অধিকাংশই আমরা বুঝছি না।'

ওরা দুনিয়ার এ জীবনটাকেই একমাত্র জীবন হিসাবে ভাবতো, যার কারণে সব কিছুকে দুনিয়ার জীবনের জন্যে ব্যবহৃত বস্তুগত ও প্রকাশ্য জিনিসের নিরিখে পরিমাপ করতো, তাই তাদের কথা,

'তোমার মুষ্টিমেয় এ সংগীদল যদি না থাকতো, তাহলে অবশ্যই তোমাকে আমরা পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতাম।'

তাদের মতে দলীয় শক্তিরও উৎস হচ্ছে বংশীয় বা গোত্রীয় সম্পর্ক। ঈমানের কারণে দলীয় শক্তি সৃষ্টি হয় না। তারা বিশ্বাস করতো, রক্তের সম্পর্কই আসল সম্পর্ক, অন্তরের সম্পর্ক আসল নয়। এরপর, তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের আত্মসম্ভ্রম বোধকে উপেক্ষা করেছে এবং তাদের বিশ্বাসের ওই পবিত্র অনুভূতিকে তারা আদৌ কোনো মূল্য দেয়নি। তাই তাদের কথা,

'আমাদের ওপর (প্রভাব বিস্তার করার মতো) তুমি কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি নও।'

অর্থাৎ, ওদের দৃষ্টিতে আল্লাহ প্রদত্ত সম্মানের কোনো মূল্য নেই। মূল্য নেই কোনো মহত্ত্ব ও ভদ্রতার। কোনো মূল্য নেই যুক্তির বিজয়ের বা মানসিক প্রভাবের। ওদের কাছে শুধু বংশীয় ও গোত্রীয় শক্তিই একমাত্র হিসাবে আসে।

কিন্তু মানুষের অন্তর যখন আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে যায়, মুক্ত হয়ে যায় মর্যাদাপূর্ণ গুণাবলী থেকে এবং উচ্চতর আদর্শ থেকে, তখন তারা পৃথিবীর অর্থ সম্পদ, পদ মর্যাদা ও বিষয় আশয়ের কারণে অর্জিত শক্তির ওপর বড়াই করতে থাকে এবং পার্থিব সাময়িক শক্তি সামর্থের কারণে তর্জন গর্জন করতে থাকে। এসময় তারা কোনো মর্যাদাপূর্ণ আহ্বানকে মর্যাদা দিতে চায় না, কোনো মূল্য দিতে চায় না প্রকৃত মহা সত্যকে। শক্তি ক্ষমতার দাপটে সত্য পথের দিকে আহ্বানকারীকে কষ্ট দেয়া বা আঘাত করা থেকে একমাত্র তখনই বিরত থাকে যখন ওই আহ্বানকারীর পেছনে সাহায্যকারী কোনো শক্তিশালী দল থাকে, অথবা থাকে তার পেছনে কোনো বস্তুগত শক্তি, যা তার সাহায্যে তাৎক্ষণিকভাবে এগিয়ে আসবে বলে তারা মনে করে। তাদের নযরে সত্য, সততা বা আকীদা বিশ্বাসের কোনো মর্যাদা নেই, ওই সকল শক্তিহীন, সম্পদহীন, লোকবলহীন মানুষের কোনো নিরাপত্তা বা মান মর্যাদা তাদের দৃষ্টিতে নেই।

এ কারণে শোয়ায়ব (আ.)-এর আত্মবিশ্বাসে প্রচন্ড আঘাত লাগলো যেহেতু তিনি তো সেই মহান মনিবের প্রতিনিধি তার, যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। তার মহানত্ব ও তাঁর সম্ভ্রমের কারণে তার মধ্যেও গড়ে উঠেছে প্রবল এক আত্মমর্যাদাবোধ। এজন্যে তিনি তার নিজের ওই

নগণ্য দল বা বংশের শক্তি থেকে নিজেকে সম্পর্কমুক্ত বলে ঘোষণা দিচ্ছেন এবং অন্যায়কারী ও অপশক্তির মোকাবেলায় তিনি একমাত্র সেই মহা শক্তিমান মালিকের আশ্রয় প্রার্থনা করছেন, যিনি বিশ্বসজগতের সৃষ্টিকর্তা, মালিক মনিব প্রভু পালনকর্তা, আইনদাতা ও শাসন কর্তা, যাঁর ইচ্ছায় টিকে আছে গোটা সৃষ্টিজগত। সকল কিছুর মালিক মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি তাদের উপেক্ষা প্রদর্শনে তিনি বিচলিত বোধ করছেন এবং তাই উচ্চারিত হচ্ছে তাঁর মুখ দিয়ে চূড়ান্ত ও শেষ কথা। আর তিনি এ আকীদার পার্থক্যের কারণে চূড়ান্তভাবে তাঁর জাতি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলছেন এবং তাদের ও আল্লাহর মধ্যে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছেন। এ সাথেই তিনি ঘোষণা দিচ্ছেন সেই আযাবের যা তাদের মত জনপদ সদা সর্বদা অপেক্ষা করছে, আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিচ্ছেন সেই কঠিন পরিণতির দিকে, যা তারা নিজেরাই পছন্দ করে নিয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'সে বললো, হে আমার জাতি, আমার এ ক্ষুদ্র দলটি (যার পরওয়া তোমরা করে থাকো এবং যাদের কারণে তোমরা আমাকে মেরে ফেলা থেকে বিরত রয়েছ বলে জানাচ্ছ, ওরা) কি তোমাদের কাছে আল্লাহ থেকে বেশী শক্তিশালী, যাঁকে তোমরা হেলা ভরে পেছনে ফেলে রেখেছো (তাঁর কোনো পরওয়াই করছো না)? অবশ্যই তোমরা যা কিছু করে চলেছো, সে বিষয়ে আমার রব পুরোপুরি খবর রাখেন। আর হে আমার জাতি, তোমাদের স্থানে থেকে তোমরা যা কিছু করছো করে যাও। অবশ্য আমিও কিছু করতে চলেছি। শীঘ্রই তোমরা জানতে (ও দেখতে) পারবে, কার ওপর অপমানজনক আযাব আসে, আর কে মিথ্যাবাদী। অতএব, তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষারত রইলাম। আবারও দেখুন আল্লাহর নবীর কথাকে উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

'(আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী) আমার ছোট্ট এ দলটা (যারা নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার কারণে তোমাদের নযরে বেশ শক্তিশালী) তারা কি তোমাদের কাছে আল্লাহ থেকেও বেশী শক্তিশালী মনে হচ্ছে?

অর্থাৎ মানুষের একটি দল, তারা যতোই শক্তিশালী হোক আর তারা যতোই সংখ্যা ও সাজ সরঞ্জামের অধিকারী হোক না কেন, তবু তারা তো মানুষ। কাজেই তারা অবশ্যই দুর্বল। তারা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকেই তো একটা জনগোষ্ঠী। তারা কি আল্লাহ থেকে বেশী শক্তিশালী হতে পারে? তোমাদের অন্তরের মধ্যে তাদের শক্তি ও ভীতি কি আল্লাহ(-র শক্তি) থেকে অধিক ক্রিয়াশীল?

খুবই অশ্রদ্ধার সাথে ও (বেপরওয়াভাবে) তাঁকে তোমরা পেছনে ফেলে রেখেছো?'

এ কথা দ্বারা ওদের আল্লাহকে পরিত্যাগ করা ও তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার এমন একটা চিত্র এখানে আঁকা হয়েছে যে, সহজে মানুষ বুঝতে ও অনুভব করতে পারে তাদের কদর্য চরিত্র ও নিকৃষ্ট কাজকে। তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে চলেছিলো এবং তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে দূরে সরে যাচ্ছিলো। অথচ তারা তো তাঁরই সৃষ্টি। তিনিই তাদের রিযিকদাতা। আর তিনিই তো দিচ্ছেন তাদেরকে সেই সব ধন সম্পদ ও কল্যাণকর বস্তু ও বিষয়সমূহ, যা নিয়ত ওরা ভোগ করে চলেছে। এটা নিছক অহংকার। নেয়ামতের না-শোকরী এবং এ সব আচরণ কুফরীর সাথে সাথে নির্লজ্জতাও বটে! এ আচরণ দ্বারা তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করাও তাঁর নিকৃষ্ট মূল্যায়ন করাও বুঝায়। নবী শোয়ায়বের কথা তুলে ধরতে গিয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আমার রব সেই সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান এবং ওই সকল বিষয় সম্পর্কে ওয়াকেফহাল, যা তোমরা করছো।'

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٩٦﴾ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ

فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ﴿٩٧﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ؕ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ﴿٩٨﴾ وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً

وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ﴿٩٩﴾

রুকু ৯

৯৬. আমি মূসাকে তার জাতির কাছে আমার নিদর্শনসমূহ ও (নবুওতের) সুস্পষ্ট দলীলসহ পাঠিয়েছিলাম, ৯৭. (তাকে আমি পাঠিয়েছিলাম) ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে, (কিন্তু) তারা (সর্বদা) ফেরাউনের কথাই মেনে চলতো, (অথচ) ফেরাউনের কোনো কাজ (ও কথাই তো) সঠিক ছিলো না। ৯৮. কেয়ামতের দিন সে তার (দন্ডপ্রাপ্ত) জাতির আগে আগে থাকবে, অতপর সে তাদের (জাহান্নামের) আগুন পর্যন্ত নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যাবে; কতো নিকৃষ্ট সে জায়গা, যেখানে তাদের নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যাবে! ৯৯. এ দুনিয়াতে আল্লাহর অভিশাপ তাদের পেছনে ধাবিত করা হলো, আবার কেয়ামতের দিনও (তারা কঠিন আযাবে নিমজ্জিত হবে); কতো নিকৃষ্ট (এ) পুরস্কার, যা (তাদের) সেদিন দেয়া হবে।

তাফসীর

আয়াত ৯৬-৯৯

এ সকল ঘটনার পরিসমাপ্তিতে মূসা ও ফেরাউনের ঘটনার দিকে কিছু ইংগিত করা হয়েছে। যাতে ফেরাউন ও তার সভাসদদের কঠিন পরিণতি মানুষের গোচরীভূত করা যায় এবং জানানো যায় তাদের পরিণতিও, যারা তার হুকুমে নানা প্রকার সলা পরামর্শ করেছিলো। উপরন্তু এ অর্থবহ ইশারার মধ্যে আরো বহু ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণী তথ্য পেশ করা হয়েছে, যা স্পষ্ট করে এখানে বর্ণনা করা হয়নি। যেমন ধরুন, কেয়ামতের দিনের ওই সব দৃশ্যের মধ্যে একটি হচ্ছে মানব জাতির সবার জীবিত ও গতিশীল প্রাণী হিসাবে উঠে আসার দৃশ্যের বর্ণনা জীবন্ত ছবির মতো ওই সময়ের মর্মান্তিক অবস্থাটা ফুটে উঠেছে। এসব বর্ণনার মধ্যে ইসলামের মূলনীতিগুলোর সর্ব প্রধান নীতিটি ফুটে উঠেছে, আর তা হচ্ছে, আজকে যারা নেতা ও ধনের দোহাই দিয়ে বিবেক বিরুদ্ধ কাজ করে যাচ্ছে, তারা সবাই উঠে আসবে ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব নিয়ে সেদিন উঠবে সেদিন কেউ কারো সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসবে না, না এগিয়ে আসবে এমন কোনো আপনজন বা সেই সব বড়লোক, বুদ্ধিজীবী ও নেতৃবৃন্দ, যাদের অন্ধ অনুসারী হওয়ার কারণে পৃথিবীতে বহু বিবেক বিরুদ্ধ কাজ করা হয়েছে।

এ অধ্যায়টা শুরু হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত শক্তি ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে মূসা (আ.)-এর আগমনের দৃশ্যের বর্ণনার সাথে। তাঁকে পাঠানো হয়েছিলো তৎকালীন বৃহৎ শক্তি হিসাবে পরিচিত ফেরাউন ও তার জাতির নেতৃবৃন্দের কাছে। দেখুন কী মধুর এ বর্ণনাভংগি,

'আর অবশ্যই আমি মহান আল্লাহ পাঠালাম মূসাকে আমার শক্তি-ক্ষমতার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট ক্ষমতাসহ ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে।'

অবশ্য আলোচ্য ঘটনার বিষয়গুলোকে সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করা হয়েছে যাতে করে ঘটনার শেষ ও প্রধান অংশটার প্রতি যথাযথভাবে গুরুত্ব আরোপ করা যায়। ওই পারিষদবর্গের অবস্থা ছিলো এই যে, তারা নির্দ্বিধায় ও বিনা বাক্যে ফেরাউনের হুকুম মানত এবং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য

করত, এমনকি ফেরাউনের হুকুম মানতে গিয়ে বেওকুফী, মূর্খতা ও সীমা ছাড়া ব্যবহার করতে হলেও তাতে ওদের কোনো আপত্তি ছিলো না। এ জন্যে বলা হচ্ছে,

'ওরা ফেরাউনের নির্দেশ মানতে থাকলো, অথচ ফেরাউনের নির্দেশ মোটেই সঠিক ছিলো না।'

এ ব্যাপারে ওরা যখন ফেরাউনের অনুসারীই ছিলো, তখন তার পেছনে পেছনেই তারা চলতো এবং ভুল পথের দিকে পরিচালিত রাস্তাতে ওরা বিনা বাক্য ব্যয়ে ও চিন্তা ভাবনা না করে ফেরাউনের পদাংক অনুসরণ করতো, এমনকি তাদের নিজস্ব কোনো মতই ছিলো না। নিজেকে তারা অত্যন্ত ছোট ও শক্তিহীন মনে করতো। এতো বেশী হীনমন্যতায় তারা ভুগতো যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী চলতে এবং যে কোনো পথ গ্রহণের যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তার সদ্ব্যবহার করার চিন্তাও করতে পারতো না। তারা যখন এভাবেই হক-না হক সকল জিনিসে ফেরাউনের অনুসরণ করতে থাকলো, তখন অবশ্যই একথাটা এসে যায় যে, কেয়ামতের দিন ফেরাউন তাদেরকে পরিচালনা করবে এবং ওরা তার অনুসরণকারী হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'সে কেয়ামতের দিন তাদেরকে পরিচালনা করবে।'

আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা অতীতের কাহিনী এবং ভবিষ্যতের ওয়াদা সম্পর্কে শুনতে পাচ্ছি। আবার এও দেখতে পাচ্ছি যে সকল দৃশ্য পরিবর্তনশীল হয়ে থাকে, আর ভবিষ্যত যখন এসেই যায়, তখনই তা পার হয়ে চলে যায়। এমতাবস্থায় ফেরাউন তার অনুসারীদেরকে জাহান্নামের আগুনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং তারা শেষও হয়ে যাবে। বলা হচ্ছে,

'অতপর সে তাদেরকে আগুনের মধ্যে পৌঁছে দেয়ার জন্যে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।'

পৌঁছে দেবে তেমনি করে, যেমন করে রাখাল ছাগলের পালকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। যারা চিন্তা করে না, তারা কি ছাগলের পাল থেকে বেশী নির্বোধ নয়? ওদের মধ্যে ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা ও ভালো মন্দ বিচার ক্ষমতা দেয়া সত্তেও তার সঠিক ব্যবহার না করার কারণে কি ওরা জীব জানোয়ারের তুলনায় এতোটুকু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী? এ কারণেই তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পৌঁছে দেয়া হবে। হায়, হায়! কত নিকৃষ্ট সে ব্যক্তি, যাকে সেখানে ফেলা হবে। সেখানে কোনো পিপাসা মিটবে না এবং কোনো পিপাসার্তকে পানি পান করানো হবে না। সেখানে পেট ও অন্তর (দিল) সিদ্ধ হয়ে যাবে।

'নিকৃষ্ট সে ফেলে দেয়ার স্থানটা, নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যাকে সেখানে ফেলা হবে।' আর এসব কিছু অবশ্যই হবে যেহেতু তাদেরকে ফেরাউন পরিচালনা করেছিলো। এ জন্যে তাদের ওই নিক্ষিপ্ত হওয়ার স্থানই হবে তাদের উপযুক্ত স্থান। এ হচ্ছে তাদের পিপাসা নিবারণের কাহিনী। আর এ অবস্থাতেই তাদেরকে ঝুলিয়ে রাখা হবে।

'আর এ ধরার বুকে রয়েছে তাদের জন্যে লানত এবং কেয়ামতের দিনেও রয়েছে তাদের জন্যে অভিশাপ আর অভিশাপ।'

তাদেরকে সেখানে বিদ্রূপ করা হবে এবং তাদের মাথাকে নীচের দিকে দিয়ে ছুঁড়ে ফেলা হবে। 'নিকৃষ্ট এ দান এবং অতি নিকৃষ্ট সেই স্থানটা- যেখানে তাদেরকে এসব পুরস্কার দেয়া হবে।'

এ আগুনই হবে তাদের উপযুক্ত পুরস্কার এবং ফেরাউন তার জাতির যে উপকার করেছিলো, তার সমুচিত প্রতিদান হবে এটাই!! যে জাদুকরদের পোষণ করা হয়েছিলো ওই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায়, তাদের জন্যে কত চমৎকার পুরস্কার এটা এবং কত সুন্দর এ আগুনভরা বাসস্থান তাই না! কী নিকৃষ্ট এ আগমন স্থল, আর কী নিকৃষ্ট এ পুরস্কার!

কেয়ামতের দিনের ভয়াবহতা ও দোযখের কঠিন ওই অবস্থার চিত্র অংকনে আলোচ্য সূরাটি (আশ্চর্য এ কেতাবের মধ্যে) এমন এক চমৎকার ভূমিকা পেশ করেছে, যা মানবীয় কল্পনার অতীত!

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ ﴿١٠٠﴾ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ

وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِىْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ

اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ﴿١٠١﴾ وَكَذٰلِكَ

اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ﴿١٠٢﴾ اِنَّ

فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ

النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ﴿١٠٣﴾ وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ يَاْتِ

لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّسَعِيْدٌ ﴿١٠٥﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا

فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ﴿١٠٦﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ

১০০. (হে নবী,) এ হচ্ছে (ধ্বংসপ্রাপ্ত) কতিপয় জনপদের কাহিনী, যা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি, এদের (ধ্বংসাবশেষের) কিছু তো (এখানে সেখানে এখনো) বিদ্যমান আছে, আবার (তার অনেক কিছু কালের গর্ভে) বিলীনও (হয়ে গেছে)। ১০১. (এ আযাব পাঠিয়ে) আমি (কিন্তু) তাদের ওপর যুলুম করিনি, যুলুম তো বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর করেছে, যখন (সত্যি সত্যিই) তোমার মালিকের আযাব তাদের ওপর নাযিল হয়েছে, তখন তাদের সে সব দেবতা তাদের কোনো কাজেই আসেনি, যাদের তারা আল্লাহর বদলে ডাকতো, বরং তারা তাদের ধ্বংস ছাড়া অন্য কিছুই বৃদ্ধি করতে পারেনি। ১০২. (হে নবী,) তোমার মালিক যখন কোনো জনপদকে তাদের অধিবাসীদের যুলুমের কারণে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এমনিই হয়; আল্লাহ তায়ালার পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর (অত্যন্ত ভয়ংকর)। ১০৩. এ (কাহিনীগুলো)-র মাঝে তার জন্যে (সত্য জানার প্রচুর) নিদর্শন (মজুদ) রয়েছে, যে ব্যক্তি পরকালের আযাবকে ভয় করে, সেদিন হবে সমস্ত মানুষদের একত্রিত করার দিন, (উপরন্তু) সেটা সবাইকে উপস্থিত করার দিনও বটে। ১০৪. আমি সে (দিন)-টি একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে মুলতবি করে রেখে দিয়েছি; ১০৫. সেদিন যখন (আসবে তখন) কেউ আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো কথা বলবে না, অতপর (মানুষরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাবে,) তাদের মধ্যে কিছু থাকবে হতভাগ্য আর কিছু (থাকবে) ভাগ্যবান। ১০৬. অতপর যারা হবে হতভাগ্য পাপী, তারা থাকবে (জাহান্নামের) আগুনে, সেখানে তাদের জন্যে থাকবে (আযাবের ভয়াবহ) চীৎকার ও (যন্ত্রণার ভয়াল) আর্তনাদ, ১০৭. তারা সেখানে থাকবে চিরকাল– যতোক্ষণ পর্যন্ত আসমানসমূহ ও যমীন বিদ্যমান থাকবে, তবে হ্যাঁ, তাদের কথা আলাদা যাদের ব্যাপারে

وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ
سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا
شَاءَ رَبُّكَ ۖ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ ۚ مَا
يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ
مَنقُوصٍ ﴿١٠٩﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ
سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿١١٠﴾ وَإِنَّ
كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾ فَاسْتَقِمْ كَمَا
أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾ وَلَا

তোমার মালিক ভিন্ন কিছু চান; তোমার মালিক যখন যা চান তার বাস্তবায়নে তিনি একক ক্ষমতাবান। ১০৮. (অপরদিকে সেদিন) যাদের ভাগ্যবান বানানো হবে তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, যতোদিন পর্যন্ত আসমানসমূহ ও যমীন বিদ্যমান থাকবে, তবে তার কথা আলাদা যা তোমার মালিক ইচ্ছা করেন; আর এ (জান্নাত) হবে এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার, যা কোনোদিনই শেষ হবে না। ১০৯. সুতরাং (হে নবী), যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এসব কিছুর গোলামী করে, তাদের (শাস্তির) ব্যাপারে তুমি কখনো সন্দিগ্ধ হয়ো না; (আসলে) ওদের পিতৃপুরুষরা আগে যাদের বন্দেগী করতো, এরাও তাদেরই বন্দেগী করে; আমি এদের (এ জঘন্য অপরাধের) পাওনা পুরোপুরিই আদায় করে দেবো, বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না।

রুকু ১০

১১০. (হে নবী,) আমি মূসাকেও কেতাব দিয়েছিলাম, অতপর (বনী ইসরাঈলের তরফ থেকে) তাতেও নানা রকম মতবিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছিলো; (আসলে) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে এ (বিদ্রোহী)-দের ব্যাপারে যদি আগে থেকেই এ কথার ঘোষণা না করে রাখা হতো (যে, এদের বিচার পরকালেই হবে), তাহলে কবেই এদের ব্যাপারে (দুনিয়ায় গযবের) সিদ্ধান্ত এসে যেতো; (অবশ্যই) এরা এ (গ্রন্থের) ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে নিমজ্জিত আছে। ১১১. আর তখন তোমার মালিক এদের (সবাইকে) নিজেদের কর্মফলের পুরোপুরি বিনিময় আদায় করে দেবেন; কেননা, এরা যা কিছু করছে তিনি তার সব কিছুই জানেন। ১১২. অতএব (হে নবী), তোমাকে যেমনি করে (সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার) আদেশ দেয়া হয়েছে তুমি তাতেই দৃঢ় থাকো, তোমার সাথে আরো যারা (কুফরী থেকে) ফিরে এসেছে তারাও (যেন ঈমানের ওপর দৃঢ় থাকে), তোমরা কখনো সীমালংঘন করো না; এরা যা কিছু করছে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তার সব কিছু দেখছেন।

تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿۱۱۳﴾ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ

الَّيْلِ ۭ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۭ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿۱۱۴﴾

وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۱۵﴾ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ

مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ

اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿۱۱۶﴾

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ﴿۱۱۷﴾ وَلَوْ شَآءَ

رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ﴿۱۱۸﴾ ۙ اِلَّا مَنْ

رَّحِمَ رَبُّكَ ۭ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۭ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ

১১৩. (হে মুসলমানরা,) তোমরা কখনো তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না যারা (ন্যায়ের) সীমালংঘন করেছে, (তেমনটি করলে অবশ্যই) অতপর জাহান্নামের আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে, (আর তেমন অবস্থায়) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না, এবং (সে সময়) তোমাদের কোনো রকম সাহায্যও করা হবে না। ১১৪. (হে নবী,) নামায প্রতিষ্ঠা করো দিনের দুপ্রান্তভাগে ও রাতের একভাগে; অবশ্যই (মানুষের) ভালো কাজসমূহ (তাদের) মন্দ কাজসমূহ মিটিয়ে দেয়; এটা হচ্ছে (এক ধরনের) উপদেশ তাদের জন্যে, যারা (আল্লাহর) স্মরণ করে। ১১৫. তুমি ধৈর্য ধারণ করো, অতপর নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা নেককারদের পাওনা কখনো বিনষ্ট করেন না। ১১৬. তারপর এমনটি কেন হয়নি যে, যেসব উম্মতের লোকেরা তোমাদের আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে, (তাদের মধ্যে) অবশিষ্ট (যারা) রয়ে গেছে, তারা (মানুষকে) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করা থেকে নিষেধ করতো, এদের সংখ্যা ছিলো নিতান্ত কম, আমি যাদের আযাব থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, আর যালেমরা তো যে (বৈষয়িক) প্রাচুর্য ছিলো তার পেছনেই পড়ে থেকেছে, তারা ছিলো (আসলেই) অপরাধী। ১১৭. এটা কখনো তোমার মালিকের কাজ নয় যে, কোনো জনপদকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন, (বিশেষ করে) যখন সে জনপদের অধিবাসীরা সংশোধনে নিয়োজিত থাকে। ১১৮. (হে নবী,) তোমার মালিক চাইলে দুনিয়ার সব মানুষকে তিনি একই উম্মত বানিয়ে দিতে পারতেন (কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কারো ওপর তার ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে চাননি), এ কারণে তারা হামেশাই নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করতে থাকবে, ১১৯. তবে তোমার মালিক যার ওপর দয়া করেন তার কথা আলাদা; তাদের তো এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন (যে, তারা সত্য দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আর তা যখন লংঘিত হবে তখন) তাদের ব্যাপারে তোমার মালিকের

الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا
نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ
لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا
عَامِلُونَ ﴿١٢١﴾ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾

ওয়াদাই সত্য হবে, (আর সে ওয়াদা হচ্ছে); অবশ্যই আমি জাহান্নামকে জ্বিন ও মানুষ দিয়ে পূর্ণ করবো। ১২০. (হে নবী,) আগের নবীদের কাহিনীগুলো আমি তোমাকে শোনাচ্ছি, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি এর দ্বারা তোমার মনকে দৃঢ়তা দান করবো, এই সত্যের মাঝে যে শিক্ষা তা এখন তোমার কাছে এসে গেছে; (তা ছাড়া) ঈমানদারদের জন্যে কিছু শিক্ষণীয় উপদেশ ও সাবধানবাণী (এখানে দেয়া রয়েছে)। ১২১. (এতো কিছু সত্ত্বেও) যারা ঈমান আনে না, তাদের বলো, তোমরা তোমাদের জায়গায় যা (কুফরী কাজ) করার করে যাও, আর আমরাও আমাদের কাজ করে যাবো, ১২২. তোমরা (তোমাদের জাহান্নামের) অপেক্ষা করো, আমরাও (আমাদের জান্নাতের) অপেক্ষা করছি। ১২৩. আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় গায়ব বিষয় আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নিবেদিত) এবং এর সব কয়টি বিষয় তাঁর দিকেই ধাবিত হবে, অতএব (হে নবী), তুমি তাঁরই এবাদাত করো এবং (বিপদে-আপদে) একান্তভাবে তাঁর ওপরই ভরসা করো; (হে মানুষ,) তোমরা যা কিছু করছো সে সম্পর্কে তোমার মালিক কিন্তু মোটেই বে-খবর নন।

তাফসীর
আয়াত ১০০-১২৩

এ পর্যন্ত এসে সূরাটি শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওপরের আয়াতগুলোতে বহু ব্যাখ্যা এবং দুনিয়ার জীবন নিয়ে মেতে থাকা ওই জাতিকে এ জীবনের অসারতা ও ক্ষণস্থায়ী হওয়ার কথা বিভিন্ন কায়দায় বুঝানো হয়েছে। তাদের কাছে আল্লাহর নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে সময় থাকতেই তাদেরকে সাবধান হতে বলা হয়েছে।

এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, সমালোচনা ও তাদেরকে বুঝানোর জন্যে তীব্রভাবে প্রচেষ্টার সাথে ইতিপূর্বেকার আলোচনার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকলেও এ পর্যায়ে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও পূর্ণাংগভাবে গুরুত্বের সাথে তাদের বিবেককে পুনর্বার আকর্ষণ করা হয়েছে যেন তারা জীবনের লক্ষ্যের দিকে

এগিয়ে যেতে পারে। জীবনের মর্মবুঝতে পারে এবং সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই সাবধান হতে পারে।

আলোচ্য অধ্যায়ে প্রথম মনোযোগ আকর্ষণকারী যে সব কাহিনীর বর্ণনা এসেছে এবং প্রথম যে সমালোচনা করা হয়েছে তা সত্যিই অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।

'এই যে বিভিন্ন এলাকার ঘটনাবলী আমি তোমার কাছে তুলে ধরছি, তাদের মধ্যে কোনো কোনো এলাকার অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান আছে, আবার কিছু কিছু বিলীন হয়ে গেছে। আমি তো ওদের ওপর কোনো অবিচার করিনি; বরং ওরা নিজেরাই নিজেদের ওপর (পাপ করে) অবিচার করেছে। অতপর, ওরা যে সব অলীক মাবুদের গোলামী করতো, তারা ওদের কোনো উপকারেই আসেনি। যখন তোমার রবের ফয়সালা এসে গেছে, তখন তারা কোনো উপকারেই আসেনি। ওরা সেদিন তাদের ধ্বংসের কাজে সাহায্য করা ছাড়া আর কোনো কিছুই বাড়াতে পারবে না। যুলুমের কারণে তোমরা রব যখন কোনো জনপদের অধিবাসীদের পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এমনই হয়। অবশ্যই তাঁর পাকড়াও বড়ই শক্ত।'

দ্বিতীয় পর্যালোচনাতে আযাবের যে বর্ণনা এসেছে, তার মধ্যে আখেরাতের আযাব সম্পর্কে এক ভীতিপ্রদ চিত্র ফুটে উঠেছে, যা কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যাবলীর মধ্যে এক কঠিন দৃশ্য এবং যার দিকে তাকালে বিস্ফোরিত চোখগুলো যেন পাথর হয়ে যেতে চায়।

'অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন ওই ব্যক্তি বা জাতির জন্যে, যারা পরকালীন আযাবকে ভয় করে............আর যাদেরকে সৌভাগ্যশালী বানানো হয়েছে, তারা থাকবে জান্নাতের মধ্যে, চিরদিন তারা থাকবে সেখানে- থাকবে তারা সেখানে ততোদিন, যতদিন আসমান-যমীনের অস্তিত্ব টিকে থাকবে। তবে তোমার রব অন্য কিছু চাইলে সে ভিন্ন কথা (তোমার রবের) এ দান শেষ হবার নয়।' (আয়াত ১০৩-১০৮)

এরপর আসছে আর একটা হুশিয়ারী ও দৃষ্টি আকর্ষণী বর্ণনা, যা আরও জোরদারভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিভিন্ন জাতির করুণ দৃশ্যাবলী ফুটিয়ে তুলেছে, তুলে ধরেছে সেই আযাবের চিত্রগুলো, যা ওদের ওপর নাযিল হয়েছে, যাতে করে এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মোহাম্মদ (স.)-এর বিরোধিতাকারী মোশরেকের পরিণতি তাই হবে যা তাদের পূর্ববর্তীদের ভাগ্যে নেমে এসেছিলো।

আর তাদেরকে মূলোৎপাটিত করার কাজটা পৃথিবীর বুকে যদি সংঘটিত নাই হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে হচ্ছে আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার সেই ওয়াদার কারণে, যা তিনি ওদেরকে নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখবেন বলে ইতিপূর্বে করেছিলেন। যেমন মূসা (আ.)-এর জাতির ওপর একটু দেরীতে এসেছিলো তখন, যখন তারা নানা রকম মতভেদে লিপ্ত হয়ে (বিবদমান বহু দল ও গোত্রে) বিচ্ছিন্ন হয়েছিলো, যার বর্ণনা কেতাবের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌছেছে। কিন্তু এদের ও ওদেরকে অবশ্য অবশ্যই তাদের নিজ নিজ কাজের সমুচিত প্রতিদান দেয়া হবে। সুতরাং হে রসূল, মযবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো তুমি ও তোমার সেই সাথীরা, যারা তোমার সাথে তাওবা করেছে। আর খবরদার, যারা যুলুম করেছে ও শেরেক করেছে, তাদের দিকে কখনও ঝুঁকে পড়ো না। নামায কায়েম করো ও সবর করো। অবশ্যই আল্লাহ জাল্লা শানুহু এহসানকারীদের প্রতিদানকে কখনই বরবাদ করে দেন না। 'অতএব, যাদের ও যেসব জিনিসের পূজা-উপাসনা এরা করছে, তাদের ব্যাপারে তুমি কোনো সন্দেহের মধ্যে থেকো না .... আর তুমি সবর করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এহসানকারীদের পুরস্কার বিনষ্ট করেন না।' (আয়াত ১০৯-১১৫)

এরপর দৃষ্টি ফেরানো হচ্ছে বহু অতীতের (যুগের) দিকে, যখন পৃথিবীর খুব অল্প সংখ্যক লোকই অন্যায় ও অশান্তিকর কাজ থেকে বিরত থাকতো। অবশ্য ওদের অধিকাংশ লোক নিজেদের সময়েই ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহর চিরন্তন নিয়ম হচ্ছে, যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো এলাকায় সংশোধন (ও সংস্কারবাদী) কিছু লোক থেকে যায়, ততোক্ষণ তিনি তাদেরকে ধ্বংস করেন না।

আর গোটা মানব জাতির ইতিহাসকে সামনে রাখলে একথাও পরিষ্কারভাবে জানা যাবে যে, সর্বকালেই মানুষ বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত থেকেছে, অথচ আল্লাহ তায়ালা চাইলে সকল মানুষকে একমাত্র একটা উম্মত বানাতে পারবেন, কিন্তু বরাবরই আল্লাহ তায়ালা মানুষকে কিছু এখতিয়ার, ইচ্ছাশক্তিতে কিছু স্বাধীনতা দিতে চেয়েছেন। তাই জানানো হচ্ছে,

'আর তোমার রব যদি চাইতেন, তাহলে গোটা মানব জাতিকে একটি জাতিতে পরিণত করতে পারতেন। কিন্তু (তা করেননি, বরং) বরাবর মানুষ বিভিন্ন দল ও মতে বিভক্ত থেকেছে। এ মতভেদ থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছে একমাত্র সেই ব্যক্তি বা জাতি, যাদের প্রতি তোমার রব রহম করেছেন। আর তারা এ মতভেদ করবে বলেই তো তাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। আর তোমার রবের কথা পূর্ণ হয়েছে (যে) 'অবশ্যই আমি জ্বিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো।'

অবশেষে এসব ঘটনা বর্ণনা করার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য জানাতে গিয়ে বলা হচ্ছে যে, নবী (স.)-এর অন্তর যেন এসব বৃত্তান্ত জেনে শান্ত হয়ে যায়। এ ঘটনাবলীর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তিনি মোশরেকদেরকে চূড়ান্ত কথা শুনিয়ে দেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাবের যে অপেক্ষায় তারা ছিলো সে আযাবের দিকেই যেন তাদেরকে তিনি সোপর্দ করেন। তিনি নিজে যেন নিরংকুশভাবে আল্লাহর দাসত্ব করেন এবং তাঁর ওপরেই যেন তিনি ভরসা রাখেন। আর যে সব জঘন্য কাজ ওরা করছে, সে বিষয়ে তাদের পাকড়াও করার জন্যে তাঁর কাছেই যেন তিনি প্রার্থনা জানান।

'আর রসূলদের সকল খবর আমি তোমাকে জানাচ্ছি, যার দ্বারা আমি তোমার অন্তরকে প্রশান্ত করছি। আর এ ঘটনাবলীর মাধ্যমে তোমার কাছে সত্য উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে এবং মোমেনদের জন্যেও এ বর্ণনা এক উপদেশ ও চির স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। যারা ঈমান আনছে না তাদেরকেও বলো, তোমরা নিজ নিজ স্থানে যা করতে চাও, করো। আমরাও কিছু করবো। অপেক্ষা করো তোমরা, আমরাও অপেক্ষা করতে থাকবো (ওয়াদা করা ওই আযাবের)। আর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর গায়েবের জন্যে (অদেখা ও অজানা) খবর একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আর তাঁর কাছেই সব কিছু ফিরে যাবে। সুতরাং এবাদাত করো একমাত্র তাঁর এবং তাঁর ওপরেই ভরসা করো। আর তোমরা যা কিছু করছো, সে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা মোটেই গাফেল নন।'

এ হচ্ছে নানা জনপদের ঘটনা, যা তোমার কাছে আমি বর্ণনা করছি .... নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও বড়ই বেদনাদায়ক, বড়ই শক্ত।' (১০০-১০২)

ওই হতভাগ্য জাতির শক্তিমানদের শক্তি সামনে আসছে এবং তাদের করুণ পরিণতির দৃশ্যগুলোও মানুষ ও তাদের চিন্তার ওপর বেশ চাপ সৃষ্টি করছে। এদের মধ্যে রয়েছে সর্বগ্রাসী প্লাবনের উত্তাল তরংগের অভিঘাতে মজ্জমান মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর করুণ দৃশ্য। প্রলয়ংকারী ঝড়ের মধ্যে বিধ্বস্ত হওয়ার দৃশ্য, যাদেরকে ভীষণ চীৎকার ধ্বনিতে পেয়ে বসেছে তাদের দৃশ্য,

যাদেরকে তাদের বাড়ীঘরসহ মাটিতে গেড়ে দেয়া হয়েছে, তাদের দৃশ্য। আর কল্পনার চোখে ভেসে উঠছে তাদেরও দৃশ্য, যাদেরকে কেয়ামতের দিনে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আর সেই সমস্ত ধ্বংসলীলার দৃশ্য যা ইতিপূর্বে দুনিয়ার বুকে সংঘটিত হয়েছিলো, সেগুলো যেন আজও চোখের ওপর ভাসছে। এখানে যে সব ঘটনার বিবরণ এসেছে এবং ইতিপূর্বে যে সব বীভৎস ঘটনার তথ্য জানা গেছে, সেগুলো সবই বিদগ্ধ পাঠকের চোখের সামনে যেন ভাসতে থাকে। এখানে এসে আমরা গভীরভাবে ওই সব সংঘর্ষ এবং ওই দৃশ্যাবলীর চিত্রগুলো যেন দেখতে পাই। এখানে নীচের আয়াতে বর্ণিত শাস্তির কথা জানানো হচ্ছে,

'হাঁ, এগুলোই বিভিন্ন জনপদের অধিবাসীদের ঘটনা, যা আমি তোমাকে জানাচ্ছি। ওই সব এলাকার কোনো কোনোটা এখনও বর্তমান আছে এবং কোনোটা বিলীন হয়ে গেছে সৃষ্টির বুকে।'

'ওইসব হচ্ছে বিভিন্ন এলাকার খবরাদি যা তোমাকে আমি জানাচ্ছি।'– এগুলো সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞানই ছিলো না। ওই গায়েবের বস্তুসমূহ বা খবরাদির তথ্য সবই তোমার কাছে গোপন রহস্য হিসাবে ছিলো। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু ঘটনা ওহীর মাধ্যমে তোমাকে জানানো হয়েছে– এগুলো কোরআনে বর্ণিত কিছু কাহিনী আকারে এসেছে।

'এগুলোর কিছু এখনও দাঁড়িয়ে আছে' ...... অর্থাৎ এগুলোর যে সব ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়, তাতে বুঝা যায় যে, এগুলোর অধিবাসীরা বেশ শক্তিশালী ছিলো এবং তাদের জীবন যাপন ছিলো বেশ উন্নত মানের। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আদ জাতি, যাদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় পাহাড়ের গুহার মধ্যে এবং সামুদ জাতির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় কঠিন পাথরের শিলাখন্ডের মধ্যে। আর কিছু জাতির ধ্বংস এসেছে এমনভাবে যে, তাদের কোনো নিশানাই আর দুনিয়ার বুকে বাকি নেই। যেন তাদের শেকড়গুলোকেই কেটে দেয়া হয়েছে। এদের শেকড় ভাসমান অবস্থায় ছিলো ভূপৃষ্ঠে, কিন্তু মাটির গভীরে এসব শেকড় প্রোথিত না থাকায় উপড়ে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমনভাবে তাদের সকল চিহ্ন যমীন থেকে মুছে গেছে যেমন নূহ (আ.)-এর প্লাবনে পৃথিবী সকল প্রাণী থেকে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছিলো, অথবা সাফ হয়ে গিয়েছিলো লূত (আ.)-এর জাতি।

ওই জাতিসমূহ কারা? তাদের কাজ কারবারই বা কী ছিলো? এরা ছিলো মানব গোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ। যেমন ঝোপ ঝাড় ও জংগলের সারি ছড়িয়ে থাকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপী। সেখানে ভালো ও উপকারী গাছ গাছালীও যেমন আছে, তেমনি আছে কন্টকাকীর্ণ জংগল, যার দ্বারা তেমন কোনো উপকার পাওয়া যায় না। কিছু চারা বাড়ে, কিছু চারা মরে যায়।

'আমি এদের প্রতি কোনো যুলুম করিনি, বরং এরা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।'

এসব মানুষ তাদের প্রাপ্য পাওয়ার পথ তারা নিজেরাই বন্ধ করে দিয়েছে। তারা হেদায়াতের পথ থেকে সরে গেছে এবং সত্যের নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করেছে। তারা কেয়ামতের সতর্কবানী ঠাট্টা বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিয়েছে, যার ফলে তারা জীবনের প্রতি পদে পদে যালেম হিসাবে পরিগণিত হয়ে গেছে। সব ব্যাপারেই তারা যুলুম করেছে। কিন্তু তাদের ওপর কোনো যুলুম করা হয়নি। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'যখন আল্লাহর ফয়সালা এসে যাবে, তখন ওই সব মেকী রক্ষকরা, যাদেরকে ... আল্লাহকে বাদ দিয়ে ত্রাণকর্তা হিসাবে ডাকতো, তারা কেউই তাদের কোনো উপকারে ... আর তাদের কাছে এসব আবেদন নিবেদন ধ্বংস ছাড়া আর কিছু ডেকে আনবে না।' ......

এ সব ঘটনার মধ্যে যে সব উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে, তার মধ্যে আর একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা সাফ সাফ জানিয়ে দেয়া যে, আজকে যাদের নিকট সাহায্যের জন্যে প্রার্থনা করা হচ্ছে, কেয়ামতের দিন তারা কেউ কোনো কাজে লাগবে না। সূরাটির শুরুতে সর্বপ্রথম ওই সব ব্যক্তিকে সতর্ক করা হয়েছে, যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের কাছে মাথা নত করে এবং তাদের আইন কানুন অনুসারে জীবন যাপন করে। প্রত্যেক রসূলের অন্যান্য দায়িত্বের সাথে এ দায়িত্বও ছিলো যে, এসব মিথ্যা রব তাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে রেহাই দেবে না এ কথা তাদের জানিয়ে দেয়া। শাস্তিপ্রাপ্ত এসব মানুষ প্রকারান্তরে সতর্ককারী নবীর সত্যতা ঘোষণা করেছে। সুতরাং ওইসব মেকী মাবুদ তাদেরকে কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারবে না। আর যখন আল্লাহর শাস্তির ফায়সালা এসে যাবে, তখন সে শাস্তি থেকে বাঁচানোও তাদের কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। বরং তারা শুধু ক্ষতিই ক্ষতি এবং ধ্বংস বাড়াতে পারবে। ('তাতবীব'-শব্দটা 'চরম ধ্বংস' অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর মধ্যে ভয়াবহতার রূপ বেশী ধরা পড়ে)। এর কারণ হচ্ছে আল্লাহর ওপর ভরসা না করে ওরা ওইসব অলীক ও শক্তি ক্ষমতাহীন মাবুদদের কাছে সাহায্য চাইতো ও তাদের ওপর ভরসা করতো, যার কারণে তাদের অন্ধ অনুকরণ ও নবী (স.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার প্রবণতা আরও বেড়ে যায়। এরই প্রতিক্রিয়ায় আল্লাহ তায়ালাও তাদের নাকে দড়ি বেঁধে ঘুরানো এবং তাদেরকে ধ্বংস করার কাজ আরও ত্বরান্বিত করবেন। 'তাদেরকে বাড়িয়ে দেবেন'-এর অর্থ এটাই। ওই সব দেব দেবী তাদের না কোনো অপকার করতে পারবে আর না পারবে কোনো উপকার করতে। কিন্তু এ চক্রবৃদ্ধি হারে ক্ষতি ও ধ্বংস আসার কারণে তারা আরও বেশী কষ্ট পাবে। তাই আয়াতে এরশাদ হচ্ছে,

'আর এমনি করেই তোমার রব পাকড়াও করেন কোনো এলাকাবাসীকে, যখন তারা যালেম হয়ে যায়।'

অর্থাৎ আমি এভাবেই তাদের কেসসা তোমার কাছে পেশ করছি। আর যখন কোনো জনপদ সীমা ছাড়া যুলুম করতে থাকে, তখন তাদেরকে এভাবেই তিনি শাস্তি দেন ও তাঁর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ৩নিয়ে আসেন। তারা যালেম হয়ে যায় ও মোশরেক হয়ে যায় তখন, যখন তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো গোলামী মেনে নিয়ে তাদের নির্মিত আইন কানুন মানতে শুরু করে। শেরেক করার কারণেই তারা নিজেদের ওপর যুলুম করে এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা, ফেতনা ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করে। যুলুম করে তখন, যখন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও একত্বকে মানতে অস্বীকার করে এবং সংশোধনীর সকল পথকে পরিহার করে। এহেন পরিবেশে গড়ে ওঠা জাতির মধ্যে যুলুম ও যালেমদের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও বড়ই বেদনাদায়ক, বড়ই কঠিন।'

অর্থাৎ বহু প্রতীক্ষা, বহু দুর্ভোগ ও পরীক্ষা শেষে আসবে ওই আযাব। নবী রসূলরা যখন তাদেরকে সত্য সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন এবং দ্বীনের দাওয়াতকে গ্রহণ করতে উদাত্ত কণ্ঠে ডেকেছেন, তখন তারা ওযরের পর ওযর পেশ করেছে। নিজেদের ওপর ও অন্যদের ওপর যুলুম করেছে। নিজেরা অন্যায় করেছে, অপরকেও অন্যায় কাজে এগিয়ে দিয়েছে। এভাবেই যুলুমের প্রসার ঘটেছে। অথচ তাদের কাছে এটা স্পষ্ট ছিলো যে, সত্যের দিকে আহ্বানকারীরা সংখ্যায় অল্প এবং সমাজের অন্যদের থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। সাধারণভাবে মানুষ অন্যায়কারী হওয়ার কারণে ওই যালেমদের ওপর তাদের কোনো প্রভাব নেই, হঠকারিতার সাথে ও যুক্তিহীনভাবে তারা গোমরাহীর মধ্যে রয়েছে .... তারপর মোমেনরা যখন তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছে,

তখন তারা অন্যায় পথে টিকে থাকার জন্যে আরো বেশী যেদী হয়ে উঠেছে। তারা মনে করে, তারাই একমাত্র ধর্ম মান্যকারী জাতি। যাদের নিজস্ব ধর্ম আছে, তাদের প্রতিপালক আছে। মোমেনদের ওপরও তাদের কর্তৃত্ব রয়েছে এবং সমাজের মধ্যে তাদেরই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। এসব মোশরেক তাদের নিজেদের একমাত্র জাতি বলে গণ্য করে ও ঘোষণা দেয়। আর আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে যে পরিণতির কথা ঘোষণা করেছেন, সেই কঠিন অবস্থার সাথে সাক্ষাত হবে বলে তারা অস্বীকার করে। কিন্তু তবু সে পরিণতি আসবেই আসবে। সময় ক্ষেপণের সাথে সে পরিণতি আর আসবে না– এটা মোটেই ঠিক নয়।

অবশ্যই এ পাকড়াও হবে চরম বেদনাদায়ক, ভীষণ কষ্টদায়ক। দুনিয়াতে যে আযাব আসছে, এটা আখেরাতের আযাবেরই এক প্রতীক মাত্র। আখেরাতের আযাবকে যারা ভয় করে, তারা এ আযাবকে খেয়াল করে দেখে ও বুঝতে পারে, অর্থাৎ সত্য প্রত্যক্ষ করার জন্যে যাদের চোখ খুলে গেছে, তারা সুস্পষ্টভাবে এ সত্য দেখতে পাচ্ছে যে, এ দুনিয়ায় নানা প্রকার যুলুম করার কারণে যাদেরকে দুনিয়ার এ আযাব স্পর্শ করেছে, কেয়ামতের দিনও তাদেরকে আরও কঠিন আযাব পাকড়াও করবে। মোমেনদের এ দল আখেরাতের আযাবকে ভয় করে এবং তার থেকে বাঁচার জন্যে সতর্ক হয়ে চলার চেষ্টা করে।

এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে যে, প্রাসংগিক আলোচনা মানুষের হৃদয়ের ওপর পার্থিব দৃশ্যাবলী থেকে যে প্রভাব এনে দেয়, তারই কারণে সে কেয়ামতের দৃশ্যাবলীও সেইভাবে আঁচ করতে থাকে যেমন করে আল-কোরআন মোমেন ও কাফের– উভয় জাতির পরিণতির কথা বর্ণনা করেছে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই, যে আখেরাতের আযাবকে ভয় করে তার জন্যে নিদর্শন রয়েছে। .... এ হবে এমন এক দান, যা কখনো শেষ হয়ে যাবে না। (আয়াত ১০২-১০৮)

কেয়ামত দিবসের কিছু ভয়াবহ চিত্র

আয়াতাংশে ওই কঠিন ও বেদনাদায়ক পাকড়াও এর যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তার সাথে আখেরাতের আযাবের সাদৃশ্য রয়েছে। এ আযাবের বর্ণনা তুলে উপদেশ দেয়া হচ্ছে এবং আখেরাতের আযাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে, যদিও আখেরাতের ভয়ে ভীত যারা তারা ছাড়া ওই আযাবের ছবি অন্য কেউ দেখতে পায় না। ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তারা মানস চোখে যখন ওই দৃশ্য দেখে, তখন তাদের দৃষ্টি প্রখর হয়ে ওঠে এবং অন্তরের দুয়ার খুলে যায়।

আর, আখেরাতকে যারা ভয় করে না, তাদের অন্তরগুলো বধির হয়ে যায়। আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার নিদর্শনসমূহকে তারা বুঝতে পারে না, তারা সৃষ্টির রহস্য অনুভব করে না। অনুভব করে না পুনরায় জীবন্ত হয়ে ওঠার সত্যতাকে এবং দুনিয়াতে আযাব নাযিল না হওয়া পর্যন্ত এ আযাব সম্পর্কে তারা চিন্তাও করতে পারে না। আর যখন আযাব এসেই যায়, তখন তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার বা সঠিক চেতনা লাভ করারও আর কোনো সুযোগ থাকে না।

এরপর ওই কঠিন দিনের বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

'এ হচ্ছে সেই দিন, যখন সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে আর এ হচ্ছে সবার হাযির হওয়ার দিনটি।'

এ পর্যায়ে গোটা মানব জাতির একত্রিত হওয়ার সেই দৃশ্যটা তুলে ধরা হচ্ছে, যখন সকল মানুষ আল্লাহর দরবারে হাযির হয়ে যাবে। রোয হাশরের ওই কঠিন দিনে সবাইকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সেই মহা দরবারের দিকে। তখন সবাই যাবে, যেতে হবে সবাইকে, বাকি থাকবে না

কেউ সেখানে যাওয়া থেকে এবং সবাই এন্তেযার করতে থাকবে সেই মহাবিচারের জন্যে, যা শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে বলে তারা বুঝবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'সেই দিন যখন এসেই পড়বে, তখন কেউ তাঁর অনুমতি ছাড়া কথা বলবে না।'

সেদিনকার ভয়াবহ নীরবতা সবাইকে গ্রাস করে ফেলবে। সাথে সাথে দেখা দেবে ওই গোটা বিশ্বসভার সবার মধ্যে এক অভূতপূর্ব শংকা। আর সেদিন একমাত্র সে-ই কথা বলতে পারবে, যাকে অনুমতি দেয়া হবে। তবে সেই অনুমতি চাওয়ার সাহস কেউই করবে না, তবে আল্লাহ তায়ালা যাকে চাইবেন তাকে অনুমতি দেবেন। এরপর শুরু হবে পরীক্ষা ও কর্ম অনুসারে ভাগ ভাগ করে দাঁড় করানো। এরশাদ হচ্ছে,

'তাদের একদল থাকবে হতভাগা আর এক দল থাকবে সৌভাগ্যবান।'

এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা এক দলকে ভাগ্যহারা হিসাবে (যারা ভাগ্যাহত হয়েছিলো) দেখতে পাচ্ছি, তারা আগুনের মধ্যে ভীষণভাবে কষ্ট পাচ্ছে। ভীষণ চাপ ও সংকটের কারণে সেখান থেকে শোনা যাচ্ছে গোংগানি, চিৎকারধ্বনি ও হাহুতাশের শব্দ। আর একদলকে দেখতে পাচ্ছি, তারা সৌভাগ্যশালী, তারা জান্নাতের মধ্যে রযেছে, চিরন্তন নেয়ামতের মধ্যে তারা মহা আনন্দে রয়েছে। সীমাহীন আনন্দের মধ্যে তারা রয়েছে। এ আনন্দের শেষ নেই।

এরা এবং ওরা– দু'পক্ষকেই দেখা যাচ্ছে, নিজ নিজ অবস্থানে চিরন্তন যিন্দেগী যাপন করছে (থাকবে তারা সেখানে যতোদিন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অস্তিত্ব রয়েছে)। আসলে তাদের মন মগযে চিরন্তন অবস্থানের কথাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এভাবে বিবরণটা এসেছে। প্রত্যেকটা ব্যাখ্যার জন্যে এমন কোনো কিছুর সাথে তুলনা করতে হয়, যার সাথে ওই জিনিসের প্রকৃতিগতভাবে মিল আছে। এখানে মন্দ ও ভালো ভাগ্যের অধিকারীদের একটি বিষয়ে মিল রয়েছে, আর তা হচ্ছে চিরন্তনতা। আর এ কথাটা বলাই এখানে উদ্দেশ্য।

এখানে উপরোক্ত দু'ধরনের লোকদের বিবরণের মধ্যে যে সাধারণ সাদৃশ্য পাওয়া যায় তা হচ্ছে, আল্লাহর ইচ্ছাতে উভয় দলই নিজ নিজ বাসস্থানে চিরকাল ধরে থাকবে। যার কোনো শেষ থাকবে না। নিসন্দেহে এটা আল্লাহরই নিয়ম। কিন্তু সকল নিয়মই আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহর সকল নিয়মেরই নিজস্ব পদ্ধতি আছে, তবে এ নিয়মকে কেউ আবদ্ধ বা সীমাবদ্ধ করতে পারে না। এ নিয়ম স্বাধীন, অর্থাৎ এ নিয়ম ঠিক রাখা না রাখার ব্যাপারে তিনি স্বাধীন। তাঁর ইচ্ছার ওপর প্রশ্ন তোলার বা সে নিয়মকে সীমাবদ্ধ করার এখতিয়ার কারো নেই। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই তোমার রব যা করতে চান তা করতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান।'

প্রাসংগিক আলোচনার মধ্যে ভাগ্যবানদের জন্যে একটি অতিরিক্ত গ্যারান্টির আশ্বাসবাণী পাওয়া যায় যে, যে সব ব্যক্তি এ মহান মর্যাদার অধিকারী হবে, তাদের উক্ত অবস্থার আর কোনো পরিবর্তন হবে না। তাদের জান্নাতী যিন্দেগীর স্থায়ীত্বের মধ্যে কোনো ছেদ আসবে না। শেষ হবে না কোনো দিন তাদের ওই শান্তির জীবন।

আখরাতের চিরস্থায়ী ওই যিন্দেগীর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর, দুনিয়ায় তাদের কর্ম অনুসারে বিভিন্ন জাতিকে বিভিন্ন দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং দুনিয়াতে তারা যে কাজে নিয়োজিত ছিলো, সেই অনুসারে তাদের নির্ধারিত হবে। কাজেই আলোচ্য বর্ণনায় এখানে ও ওখানে উভয় দলের অবস্থান চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে, অথবা এখানে তাদের মধ্যে যে বৈচিত্র আছে এবং ওখানে তাদের অবস্থার মধ্যে কি বৈচিত্র আসবে বক্ষ্যমাণ আলোচায় তার ছবি দেখা যাচ্ছে। এসব বর্ণনার মধ্যে আর একটা সাধারণ মিলের কথা জানা যায়। আর তা হচ্ছে মোমেন দল সংখ্যায়

বরাবর কম থাকে এবং বিরোধীরা থাকে সদা সর্বদাই বেশী। যেমন মক্কী যিন্দেগীতে ছিলো। কিন্তু এ সাদৃশ্যের পর অন্যান্য নবীর যামানার সাথে কিছু বৈসাদৃশ্যও দেখা যায়। যেমন মাদানী যিন্দেগীতে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তেই থাকে এবং মোশরেকদের সংখ্যা ক্রমান্বয়েই কমতে থাকে। মক্কী যিন্দেগীতে মোমেনের সংখ্যা কম হলেও তাদের মধ্যে সত্যপ্রাপ্তির আনন্দ ও দৃঢ়তা বিদ্যমান ছিলো। অপরদিকে নবী (স.)-এর জাতির মিথ্যাশ্রয়ী ও সত্যকে অস্বীকারকারীরা ছিলো সদা সর্বদা সন্ত্রস্ত ও নিজ নিজ অবস্থার জন্যে চিন্তিত। হাঁ, নিসন্দেহে একটি বিষয়ে পূর্ববর্তী উম্মতের সাথে রসূলুল্লাহ (স.)-এর যামানার মোশরেকদের মধ্যে মিল দেখা যায়, তা হচ্ছে উভয় দলই বাপ দাদার আমলের দোহাই দিয়ে অন্যায় ও অযৌক্তিক কাজের দোহাই দিয়ে জাহেলিয়াতকে আকড়ে ধরেছে, বাপ দাদারা যার পূজা করতো, ওরাও অন্ধভাবে তাদের পূজা করে। এ সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পূর্ববর্তীদের সাথে মিল থাকায় উভয়ের পরিণতি একই হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী। আর তিনিই তাদেরকে এ আযাব দেবেন, যিনি সকল ক্ষমতার মালিক। তাই শীঘ্রই তিনি তাদেরকে এ আযাবে আবদ্ধ করবেন। এ আযাব দিতে গিয়ে তিনি কারও জন্যে দেরীও করে থাকেন। যেমন মূসা (আ.)-এর কওম। অবশ্য তার অর্থ এ নয় যে, আযাব আসবে না, বরং তাদের দ্বীনী ব্যাপারে মতভেদ করার কারণে তাদেরকে সমূলে নিধন করা বাকি রয়েছে এবং বিশেষ এক উদ্দেশ্যেই তিনি তাদেরকে কিছু সময় দিয়ে রেখেছেন। তবে এটাও ঠিক, মূসা (আ.)-এর জাতি এবং উম্মতে মোহাম্মদী একটা নির্দিষ্ট সময় পর কর্মের দিক দিয়ে যদি সমান হয়, তাহলে তাদের পরিণতিও সমান হবে। কারণ আল্লাহ তায়ালা প্রতিদান দেন কর্মের কারণে। তাদের ওপর আযাব আসতে বিলম্ব হয়েছে তার কারণ এ নয় যে, তারা হকের ওপর ছিলো। তারা তো অবশ্যই সেই বাতিল ব্যবস্থার ওপর ছিলো ও থাকে, যার ওপর তাদের বাপ দাদারা ছিলো।

সন্দেহ ও তার মাঝে দ্বীনের ভারসাম্য রক্ষা করা

'তুমি এসব বিষয়ে কোনো সন্দেহের মধ্যে থেকো না, যার বা যাদের গোলামী এরা করছে। এরা তো সেই সব জিনিসের পূজা করছে, যাদের পূজা ইতিপূর্বে তাদের বাপ দাদারা করতো। আর অবশ্যই আমি তাদেরকে পুরোপুরি তাদের (আযাবের) পাওনা অংশ দেবো, একটুও কম করা হবে না। .... নিশ্চয়ই যা তারা করছে, সে বিষয়ে তিনি সম্যক অবগত। (আয়াত ১০৯-১১১)

অর্থাৎ (হে নবী), তোমার অন্তরের মধ্যে ওদের কোনো এবাদাতের ব্যাপারে যেন কোনো সন্দেহ না আসে যে তা সঠিক কিনা। এখানে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে এবং তাঁর মাধ্যমে তাঁর কওমকে সতর্ক করা হচ্ছে। এ পদ্ধতি অনেক সময় ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। কারণ তাঁর কাছে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে ওদের এবাদাত ভ্রান্ত নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং বাস্তব প্রমাণের ওপর ভিত্তি করেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে জানিয়েছেন, এ ফায়সালা কারো সাথে ঝগড়া বিবাদের কারণে নয়, বা কোনো সন্দেহবাদীকেও সম্বোধন করে একথাটা বলা হয়নি। তাদের সম্পর্কে অবহেলার সাথে অথবা তাদের অবস্থা ভাল করে না জেনেই যে বলা হয়েছে তা নয়। এমতাবস্থায় হতে পারে, তাদের এবাদাতের বিষয়গুলোর নাম সরাসরি বলার পরিবর্তে পরোক্ষভাবে বলায় কথাটার গুরুত্ব বেশী অনুভূত হবে। তাই বলা হচ্ছে,

'সুতরাং যে সব জিনিসের পূজা এরা করে, সে বিষয়ে তুমি কোনো সন্দেহের মধ্যে থেকো না' .... ওদের বাপ দাদারা যেসব জিনিসের পূজা ইতিপূর্বে করতো, এরা তাই করে।'

অর্থাৎ, ওদের পরিণতি যা হয়েছে, এদের পরিণতিও তাই হবে। আর তা হচ্ছে আযাব– আযাব– কঠিন আযাব। সে আযাব সব কিছুকে গ্রাস করে ফেলবে, যেভাবে গ্রাস করেছে, ধ্বংস করেছে, নিস্তনাবুদ করে দিয়েছে অতীতের যালেম জাতিসমূহকে। সেই একইভাবে একই কায়দায় এবং একই নিষ্ঠুরতায় শেষ করে দেয়া হবে এখনকার এ নব্য যালেমদেরকে।

'আর অবশ্যই আমি পুরোপুরি ওদের পাওনা আদায় করে দেবো, একটুও কম করবো না।'

পূর্ববর্তী জাতির নসীব যেমন সবার জানা হয়ে গেছে, তেমনি ওদের নসীবও জানা আছে সবার কাছে। ইতিহাস সাক্ষী, আমরা দেখেছি এমনই বহু শাস্তির নমুনা, বহু কঠিন আযাবের দৃশ্য। ইতিহাসের পাতায় দেখা যায়, ওইসব যালেমদের ওপর যেভাবে নাযিল হয়েছে আল্লাহর অভিসম্পাত, তেমনি করে আজকের যালেমেরও মহা বিচারক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সেই কঠিন পাকড়াও থেকে রেহাই পাবে না।

তবে হাঁ, সর্বগ্রাসী আযাব নাযিল করে এ জাতিকে সামগ্রিকভাবে মূলোৎপাটিত করা হবে না, যেমন মূসা (আ.)-এর জাতিকে নিশেষে মুছে ফেলা হয়নি ধরণীর বুক থেকে।

'আর আমি মূসাকে আল কেতাব, দিয়েছিলাম কিন্তু তার মধ্যে (তার শিক্ষার মধ্যে, তার নির্দেশ চালু করতে গিয়ে) মতভেদ করা হলো।'

বহুভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো তাদের কথাগুলো, তাদের বিশ্বাসগুলো, তাদের (আনুষ্ঠানিক) এবাদাতগুলো। কিন্তু যদি তাদের সম্পর্কে পূর্বে এ ফয়সালা না হয়ে থাকতো যে, তাদের চূড়ান্ত ফায়সালা হবে কেয়ামতের দিন, তাহলে–

'যদি এ একটি কথা তোমার রব– এর পক্ষ থেকে আগেই সিদ্ধান্ত না নেয়া হতো, তাহলে অবশ্যই এখানেই ওদের চূড়ান্ত ফয়সালা (দুনিয়াতেই) করে দেয়া হতো।'

অবশ্যই এখানে কোনো এক হেকমত, আছে যার কারণে এ কথাটা বলা হয়েছে। তাদের মূলোৎপাটিত করে দেয়ার মতো সর্বগ্রাসী কোনো আযাব তাদের ওপর নাযিল করা হয়নি। কারণ তাদের কাছে একটি কেতাব আছে।

আর রসূলদের অনুসারীদের মধ্যে যাদের কাছে আসমানী কেতাব আছে (এবং তারাও সেটাকে আসমানী কেতাব দাবী করে– বাস্তবে অনেক পরিবর্তিত হওয়া সত্তেও আসমানী কেতাবের বৈশিষ্ট্যও সে কেতাবের মধ্যে রয়েছে, তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত সময় দেয়া হবে এবং সামগ্রিকভাবে ওই রকম আযাব দেয়া হবে না, যা পূর্ববর্তী গযব-প্রাপ্ত জাতিসমূহের ওপর এসেছে। এর কারণ হচ্ছে ..... আজও রয়েছে সেই মূল কেতাব (অন্য জাতির কাছে কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকলেও তার প্রধান শিক্ষা আজও অম্লান রয়েছে– তাই তাদেরকে সামগ্রিকভাবে এবং সমূলে ধ্বংস করা হবে না, তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত সময় দেয়া হবে। কারণ এই যে, আল কেতাব এ হচ্ছে একথার দলীল– একথার সাক্ষী যে, হেদায়াতের পথ এখনও খোলা রয়েছে, এখনো পৃথিবীর জনগোষ্ঠীসমূহ এ কেতাব থেকে শিক্ষা নিতে পারে। এখনো তাদের হেদায়াত পাওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়নি। এখনও আল কেতাব, আল কোরআন আকারে অবিকল রয়েছে, তার থেকে সেই ভাবে মানুষ আলোকিত হতে পারে, যেভাবে অবতরণ কালের মানুষেরা এর থেকে শিক্ষা নিয়েছিলো। এটা এমন অলৌকিক কিছু নয়, যা শুধু কোনো এক যুগের মানুষই লাভ করবে, তা কেউ বিশ্বাস করুক বা নাই করুক, সমভাবে তাদেরকে আযাব পাকড়াও করবে এমন নয়, এমন হতে পারে না। আর তাওরাত ও ইনযীল দুটিই তো পূর্ণাংগ কেতাব, যা যুগ যুগ ধরে মানুষকে পথ দেখিয়েছে। অবশেষে এলো এ শেষ কেতাব আল কোরআন, যা পূর্বেকার কেতাব দুটি (তাওরাত

ও ইনজীল)কে সত্যায়িত করেছে, তারপর ঘোষণা দিয়েছে যে, এটাই শেষ কেতাব। এ কেতাব বিশ্বের সকল মানুষের জন্যে, আর এর ভিত্তিতেই সকল মানুষের হিসাব নেয়া হবে, হিসাব নেয়া হবে এরই ভিত্তিতে তাওরাত ও ইনজীলের অনুসারীদের থেকেও .... আর তারা অর্থাৎ মূসা (আ.)-এর কওম...... অবশ্যই তারা তাদের কেতাবের বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে এবং তারা সন্দেহ সৃষ্টি করে চলেছে....... মূসা (আ.)-এর থেকে প্রাপ্ত যে কেতাব– এ কেতাব সম্পর্কেই সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে। যেহেতু, মূসা (আ.)-এর এন্তেকালের বহু যুগ পর এ কেতাব লিখিত হয়েছে এবং এ কেতাব সম্পর্কিত যে বর্ণনা ধারা রয়েছে, সেগুলো বহুলাংশেই পরস্পর বিরোধী-এর মধ্যে বহু পরিবর্তন এসেছে। রেওয়ায়াতগুলোর মধ্যে ও কোনো ধারাবাহিকতা নেই।

আর যখন আযাব এসে যাবে.......... তখন সবাইকে তাদের কাজের বদলা ভালো বা মন্দ পুরোপুরিই বুঝে দেয়া হবে, দেবেন তিনি যিনি সব জানেন, সব খবর রাখেন। আর কিছুতেই তিনি কারো প্রাপ্য নষ্ট করবেন না।

'সবাইকেই তোমার রব তাদের পাওনা পুরোপুরিই বুঝিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই যা ওরা করছে, তা সবই তিনি জানেন।'

এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গেলে দেখা যাবে যে, এর মধ্যে বিভিন্নভাবে এমন জোর দিয়ে কথা বলা হয়েছে যে, যে বিষয়ে এ পর্যন্ত সতর্ক করা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময়ে আযাব আসবে বলে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তা যে অবশ্য ঘটবে তার মধ্যে কোনো সন্দেহ মনে হয় না। এমন কি, তারা যে অন্যায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এবং তাদের সকল কাজ নির্জলা মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত এ বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকে না। আর সকল মোশরেকরা যে সব পূজা অর্চনা বা এবাদাত করে, তা সবই যে শেরেকের মধ্যে গণ্য, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

যে সময় দ্বীন ইসলামের এ দাওয়াত দেয়া হচ্ছিল, সে সময়ে মোশরেকরা স্বয়ং রসূল (স.) ও তাঁর মুষ্টিমেয় সংগী সাথীদের জীবন বিপন্ন করার জন্যে চরম শত্রুতাপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলো এবং এ দাওয়াতকে প্রতিহত করার জন্যে সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা শুরু করেছিলো এর ফলে তাদের ওপর কঠিন আযাব আসাটা অবধারিত হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তবু তা স্থগিত করা হলো এবং এরপর আর কোনো দিন সামগ্রিক কোনো আযাব আসেনি। আর অপরদিকে এমনও হয় যে, মোমেনদের কোনো কোনো দলের ওপর কষ্ট আসে এবং দেখা যায় তাদের দুশমনরা রেহাই পেয়ে যাচ্ছে।........ এ এমন একটা জটিল অবস্থা যে, কোনো কোনো হৃদয় এহেন পরীক্ষায় বিচলিত হয়ে পড়ে, এমনকি অনেক দৃঢ় চিত্তের অধিকারীদের অন্তরও ভয়ে প্রকম্পিত হতে থাকে। সে অবস্থাতে তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার প্রয়োজন হয় এবং তাদেরকে দৃঢ়তা দান করার জন্যে উৎসাহিত করতে হয়।

আর মোমেনদের অন্তরকে মযবুত করার জন্যে এর থেকে বড় ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না যে তারা দৃঢ়ভাবে অনুভব করবে যে, আল্লাহর দুশমনই তাদের দুশমন, আর ওই দুশমনরা পুরোপুরি মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই।

এমনি করে মোমেনরা যখন সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায় এবং বুঝতে পারে যে, যালেমদেরকে ঢিল দেয়ার মধ্যে অবশ্যই আল্লাহর হেকমত আছে এবং বিদ্রোহীদের অন্তরে সুদীর্ঘ কাল ধরে বেঁচে থাকার কামনা পয়দা করার মধ্যেও আল্লাহর হেকমত আছে, তখনই সে এর মধ্যে আল্লাহর রহমত অনুভব করে এবং সে তখন দিশাহারা হয়ে যায় না!

এমনি করে, কোরআনের আয়াতের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই এবং অন্তরের ঐকান্তিক বিশ্বাসের সাথে অনুভব করি যে, আল্লাহর রাজ্যে তাঁরই আইন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আমাদের জড়িত থাকতে হবে। আরো দেখতে পাই, কেমন করে আল কোরআন মুসলিম জামায়াতকে নিয়ে যুদ্ধ করার কথা বলেছে এবং কেমন করে তার জন্যে সর্বপ্রকার পথ রচনা করেছে।

এভাবে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আমাদের অন্তরের মধ্যে একথা বদ্ধমূল করে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর শরীয়া তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অবশ্যই চালু করতে হবে। আর এ কারণেই মোমেনদের জীবন ভর আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থার ওপর দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকা প্রয়োজন এবং তাঁর দিকে দাওয়াত দানকারীদের তাদের অবিচলভাবে ঈমানের পথে টিকে থাকা দরকার, যেমন করে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সব নির্দেশ পালন করার ব্যাপারে তারা কোনো বাড়াবাড়ি করবে না (অর্থাৎ যেভাবে এসব নির্দেশ পালন করতে বলা হয়েছে, অবিকল সেভাবেই পালন করবে, তার থেকে কিছু অংশ কম করবে না) আর সে নির্দেশ পালনে কিছুমাত্র বাড়াবেও না। আর শত্রুর শক্তি যতো বেশীই হোক না কেন, তার কোনো পরওয়াই করবে না এবং মানুষ জীবনের কল্যাণের যতো পথই দেখাক না কেন, কোনো অবস্থাতেই মানব রচিত কোনো পথ বা আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মানুষের তৈরী কোনো বিধান গ্রহণ করবে না। এরপর তারা পথ চলবে নির্ভয় এবং এ সকল প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং এসব কাজ করতে গিয়ে যতো বাধা বিপত্তি আসবে, তা অতিক্রম করার জন্যে হবে তারা বদ্ধপরিকর এবং যা কিছু সংকট সমস্যা দেখা দেবে, অবিচলিতভাবে সেগুলো সহ্য করে যাবে। আর ততদিন তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর সাহায্যের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকবে, যতো দিন না তিনি নিজ ইচ্ছায় তাঁর নিয়ম চালু করার সুয়োগ করে দেন। এজন্যে এরশাদ হচ্ছে,

'অতএব (হে নবী), যেভাবে নির্দেশ তোমাকে দেয়া হয়েছে সেভাবে (সত্যের উপর) প্রতিষ্ঠিত থাকো। আর যারা অন্য সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর দিকে রুজু করার জন্যে তোমার সাথে যোগ দিয়েছে। আর খবরদার (কোনো বিষয়েই) সীমা অতিক্রম করো না.........এবং ধৈর্য ধরো, (অবিচল থাকো সর্বাবস্থায়)। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কিছুতেই ইহসানকারীদের পুরস্কারকে নষ্ট করেন না।' (আয়াত ১১২-১১৫)

ওপরের আয়াতে যে নির্দেশ দেখা যাচ্ছে, তা সমভাবে রসুল (স.) ও সেই সকল মোমেনের জন্যে প্রযোজ্য যারা তাঁর মিশনে তাঁর সাথে যোগ দিয়েছে।

'অতএব মযবুত হয়ে থাকো সেই নির্দেশ পালনে, যা তোমাকে দেয়া হয়েছে।' ....একথাটা রসূল (স.)-এর হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। যখন নবী (স.) আল্লাহর ভয় ও তাঁর শক্তি নিজ অন্তরের মধ্যে অনুভব করেন, তখন তাঁর মধ্যে আরো বেশী দৃঢ়তা আসে, এমনকি এ বিষয়ে তাঁর সম্পর্কে একটা বর্ণনা পাওয়া যায়, তিনি হূদ কওমের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, 'হূদ (জাতি) আমার চুল পাকিয়ে দিয়েছে।' সুতরাং, 'সব কিছুর ব্যাপারে ভারসাম্য বজায় রাখা এবং দ্বীন ইসলামের দেয়া (সঠিক) পথে চলা, কোনো হুকুম মানতে অস্বীকার বা গাফলতি না করা, অর্থাৎ আল্লাহর যাবতীয় বিধান মানার উদ্দেশ্যে সদা সর্বদা জাগ্রত থাকা ও আল্লাহর সীমার মধ্যে টিকে থাকার জন্যে সদা সর্বদা খেয়াল রাখা– আবেগ বা উত্তেজনার বশে মানুষ কখনও কখনও সঠিক আচার আচরণ থেকে এদিক-ওদিক হয়ে যাওয়ার উপক্রম করে, সে অবস্থায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা– এভাবে জীবনের সকল কাজ, কথা, চিন্তা চেতনায় আবেগ দ্বারা চালিত না হয়ে হিসাব করে চলার নামই হচ্ছে দৃঢ়তা অবলম্বন করা।

হাঁ, মানুষের ছোটো খাটো ত্রুটি বিচ্যুতি ও ভাবপ্রবণতা সর্বদাই কিছু না কিছু হতেই থাকে, যার দিকে ইংগিত দিয়ে এখানে হুশিয়ারী দান করা হচ্ছে যেন তারা যে কোনো কাজে দৃঢ়তা অবলম্বন করে। ত্রুটি বিচ্যুতি, কর্তব্য পালনে ঢিলেমি একেবারে শেষ হয়ে যাবে এমন নয়, কিন্তু যে সব বিষয়ে চূড়ান্তভাবে ঘোষনা করা হয়েছে তা হচ্ছে বিদ্রোহাত্মক ও সীমা ছাড়া কাজ করা, আর বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে চলা ও যুক্তি সংগত কাজ করা– এসব বড় বড় ব্যাপারে সতর্ক থাকার নামই হচ্ছে 'ইস্তেকামাত' বা দৃঢ়তা অবলম্বন করা। এর দ্বারা জীবন সহজ হয়ে যায় এবং সংকট সমস্যা দূর হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনকে (আনুগত্যকে) ঠিক সেভাবে দেখতে চান যেমন করে তিনি নাযিল করেছেন এবং তিনি চান মানুষ বাড়াবাড়ি না করে তাঁর আনুগত্যে মযবুত হয়ে থাকুক। আল্লাহর নির্দেশের মধ্যে কিছু বাড়িয়ে দেয়া অথবা কমিয়ে দেয়ার অভ্যাসই এ দ্বীনকে তাঁর নিজ প্রকৃতি থেকে বের করে দেয়। এ মযবুতী (দৃঢ়তা) হচ্ছে মহা মূল্যবান জিনিস এবং আল্লাহর পথে মযবুতভাবে টিকে থাকার জন্যে দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে পুরোপুরি মনোযোগী হওয়া। বাড়াবাড়ি করা বা নিজ ইচ্ছা মতো কোনো বিষয়ে উদাসীনতা দেখানো দ্বারা উভয় অবস্থাতেই আসলে দ্বীন ইসলামকে উপেক্ষা করা হয়।

'নিশ্চয়ই যা কিছু তোমরা করছো, সব কিছুই তিনি দেখছেন।'

'বাসারু' শব্দটি দ্বারা বুঝায় দেখা, অনুভব করা, বুঝা, হৃদয়ংগম করা। এ শব্দটি 'বাসীরাত' থেকে আসছে, যার অর্থ হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখা। এ ক্ষেত্রে এ শব্দটাই উপযোগী, যার দ্বারা বুঝায় অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে যে কোনো জিনিসকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন দেখেন। সুতরাং হে রসূল, সেই দ্বীনের উপর তুমি দৃঢ়ভাবে টিকে থাকো যার নির্দেশ তোমাকে দেয়া হয়েছে। আর যারা তোমার সাথে, অন্যায় অবিচারের জীবন পথ থেকে সত্য সুন্দর জীবন ব্যবস্থার দিকে ফিরে এসেছে।

'আর সাবধান, তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না, যারা যুলুম করেছে (যদি তা করো) তাহলে তোমাদেরকে পাকড়াও করে নেবে আগুনে।'

অর্থাৎ যালেমদের দিকে, হঠকারী বিদ্রোহী অত্যাচারীদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না। পৃথিবীতে যারা শক্তিমান হয়ে রয়েছে, কারণ ওরাই তো শক্তির দাপট দেখিয়ে আল্লাহর বান্দাদের ওপর জবরদস্তি করে, যুলুম অত্যাচার করে, ওদের নিষ্পেষণে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে রয়েছে। তারা আল্লাহর বান্দাকে গায়রুল্লাহর বন্দেগীতে আবদ্ধ করতে চায় এবং আল্লাহর হুকুমের বাইরে অন্যের হুকুম মানতে বাধ্য করে। খবরদার, ওইসব যালেমের দিকে কোনোভাবেই ঝুঁকে পড়ো না। কারণ, তাদের দিকে তোমাদের এ ঝুঁকে পড়ার অর্থ হচ্ছে সেই বিরাট অন্যায়কে স্বীকার করে নেয়া ও প্রকারান্তরে সেই অন্যায়কে সমর্থন করা, যা ওরা নিয়ত করে চলেছে। পরক্ষোভাবে এতে ওই মহা অন্যায়কে মেনে নিয়ে এর গোনাহের বোঝা তোলার কাজে নিজেকে অংশীদার বানিয়ে নেয়া বুঝায়।

'এর ফলে তোমাদেরকে পাকড়াও করবে কঠিন আগুনে।'

এটাই হবে সঠিক কাজ থেকে ফিরে যাওয়ার প্রতিফল।

'অথচ তোমাদের জন্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো দরদী বন্ধু বা অভিভাবক নেই। (এমনটি করলে তারপর তোমাদেরকে আর কোনো সাহায্য করা হবে না।'

অবশ্য এসব দুর্বলতার সময় দৃঢ়তা অবলম্বন করা বড়ই কঠিন কাজ। এর জন্যে এমন কিছু পাথেয় প্রয়োজন, যা তাকে সাহায্য করতে পারে। আর আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজে তাঁর রসূলকে পথ দেখিয়েছেন এবং তাঁর সংগী অল্প কিছু সংখ্যক মোমেনের দ্বারা পাথেয় সরবরাহ করেছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'নামায কায়েম করো দিনের দুইভাগে এবং রাতের প্রান্ত ভাগসমূহে।'

অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, অন্য সব পাথেয় শেষ হয়ে গেলেও তাঁর সাহায্যের এ পাথেয়টা বাকি থেকে যাবে। আর তিনিই আত্মিক ভিত্তিকে দাঁড় করিয়ে রাখবেন এবং অন্তরসমূহকে কঠিন, সংকটপূর্ণ ও কষ্টকর হক পথে টিকিয়ে রাখবেন। এটা আল্লাহর ওয়াদা, আর অবশ্যই তিনি এ ওয়াদা পূরণ করবেন, যেহেতু এ সকল নেক হৃদয়গুলো আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের পরশ পেয়েছে, যিনি সর্বদাই কাছে আছেন, অতি কাছে, যিনি তাঁর নিবেদিতপ্রাণ বান্দাদের বিনীত প্রার্থনায়, সাড়া দেয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছেন, তিনি শত্রু পরিবেষ্টিত জাহেলিয়াতের ভয়াবহ দুঃখ, ভয় ভীতি ও আত্মীয় পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তাদের ওপর স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিচ্ছেন নিশিদিন।

দেখুন, এখানে আয়াতে দিনের প্রান্তদ্বয়ের কথা উল্লেখিত হয়েছে, অর্থাৎ প্রথম ও শেষ প্রান্ত।

'আর রাতের নিকটবর্তী অংশগুলোতে'– এর দ্বারা দুই-এর অধিক নামায হওয়ার দিকে ইংগিত করা হয়েছে, যদিও সংখ্যা বলা হয়নি। নামাযের ওয়াক্তের সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে রসূল (স.) কর্তৃক প্রচলন করা পদ্ধতি অনুসারে, যার বিবরণ নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে জানা যায়। এর সময়গুলো রসূল (স.)-ই ঠিক করে দিয়েছেন।

আর কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে নামায কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ নামায পূর্ণাংগভাবে এবং যথাযথভাবে আদায় করতে হবে, যাতে করে সৎ কাজগুলো অন্যায় কাজগুলো মুছে দিতে পারে। কোরআনের এ আয়াতের হুকুম সকল নেক কাজের জন্যে প্রযোজ্য। আর নামায সকল নেক কাজের সেরা নেক কাজ এবং প্রথম নেক কাজ, যা অপর নেক কাজের দুয়ার খুলে দেয় বটে, তাই বলে নামায পড়ার কারণে সকল মন্দ কাজ আপনা থেকেই দূর হয়ে যাবে এমন নয়, যেমন কোনো কোনো তাফসীরকারক এভাবে মনে করেন এবং তাঁদের দলীল পেশ করতে গিয়ে তাঁরা নীচের আয়াতাংশ তুলে ধরেন।

'এটা উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্যে এক মূল্যবান উপদেশ।'

অতএব, (বুঝা যায়) মূলত এটা এক উপদেশ বিশেষ এবং এ কারণেই এর মধ্যে স্মরণ করতে থাকার জন্যে আবেদন করা হচ্ছে এবং নামাযের মাধ্যমে যে ভালো প্রেরণা পাওয়া যায়, তাকে বাস্তব জীবনে কাজে লাগানোর জন্যেও বলা হচ্ছে,

'ইস্তেকামাত'-দৃঢ়তা সবর করার দিকে, যা সর্বাবস্থায় মানুষকে অবিচল থাকতে এগিয়ে দেয়, যেমন অস্বীকারকারীদের জন্যে আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী শাস্তির কথা নাযিল হওয়ার অপেক্ষা করার জন্যেও সবরের প্রয়োজন। অর্থাৎ ধৈর্য না থাকলে এবং শাস্তি নাযিলের দোয়া করলেই যে সংগে সংগে ইসলামের দুশমনদের ওপর আযাব নাযিল হয়ে যাবে, তা কখনো হবে না, যেহেতু এটা পরম করুণাময় আল্লাহর নিয়ম নয়। এজন্যে ধৈর্য অবলম্বন করার জন্যে এখানে এবং পেছনে অনেক আয়াতের মাধ্যমে আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে,

'সবর করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এহসানকারীদের পুরস্কারকে নষ্ট করে দেন না।'

দৃঢ়তা অবলম্বন করা– এটাও এক প্রকার এহসান, সময় মতো নামায পড়াও একটা এহসান এবং নবীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্যে যে ষড়যন্ত্র করা হয়, তা প্রতিহত করার জন্যে সবর করা ও এক প্রকার এহসান ....এ কারণেই বলা হয়েছে আল্লাহ তায়ালা সবরকারীদের পুরস্কারকে নষ্ট করেন না।

সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব

এরপর আলোচনা প্রসংগ আবার ফিরে আসছে। বলা হচ্ছে, পেছনের বহু যুগের মানুষেরা অন্যায় পথে টিকে থাকার জন্যে যে নানা প্রকার ষড়যন্ত্রের জাল বুনা হয়েছিলো এবং এখনও যারা নানা প্রকার তৎপরতা চালাচ্ছে সে বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেয়া যায় এবং তাদেরকে কিভাবে শায়েস্তা করা যায়, সে বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। অতপর গোপন চোখের ইশারা দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, আজকের যুগে যদি পূর্বেকার কেউ উপস্থিত থাকতো, তাহলে তারা আল্লাহর কাছে কল্যাণ লাভ করার আশায় প্রতিযোগিতা করতো, পৃথিবীতে অশান্তি ও বিশৃংখলা ছড়ানো থেকে তারা বিরত থাকতো এবং অতীতের লোকেরা যে যুলুম করার কারণে তাদের ওপর আযাব নাযিল হয়েছিলো, সেভাবে কাউকে যুলুম করতে দেখলে তারা অবশ্যই তাদেরকে দমন করতো। কারণ তারা পরবর্তীকালের ঘটনাবলীকে সামনে রেখে অবশ্যই বুঝতে পারতো যে, আল্লাহ তায়ালা ওই জনপদকে নিঃশেষে বিলীন করে দেন না, যাদের মধ্যে কিছু ভালো লোক আছে। অর্থাৎ কোনো জনপদে সংস্কারপ্রিয় লোকদের হাতে অন্যায় কাজ দমন করার মতো ক্ষমতা যদি থাকে, আর তারা যদি সে ক্ষমতার সদ্ব্যবহার না করে এবং অন্যায় কাজ দমন না করে বা দমন করার চেষ্টা না করে, তাহলে তাদের ওপর অবশ্যই আযাব নাযিল হয়। কিন্তু যখন তারা এতোই দুর্বল হয়ে পড়লো যে, অন্যায় অত্যাচার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেললো, সে অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বাঁচিয়ে নিলেন এবং বাকিদেরকে ধ্বংস করে দিলেন। ওদের মধ্যে সম্পদশালী লোকই বেশী ছিলো, বাকি যারা ছিলো তারা ওদের দাপটের কারণে অনিচ্ছা সত্তেও ওদের আনুগত্য করতো। এজন্যে এসব যালেমকে নিয়েই আল্লাহ তায়ালা ওই সব এলাকাকে ধ্বংস করে দিলেন।

'কেন এমন হলো না যে, তোমাদের পূর্বে যারা বুদ্ধিমান ছিলো, তারা পৃথিবীতে অন্যায় অত্যাচারের পথ রোধ করার জন্যে কিছু না কিছু চেষ্টা করতো।........... আর তোমার রব সেসব এলাকাকে কখনো সামগ্রিকভাবে ধ্বংস করে দেবেন না, যতো দিন তার অধিবাসীরা সংশোধনবাদী থাকবে।

আর এ ইশারাটাই আল্লাহর নিয়মাবলীর মধ্য থেকে একটা নিয়মকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। অতএব, যে উম্মতটার ওপর আল্লাহ ছাড়া মানুষের গোলামী করার কারণে অশান্তি এসে পড়েছিলো, তারপর ওই ফাসাদকে রোধ করার জন্যে একটা দল যখন রুখে দাঁড়ালো, তখন সেই দলটা ওই আযাব থেকে বেঁচে গেলো। আল্লাহ তায়ালা সেই দলটাকে আযাব ও ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই দিলেন। আর যারা যালেমদের সাথে জড়িত থেকে নিজেরাও যুলুম করেছিলো এবং অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করার কাজে অংশ নিয়েছিলো, যুলুম ও বিশৃঙ্খলা বন্ধ করার জন্যে কোনো উদ্যোগ নেয়নি, অথবা তারা এসব অন্যায় কাজকে অপছন্দ করেছে ঠিক, কিন্তু অন্যায় ও অশান্তিকর কাজ বন্ধ করার জন্যে কোনো সক্রিয় ভূমিকা পালন করেনি, অথবা যালেমদের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতেও সমর্থ হয়নি, আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী তাদের ওপরও আযাব নাযিল

হয়ে গেছে। কখনও তাদের মূলোৎপাটিত করা হয়েছে, কখনো তাদের একতাকে ধ্বংস করা হয়েছে, যার ফলে তারা পরস্পর বিরোধী তৎপরতায় ধ্বংসের কিনারায় পৌঁছে গেছে, আবার কখনও তারা নানা প্রকার অশান্তির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

অতপর তারা এক আল্লাহর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব (রবুবিয়্যাত) প্রতিষ্ঠার জন্যে আন্দোলন শুরু করেছে, পৃথিবীকে অশান্তি ও বিশৃংখলা থেকে মুক্ত রাখতে তৎপর থেকেছে এবং আল্লাহর আইন মেনে চলার বিরোধিতা করেছে। তারা নিরাপত্তা লাভ করেছে এবং গোটা জাতির জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে। এভাবে সত্যের সংগ্রামে আত্মনিয়োগকারী ও আল্লাহর প্রভুত্বকে কায়েমের সংগ্রামে নিয়োযিত ব্যক্তিদেরকে প্রতিদান দেয়া হয়েছে এবং যারা আল্লাহর যমীনে তাঁর রবুবিয়্যাত কায়েমের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, নিজেরাও যে কোনোভাবে যুলুম ও অশান্তিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, তারা তাদের রব-এর পক্ষ থেকে দেয়া কর্তব্য পালন করেনি, তাঁর প্রেরিত জীবন ব্যবস্থাকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দেয়নি, তারা প্রকৃত অর্থে দ্বীন থেকে সরে গেছে, যার ফলে তাদের ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়েছে। তাদেরকে নাকে দড়ি দিয়ে অন্যরা ঘুরিয়েছে এবং পরে তাদেরকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

মতভেদে লিপ্ত হওয়া

পরিশেষে শেষ বারের মতো সতর্ক করা হয়েছে, যেন মতভেদ করে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে তারা যেন সাবধান থাকে এবং এভাবে গোমরাহী থেকে বেঁচে যায়। এখানে মানুষকে আহ্বান জানানো হয়েছে আল্লাহর দৃঢ় নিয়ম সম্পর্কে চিন্তা করতে, যার দ্বারা তিনি পৃথিবীর সৃষ্টিকে পরিচালনা করেন। এরশাদ করেন,

'আল্লাহ তায়ালা চাইলে গোটা মানবমন্ডলীকে এক জাতিতে পরিণত করে দিতে পারতেন, অথচ তারা সবসময়ই মতভেদে লিপ্ত থেকেছে, তবে যার প্রতি তোমার রব রহম করেছেন, তার কথা ভিন্ন। আর এ জন্যেই তো তাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন (যে তারা দ্বীনের ওপর সঠিকভাবে টিকে থাকবে) তোদের এই আচরণের দ্বারা তোমার রবের কথা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, (যে) অবশ্যই আমি জাহান্নামকে ভরে দেবো জ্বিন ও মানুষ সবার দ্বারা।'

আল্লাহ তায়ালা চাইলে তিনি অবশ্যই সকল মানুষকে একই মন মগয ও রীতি নীতি দিয়ে পয়দা করতেন, তাদের যোগ্যতাও একই বানিয়ে দিতে পারতেন..... বারবার তারা বিলীন হয়ে গেলেও তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য বা শ্রেণী বিভাগ থাকতো না। কিন্তু এ ধরার বুকে যে সৃষ্টজীবের আসাকে আল্লাহ তায়ালা পূর্ব নির্ধারিত করে রেখেছিলেন এবং মানব সৃষ্টির যে প্রকৃতি তিনি বানিয়ে দিয়েছেন তাকে দিয়েছেন পৃথিবীতে খেলাফাতের দায়িত্ব– তার জন্যেই তিনি এ বিভিন্নতা দূর করে সবাইকে তিনি একই মন-মেযাজের বানিয়ে দেননি এক বিশেষ উদ্দেশ্যের কারণে।

আর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এ সৃষ্টিকে বিভিন্ন প্রকারের বানাতে চেয়েছেন এবং তাদেরকে তিনি তাদের জীবনের গতিপথ নির্ধারণের জন্যে পৃথক পৃথক কর্ম ক্ষমতাও দিতে চেয়েছেন। তাদের তিনি নিজ নিজ পছন্দ মতো পথ ও পদ্ধতি বেছে নেয়ার স্বাধীন ক্ষমতা ও অধিকার দিয়েছেন এবং এই এখতিয়ার অনুসারে চলতে গিয়ে, সঠিক বা বে-ঠিক যে কোনোটা গ্রহণ করার স্বাধীনতা তিনি তাদের দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহর নিয়ম তাঁর সৃষ্টির মধ্যে চালু হয়ে গেছে এবং সর্বত্র তাঁর ইচ্ছা কার্যকর রয়েছে। এখন যে হেদায়াতের পথ বেছে নেবে, আর যে গোমরাহীর পথ বেছে নেবে, তারা একইভাবে আল্লাহর নিয়মের মধ্যে রয়েছে এবং তাদেরকে যে এখতিয়ার দেয়া

হয়েছে সেই অনুসারে যে কোনো পথ তারা বাছাই করে নিয়েছে এবং এর ফল স্বরূপ তারা তাদের বাছাই করা পথের উপযুক্ত পরিণতিও লাভ করবে।

আল্লাহ তায়ালা নিজেই চেয়েছেন যে মানুষ এক জাতি না হয়ে থাকুক। আর এ কারণেই তাদের মধ্যে মতবিরোধ থাকা এবং বিভিন্ন দলে তাদের বিভক্ত হয়ে থাকা প্রয়োজন। আর এ মতভেদ সাধারণ আকীদা নিয়েই হবে, তবে যাদেরকে আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দান করা হয়েছে, তারাই হচ্ছে সেই সব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যারা সত্যের দিকে এগিয়ে গেছে– পেয়ে গেছে আল্লাহর সত্য সঠিক পথ। আর অবশ্যই একথা সত্য যে, সত্য সঠিক পথ মোটেই বিভিন্ন নয়। অতএব, সত্য পথের যাত্রীরা এপথের ব্যাপারে বরাবরই একমত হতে পেরেছে। তারা কোনো দিন কোনো ভুলের সাথে আপোস করেনি এবং পথভ্রষ্ট মানুষের সাথে তারা যে দ্বিমত পোষণ করে, তার অর্থ অবশ্যই এটা নয় যে, একমত এক পথের পথিকরাও পরস্পর জটিল মতভেদে লিপ্ত হবে।

এর যে বিপরীত কথাটা আল কোরআন থেকে জানা যায়, তা হচ্ছে,

'তোমার রব-এর কথা চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে গেছে (যে) আমি জিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করে দেবো।'

এ আয়াতাংশে বুঝা যাচ্ছে যে, যারা সত্য পথ পেয়েছে এবং আল্লাহর রহমত লাভ করে যারা ধন্য হয়েছে, তাদের আর একটা আশ্রয়স্থল আছে এবং তা হচ্ছে জান্নাত, যাকে পরিপূর্ণ করা হবে নেক লোকদের দ্বারা– যেমন করে পরিপূর্ণ করা হবে জাহান্নামকে পথভ্রষ্ট লোকদের দ্বারা। যারা বরাবরই হকপন্থীদের সাথে মতভেদ করতে থাকবে এবং সব কিছুতে তারা হবে ভিন্ন প্রকৃতির। আর একটা বড় সত্য হচ্ছে, এ বাতেল পন্থীরা হবে বিভিন্ন প্রকারের এবং বহু পথের পথিক!

আর সর্বশেষে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে, পেছনের সকল কাহিনীর সাথে মোমেনদের বৈশিষ্ট্যের কিছু যোগ আছে। যারা ঈমান আনে না তাদেরকে চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দেয়া দরকার যে, মোমেনদের সাথে তাদের পার্থক্য থাকবেই এবং কোনো দিন এ দুই পক্ষ এক হতে পারবে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা নির্দেশের ব্যাপারে তাদের মধ্যে অবশ্য মতভেদ আসতেই হবে। এরপর বলা হচ্ছে, মোমেনদের কর্তব্য হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করা এবং তাঁরই ওপরে সকল ব্যাপারে ভরসা করা, আর যা তারা করছে সেদিকে গোটা জাতিকে আহ্বান জানাতে থাকা। এ বিষয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'আর আমি রসূলদের সকল খবর তোমাকে জানাচ্ছি, যার দ্বারা তোমার অন্তরকে মযবুত বানাতে যাই .... তোমরা যা কিছু করছো, সে বিষয়ে তোমার রব মোটেই উদাসীন নন।'

অর্থাৎ, রসূল (স.)-কে উপেক্ষা করায় এবং তাঁর শিক্ষাকে বিদ্রূপ করায় তিনি তাঁর জাতির কাছ থেকে যে কষ্ট পাচ্ছিলেন, তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা অতীতের ঘটনাবলী তাঁর কাছে পেশ করে তাঁকে সান্তনা দিচ্ছেন এবং তাঁকে তাঁর রবের নির্দেশিত পথে টিকে থাকার জন্যে প্রস্তুত করছেন, যেন তিনি সকল পরিস্থিতিতে অবিচল, মযবুত ও নিশ্চিন্ত হতে পারেন। জানাচ্ছেন,

'রসূলদের সকল খবরই আমি তোমার কাছে বনর্ণা করছি, যার দ্বারা আমি তোমার অন্তরকে প্রশান্ত করতে চাই।'

'আর এ কাহিনীর মাঝে যে শিক্ষা রয়েছে তা তোমার কাছে এসে গেছে।'

অর্থাৎ অতীতের জাতিসমূহের ঘটনাবলী তোমার কাছে পেশ করে তোমাকে নসীহত করা হচ্ছে এবং আল্লাহর নিয়ম নীতি ও বিধি নিষেধগুলো তোমাকে জানিয়ে তোমার কর্তব্যসমূহ স্মরণ করানো হচ্ছে।

সুতরাং এর পরও যারা ঈমান আনবে না, সদুপদেশ তাদের কোনো কাজে লাগবে না এবং কোনো ভাল কথা তারা স্মরণেও রাখবে না-এটাই হচ্ছে পরম ও চরম সত্য কথা। এর দ্বারা সত্য মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেয়া হল। এরশাদ হচ্ছে,

'আর, যারা ঈমান আনছে না, তোমরা তোমাদের জায়গায় থেকে (যা খুশী তাই) করো। আমিও (যা করার তাই) করবো। আর (সেই চরম পরিণতির), অপেক্ষা করো আমিও অপেক্ষমাণ রইলাম (সেই দিনটি আসার)!

অর্থাৎ এ সূরার মধ্যে যাদের ঘটনাবলী ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে তোমার এক ভাই যেমন করে তার জাতিকে বলেছিলো তারপর (ওদের একথায় কর্ণপাত না করায়) সে তাদেরকে দুনিয়ায় ভোগ বিলাস করার জন্যে ছেড়ে দিয়েছে ....সে ছেড়ে দিয়েছে তাদেরকে আল্লাহর সেই গায়েবী আযাবে পতিত হওয়ার জন্যে– যার অপেক্ষা তারা করছিলো।

'আর আল্লাহ তায়ালাই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর গায়েবী রহস্যের মালিক।' অর্থাৎ সকল বিষয়ই আল্লাহর হাতে রয়েছে– রয়েছে তোমার বিষয় এবং মোমেনদের সকল বিষয়ও, তাদের বিষয়ও রয়েছে সর্বশক্তিমান আল্লাহর হাতে, যারা ঈমান আনে না। আর এ মহা সৃষ্টির মধ্যে দৃশ্য অদৃশ্য যা কিছু বর্তমান আছে আর যা কিছু ভবিষ্যতে হবে, সে সব বিষয়ও একমাত্র তাঁর হাতেই রয়েছে। তিনিই সব কিছুর মালিক এবং সবকিছু নিশিদিন তাঁরই পরিচালনায় সংঘটিত হয়ে চলেছে।

'অতএব, নিরংকুশভাবে একমাত্র তাঁর আনুগত্য করো।'

অর্থাৎ নিশর্ত ও সার্বিক আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য একমাত্র তিনি, আর একমাত্র তাঁর আইনই মানার যোগ্য।

'আর তাওয়াককুল করো তাঁর ওপরেই।'

অর্থাৎ একমাত্র তিনিই অভিভাবক এবং তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী। ভালো মন্দ যা কিছু তোমরা করছো, সে সবই তিনি জানেন। আর কিছুতেই তিনি কারো কোনো প্রাপ্য পুরস্কারকে নষ্ট করবেন না।

'আর তোমরা যা কিছু করছো তোমরা তোমার রব সে সম্পর্কে বে-খবর নন।'

এভাবে এ সূরাটির মর্মার্থ ও ব্যাখ্যার পরিসমাপ্তি ঘটছে, এটি শুরু হয়েছিলো এ কথা দিয়ে যে, আনুগত্য পাওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর, তাওবা করতে হবে একমাত্র তাঁর কাছেই, রুজু করতে হবে একমাত্র তাঁর দিকেই এবং অবশেষে জীবনের সফর শেষে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। একমাত্র তাঁর দিকেই সব ব্যাপারে ঝুঁকে থাকার কথা দিয়ে এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে, অন্তরের গভীরে, যুগযুগান্তর ধরে এবং নশ্বর এ জীবনের সফর শেষে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে সেই সব কথা দিয়েই সূরাটি শেষ করা হচ্ছে।

এভাবে দেখা যায় সূরাটির বর্ণনাধারায় শুরু ও শেষের সাথে এক চমৎকার ধারাবাহিকতা এবং আলোচ্য বিষয়াদির মধ্যে পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য এক সম্পর্ক রয়েছে। দেখা যায় বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মধ্যে এমন এক যোগসূত্র, যাতে বুঝা যায়, সব কিছুর মূল সূত্র,উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই। আরো জানা যায়, সব কিছুর মধ্যে যে সুর ধ্বনিত হচ্ছে, কাজ করছে একই চিন্তা ও চেতনা এবং রসূলের শিক্ষা একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছে সকল নবীর দাওয়াত। এর চূড়ান্ত রূপ ফুটে উঠেছে এসব কিছুর অতি চিত্তাকর্ষক এক ধারা বিবরণী আল কোরআনুল করীমে– পেশ করা হয়েছে। এ কেতাব যদি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো দ্বারা রচিত হতো, তাহলে এর মধ্যে

বর্ণিত ঘটনা পরম্পরার মধ্যে এমন সুন্দর সম্বন্ধ, এমন প্রাসংগিক আলোচনা এবং পারস্পরিক এমন মর্মস্পর্শী যোগ-সূত্রে আবদ্ধ কথার গাঁথুনি পাওয়া সম্ভব হতো না, বরং সব কিছুর মধ্যে খাপ ছাড়া ভাব, অপ্রাসংগিকতা এবং বহু মতান্তর পরিলক্ষিত হতো।

এরপর শেষ করতে গিয়েও শেষ হতে চায় না যে কথা, তা হচ্ছে, সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে গোটা সূরার বর্ণনাধারার মধ্যে দেখা যায় সকল মক্কী সূরার মধ্যে এক চমৎকার সুর, একই খাতে, একই উদ্দেশ্যে, একই মর্মকথা, একইভাবে মানুষকে দৃঢ়বদ্ধ রাখার লক্ষ্যে ভাষার জস্বিতা, যা গভীরভাবে হৃদয়েতে প্রভাব ফেলে, সকল মক্কী সূরার মধ্যে আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েমের মূল কথাটি ঝংকৃত হচ্ছে, যাকে কেন্দ্র করে সকল কথা আবর্তিত হয়েছে, সে দিকেই সকল বর্ণনার গতি চালিত হয়েছে। যতো মত ও পথের আলোচনা হয়েছে সব কিছুর গতি যে একই দিকে, তা সকল বর্ণনার মধ্যে ভাস্বর হয়ে রয়েছে ....জীবনের সব কিছু নিয়ন্ত্রণকারী যে পরিচালিকাশক্তি তাই হচ্ছে অন্তরের গভীরে প্রোথিত তাওহীদী বিশ্বাস, যাকে কেন্দ্র করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সব কিছু .... আসলে অন্তরের গভীরে উপস্থিত আকীদাই হচ্ছে সেই মধ্যবিন্দু, যাকে ঘিরে চলছে গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দেয়া জীবন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার বর্ণনা কোনো জায়গায় দেয়া হয়েছে সংক্ষেপে, আবার কোনো জায়গায় এসেছে এমন বিস্তারিতভাবে, যা পাঠ করলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। মন প্রশান্ত হয় এবং পরম তৃপ্তিতে দেহ প্রাণ ভরে যায় ....।

আলোচ্য সূরার ওপর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করতে গিয়ে আমি উক্ত রেখা ও বৃত্তের ওপরই অবস্থান করার প্রযোজনীয়তা অনুভব করছি– যা সূরার অভ্যন্তরে এসে স্পষ্ট হয়ে গেছে– যদিও আমি ইতিপূর্বে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি, তথাপি আমি সর্বশেষ পর্যালোচনার বিভিন্ন অংশের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এখানে গুরুত্ব সহকারে এ মন্তব্য পুনরায় বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

প্রথম ও প্রধান সত্য বস্তু যা গোটা সূরাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেট সূরার ভূমিকাতেও আলোচিত হয়েছে। সেখানে কোরআনে হাকীমের নির্যাস বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ আল কোরআনকে দিয়ে মোহাম্মদ (স.)-কে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। অথবা এটা ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনার মাঝে হয়েছে যা ইতিহাস ব্যাপী ইসলামী আকীদার আন্দোলনের রেখা বাতলে দেয়। কিংবা এটা সমাপনী পর্যালোচনার মাধ্যমেও প্রকাশ পেতে পারে, যেখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রসূলকে বিভিন্ন ঘটনা এবং মহাগ্রন্থ আল কোরআনের নির্যাস থেকে চয়নকৃত ফলাফলের মাধ্যমে মোশরেকদের মুখোমুখি হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর এবাদাত করার নির্দেশ এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাবুদের গোলামী করাকে নিষেধ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা, এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করা যে, ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান এবং পূর্বে বর্ণিত মূলনীতির ভিত্তিতে অংগীকার ও ভীতিপ্রদর্শন, হিসাব নিকাশ, প্রতিদান, পাপ পুণ্য ও শাস্তি প্রতিষ্ঠিত করা। এ সম্পর্কে আলোচ্য সূরার সূচনা এবং এর তাফসীর করতে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে আমি কিছু কিছু বর্ণনা করেছি।

এবার আমি এখানে উপরোক্ত সত্য বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে কোরআনী বিধানের পথ উপস্থাপন করছি।

এক আল্লাহর এবাদাতের বিষয়টি আলোচ্য সূরার দু'টি স্থানে এভাবে এসেছে, 'হে আমার কওমের লোকেরা, একামত্র আল্লাহর গোলামী করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।' অন্যত্র এভাবে এসেছে, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোর গোলামী করবে না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে সতর্ককারী এবং সুসংবাদ দাতা।'

উল্লেখিত দু'টি বাক্যের ভিন্নতা স্পষ্ট। তন্মধ্যে একটি আদেশ, অপরটি নিষেধ। যদি প্রশ্ন করা হয়, এ দু' বাক্যের রূপের ভিন্নতা সত্তেও কি উভয়ের মর্মার্থ এক? জবাবে বলা হবে, প্রথম বাক্যে আল্লাহর এবাদাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া এবাদাতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। দ্বিতীয় বাক্যে এক আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো মাবুদের এবাদাত করা থেকে বারণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বাক্যের ভাব ও অর্থটি প্রথম বাক্যের অর্থেরই দাবী। প্রথম বাক্যে বিষয়টি সরাসরি আলোচিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় বাক্যে প্রথম বাক্যের বক্তব্যটি আকারে ইংগিতে বুঝা গেছে। এ মহাসত্য বস্তুটি বর্ণনার ক্ষেত্রে আল্লাহর হেকমতের দাবী হচ্ছে, এক আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো গোলামী না করার নির্দেশটি। যা প্রথম বাক্যে আকারে ইংগিতে বুঝা যায়, তার ওপর যথেষ্ট না করা বরং এ নিষেধটি সরাসরি শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা, যদিও এ নিষেধটি প্রথম বাক্যেই অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং তাঁর মাধ্যমে আকার ইংগিতে ও তা বুঝা গিয়েছিলো।

নিসন্দেহে উপরোক্ত আলোচনা এ মহাসত্যের আল্লাহর কাছে তার ওযনের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। এর দাবী হচ্ছে, শুধু আল্লাহর এবাদাতের নির্দেশ এবং 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই' এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে যে বিষয়টি আকার ইংগিতে বুঝা যায় তার ওপরই নির্ভর করা যাবে না, বরং এ ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহর এবাদাত না করার ওপর সরাসরি নিষেধ ও উচ্চারিত হতে হবে। তাই আদেশের পাশাপাশি নিষেধেরও উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে এ মহাসত্য বিষয়টির দু'টি অংশ— 'আল্লাহর এবাদাত করা এবং তিনি ছাড়া অন্য কারো গোলামী না করা'-কে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে কোরআনী বিধান যে জ্ঞান আমাদেরকে উপহার দিচ্ছে তা হচ্ছে, মানুষ এ দু'টি অংশের ওপর কোরআনের অকাট্য ভাষ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সাথে সাথে সে আল্লাহর এবাদাতের নির্দেশ এবং 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই' এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে রাযী নয়, বরং গায়রুল্লাহর এবাদাত না করা সম্বলিত স্পষ্ট নিষেধের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে। এটা এজন্যেই যে, কালের চক্রে মানুষ এমন অবস্থায় উপনীত হবে, যখন তারা আল্লাহকে অস্বীকার করবে না এবং তাঁর এবাদাতকে বর্জন করবে না, কিন্তু তাঁর সাথে গায়রুল্লাহরও এবাদাত করে বসবে। এর মাধ্যমে তারা শেরেকে নিমজ্জিত হবে। যদিও তাদের ধারণা থাকবে তারা খাঁটি মুসলমান।

এ কারণেই কোরআনে হাকীম আদেশ এবং নিষেধ উভয়ের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, এ আদেশ ও নিষেধের একটি অপরটিকে জোরদার করে। যার ফলে শেরেক অনুপ্রবেশ করার সামান্যতম সুযোগও অবশিষ্ট থাকবে না।

এ ধরনের বর্ণনাভংগি আলোচ্য সূরা এবং কোরআনে হাকীমের অন্যান্য সূরায় ভূরি ভূরি রয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হলো। (আয়াত ১-২, ২৫-২৬, ৫০)

'আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা দুই মাবুদ গ্রহণ করো না, মাবুদ তো মাত্র একজনই। অতএব আমাকেই ভয় করো।' (সূরা নাহল, আয়াত ৫১)

'ইবরাহীম ইহুদী ছিলো না এবং নাসারাও ছিলো না, কিন্ত সে ছিলো আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং সে মোশরেক ছিলো না।'

(সূরা আল ইমরান, আয়াত ৬৭)

'আমি একমুখী হয়ে স্বীয় মুখ ওই সত্ত্বার দিকে নিবিষ্ট করেছি, যিনি আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মোশরেক নই।' (সূরা আল আনয়াম, আয়াত ৭৯)

এটা আল্লাহর একত্ববাদ সংক্রান্ত কোরআনের বর্ণনাভংগি, চিরন্তন বিধান। নিসন্দেহে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এর গুরুত্ব তাওহীদ এবং এর বিশালতার মূল্য স্পষ্ট। তাওহীদের দাবী হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অস্পষ্টতার আশ্রয় নেয়া যাবে না, কোনো বিষয় আকার ইংগিতে বুঝা গেলেও তাকে যথেষ্ট মনে করা যাবে না, বরং এর প্রতিটি দিক স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে।

এবাদাতের প্রচলিত অপব্যাখ্যা

আলোচ্য সূরা এবং গোটা কোরআন শরীফে 'এবাদাত' পরিভাষাটি ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এ সম্পর্কে একটু আলোকপাত করার প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করছি। যার ফলে আমরা এক আল্লাহর এবাদাতের নির্দেশ এবং তিনি অন্য কোনো মাবুদের এবাদাত করার নিষেধের গুরুত্ব আরোপ বুঝতে সক্ষম হবো। পাশাপাশি আমরা এটাও বুঝতে সক্ষম হবো যে, আল্লাহ তায়ালা তাওহীদের দু'টি দিক কেন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করলেন এবং আকার ইংগিতে বুঝার ওপর কেন যথেষ্ট করলেন না?

আমি পূর্বে হূদ (আ.) এবং তাঁর সমাজের ঘটনার পর্যালোচনা করতে গিয়ে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি যে, 'এবাদাত' পরিভাষাটির অর্থ কি? কেনই বা তার প্রতি এতো বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে? নবী রসূলরা কেনইবা এপথে বিরামহীন শ্রম ব্যয় করেছেন? আর যুগে যুগে এক আল্লাহর এবাদাতের প্রতি আহ্বানকারীরা কেনইবা এতো কষ্ট যাতনা সহ্য করেছিলেন? আমি এখানে উপরোক্ত পর্যালোচনার সাথে আরো কয়েকটি কথা সংযোজন করছি।

'এবাদাত' শব্দটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি এবং আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার লেনদেনকে বুঝায়। পক্ষান্তরে 'মোয়ামালাত' শব্দটি মানুষের পারস্পরিক লেনদেনকে বুঝায়। এবাদাত এবং মোয়ামালাত শব্দদয়ের উল্লিখিত পার্থক্য কোরআনে কারীম নাযিল হওয়ার যুগে তথা রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় পরিচিত ছিলো না; বরং তা পরবর্তী যুগে আবিষ্কৃত হয়েছে।

আমি আমার 'খাসায়েসুত্ তাসাব্বুরিল ইসলামী ওয়া মোকাব্বিমাতুহ' গ্রন্থে এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করেছি। সেখান থেকে কয়েকটি অনুচ্ছেদ আমি এখানে উদ্ধৃত করছি।

'মানবীয় কর্মকান্ডকে এবাদাত এবং মোয়ামালাতে বিভক্ত করার বিষয়টি ইসলামী আইন শাস্ত্রের বইপত্রাদি লেখার পর আবিষ্কৃত হয়েছে। যদিও প্রথম থেকে এর উদ্দেশ্য ছিলো রচনা ও সংকলন রীতির একটি পদ্ধতি বর্ণনা করা। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হয় যে, এ বিভক্তীকরণ পরবর্তী সময়ে মানুষের চিন্তা চেতনা ও ধ্যান ধারণায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। যার ফলশ্রুতিতে এটা গোটা ইসলামী জীবন যাপনে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। তখন মানুষের চিন্তা চেতনা ও ধ্যান ধারণায় এ বিষয়টি আসতে শুরু করে যে, এবাদাতের বৈশিষ্ট্য প্রথম প্রকার কর্মকান্ডের সাথে নির্দিষ্ট। পক্ষান্তরে এ বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয় প্রকার কর্মকান্ডের মাঝে এসে লোপ পেতে থাকে, যাকে মোয়ামালাত (লেন দেন) সংক্রান্ত বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এটা নিসন্দেহে ইসলামী চিন্তা চেতনার বিকৃতি। এর কারণে গোটা মুসলিম সমাজ জীবনে বিকৃতি ও বিপর্যয় ঘটাটা অস্বাভাবিক নয়।'

'ইসলামী চিন্তা চেতনায় এমন কোনো মানবীয় কর্মকান্ড নেই, যার ওপর এবাদাত শব্দটি প্রযোজ্য নয়, অথবা যার মাঝে এবাদাতের বিশেষণটির বাস্তবায়ন উদ্দেশ্য নয়। গোটা ইসলামী বিধানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে, সর্বাবস্থায় যমীনে এবাদাতের অর্থ প্রতিষ্ঠিত করা।'

'ইসলামী বিধানে শাসন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ফৌজদারী বিধি-বিধান, নাগরিক ও পারিবারিক আইন কানুন এবং এই বিধানের অন্তর্গত অপরাপর বিধি বিধান রচনার পশ্চাতে এবাদাতের অর্থ প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যই নিহিত নেই।'

'মানব জীবনেও এবাদাতের অর্থ প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিহিত নেই। কোরআনে করীমের আলোকে সেই উদ্দেশ্য মানব সৃষ্টিরও উদ্দেশ্য। আল্লাহর বিধানানুসারে মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ড যদি সম্পাদিত হয়, তবে সেটা উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। এর মাধ্যমে কেবল আল্লাহকেই মাবুদের মর্যাদা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা এবং একমাত্র তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্যের স্বীকৃতি দেয়া সম্ভব হবে। অন্যথায় সেটা এবাদাত বহির্ভূত বিষয় বলে গণ্য করা হবে। কারণ সেটা দাসত্ব ও আনুগত্য বহির্ভূত তথা আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য বহির্ভূত। ব্যাপক অর্থে সেটাকে আল্লাহর দ্বীন বহির্ভূত বলেও গণ্য করা হবে।'

ওপরের বৈশিষ্ট্য সহকারে ইসলামী চিন্তা চেতনা ও ধ্যান ধারণার উর্ধে মানুষের যে সকল কর্মকান্ডের ওপর ইসলামী আইন ও বিধান প্রণেতারা এবাদাত শব্দটি প্রয়োগ করেছেন, যদি আমরা কোরআনে হাকীমের আলোকে বিভিন্ন স্থানে এবাদাত শব্দের সেই ব্যবহার বিধি পর্যালোচনা করি, তাহলে আমাদের সামনে এমন একটি সত্য প্রকাশ পাবে— যাকে উপেক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব নয়, আর সেটা হচ্ছে 'এবাদাত' শব্দটিকে মানুষের অপরাপর বিভিন্ন কর্মকান্ড থেকে পৃথক করে এককভাবে কোথাও ব্যবহার করা হয়নি। যার ওপর ফকীহরা (ইসলামী আইন প্রণেতারা) 'মোয়ামালাত' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। সে হিসেবে 'এবাদাত' ও 'মোয়ামালাত' উভয়ের ব্যবহার এমনভাবে পাশাপাশি ব্যবহার হয়েছে যেন মোয়ামালাত এবাদাতের মতোই এই বিধানের একটি অংগ। এর মাধ্যমে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত করা হবে।'

'কালের আবর্তে মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ এবাদাত ও মোয়ামালাতে বিভক্তীকরণ মানুষকে এ ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত করে যে, তারা যদি ইসলামের বিধানানুসারে শুধু এবাদাতের যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করে, তবেই তারা পরিপূর্ণ মোমেন হতে পারবে। যদিও তারা মোয়ামালাতের বিভিন্ন কর্মকান্ড তখনও অন্য বিধানানুসারে আঞ্জাম দিতে থাকে— যা তারা আল্লাহ থেকে গ্রহণ করেনি বরং গ্রহণ করেছে মানুষের কাছ থেকে এবং এভাবে তারা তাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন বিধান রচনা করেছে যার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা দেননি।'

'এটা মস্তবড় একটি ভ্রান্ত ধারণা। ইসলাম হচ্ছে অবিচ্ছেদ্য একটি ঐক্যের নাম, যাকে ছেদ বা বিভক্ত করা সম্ভব নয়। যে বা যারা বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে এ ইসলামকে দু'ভাগে বিভক্ত করে সে বা তারা নিসন্দেহে এ ঐক্য থেকে বেরিয়ে পড়বে। অন্য ভাষায় সে দ্বীন ইসলাম থেকে বেরিয়ে পড়বে।' 'এটা এমন এক মহাসত্য, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত এই বিষয়টির দিকে লক্ষ্য করা, যদি সে তার ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাহলে এবাদাত ও মোয়ামেলাতকে তাকে অভিন্নভাবে দেখতে হবে।

উল্লেখিত অনুচ্ছেদগুলোর সাথে আমি ইতিপূর্বে এ খন্ডে যা বলেছি, তা এখানে সংযোজন করে নিতে হবে।

কোরআনে কারীমের মাধ্যমে প্রথম বারের মতো যখন আচার অনুষ্ঠানাদি পালন করার নির্দেশ দেয়া হলো, তখন সে জাতি এবাদাত শব্দটির অর্থকে সীমাবদ্ধ করেনি। বরং যেদিন প্রথম বারের মতো মক্কার আরব জাতিকে সম্বোধন করা হয়, তখনবধি এবাদাত সংক্রান্ত অন্যান্য আচার

অনুষ্ঠানাদি ফরয হয়নি। তারা এবাদাত শব্দের অর্থ তখন বুঝতো সকল বিষয়ে একমাত্র আল্লাহকে বিচারক হিসাবে মানা এবং তাঁর কাছে সমাধান চাওয়া এবং একমাত্র তাঁর দাসত্ব ও বন্দেগী করা, আর গায়রুল্লাহর বিধানকে কাঁধ থেকে ছুঁড়ে ফেলা। রসূল (স.) এবাদাতের ব্যাখ্যা এই অনুসরণ এবং অনুকরণের মাধ্যমে করেছেন, এবাদাত বন্দেগী সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নয়। তিনি একদা ইয়াহুদ এবং নাসারাদের পুরোহিত এবং ধর্মযাজকদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করাকে কেন্দ্র করে আদী ইবনে হাতেমকে বলেন, 'তারা (ধর্মযাজকরা) তাদের অনুসারীদের জন্যে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করেছে। অতপর অনুসারীরা এ বিষয়ে তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ করেছে। এটা তাদের জন্যে তাদের এবাদাত।'

আমি ইতিপূর্বে এখন্ডে এটা উল্লেখ করেছি যে, যদি এবাদাতের মর্মার্থ শুধু এবাদাত বন্দেগী সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠানাদিই হতো, তবে যুগে যুগে বিভিন্ন রসূলকে রেসালাতসহ এ দুনিয়ায় আসতে হতো না। এ পথে এতো শ্রম দেয়ার প্রয়োজন হতো না এবং আল্লাহর পথে আহবানকারী এবং মোমেনদের দীর্ঘ কাল পরিক্রমায় অসহনীয় নির্যাতন, যাতনা, দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হতে হতো না। যুগে যুগে নবী রসূল, আহ্বানকারী মোমেনদের এত চড়া মূল্য দেয়ার পেছনে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো, মানব জাতিকে তার সকল বিষয়ে এবং দুনিয়া ও পরকালীন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বন্দার বন্দেগী থেকে বের করে একমাত্র আল্লাহর বন্দেগীর জন্যে নির্দিষ্ট করা।'

'নিসন্দেহে এটা হচ্ছে এক আল্লাহকে মাবুদ হিসাবে মানা, তাঁকে রব হিসাবে গ্রহণ করা, তাঁকে একমাত্র অভিভাবক এবং সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসাবে মানা, শরীয়তের উৎসকে একীভূত করা, জীবন বিধানকে একীভূত করা এবং ওই দিকগুলোকে একীভূত করা যার জন্যে মানুষ তাদের পূর্ণ বন্দেগী নিবেদন করে। এ ধরনের যাবতীয় তাওহীদের তাকীদ ছিলো যুগে যুগে বিভিন্ন নবী রসূলকে পাঠানোর উদ্দেশ্য। এ পথে তাঁদের এত শ্রম ব্যয় করা এবং এ লক্ষে নির্যাতন নিপীড়ন ও দুঃখ কষ্ট সহ্য করা। এসব কিছু এ জন্যে নয় যে, আল্লাহ তায়ালা এগুলোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন। কারণ তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি মোটেই মুখাপেক্ষী নন। বরং মানব জীবন ওই তাওহীদ ছাড়া উপযোগী ও সুষ্ঠু হতে পারে না এবং উন্নত হতে পারে না। সর্বোপরি সে জীবন মানুষের যথাযথ উপযোগী হতে পারে না যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ তাওহীদের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে।'

মানুষ হয়ে মানুষের এবাদত করা

আমি পূর্বে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, তাওহীদ সংক্রান্ত বিষয়টি পর্যালোচনার শেষের দিকে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করবো। আমি এখানে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাওহীদের মূল্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করবো।

আমি প্রথমে মানব অস্তিত্বে তাওহীদের প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই। এর কয়েকটি দিক হতে পারে, যেমন মানুষের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব, তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন ও গঠন, তার চিন্তা চেতনা ও ধ্যান ধারণায় তাওহীদের প্রভাব এবং তার মূল অস্তিত্বে এ চিন্তা চেতনার প্রভাব ইত্যাদি।

এ ব্যাপক চিন্তা চেতনা মানব অস্তিত্বকে তার বিভিন্ন দিক, উৎসাহ উদ্দীপনা, প্রয়োজন ও প্রবণতাসহ সম্বোধন করে এক কর্তৃপক্ষের প্রতি তাকে আহবান করে, যার সাথে সে সকল বিষয়ের লেন দেন করে। যার কাছে সে সকল বস্তু কামনা করে এবং যার প্রতি সে সকল কিছু নিয়ে ধাবিত

হয়। এটা এমন একক কর্তৃপক্ষ, সে যাকে কামনা করে এবং যাকে সে ভয় পায়। সে যার ক্রোধকে ভয় পায় এবং যার সন্তুষ্টির আশা করে। এটা এমন এক কর্তৃপক্ষ, যিনি সকল জিনিসের একচ্ছত্র অধিপতি। কারণ তিনি সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। একচ্ছত্র মালিক এবং সকল বস্তুকে পরিচালনাকারী।

অনুরূপভাবে এ চিন্তা চেতনা মানব অস্তিত্বকে এক উৎসের প্রতি ধাবিত করে, যার থেকে সে চিন্তা, ধ্যান ধারণা, মূল্যবোধ, মাপকাঠি, বিধি বিধান এবং আইন কানুন গ্রহণ করে। হৃদয়ে যতো প্রকার প্রশ্নের উদ্রেক হয় সকল প্রশ্নের উত্তর সে তাঁর কাছেই পায়।

তখন মানব অস্তিত্ব আকীদা বিশ্বাস, বিধি বিধান, সাহায্য চাওয়া, কিছু গ্রহণ করা, জীবন মৃত্যু, এর গতি, সুস্থতা, রেযেক, দুনিয়া এবং আখেরাতের ক্ষেত্রে আবেগ অনুভূতি, আচার আচরণ, একত্রীভূত হয়ে যায়। কখনো সে অস্তিত্ব বিচ্ছিন্ন হয়ে টুকরা টুকরা হয়ে যায় না। সে বিভিন্ন অবলম্বন ও দিগন্তের দিকে ধাবিত হয় না এবং সে যত্রতত্রভাবে নানা পথের অনুসরণ করে না।

মানব অস্তিত্ব যখন এই চিন্তায় এসে সমবেত হয়, তখন সে সত্যিই এক উত্তম অবস্থায় বিরাজ করে। কারণ সে তখন ঐক্যের ওপর অবস্থান করে। এই ঐক্য মানব অস্তিত্বের উদ্দেশ্য। এ হচ্ছে এবাদাত ও বন্দেগী। এমনিভাবেই মানুষ যখন এ ধরার প্রত্যেক বস্তুর হাকীকত নিয়ে গবেষণা করে, তখনই তার সামনে জীবনের ঐক্য ভেসে উঠে।

যখন মানব অস্তিত্ব এমন অবস্থার ওপর বিরাজ করে যে, প্রত্যেক বস্তুর মৌলিক অবস্থার সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন সে অস্তিত্ব শক্তিশালী অবস্থায় থাকে। কারণ এ পৃথিবীর মূল বস্তুর সাথে তার সমন্বয় থাকে, যেখানে আমরা বসবাস করি এবং যার সাথে আমরা লেন দেন করি। অনুরূপভাবে এ অস্তিত্বের প্রত্যেক বস্তুর মূলের সাথে তার সুন্দর সমন্বয় সাধিত হয়, সে তার দ্বারা নিজে প্রভাবিত হয় এবং তাকে আবার প্রভাবিত করেও। আর এ সমন্বয়ের কারণেই সে একদিন পৃথিবীতে ব্যাপক ও বিশাল প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার সুযোগ পেয়েছে।

প্রথম যুগের বাছাই করা মুসলমানরা এই ঐক্যের চরম শিখরে পৌঁছেছিলো। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের দ্বারা মানব সৃষ্টি এবং মানব ইতিহাসে এমন ভূমিকা পালন করিয়েছিলেন যার প্রভাব অত্যন্ত গভীর।

সে ঐক্য যদি বর্তমান মুসলমানদের মাঝে পুনরায় সৃষ্টি হয় (আমি পূর্ণ আশাবাদী যে, এমন অবস্থা অবশ্যই একদিন সৃষ্টি হবে), তবে আল্লাহ তায়ালা তাদের দ্বারাও বড় বড় খেদমত আঞ্জাম দেবেন। তাদের সামনে যতো বাধা বিপত্তি আসুক না কেন, তারা সেগুলো অতিক্রম করে সামনের দিকে অগ্রসর হবে। কারণ এই ঐক্য সর্বযুগেই ছিলো এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি।

এ ঐক্যের গুরুত্ব শুধু ঈমানী চিন্তা চেতনার বিশুদ্ধীকরণের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়- যদিও এ বিশুদ্ধীকরণটা এমন বিশাল উদ্দেশ্য যার ওপর পুরো জীবনের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত। মানব জীবনের মূল্য তখনই বৃদ্ধি পেতে থাকে, যখন তার পুরো জীবনটা আল্লাহর এবাদাতে শামিল হয় এবং জীবনের ছোট বড় সকল কর্মকান্ড ওই এবাদাতের অংশ বা পুরো এবাদাতে পরিগণিত হয়। আর এ এবাদাতের পেছনে যে বিষয়টি সুপ্ত রয়েছে তা হচ্ছে, আল্লাহকে মাবুদের মর্যাদায় আসীন করা এবং তাঁর আনুগত্য ও দাসত্বের স্বীকৃতি দেয়া। এটা এমন একটি স্তর, যার চেয়ে ওপরের স্তরে আসীন হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এবং এ স্তরের মানবীয় পূর্ণতায় মানুষ তখনই পৌঁছতে

পারবে, যখন সে তাওহীদের পূর্ণ দাবী পালন করতে সক্ষম হবে। এ স্তরের সর্বোচ্চ আসনে প্রিয়নবী মোহাম্মদ (স.) আসীন হয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি আরোহণ করেছিলেন। সেটা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা থেকে ওহী গ্রহণের স্তর। এরশাদ হচ্ছে,

'পরম করুণাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্যে সতর্ককারী হয়। (সূরা আল ফোরকান, আয়াত ১)

অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, 'পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্ত্বা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত- যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি- যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু শোনেন এবং দেখেন। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ১)

এবাদাতকে একীভূত করার বিভিন্ন মূল্যবোধের মধ্যে আরেকটি মূল্যবোধের আলোচনা আমি এখানে করতে চাই। সেটা হচ্ছে এক আল্লাহর জন্যে এবাদাত ও বন্দেগীকে নির্দিষ্ট করা এবং মানব জীবনে তার প্রভাব নিয়ে আসা।

এক আল্লাহ তায়ালার জন্যে এবাদাতকে নির্দিষ্ট করা গায়রুল্লাহর এবাদাত থেকে মানুষকে মুক্ত করে এবং মানুষকে বান্দার বন্দেগী থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর বন্দেগীর জন্যে নির্দিষ্ট করে, এর মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ স্বাধীনতা ও মর্যাদার গ্যারান্টি ইসলামী বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধানে পাওয়া অসম্ভব। অনৈসলামী বিধানে এক মানুষ অপর মানুষের দাসত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়। তা হতে পারে আচার অনুষ্ঠানের বা বিধি বিধানের দাসত্ব বা আকীদা বিশ্বাসের দাসত্ব। যে কোনো প্রকার দাসত্বই হোক না কেন, সবগুলোই দাসত্ব, একটি অপরটির সদৃশ। গায়রুল্লাহ থেকে জীবনের যে কোনো কর্মকান্ড গ্রহণ করার মাধ্যমে মানুষের মস্তক গায়রুল্লাহর সামনেই অবনত হয়।

মানুষ সর্বাবস্থায় কারো না কারো বন্দেগীতে আবদ্ধ থাকে। বন্দেগী বা দাসত্ব ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। যারা এক আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করে না, তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহর অসংখ্য নিকৃষ্ট দাসত্বে পতিত হয়।

তারা তাদের মনের অনিয়ন্ত্রিত কামনা বাসনা ও প্রবৃত্তির শিকারে পরিণত হয়। অতপর তারা মানুষের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে পশুজগতে প্রবেশ করে। এরশাদ হচ্ছে, 'আর যারা কাফের, তারা ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।'

যদি কোনো মানুষ মানুষের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে পশুজগতে ঢুকে পড়ে, তবে তার চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আর কেউ হতে পারে না। এটা ঠিক তখনই ঘটে যখন মানুষ এক আল্লাহর দাসত্ব থেকে পালিয়ে মনের কামনা বাসনার দাসত্বে নিমজ্জিত হয়।

তারা বান্দাদেরও নানা প্রকার দাসত্বের শিকার হয়, তারা শাসক, রাষ্ট্রপ্রধান এবং নেতাদের বিভিন্ন প্রকার নিকৃষ্ট গোলামে পরিণত হয়, যারা তাদেরকে মনগড়া বিধানানুসারে পরিচালনা করে, যার কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু বিধান রচনাকারীর স্বার্থ সংরক্ষণ করা। এ বিধান রচনাকারী কোনো ব্যক্তি শাসক হতে পারে, শাসকগোষ্ঠী হতে পারে বা শাসক জাতি হতে পারে। বান্দার দাসত্ব ও বিধান বলতে ওই বিধানকে বুঝায়, যা আল্লাহর কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়নি এবং যা আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক।

কিন্তু বান্দার দাসত্ব শাসক, রাষ্ট্রপ্রধান এবং বিধান রচনাকারীর দাসত্বের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। যদিও এগুলো দাসত্বের প্রধান দিক, কিন্তু এটাই সব দিক নয়। মানুষের দাসত্বের কিছু গোপন ধরন রয়েছে। কিন্তু তা উল্লেখিত ধরন থেকে অধিক শক্তিশালী, গভীর ও কঠিনতর। আমি এখানে এর উদাহরণ স্বরূপ ফ্যাশন এবং পোশাক আশাক নির্মাতাদের দাসত্বের দৃষ্টান্ত পেশ করতে চাই। তারা নিজেদেরকে সভ্য মানুষ হিসাবে দাবী করে এমন এক বিরাট জনগোষ্ঠীর ওপর তাদের কর্তৃত্ব রয়েছে। পোশাক এবং ফ্যাশনের প্রভুদের পক্ষ থেকে যখন যে পোশাক, ডিজাইন বা মডেল চাপিয়ে দেয়া হয়, তা নতশিরে তাদের মেনে নিতে হয়। এ ফ্যাশন ডিজাইন বা মডেল পোশাক আশাক, যানবাহন, ইমারত, দৃশ্য বা অনুষ্ঠানাদিও হতে পারে। ফ্যাশন প্রভুদের চাপানো ফ্যাশন স্পষ্ট দাসত্বের প্রতিনিধিত্ব করে, যেই দাসত্ব থেকে কোনো নর বা নারী জাহেল (মূর্খ)-এর পালিয়ে যাওয়া বা বের হওয়ার কল্পনা করার সুযোগও নেই। এ সভ্য জাহেলিয়াতের মানুষ ফ্যাশন, পোশাক ও মডেল নির্মাতাদের যে পরিমাণ দাসত্ব করে তার আংশিক দাসত্ব যদি তারা আল্লাহর জন্যে করতো, তবে তারা নিষ্ঠাবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতো। অতএব ফ্যাশনের প্রভুদের দাসত্বকে যদি দাসত্ব না বলা হয়, তবে কোনটাকে দাসত্ব বলা হবে? অনুরূপভাবে ফ্যাশন নির্মাতাদের দাসত্বকে যদি প্রতিপালক এবং অভিভাবক হিসাবে ধরা না হয়, তবে কোন দাসত্বকে রব এবং অভিভাবক হিসাবে ধরা হবে?

মানুষ রাস্তা ঘাটে চলতে গেলে অনেক সময় এমন পোশাক পরিহিতা মহিলাকে দেখতে পায়, তাদের ছতর প্রায়ই খোলা থাকে। সে পোশাক তার আকৃতি ও গঠনের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সে তার পোশাকে এমনভাবে রং ছিটায়, যার ফলে সে পোশাককে বিকৃত এবং হাসি-তামাশা ও বিদ্রূপের বস্তুতে পরিণত করে। কিন্তু পোশাক এবং ফ্যাশন নির্মাতাদের প্রভুদের প্রতাপশালী দাসত্ব উক্ত রমণীকে ওই অপমানকর পোশাক পরিধান করতে এমনভাবে বাধ্য করে যে, সে তাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা রাখে না এবং সে তার দাসত্ব অস্বীকার করারও শক্তি রাখে না। কারণ গোটা জাতি সেই দেবতারই দাসত্ব করে চলেছে। সুতরাং এটা যদি দাসত্ব না হয়, তবে কোন্‌টাকে আমরা দাসত্ব বলে আখ্যায়িত করবো? আর এটাকে যদি অভিভাবক এবং রব হিসাবে মেনে নেয়া ধরে না নেই তবে কোনটাকে অভিভাবক এবং রব হিসাবে ধরে নেবো?

এটা অপমানকর দাসত্বের একটি মাত্র উদাহরণ, যেখানে মানুষ একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করে না বরং মানুষ গায়রুল্লাহ তথা অপর মানুষেরই বন্দেগী করে। রাষ্ট্র প্রধান, শাসক এবং নেতাদেরকে অভিভাবক মানা মানুষকে মানুষের অভিভাবক মানা এবং মানুষের দাসত্ব মানুষ করার দাসত্বের একমাত্র ঘৃণিত পন্থা নয়, বরং তার আরো বহু আকৃতি হতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনার পথ ধরে আমি এখানে মানুষের আত্মা, ইযযত আবরূ এবং ধন সম্পদের হেফাযতের ক্ষেত্রে এবাদাত ও বন্দেগী একমাত্র আল্লাহর জন্যে একীভূত করার কি মূল্য— সেদিকে কিছুটা আলোকপাত করবো। মানুষের দাসত্বের কয়েকটি দিক হতে পারে। যেমন বিধান রচনা করা তথা বিধান রচনাকারীকে অভিভাবক মানা, প্রচলিত রীতি নীতিকে অভিভাবক মানা এবং আকীদা বিশ্বাস এবং চিন্তা দর্শনকে অভিভাবক মানা ইত্যাদি।

আকীদা বিশ্বাস এবং চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহর বন্দেগী করার অর্থ হচ্ছে, ভুল ধ্যান ধারণা, কল্প কাহিনী এবং অসংখ্য কুসংস্কারের থাবার মধ্যে পতিত হওয়া, যা হচ্ছে নানাবিধ

পৌত্তলিক জাহেলিয়াতের বিভিন্ন আকৃতি, ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাস এবং বিকৃত চিন্তা চেতনার দরুন তারা মূর্তির জন্যে নযর মান্নত, ধন সম্পদ ও সন্তান সন্তুতির নযর নেওয়ায উৎসর্গ করে। এ ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাসের দরুন মানুষ সদা নানাবিধ কাল্পনিক রব এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট খাদেম ও গণক, জ্বিন এবং শয়তানের সাথে সংশ্লিষ্ট যাদুকর, পীর মাশায়েখ ও রহস্যের অধিকারী ঋষি ও পাদ্রী থেকে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে, তারা তাদের নৈকট্য হাসিল করতে চায় এবং তাদের কাছে বিভিন্ন বস্তু কামনা করে। এ ধরনের বেহুদা কাজের মধ্যে তাদের সমস্ত শক্তি ও চেষ্টা প্রচেষ্টা নিশেষ হয়ে যায়।

পোশাক ও ফ্যাশনের প্রভুদের রীতি নীতি ও নিয়ম কানুন পালন করতে গিয়ে গায়রুল্লার দাসত্ব করেছে এবং এতে অনেক মাশুল দিয়েছে। আমি ইতিপূর্বে তার একাধিক উদাহরণ পেশ করেছি। ইযযত আবরু এবং চরিত্রের জলাঞ্জলির পাশাপাশি ভ্রান্ত রব ও প্রভুদের তুষ্টি অর্জনে কতো ধন সম্পদ এবং চেষ্টা শ্রম বিনষ্ট হয়ে যায়, তাও আমাদের জানা উচিত।

মধ্যম আয়ের একজন গৃহকর্তা প্রসাধনী দ্রব্য ক্রয় তথা তেল ও সুগন্ধি দ্রব্যাদি ক্রয়, পার্লারে গিয়ে চুলের স্টাইল করা এবং চুল সোজা করা, বিভিন্ন প্রকার পোশাকাদি ক্রয় ও রকমারি জুতা ও স্বর্ণের অলংকারাদি ক্রয়ের পেছনে তার আয়ের অর্ধেক টাকা এবং অর্ধেক শ্রম ব্যয় করে। তারা ভ্রান্ত ক্ষণস্থায়ী 'রবের' কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্যেই এ ব্যয় করে থাকে। এর পশ্চাতে রয়েছে মূলধনের অধিকারী ইহুদী মহাজনরা। তারা তাদের অজস্র অর্থ সম্পদ এ ধরনের শিল্পের পেছনে ব্যয় করে। একজন নর এবং নারী যতো কষ্টের মাঝেই থাকুক না কেন, তারা এ ঘৃণ্য দাসত্বের চাহিদায় সাড়া না দিয়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। সে চাহিদা হচ্ছে শ্রম, মাল সম্পদ ইযযত আবরূ এবং চরিত্রের কোরবানী।

এ পর্যায়ে যে বিষয়টির আলোচনা প্রাধান্য পাচ্ছে তা হচ্ছে, মানব রচিত বিধানের দাসত্ব করতে গিয়ে আমরা যে নযরানা ও মাসুল দিয়ে থাকি সে প্রসংগ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, একজন খাঁটি বান্দা তার প্রভু রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির জন্যে যে পরিমাণ কোরবানী উৎসর্গ করে থাকে, গায়রুল্লাহর এবাদাতকারীরা তাদের ভ্রান্ত প্রভুদের সন্তুষ্টির জন্যে কয়েকগুণ বেশী জান মাল ও ইযযত আবরু ও মান সম্মান উৎসর্গ করে থাকে।

দেশ সম্প্রদায়, জাতি, শ্রেণী ও উৎপাদনের নামে নানা প্রকার মূর্তি, প্রতিমা ও প্রভু নির্ধারণ করা হয়। অতপর উক্ত প্রতিমা ও প্রভুদের প্রতি আহবান জানাবার জন্যে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়। প্রত্যেকটির জন্যে পৃথক পৃথক ঝান্ডা উত্তোলন করা হয়। তারপর মূর্তিপূজক পৌত্তলিকদেরকে নির্দ্বিধায় সেই মূর্তিদের সৌজন্যে জান মাল উৎসর্গ করার জন্যে আহ্বান করা হয় (অর্থাৎ এ সমস্ত মতবাদ গ্রহণ করার জন্যে আহ্বান জানানো হয়)। যদি উৎসর্গ করার ক্ষেত্রে ইতস্তত ও সংকোচ বোধ করা হয়, তবে তাকে খেয়ানত, বিশ্বাসঘাতকতা ও দোষী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এমনকি যদি মান সম্মানও মতবাদের চাহিদার সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তবে তার সামনে মান সম্মানকে উৎসর্গ পর্যন্ত করা হবে। আর এটাকে মর্যাদা হিসাবে ধরে নেয়া হয়, যার জন্যে রক্ত প্রবাহিত করা তথা প্রাণ উৎসর্গ করাকে বড় কিছু মনে করা হয় না। এ সকল মতবাদের ধ্বজাধারীরা তাদের মতবাদের দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করে। আর তাদের পেছনে রয়েছে শাসক শ্রেণীর প্রভুরা, তারা বিভিন্নভাবে তাদেরকে সাহায্য করে।

আল্লাহর পথে জেহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ পৃথিবীতে একমাত্র তাঁরই গোলামী করা হবে। মানুষকে প্রতিমা এবং তাগুতের দাসত্ব ও বন্দেগী থেকে মুক্ত কবা হবে এবং মানব জীবন সেই মর্যাদাপূর্ণ দিগন্তের দিকে উন্নীত হবে, যা আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে নির্ধারণ করেছেন। জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহ, (আল্লাহর পথে জেহাদ) যে সকল কোরবানী দাবী করে, তা এজন্যে যে, যারা গায়রুল্লাহর এবাদাত বন্দেগী করে, তারা এর সমতুল্য বা বেশী সে পথে ব্যয় করে। যারা পরকালীন আযাব ও বেদনা, জীবন বিসর্জন দেয়া এবং জান, মাল এবং সন্তান ও সন্ততির ক্ষতির আশংকা করে, তারা যদি আল্লাহর পথে জেহাদ করে, তবে তাদের এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা উচিত যে, তারা যদি গায়রুল্লাহর এবাদাত করে, তবে তাদের কি পরিমাণ জান মাল, সন্তান সন্ততি, ইযযত আবরু ও চরিত্রের জলাঞ্জলি দিতে হতো? সেই তুলনায় আল্লাহর পথে জেহাদে খুব নগণ্যই ব্যয় হচ্ছে। অধিকন্তু গায়রুল্লাহর এবাদাতে যে অপমান, বিনতি এবং লজ্জা সইতে হয়, তাও এখানে সইতে হবে না।

এবাদাতের ব্যাপারে একত্ববাদ, বন্দেগী ও দাসত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করা এবং গায়রুল্লাহ তথা সৃষ্টির কারো জন্যে এবাদাতকে অস্বীকার করা, ভ্রান্ত রবকে খোদা বানাতে অজস্র অর্থ ব্যয় করা থেকে মানবীয় প্রচেষ্টাকে হেফাযত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু, এর পরিবর্তে গোটা প্রচেষ্টাকে এ পৃথিবীর আবাদ, উন্নয়ন এবং তার জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিবিষ্ট করা যায়।

এখানে এমন একটি বৈশিষ্ট্যের কথা আসছে, যা আমি ইতিপূর্বে এখন্ডেই ইংগিত করেছি। তা হচ্ছে, যখনই আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে এমন কোনো বান্দার আবির্ভাব হবে, যে নিজকে মানুষের সামনে তাগুত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবে, এলক্ষ্যে যে সকল মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে তার গোলামী করবে। তখন সে তাগুত স্বীয় এবাদাত বন্দেগী ও আনুগত্য অনুসরণের লক্ষ্যে সকল শক্তি এবং ক্ষমতাধরকে বাধ্য করার প্রয়োজনীয়তা দু'কারণে অনুভব করবে। প্রথমত, নিজেকে সংরক্ষণ করা, দ্বিতীয়ত, নিজকে ইলাহ হিসাবে প্রকাশ করা। এক্ষেত্রে সে প্রচার মাধ্যম এবং তার পতাকাবাহী অনুসারীরা এর প্রয়োজন বোধ করবে। যারা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকবে এবং গুণকীর্তন করবে। তারা তার দাসত্বের জীর্ণশীর্ণ আকৃতিকে মানুষের সামনে বড় করে প্রভুর আকৃতিতে পেশ করবে। তারা ক্ষণিকের জন্যেও এ প্রশংসা থেকে বিরত থাকবে না, বরং প্রশংসার মাধ্যমে তারা অসংখ্য মানুষকে তার অনুসারী বানাতে চেষ্টা করবে।

এই প্রচেষ্টা ক্ষণিকের জন্যেও বন্ধ হওয়ার নয়। কারণ যখনই তাগূতের অনুসারীরা তার প্রশংসা, প্রচার প্রপাগান্ড বন্ধ করে দেবে, তখনই সে ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়বে।

এ ক্লান্তিকর প্রচেষ্টায় অজস্র শক্তি, ধন সম্পদ, প্রাণ ও ইযযত সম্মান ব্যয় করা হয়। যদি মানব জীবনেব উন্নতি ও তাকে অমুখাপেক্ষী করার লক্ষ্যে তার কিছু অংশও পৃথিবীকে আবাদ এবং ফলদায়ক উৎপাদনে ব্যয় করা হতো, তবে এটা বিশ্ব মানবতার জন্যে কল্যাণকর অনেক কিছু বয়ে নিয়ে আসতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শক্তি সামর্থ ও জান মাল এ লক্ষ্যে ব্যয় করা হয় না, যেহেতু মানুষ একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্ব করে না বরং তারা তিনি ব্যতীত অন্য তাগুত ও শয়তানদের গোলামী ও দাসত্ব করে।

ওপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষ এক আল্লাহর দাসত্ব থেকে দূরে থেকে গায়রুল্লাহর দাসত্ব করার দরুন মোটামুটি শক্তি সামর্থ, ধন সম্পদ, পৃথিবী গড়ার কাজে এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অধিকন্তু মানুষ জান, মান সম্মান, মূল্যবোধ, নীতি নৈতিকতা ও চরিত্রের অবক্ষয়ের দিক থেকে ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং যমীনে অপমানিত, পর্যুদস্ত, অপবিত্র ও লজ্জিত হয়েছে।

ইতিপূর্বে যারা আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্ব থেকে দূরে সরে এসে কিছু সংখ্যক লোককে গায়রুল্লাহর বিধানে বিচার ফয়সালা ও দেশ শাসনের সুযোগ দিয়েছে, পরিণামে তারা সবাই গায়রুল্লাহর নিকৃষ্ট দাসে পতিত হয়েছে। যে দাসত্ব তাদের মানবতা, মর্যাদা ও স্বাধীনতাকে হরণ করে নিয়েছে। গায়রুল্লাহর সকল প্রকার বিধানই ভ্রান্ত, আর এগুলো কখনো মানবতার কল্যাণে আসতে পারে না। যদিও কিছু কিছু বিধান দেখে মানুষ ধারণা করে যে, এগুলো তাদের মানবতা, স্বাধীনতা এবং মর্যাদা বুঝি নিশ্চিত করবে কিন্তু আসলে তা নয়।

ভ্রান্ত দ্বীনের নামে সীমালংঘনকারী গীর্জা থেকে পালাতে গিয়ে ইউরোপবাসী আল্লাহ থেকে দূরে সরে গেছে এবং তারা তাদের ঐ গীর্জার ওপর বিদ্রোহ করতে গিয়ে আল্লাহর সাথেই বিদ্রোহ করে বসলো। এই গির্জা তার প্রাধান্যের যুগে সকল প্রকার মানবীয় মূল্যবোধকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। অতপর মানুষ ধারণা করতে থাকে যে, তারা তাদের মানবতা, স্বাধীনতা, মর্যাদা এবং স্বার্থ গণতান্ত্রিক বিধানে সংরক্ষিত পাবে। তাই তারা তাদের সকল আশা ভরসা বিভিন্ন ধরনের স্বাধীনতা এবং নিশ্চয়তা-এর ওপর ন্যস্ত করে। মানব রচিত সংবিধান, সংসদীয় গণতন্ত্রও এমনি। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, বিচার ও আইন বিভাগীয় গ্যারান্টি এবং নির্বাচিত সংখ্যাগুরুর শাসন এবং এ জাতীয় সকল প্রতিষ্ঠানকে তারা বন্ধু ভেবেছে। অতপর তার পরিণাম কি হয়েছিলো? পরিণামে বিজয় হয়েছিলো পুঁজিবাদের। এ বিজয় সকল প্রকার গ্যারান্টি এবং বাহ্যিক আচরণকে শুধু সাইনবোর্ড বা কল্পনায় পরিণত করে দিয়েছে। অধিকাংশ মানুষ কতেক স্বৈরাচারী মানুষের নিকৃষ্ট দাসত্বে পতিত হয়েছিলো, যারা ছিলো মূলত মূলধনের মালিক। সাথে সাথে তারা সংসদীয় আধিক্য, মানব রচিত সংবিধান, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং অপরাপর গ্যারান্টির মালিকও হয়ে গেছে। যেগুলোর ব্যাপারে মানুষের ধারণা ছিলো যে, এগুলোই তাদের মানবতা, মর্যাদা এবং স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যিম্মাদার হবে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা তারা কখনো এতে অনুভব করেনি।

অতপর তাদের মধ্য থেকে একদল লোক ব্যক্তিগত বিধি বিধান– যেখানে মূলধন ও শ্রেণীর প্রাধান্য বেশী– থেকে পালিয়ে সামষ্টিক বিধি-বিধানের দিকে অগ্রসর হলো। এ প্রক্রিয়ায় তারা কী করেছে? তারা পুঁজিবাদী শ্রেণীর দাসত্বের পরিবর্তে সর্বহারা শ্রেণীর দাসত্বকে গ্রহণ করেছে অথবা মূলধন এবং কোম্পানীর দাসত্বের পরিবর্তে শাসকের পাশাপাশি সম্পদের অধিকারী গোটা দেশের দাসত্ব গ্রহণ করেছে। সুতরাং এ সামষ্টিক বিধি বিধান সব দিক থেকে (সমাজতন্ত্র) পুঁজিবাদী শ্রেণীর চেয়ে অধিকতর ভয়াবহ প্রমাণিত হলো।

উপরোক্ত সকল অবস্থা, পরিস্থিতি এবং বিধানে মানুষ মানুষের দাসত্ব করেছে। এক্ষেত্রে তারা তাদের ধন সম্পদকে বিভিন্ন প্রভুর সৌজন্যে কর হিসাবে নযরানা পেশ করেছে।

এটা ছিলো নিসন্দেহে দাসত্ব। এ দাসত্ব যদি একমাত্র আল্লাহর জন্যে নিবেদিত না হয়, তবে গায়রুল্লাহর জন্যে অবশ্যই তা উৎসর্গিত হবে। এটা সুবিদিত যে, একমাত্র আল্লাহর দাসত্বই মানুষকে মুক্ত, মর্যাদাবান, সুউচ্চ আসনে আসীন করে। পক্ষান্তরে গায়রুল্লাহর দাসত্ব মানুষের মানবতা, মর্যাদা, স্বাধীনতা এবং সদগুণকে প্রথমে বিনষ্ট করে এবং পরিশেষে তাদের ধন সম্পদ এবং বস্তুগত সুযোগ সুবিধাদিও বিনষ্ট করে দেয়।

এ সকল কারণে প্রভুত্ব এবং দাসত্বের বিষয়টি আল্লাহর বিভিন্ন কেতাব এবং রেসালাতে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। আলোচ্য সূরাটি গুরুত্বের একটি নমুনা মাত্র। এ বিষয়টি অতীতের সকল জাহেলী যুগের প্রতিমা পূজারীদের সাথেই সংশ্লিষ্ট নয়, বরং তা সকল যুগের সকল কালের গোটা মানব জাতি এবং তাদের সকল প্রকার জাহেলিয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এটা ইতিহাসপূর্ব জাহেলিয়াত, ইতিহাস পরবর্তী জাহেলিয়াত, বিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়াত এবং এমন প্রত্যেক জাহেলিয়াতকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, যা বান্দার দাসত্ব বান্দার জন্যে নিবেদন করার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ বিষয়ে সারকথা হচ্ছে এই যে, গোটা কোরআন বিশেষ করে আলোচ্য সূরার আলোচনা থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, দাসত্ব, আনুগত্য, অনুকরণ, অভিভাবকত্ব এবং সার্বভৌমত্ব– যাকে অত্র সূরায় এবাদাত শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে– এর বিষয়টি সম্পূর্ণত আকীদা, ঈমান এবং ইসলামের বিষয়। শুধু আইন, রাজনীতি বা বিধি-বিধানের বিষয়ই নয়।

নিসন্দেহে এটা আকীদা বিশ্বাসের বিষয়, আকীদা বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হোক বা না হোক। এটা ঈমানের ব্যাপার, ঈমানের অস্তিত্ব পাওয়া যাক বা না পাওয়া যাক এটা ইসলামের ব্যাপার, ইসলাম বাস্তবায়িত হোক বা না হোক। এটা বাস্তব জীবন বিধানের ব্যাপার, বিভিন্ন বিধি বিধান, নিয়ম নীতি এবং নির্দেশাবলীর আকারে তা বিভিন্ন সমাজে পাওয়া যাক আর না যাক।

অনুরূপভাবে এবাদাত শব্দটি আচার অনুষ্ঠানের মাঝেও সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটা দাসত্ব, আনুগত্য, অনুসরণ এবং বাস্তব জীবনের বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতি, বিধি বিধান এবং নিয়ম নীতিকেও অর্ন্তভুক্ত করে। এসব কারণেই এ বিষয়টি খোদায়ী বিধান তথা দ্বীন ইসলামে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। এ কারণেই যুগে যুগে বিভিন্ন নবী রসূলের আবির্ভাব হয়েছে এবং তারা বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্পেষণ ও নিপিড়নের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

বহুরূপী জাহেলিয়াতের শিকার মানবজাতি

এখানে আমি আলোচ্য সূরার বিভিন্ন ঘটনাবলী ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরবো এবং গোটা মানব ইতিহাসে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের আন্দোলনগত রেখার ওপর তার কি প্রভাব, তাও আমি উল্লেখ করবো।

আমি ইতিপূর্বে নূহ (আ.)-এর ঘটনা পর্যালোচনা করতে গিয়ে বর্ণনা করেছি যে, দ্বীন ইসলাম হচ্ছে প্রথম আকীদা যা বিশ্বমানবতা আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.), আমাদের দ্বিতীয় পিতা হযরত নূহ (আ.)-এর পরবর্তীতে বিভিন্ন নবী রসূলের মাধ্যমে ভালোভাবে জেনেছে। ইসলাম বলতে 'তাওহিদুল উলূহিয়্যাত' এবং 'তাওহীদুর রবুবিয়্যাত'কে বুঝায়। 'তাওহিদুল উলূহিয়্যাত' হচ্ছে আকীদা বিশ্বাস, চিন্তা চেতনা এবং এবাদাত ও আচার অনুষ্ঠানাদির দিক থেকে আল্লাহর একত্ববাদ। আর 'তাওহিদুর রবুবিয়্যাত' হচ্ছে, দাসত্ব, আনুগত্য, অনুসরণ অনুকরণ এবং আত্মসমর্পণের দিক থেকে রবের একত্ববাদ, ভাষান্তরে অভিভাবকত্ব, সার্বভৌমত্ব, নির্দেশনা এবং বিধান রচনার একত্ববাদ।

অতপর আমি জাহেলিয়াত বর্ণনা করেছি– এটা এক আকীদা বিশ্বাস, চিন্তা দর্শন। এবাদাত ও আচার অনুষ্ঠানাদির ক্ষেত্রে জাহেলিয়াত হতে পারে, কিংবা দাসত্ব, আনুগত্য, অনুসরণ অনুকরণ এবং আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রেও জাহেলিয়াত হতে পারে। অথবা উভয় প্রকার জাহেলিয়াতের আযাব এক সাথেও চলতে পারে– যুগে যুগে বিভিন্ন নবী রসূলের মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়ার পর বিশ্ব মানবতার ওপর এই জাহেলিয়াতই আসন গেড়ে বসেছিলো। এ জাহেলিয়াত গায়রুল্লাহর দাসত্বের মাধ্যমে তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা চেতনা বিনষ্ট করেছে, যেমন বিনষ্ট করেছে তাদের জীবন এবং তাদের পরিবেশ পরিস্থিতিকে। গায়রুল্লাহর এই দাসত্ব ব্যাপক। এটা বেশী, পাথর, গাছ, নক্ষত্র, তারা, আত্মা বা আত্মাসমূহের দাসত্ব হতে পারে কিংবা মানুষের দাসত্ব মানুষের ক্ষতিও হতে পারে– যেমন গণক, জাদুকর বা শাসকের দাসত্ব। এ যাবতীয় দাসত্ব আল্লাহর একত্ববাদ থেকে বিচ্যুতি ঘটিয়ে শেরেকের দিকে ধাবিত হওয়া এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে জাহেলিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়ার কারণেই দেখা দেয়। ভাব প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এরা এক ও অভিন্ন।

আল্লাহ পাক নির্ভুল কোরআনে হাকীমে যে সব ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন, সেই ধারাবাহিক ইতিহাস যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তাহলে আমাদের সামনে ওই বিধানের ক্রটি স্পষ্ট হবে, যে বিধানের অনুসরণ করে তুলনামূলক ধর্ম গবেষক বা পন্ডিতরা এ পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছে। অনুরূপভাবে ফলাফলের ক্রটিও স্পষ্ট হবে, যা তারা ওই বিধানের অনুসরণের মাধ্যমে আজ ভোগ করছে।

ক্রটিপূর্ণ বিধান এ জন্যে বলা হয়েছে, যেহেতু এ বিধান মানুষের নিকট পরিচিত বিভিন্ন জাহেলিয়াতের পথ অনুসরণ করে এবং তাওহীদের পথ বর্জন করে, অথচ এই তাওহীদের আহ্বান নিয়ে যুগে যুগে বিভিন্ন নবী রসূলের আগমন ঘটেছিলো। তারা জাহেলিয়াতের পথ অনুসরণ ও অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রেও জাহেলী যুগের নিদর্শনসমূহ যা কিছু সংরক্ষণ করেছে, তার শরণাপন্ন হয়েছে। আর ওই নিদর্শন ও পুরাকীর্তির ওপর নব্য ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ নব্য ইতিহাস গোটা মানব জাতির ইতিহাস সম্পর্কে খুব কমই জানে। এ সামান্য জ্ঞান মূলত ধারণা এবং নির্বাচনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এমনকি তারা যদি তাওহীদের কোনো নিদর্শনের কাছে উপনীত হয়, যা নবী রসূলরা যুগে যুগে বহন করে নিয়ে এসেছেন, আর সেটা যদি বিকৃত তাওহীদের নিদর্শনও হয়, যেমন পুরাতন মিসরীয় ধর্মে আখ্‌নাতুনের বিকৃত তাওহীদের কথা বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ.) এর সময় তারা তাকে অবজ্ঞা করে তাঁর তাওহীদের সুসংবাদ দেয়ার পর মিসরে আখনাতুনের আগমন ঘটে। কোরআনে করীমের সূরা ইউসুফে জেলখানায় দুই সাথীর প্রতি তার বক্তব্যকে বর্ণনা করেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আসল ব্যাপার হচ্ছে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং আখেরাত অস্বীকার করে, তাদের পথ পরিহার করে আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের পথ অবলম্বন করেছি। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। আসলে এটা আমাদের এবং সমগ্র মানব জাতির প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ (যে, তিনি আমাদের তাঁর ছাড়া আর কারোর বান্দা হিসাবে তৈরী করেননি)। কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না! হে আমার জেলখানার সাথী! তোমরা

নিজেরাই ভেবে দেখো, ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যক রব ভালো, না এক আল্লাহ, যিনি সবার ওপর বিজয়ী। তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের বন্দেগী করছো, তাতো শুধুমাত্র কতকগুলো নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃ পুরুষরা রেখেছো, আল্লাহ এগুলোর পক্ষে কোনো প্রমাণ পাঠাননি। শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নয়। তিনি হুকুম দিয়েছেন তোমরা তিনি ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করবে না। এটিই সরল সঠিক জীবন পদ্ধতি, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।' (সূরা ইউসুফ, আয়াত ৩৭-৪০)

তারা এ ধরনের কাজ এ জন্যে করতো যে, তাদের গোটা বিধান শুরু থেকে দ্বীনী বিধানের শত্রুতা এবং তাকে অস্বীকার করার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কারণ ইউরোপীয় গির্জা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাঝে প্রতিটি ক্ষেত্রে যুগে যুগে সংঘর্ষ হয়েছিলো। ফলে এই আদর্শের সূচনা হয় যে, গির্জার গোটা ধ্যান ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে হবে। কিন্তু তারা এ কাজ করতে গিয়ে গোটা গির্জার অস্তিত্বকে ধ্বংস ও বিলুপ্ত করতে চাইলো। এ কারণেই সূচনালগ্ন থেকে এ আদর্শ বিকৃতরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করতে লাগলো। কারণ এ আদর্শ এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করার পূর্বেই পূর্ব নির্ধারিত ফলাফলে পৌঁছে গেলো।

গির্জার বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব বিলোপ করার পর যখন এ আদর্শের গির্জার প্রতি তীব্র শত্রুতা প্রশমিত হয়ে এলো তখন উক্ত আদর্শ ধর্মহীন পথে চলতে লাগলো। কারণ এ আদর্শ যেই মূলের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হলো না।

যেহেতু আদর্শ ত্রুটিপূর্ণ সাব্যস্ত হয়েছে, সেহেতু ফলাফলও ত্রুটিপূর্ণ হওয়া একান্ত স্বাভাবিক।

তাদের আদর্শ ও ফলাফল যাই হোক না কেন, তাদের আদর্শের সিদ্ধান্তগুলো কোরআনে বর্ণিত আল্লাহ প্রদত্ত সিদ্ধান্তসমূহের মৌলিকভাবে বিরোধী। যদি একজন বিধর্মীর জন্যে কোনো বিষয়ে এমন ফলাফল গ্রহণ করা ঠিক হয়, যা আল্লাহর বাণীর সুস্পষ্ট বিপরীত, তবে একজন গবেষক যিনি নিজকে একজন মুসলমান হিসাবে দাবী করে স্বীয় গবেষণা কর্ম মানুষের সামনে উপস্থাপন করেন, তাঁর জন্যে ওই ধরনের ফলাফল গ্রহণ করা মোটেও বৈধ নয়। কারণ ইসলাম এবং জাহেলী মতবাদের প্রশ্নে, মানব ইতিহাসে জাহেলিয়াতের পূর্বে ইসলামের আগমন প্রশ্নে এবং শেরেকের পূর্বে তাওহীদের আগমন প্রশ্নে কোরআনের বর্ণনা ও সিদ্ধান্তসমূহ সুস্পষ্ট ও অকাট্য, যা কোনো প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে গ্রহণ করে না। এ সমস্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, এগুলো ইসলাম ধর্মের অত্যাবশ্যকীয় প্রমাণিত বিষয়সমূহের মধ্যে গণ্য। যার জন্যে কোনো দলীয় প্রমাণাদির প্রয়োজন হয় না। যারা এ বিষয়ে তুলনামূলক তথাকথিত গবেষকদের ফলাফল গ্রহণ করতে চায়, তাদের উচিত তারা যেন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা কি আল্লাহর বাণী গ্রহণ করবে, না ধর্ম গবেষকদের বাণী গ্রহণ করবে? অন্য ভাষায় তারা কি ইসলাম গ্রহণ করবে, না ইসলামহীনতা গ্রহণ করবে?

যাই হোক, এটা সর্বশেষ পর্যালোচনায় আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় নয়। মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, মানব ইতিহাসে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের গতিশীল পথ দর্শন। ইসলাম এবং জাহেলিয়াত মানুষের কাছে পালাক্রমে আসে। একটা যায়, আরেকটা আসে। শয়তান মানবীয় দুর্বলতা এবং দ্বৈত প্রকৃতি ও প্রবণতার এই সৃষ্টির গঠন প্রকৃতির সুযোগ গ্রহণ করে। মানুষ

ইসলাম সম্পর্কে সম্যক জানার পরও জাহেলিয়াত তথা জাহেলী মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তারা যখন জাহেলিয়াতের মাঝে হাবুডুবু খেতে থাকে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জাহেলিয়াত থেকে বের করে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্যে রসূল বা নবী পাঠান। নবী বা রসূল মানুষদের যে জিনিস থেকে প্রথম বের করে নিয়ে আসেন, তা হচ্ছে, গায়রুল্লাহ তথা অসংখ্য রবের দাসত্ব। তারা প্রথমত যে জিনিসের দিকে মানুষকে প্রত্যাবর্তন করতে বলেন, তা হচ্ছে, সকল বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করা– একমাত্র এবাদাত সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠানাদি বা শুধু অন্তরের আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই এটা সীমাবদ্ধ নয়।

উপরোক্ত দর্শন আজকের যুগের মানুষের অবস্থান নিরূপণ এবং ইসলামী দাওয়াতের প্রকৃতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অনেকটা সাহায্য করে। নিসন্দেহে আজকের যুগের মানুষ জাহেলিয়াতের দিকে ব্যাপক ভাবে ফিরে যেতে চায়, যা থেকে মানুষকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ (স.) একদিন উদ্ধার করেছেন। এ জাহেলিয়াতের কয়েকটি আকৃতি আছে।

প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহকে প্রত্যাখ্যান করা এবং তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। আকীদা বিশ্বাস এবং চিন্তা চেতনার জাহেলিয়াত। সমাজতন্ত্রীদের জাহেলিয়াত অনেকটা এই রকম।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিকৃত ধারণা এবং এবাদাত সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠানাদি, দাসত্ব, আনুগত্য ও অনুসরণ অনুকরণের ক্ষেত্রে গোমরাহী। পৌত্তলিক তথা হিন্দুদের জাহেলিয়াত এবং ইহুদী খ্রীষ্টানদের জাহেলিয়াত অনেকটা এরকম।

তৃতীয়টি হচ্ছে, আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশুদ্ধ স্বীকৃতি দেয়া এবং এবাদাত সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠানাদি যথাযথ পালন করা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আর মোহাম্মদ (স.) আল্লাহর রসূল এর সাক্ষ্যের ভাব হৃদয়ংগম করার ক্ষেত্রে বিপদজ্জক বিকৃতি এবং আনুগত্য এবং অনুসরণ অনুকরণের ক্ষেত্রে পূর্ণ শেরেকে লিপ্ত হওয়া। যেমন ওদের জাহেলিয়াত যারা নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে পরিচয় দেয় এবং তারা এটা মনে করে যে, শুধু কালেমায়ে শাহাদাত মুখে উচ্চারণ এবং এবাদাত সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠানাদি পালনের মাধ্যমেই তারা পূর্ণ মুসলমান হয়ে যাবে এবং ইসলামের বৈশিষ্ট্য এবং অধিকারসমূহ অর্জন করে ফেলবে। কালেমায়ে শাহাদাতের অর্থ ভালোভাবে হৃদয়ংগম না করলে এবং গায়রুল্লাহ তথা আল্লাহর বান্দার সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং এই স্বীকৃতিতে তাদের কিছু আসে যায় না।

এসবই জাহেলী মতবাদ এবং পূর্ববর্তীদের ন্যায় আল্লাহর অস্বীকৃতি এবং পরবর্তীদের ন্যায় আল্লাহর সাথে শেরেক করা।

তাওহীদের আহবানে সমাজের প্রতিক্রিয়া

আমরা যদি অধুনা বিশ্বের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে এ বিষয়টি আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হবে যে, বর্তমান বিশ্বমানবতা ব্যাপক জাহেলিয়াতের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়েছে এবং তারা জাহেলিয়াতের প্রতি এক ঘৃণ্য প্রত্যাবর্তন রোগে ভুগছে, যার থেকে ইসলাম বারবার তাদেরকে উদ্ধার করেছে।

ইসলামী মিশনের অগ্রপথিকদের এখন সময় এসেছে। যারা ঘৃণ্য জাহেলী মতবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে, তাদেরকে তার থেকে বের হয়ে পুনরায় ইসলামী জীবন বিধানে প্রবেশ করার জন্যে তারা আহ্বান করবে। সেই সাথে তারা মানুষের সামনে ইসলামের মৌলিক বক্তব্য পেশ করবে,

আর তা হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহকে মাবুদ হিসাবে বিশ্বাস করা, তাঁরই জন্যে এবাদাত সংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি নিবেদন করা এবং জীবনের যাবতীয় বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব, আনুগত্য ও অনুসরণ করা। এগুলো ছাড়া ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করা যায় না, মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য মানুষের জন্যে কল্পনা করা যায় না এবং ওই সমস্ত অধিকারও তাদের জন্যে নির্ধারিত হবে না, যা দ্বীন ইসলাম তাদের জন্যে তাদের জান মালে নির্ধারিত করে রেখেছে। উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের কোনো একটি কোনো মুসলমানের মধ্যে না পাওয়া যাওয়া, আর সবগুলো না পাওয়া যাওয়া একই কথা। এ অবস্থায় মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে জাহেলী মতবাদে ঢুকে পড়বে এবং তাদেরকে কাফের বা মোশরেক হিসাবে আখ্যায়িত করা হবে।

নিসন্দেহে এটা জাহেলী যুগসমূহের একটি নতুন রূপ, যা এসেছে ইসলামের আগমনের পরে। সুতরাং ইসলামী যুগের মধ্য থেকে একটি যুগকে এ যুগের মুখোমুখি হওয়া উচিত। যে ইসলাম মানুষকে পুনরায় আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনতে এবং মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে।

মুসলিম সমাজের আজ চূড়ান্ত এবং সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে, যারা মানব জীবনের ক্রান্তিলগ্নে ব্যাপক জাহেলিয়াতের দ্বার প্রান্তে উপনীত। চূড়ান্ত এবং সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া ইসলামী মিশনের অগ্রপথিকরা মানব ইতিহাসের এই ক্রান্তিলগ্নে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হবে না। তারা নিজেদেরকে মুসলমান ভাবা সত্তেও জাহেলী সমাজের সামনে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকবে।

প্রত্যেক রসূলকে তাঁর সমাজের লোকদের কাছে পাঠানো হয়েছে। দাওয়াতের সূচনালগ্নে প্রত্যেক রসূলই ছিলেন তাঁর সমাজের একজন মানুষ। তিনি তাদেরকে সহোদর ভাই হিসাবে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেন। এক ভাই অপর ভাইয়ের জন্যে যেমন কল্যাণ কামনা করে, তিনিও তাদের জন্যে ওই কল্যাণ কামনা করেন। যার প্রতি আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পথ প্রদর্শন করেন এবং যার ওপর তিনি নিজের মাঝে স্বীয় প্রভুর পক্ষ থেকে প্রমাণ পান। দাওয়াতের সূচনালগ্নে প্রত্যেক রসূলের সাথে তাঁর সমাজের এটাই ঘটে। আর দাওয়াতের সমাপনীতে প্রত্যেক রসূলের অবস্থানও হয় অভিন্ন।

সমাজের একদল লোক রসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওই আহব্বানের প্রতি ঈমান আনে, যা দিয়ে তাঁকে তাদের কাছে প্রেরণ করা হয়, তাঁর কথানুসারে তারা একমাত্র আল্লাহর এবাদাত বন্দেগী করে এবং তারা তাদের ঘাড় থেকে সৃষ্টির প্রতি দাসত্ব ও আনুগত্যের বন্ধনকে ছুঁড়ে ফেলে। এর মাধ্যমে তারা মুসলমান হয় এবং মুসলিম জাতিতে রূপান্তরিত হয়। পক্ষান্তরে সমাজের আরেকদল লোক সেই রসূলের ডাকে সাড়া না দিয়ে ওই ঐশী বাণীকে অস্বীকার করে, যা নিয়ে তিনি তাদের কাছে প্রেরিত হন। তারা গায়রুল্লাহ তথা সৃষ্টির দাসত্বে আবদ্ধ হয়। তারা তাদের জাহেলী মতবাদেই অবস্থান করে। তারা অন্ধকার থেকে বের হয়ে ইসলামের আলোর দিকে আসে না। এর মাধ্যমে তারা মোশরেক জাতি থেকে যায়।

রসূলের দাওয়াতের পর একটি সমাজ এভাবে দু'টি জাতিতে বিভক্ত হয়। একটি মুসলিম জাতি; অপরটি মোশরেক জাতি। রেসালাতের পূর্বে তারা যেরূপ একই জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলো, রেসালাতের পরে তারা সেই একই জাতির অন্তর্ভুক্ত থাকবেনা। যদিও জাতীয় ভাবধারা এবং

মূলের দিক থেকে তারা থাকে একটি জাতি। কিন্তু জাতীয়তাবাদ এবং মূলের বন্ধন এবং ভূমি এবং যৌথ স্বার্থের বন্ধন পূর্বের ন্যায় তাদেরকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। রেসালাতের আবির্ভাবের সাথে সাথে নতুন একটি বন্ধনের আত্মপ্রকাশ ঘটে, যা সমাজকে যেমন একত্রিত করে এবং তেমনি তাকে বিচ্ছিন্নও করে। আর তা হচ্ছে আকীদা বিশ্বাস, আদর্শ এবং দাসত্বের বন্ধন। আর এ বন্ধন একই সমাজের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করে দু'টি জাতিতে রূপান্তরিত করে। এ দু'জাতি কখনো এক হতে পারে না এবং এক সাথে অবস্থানও করতে পারে না।

কারণ এই দু'জাতির প্রত্যেকের আকীদা বিশ্বাসের মাঝে বিচ্ছিন্নতা প্রকাশ পাওয়ার পর রসূল (স.)-এবং তাঁর সাথী মুসলিম জাতি ঈমান দাসত্ব এবং আদর্শের ভিত্তিতে ওদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তারা মোশরেক জাতি থেকে পৃথক হয়ে যান। অথচ রেসালাতের পূর্বে তাদের ছিলো একই সমাজ, একই জাতি। দুটি আদর্শ দুভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করে এবং একটি সমাজ দুটি জাতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, যা কখনো পুনরায় একস্থানে একত্রিত হতে পারে না এবং একই সাথে বসবাসও করতে পারে না।

যখন মুসলমানরা আদর্শ এবং আনুগত্য ও দাসত্বের ভিত্তিতে সমাজের লোকদের থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের আলাদা করে দেন এবং তিনি মোশরেক জাতিকে ধ্বংস করে মুসলিম জাতিকে মুক্তি দেন। আমরা আলোচ্য সূরাতে যা দেখেছি, তার আলোকে বলতে পারি যে, এ নিয়মটিই ছিলো ইতিহাসে প্রচলিত।

মুসলিম মিশনের অগ্রপথিকদের সর্বত্র যে বিষয়টির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা উচিত, তা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা মুসলমান এবং তাদের সমাজের শত্রুদের মাঝে ততোক্ষণ এই পর্যন্ত বিভিন্নতা সৃষ্টি করেন না, যতোক্ষণ না মুসলমানরা তাদের শত্রুদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং তাদের সাথে বিচ্ছিন্নতার ঘোষণা না দেবে যে, অন্যরা শেরেকের ওপর বিদ্যমান। তারা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করবে যে, তারা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করে, তারা মোশরেকদের ভ্রান্ত অসংখ্য প্রভুর দাসত্ব করে না। তারা সমাজে প্রাধান্য বিস্তারকারী তাগুতদের অনুসরণ করে না। তারা ওই সমাজে থাকতে চায় না, যেখানে তাগুতরা এমন বিধি বিধানের মাধ্যমে শাসন করে, যার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দেননি।

মুসলমানরা যালেম মোশরেকদের থেকে পৃথক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ধ্বংস করেননি, যেহেতু মুসলমানরা নিজের সমাজের মোশরেকদের থেকে তখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি, তাদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে দাবী করেনি এবং তাদের দীন ওদের দ্বীন থেকে পৃথক, তাদের আদর্শ ওদের আদর্শ থেকে আলাদা এবং তাদের পথ ওদের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন তারা একথার সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়নি। তাই আল্লাহ তায়ালা এ দুই দলকে পৃথক করা, মোমেনদের সাহায্য এবং যালেমদের ধ্বংস করার তাঁর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে তখনো হস্তক্ষেপ করেননি।

মুসলিম মিশনের অগ্রপথিকদের এই প্রতিষ্ঠিত নিয়মটি অনুধাবন করা উচিত এবং এরই ভিত্তিতে তাদের গতিকে সুবিন্যস্ত করা উচিত।

মুসলমান এবং মোশরেকদের মাঝে এই বাস্তব পৃথকীকরণের পূর্বে আল্লাহর পথে আহ্বানের এই সময় অনেক দীর্ঘ হতে পারে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে আকীদা বিশ্বাস এবং চিন্তা চেতনার দিক থেকে তাকে ওদের কাছ থেকে পৃথক হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

একই সমাজের এই দুই জাতির মাঝে এই পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া খুব মন্থরগতিতে সম্পন্ন হতে থাকে। এই সময় আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের প্রচুর ত্যাগ তিতিক্ষা, কোরবানী, নির্যাতন নিষ্পেষণ এবং দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়। এ ওয়াদা বৃথা যাবার নয়। মানব ইতিহাসের প্রতি তাকালে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় যে, তিনি কখনো তাঁর ওয়াদা ভংগ করেন না।

আল্লাহর বিধান চূড়ান্ত ও সুস্পষ্ট, তিনি কখনো ওয়াদা খেলাফী করেন না। এ বিষয়টিকে অনুধাবন করা ইসলামী আন্দোলনের জন্যে নিতান্ত প্রয়োজন। এটা আল্লাহর চিরাচরিত বিধান, বিশেষ কোনো কাল বা স্থানের সাথে এটা সীমাবদ্ধ নয়। যেহেতু ইসলামী মিশনের অগ্রপথিকদের এই নতুন জাহেলিয়াতের মুখোমুখি হতে হয়, তাই মুসলিম উম্মারও উচিত এই নিয়ম অনুসরণ করা। দাওয়াতের শুরুর বিন্দু, সমাপনী এবং মাঝখানে তাদের কর্মসূচী নির্ধারণ করা। পাশাপাশি তাদের এ বিশ্বাস রাখাও নিতান্ত প্রয়োজন যে, আল্লাহর বিধান তাঁর নিজস্ব গতিপথে চলবেই, সর্বশেষ সাফল্য মুত্তাকীদের সপক্ষেই থাকবে।

আলোচ্য সূরার বিভিন্ন ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার ফলে আমাদের কাছে দ্বীন ইসলামের এই বিধান প্রকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

আলোচ্য সূরার এই বিষয়গুলো যখন রসূল (স.)-এর ওপর নাযিল হয়, তখন তিনি ছিলেন মক্কায়। তাঁর সাথের মুষ্টিমেয় মুসলমান মক্কায় আবদ্ধ ছিলো। ইসলামী দাওয়াত তাদের মাঝে স্থবির হয়ে পড়েছিলো। তাদের রাস্তা ছিলো দীর্ঘ বন্ধুর। তারা তাদের কোনো শেষ দেখতে পাচ্ছিল না। উক্ত সূরার ঘটনাবলী তাদের সামনে কন্টকাকীর্ণ রাস্তার পরিসমাপ্তি খুলে ধরে এবং তার বিভিন্ন স্তরের ভোগান্তি ও কষ্ট প্রকাশ করে। এ ঘটনাবলীর আলোচনা নির্যাতিত মানুষদের তাদের হাত ধরে বন্ধুর রাস্তা অতিক্রম করে সাহায্য করে এবং ওই পথে যাত্রা করতে তাদেরকে উৎসাহিত করে। এই ধারা মানব ইতিহাসের গোটা দাওয়াতী আন্দোলনের সাথেই যুক্ত ছিলো।

এমনিভাবে কোরআন সব সময় মুসলিম সারিতে গতিশীল ছিলো এবং তা মুসলিম সারিকে সব সময় নিরাপদ ও গতিসম্পন্ন করে রেখেছে। ইসলামী মিশনের অগ্রপথিকদের আল্লাহর পথে আহ্বান করার সাথে সাথে কোরআন তাদেরকে গতি সম্পন্ন করে তোলে।

এই মিশনের অগ্রপথিকদের মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে এই শিক্ষাটি গ্রহণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। তারা আন্দোলনের বিধান, পদক্ষেপ শুধু কোরআন থেকেই গ্রহণ করবে– অন্য কোথাও থেকে নয়।

উপরের আলোচনার দ্বারা এ বিষয়টিও পরিষ্কার হলো যে, মহাগ্রন্থ আল কোরআন শুধু তেলাওয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, যা শুধু বরকতের জন্যে পড়া হবে। বরং তা হচ্ছে চির ভাস্বর ও চিরঞ্জীব, প্রতি মুহূর্তেই তা যেন একটি গতিশীল জাতির ওপর নাযিল হচ্ছে। যার মাধ্যমে তারা পাবে গতি ও স্পন্দন। তার নির্দেশাবলী তারা অনুসরণ করবে এবং এতে বর্ণিত আল্লাহর ওয়াদাসমূহের প্রতিও তারা আশাবাদী হবে।

কোরআন তার রহস্যসমূহ মোমেন সম্প্রদায়ের সামনে খুলে ধরে, যারা কোরআনের ভাবকে বাস্তব জগতে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করে। কোরআন তার রহস্যসমূহকে কখনো ওদের সামনে উন্মোচন করে না, যারা একে শুধু বরকতের জন্যে তেলাওয়াত করে, যারা শুধু কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক শিক্ষা অর্জনের জন্যে একে পাঠ করে উপরন্তু যারা শুধু এর বর্ণনাভংগি অন্বেষণের

জন্যেই একে অধ্যয়ন করে, তারা এ কোরআন থেকে কখনো উল্লেখযোগ্য কোনো কিছু উদ্ধার করতে পারবে না, কারণ কোরআনে হাকীম এভাবে পাঠের বিষয়বস্তু হিসাবে নাযিল হয়নি, বরং এ কোরআন একটি আন্দোলন এবং দিক নির্দেশনার বিষয়বস্তু হিসাবে নাযিল হয়েছে।

যারা দ্বীন ইসলামের মাধ্যমে সীমালংঘনকারী এই জাহেলিয়াতের সম্মুখীন হয়, যারা পথভ্রষ্ট মানুষকে নতুন করে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্যে জেহাদ করে এবং যারা মানুষকে মানুষের দাসত্বের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে পৃথিবীর সব তাগূতের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে একমাত্র এরাই সত্যিকার অর্থে কোরআনে হাকীমকে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়। কারণ এর ফলে তারা এমন পরিবেশে জীবন যাপন করতে শুরু করে, যে পরিবেশে কোরআন নাযিল হয়েছিলো। তারা এখানে এমন প্রচেষ্টা চালায়, যেমনভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তারা যাদের ওপর প্রথমবার এ কোরআন নাযিল হয়েছিলো। তারা আন্দোলন এবং জেহাদের ভাষাকে অনুধাবন করে। কারণ তারা বিভিন্ন ঘটনাবলীর মাঝে এর প্রতিচ্ছবিত দেখতে পায়। সর্বশেষে এটা ছিলো তাদের সমস্ত দুঃখ কষ্ট, নির্যাতন ও নিষ্পেষণের প্রতিদান। আমি কি সত্যিই এটাকে প্রতিদান হিসাবেই আখ্যায়িত করবো? কখনও নয়, আল্লাহর শপথ, এটা প্রতিদান না– এটা তো আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ। এরশাদ হচ্ছে,

'হে নবী, বলো, এ জিনিসটি যা তিনি পাঠিয়েছেন– এটি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর মেহেরবানী। এ জন্যে তো লোকদের আনন্দিত হওয়া উচিত। তারা যা কিছু জমা করছে, সে সবের চেয়ে এটি অনেক ভালো।'

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর। যিনি অসীম করুণার আধার।

এক নযরে
তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'এর ২২ খন্ড

১ম খন্ড
সূরা আল ফাতেহা ও
সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ

২য় খন্ড
সূরা আল বাকারার শেষ অংশ

৩য় খন্ড
সূরা আলে ইমরান

৪র্থ খন্ড
সূরা আন নেসা

৫ম খন্ড
সূরা আল মায়েদা

৬ষ্ঠ খন্ড
সূরা আল আনয়াম

৭ম খন্ড
সূরা আল আ'রাফ

৮ম খন্ড
সূরা আল আনফাল

৯ম খন্ড
সূরা আত তাওবা

১০ম খন্ড
সূরা ইউনুস
সূরা হুদ

১১তম খন্ড
সূরা ইউসুফ
সূরা আর রা'দ
সূরা ইবরাহীম

১২তম খন্ড
সূরা আল হেজ্র
সূরা আন নাহ্‌ল
সূরা বনী ইসরাঈল
সূরা আল কাহ্‌ফ

১৩তম খন্ড
সূরা মারইয়াম
সূরা ত্বাহা
সূরা আল আম্বিয়া
সূরা আল হাজ্জ

১৪তম খন্ড
সূরা আল মোমেনুন
সূরা আন নূর
সূরা আল ফোরকান
সূরা আশ শোয়ারা

১৫তম খন্ড
সূরা আন নামল
সূরা আল কাছাছ
সূরা আল আনকাবুত
সূরা আর রোম

১৬তম খন্ড
সূরা লোকমান
সূরা আস সাজদা
সূরা আল আহযাব
সূরা সাবা

১৭তম খন্ড
সূরা ফাতের
সূরা ইয়াসিন
সূরা আছ ছাফফাত
সূরা ছোয়াদ
সূরা আঝ ঝুমার

১৮তম খন্ড
সূরা আল মোমেন
সূরা হা-মীম আস সাজদা
সূরা আশ শূ-রা
সূরা আয যোখরুফ
সূরা আদ দোখান
সূরা আল জাছিয়া

১৯তম খন্ড

সূরা আল আহকাফ
সূরা মোহাম্মদ
সূরা আল ফাতাহ
সূরা আল হুজুরাত
সূরা ক্বাফ
সূরা আয যারিয়াত
সূরা আত তূর
সূরা আন নাজম
সূরা আল ক্বামার

২০তম খন্ড

সূরা আর রাহমান
সূরা আল ওয়াক্বেয়া
সূরা আল হাদীদ
সূরা আল মোজাদালাহ
সূরা আল হাশর
সূরা আল মোমতাহেনা
সূরা আস সাফ
সূরা আল জুমুয়া
সূরা আল মোনাফেকুন
সূরা আত তাগাবুন
সূরা আত তালাক্ব
সূরা আত তাহ্‌রীম

২১তম খন্ড

সূরা আল মুলক
সূরা আল ক্বালাম
সূরা আল হাক্বাহ
সূরা আল মায়ারেজ
সূরা নূহ
সূরা আল জ্বিন
সূরা আল মোযযাম্মেল
সূরা আল মোদ্দাসসের
সূরা আল ক্বেয়ামাহ
সূরা আদ দাহর
সূরা আল মোরসালাত

২২তম খন্ড

সূরা আন নাবা
সূরা আন নাযেয়াত
সূরা আত তাকওয়ীর
সূরা আল এনফেতার
সূরা আল এনশেক্বাক
সূরা আল বুরুজ
সূরা আত তারেক
সূরা আল আ'লা
সূরা আল গাশিয়া
সূরা আল ফজর
সূরা আল বালাদ
সূরা আশ শামস
সূরা আল লায়ল
সূরা আল এনশেরাহ
সূরা আত তীন
সূরা আল আলাক্ব
সূরা আল ক্বদর
সূরা আল বাইয়্যেনাহ
সূরা আয যেলযাল
সূরা আল আদিয়াত
সূরা আল ক্বারিয়াহ
সূরা আত তাকাসুর
সূরা আল আসর
সূরা আল হুমাযাহ
সূরা আল ফীল
সূরা কোরায়শ
সূরা আল কাওসার
সূরা আল কাফেরূন
সূরা আন নাসর
সূরা লাহাব
সূরা আল এখলাস
সূরা আল ফালাক্ব
সূরা আন নাস